

الحل

আল-হাল্লু

জীবন সমস্যার সমাধান

ডক্টর আয়েয আল-কারনী



দারুস সালাম বাংলাদেশ



আল-হাদ্দু

জীবন সমস্যার সমাধান

মূল:

ড. আয়েয আল-কারনী

ভাষান্তর:

জুবাইর বিন আলতাফ

বইটি পড়ে ভালো
লাগলে এক কপি
হার্ডকপি কিনে
সংগ্রহে রাখুন



দারুস সালাম বাংলাদেশ

কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক প্রকাশনা

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯

E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

আল-হাল্লু

- মূল:

ড. আয়েয আল-কারনী

- ভাষান্তর:

জুবাইর বিন আলতাফ

- প্রথম প্রকাশ:

আগস্ট, ২০২০

- প্রকাশক:

মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ

- গ্রন্থস্বত্ব:

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

- পরিচালক:

ফাওযুল আযীম ফাওয়ান

- পরিচালনায়:

মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম

মোবাইল: ০১৯২৬ ২৭ ৩০ ৩৫

- মূল্য:

৫৪০ (পাঁচশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

ইহুদা

মা-বাবার প্রতি বিনম্র হাদিয়া,
যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার পথচলা,
যাঁদের শ্রম-সাধনায় আমার জীবন গড়া।

জুবাইর বিন আলতাক

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য । দরুদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর, এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের অনুসারীগণের উপর ।

এ বইটি এমন সব সমাধান সংবলিত, যা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত । কিছু সমাধান মহান পূর্বসূরি আলেমগণের অভিজ্ঞতালব্ধ । আর কিছু সমাধান মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন শাস্ত্রীয় মনীষী-মহামনীষী, আবিষ্কারক-সংস্কারক ব্যক্তিগণের অমর বাণী থেকে সংগৃহীত ।

বইটি যদি আপনার সংগ্রহে থাকে, তাহলে তা হবে আপনার আন্তরিক বন্ধু ও বিশ্বস্ত সফরসঙ্গী, যা আপনাকে প্রাজ্ঞ আলেমের ন্যায় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে, স্নেহপরায়ণ পিতার মতো ভুল শুধরে দিবে, বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় আপনার চিকিৎসা বাতলে দিবে । সর্বোপরি বইটি হবে আপনার জীবন পথের পাথর, যার প্রয়োজনীয়তা ফুরানোর নয়, নিঃশেষ হওয়ার নয় ।

ড. আয়েয আল-কারনী

অনুবাদের কথা

১

জীবন বিচিত্র । বৈচিত্র্যই হলো মানব জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য । এর শাখা-প্রশাখা যেমন বিস্তৃত, তেমন অসংখ্য । যুগের উন্নতি-অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহেও নিত্য-নতুন ডাল-পালা গজাতে থাকে । আবার কালের ঘাত-প্রতিঘাতে কিছু শাখা ক্রমশ মলিন নির্জীব হয়ে ঝড়ে পড়ে । অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা, বাসস্থান ও চিকিৎসা-অনুসঙ্গগুলো মানব-জীবনের সঙ্গে স্থায়ীভাবে জুড়ে আছে সত্য, তবে এর উপায় উপকরণ ও ধরন-ধারণে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে । ইতিহাসের পাতাজুড়ে সে পরিবর্তনের সাক্ষ্য বিদ্যমান ।

এর বিপরীতে জীবনের কিছু অনুসঙ্গ আরও বাস্তব, আরও চিরন্তন । জন্ম-মৃত্যু, রোগ-বিরোগ, রাগ-বিরাগ, অলসতা, অসুস্থতা, বিবাহ, পরিবার ও সমাজ ইত্যাদি তার অন্তর্ভুক্ত । কালের বিবর্তনে মানব সভ্যতার কতো পরিবর্তন ঘটেছে, তার মননশীলতার কতো বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু এ বিষয়গুলো ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে । আদম (আ.)-এর দু'পুত্রের মাঝে সংঘাতের যে নেপথ্য কারণ (হিংসা-বিশেষ) ছিল, আজও তা মানবজাতির স্বভাব-প্রকৃতিতে মিশে আছে । মানুষের ক্ষমতা নেই, সর্বোচ্চ সাধ্য-সাধনা করে, নিজেকে ভেঙ্গে-গড়ে তা থেকে মুক্ত হওয়ার । এ তো তার স্বভাবজাত, প্রাকৃতিক ।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতি অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে । অনেক নতুন সভ্যতা-সামাজিকতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে । সৃজনশীল শক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা তাকে দিয়েছে আধুনিক হতে অত্যাধুনিক জীবনোপকরণ, সম্মুখীন করেছে কঠিন-জটিল পরিস্থিতির । আবিষ্কার ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় জীবন-যাপন অনেকটা সহজসাধ্য হয়েছে সত্য, তার চেয়ে তিক্ত সত্য হলো, যান্ত্রিকতার কবলে তাকে অনেক জটিলতা ও প্রতিকূলতার শিকার হতে হচ্ছে ।

মানব-জীবনের স্বতসিদ্ধ ও চিরন্তন বিষয়, কালের বিবর্তনে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত অনুসঙ্গ এবং যুগের আধুনিকায়নে উদ্ভূত পরিস্থিতি, ইত্যাদি বিষয়ের বর্তমান চিত্র, তার সমস্যা-সংকট ও আমাদের করণীয় হলো এ বইয়ের প্রধান উপজীব্য।

বিষয়বস্তু:

কিতাবটিতে ষাটের অধিক বিষয়ের সমাধান পেশ করা হয়েছে, যার প্রতিটিই জীবনঘনিষ্ঠ, জীবন-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং মানবিকতা ও সামাজিকতায় সদা সক্রিয়; কিন্তু নানা সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত।

সমাধান:

প্রতিটি সমস্যার বর্তমান বাস্তবানুগ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কুরআন-সুন্নাহ, মহান পূর্বসূরিগণের অভিজ্ঞতা এবং সমসাময়িক জ্ঞানী-গুণীদের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট:

প্রতিটি আলোচনার শেষে যুক্ত হয়েছে একটি পরিশিষ্ট। যা শুধু কুরআন-সুন্নাহ ও ইতিহাসের মহা মনীষীগণের বাণী দ্বারা রচিত।

২

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ" قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: "لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".

তামীম আদ্দারী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

‘সদুপদেশ দেয়াই দীন।’

আমরা আরয করলাম:

‘কার জন্য উপদেশ?’

তিনি বললেন:

‘আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের, তাঁর রসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের।’ (মুসলিম, হাদীস নং: ১০০)

হাদীসশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম খতাবী (রহ.) হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

‘মুসলিম জনসাধারণের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষার অর্থ হলো, তাদের ইহকাল-পরকালের মঙ্গল ও কল্যাণের দিকনির্দেশনা দেওয়া এবং জীবন-জগতের সংকট ও প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণের পথ-পন্থা বাতলে দেওয়া।’

মানবজাতির কল্যাণ কামনায় ও হিতবাদী সাধনায় রাসূল ﷺ যে নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা করেছেন, দু’টি গভীর মর্মসমৃদ্ধ শব্দের’ মাধ্যমে তার সে প্রাণ ও প্রেরণায় মানবজাতিকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং মানবজাতির কাঁধে এ মহান দায়িত্ব অর্পন করেছেন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজ ও পরিবারের প্রত্যেকের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। জীবনের কোনো অঙ্গনেই তা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

তাই যুগে যুগে ইতিহাসের মনীষী ও মহামনীষীগণ মানবজাতিকে চিরকল্যাণ ও পরম সৌভাগ্যের পথ দেখিয়েছেন, সতর্ক করেছেন কালের দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে। এর মাধ্যমে তাঁরা মূলত নিজেদের উপর অর্পিত মহান দায়িত্বই পালন করেছেন।

এ মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশনা হলো, নিখাঁৎ একনিষ্ঠতা, ঐকান্তিকতা, কথা-কাজের সামঞ্জস্য এবং আচরণ-উচ্চারণের অভিন্নতা। তাতে মতলব হাসিল ও স্বার্থ সাধনের দূষণ থাকবে না, থাকবে না বণিক চিন্তাধারা ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য। যেকোনো সদাচার ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইসলামের এ নির্দেশনা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, হিতবাদী উদ্যোগ-আয়োজন এবং দিকনির্দেশনা ও হিতাকাঙ্ক্ষার অন্তরালে আজ স্বার্থবাদী উদ্দেশ্য হাসিল করার মানসিকতা প্রকট।

বিশ্বায়ন ও পুঁজিবাদের কবলে আজ কল্যাণ কামনা, হিতাকাঙ্ক্ষা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করার মতো মহৎ পবিত্র দায়িত্বটি মুনাফাবান্ধব বাণিজ্যক্ষেত্রের রূপ ধারণ করেছে, পরিণত হয়েছে অর্থ-বিনিয়োগ ও আয়-উপার্জনের অন্যতম মাধ্যমে। যেখানে ইসলাম ও আল-কুরআনের সতর্কবাণী হলো:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ২]

অর্থ: 'হে মু'মিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কর না।' (সা-ফ, ৬১: ২)

সেখানে এর বিপরীত ও বিচ্যুত প্রবণতা প্রবল হয়ে ওঠেছে। ব্যক্তি তার মানবিক উন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে এডভাইয়ার ও পরমর্শদাতার পেশায় প্রবৃত্ত হচ্ছে। চটকদার কথা ও নান্দনিক উপস্থাপনা দিয়ে দর্শক-শ্রোতাকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তারা এডভাইয়ারের কথা শুনছে, শুধু শুনছে না, যেন গোত্রাসে গিলছে; কিন্তু যেই হলরুম থেকে বেরিয়ে আসছে, অমনি সব উধাও। দর্শক-শ্রোতা আগের গদবাঁধা জীবনাচারে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে।

এর অন্যতম কারণ হলো, এডভাইয়ার হলেন প্রফেসনাল ও পেশাজীবী এডভাইয়ার। দর্শক-শ্রোতাকে তাক লাগিয়ে দেওয়া, তাদের মন্ত্রমুগ্ধের মতো সম্মোহিত করে রাখাই হলো তার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এরপর যদি কেউ তার কথায় উপকৃত হয়, তাহলে ভালো; না হলেও সমস্যা নেই। এর দায় অবশ্যই ব্যক্তিকে বহন করতে হবে; তবে এডভাইয়ারও তার আংশিক দায় এড়াতে পারে না।

ব্যক্তির অবহেলা-উদাসীনতার দায় কেন এডভাইয়ার বহন করতে যাবে?! কথা যৌক্তিক; কিন্তু উপদেশ প্রদান ও পামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিষয় অভিজ্ঞতালব্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত যে, আত্মোন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধির বিষয়ে যার কোনো গুরুত্ব নেই, জাতির অধঃপতন ও অধোগতি দেখে যার হৃদয় কাঁদে না, তার উপদেশবাণী কীভাবে শ্রোতার মর্মস্পর্শ করতে পারে?! তার দিকনির্দেশনা কীভাবে জাতির হৃদয়াত্মায় প্রভাব বিস্তার করবে এবং জীবন-জগতের বাস্তবতায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে?! তাই তো পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এমন কার্যকলাপের নিন্দা করে বলেছেন:

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ৩]

অর্থ: 'আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা তোমরা কর না।' (সা-ফ, ৬১: ৩)

এ জায়গাটিতে “আল-হালু” বইটি সফল সার্থক । কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে লেখকের জ্ঞানগভীরতা, ঈমান-আমলে তাকওয়াপূর্ণ জীবন-যাপন এবং জাতির মঙ্গল ও হিতাকাঙ্ক্ষায় তাঁর নিরন্তর চেষ্টা-সাধনাই এর বাস্তব প্রমাণ ।

৩

পবিত্র ওমরার সফরে “আল-হালু” বইটি নির্বাচন করেছেন মুহাম্মদ নাছির উদ্দীন । অনুবাদ থেকে শুরু করে প্রকাশকাল পর্যন্ত পরামর্শ ও সক্রিয় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সহযোগিতা করেছেন নঈম সিদ্দিকী । অল্প সময়ে কম্পোজ করে দিয়েছেন মাহবুবুর রহমান । তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন ।

অনুবাদ-শিল্পে যার একটি কথা^২ আমাকে অনেক খাটিয়েছে, তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি । আল্লাহ তা‘আলা তাঁর লেখা ও রচনা দ্বারা আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন ।

আল্লাহ তা‘আলা বইয়ের পাঠক, লেখক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইহকাল ও পরকালে বরকত দান করুন, খাতিমা বিল খাইর নসীব করুন ।

জুবাইর বিন আলতাফ

সাভার, ঢাকা

^২ ‘অনুবাদিত বইয়ের বাংলা পড়ে যদি মনে হয়, তা অন্য ভাষার অনুবাদ, তাহলে তা সার্থক অনুবাদ হতে পারে না ।’ -আহমদ হুফা ।

মূর্ছীপত্র

১. সমস্যা-সংকট -----	১৭
২. পারিবারিক সমস্যা -----	২৫
৩. সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপর্যয় -----	৩৫
৪. ফাসাদ ও দুর্নীতি -----	৪৩
৫. পারিবারিক সহিংসতা-----	৫৫
৬. ভাসাখুত -----	৬৫
৭. খেলাধুলা নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি ও পক্ষপাতিত্ব-----	৭৯
৮. ব্যর্থতা-----	৮৪
৯. মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের অবাধ্যতা -----	৯৩
১০. বিপদ-আপদ -----	১০০
১১. দেশাত্মবোধের অভাব -----	১২১
১২. তালুক ও ডিভোর্স -----	১২৮
১৩. নারী-নির্যাতন -----	১৩৪
১৪. আইবুড়োত্ব -----	১৪০
১৫. অবৈধ সম্পর্ক -----	১৪৭
১৬. খেয়ানত ও প্রতারণা -----	১৬০
১৭. নাস্তিকতা -----	১৬৯
১৮. শিরক -----	১৮১
১৯. বিদ'আত -----	১৮৯
২০. ওয়াসওয়াসা ও গুচিবায়ু-----	১৯৫
২১. রিয়া ও লৌকিকতা-----	২০৪

২২. মিথ্যা-----	২১০
২৩. পরনিন্দা ও চোগলখুরি-----	২১৭
২৪. নামাযে অবহেলা -----	২২৪
২৫. কঠোরতা ও রুঢ়তা -----	২৩৪
২৬. অহমিকা -আত্মগরিমা -----	২৪২
২৭. স্বার্থপরতা-----	১৪৭
২৮. অজ্ঞতা ও মূর্থতা -----	২৫২
২৯. হিংসা-----	২৫৮
৩০. ভয় -----	২৬৫
৩১. কৃপণতা -----	২৭৫
৩২. দুঃখ-বেদনা -----	২৮৩
৩৩. নিন্দ্রাহীনতা -----	৩০০
৩৪. হতাশা -----	৩০৫
৩৫. নেতিবাচক মানসিকতা -----	৩১১
৩৬. রাগ-ক্রোধ -----	৩১৮
৩৭. তাড়াহুড়া -----	৩২৬
৩৮. মতভেদ -----	৩৩০
৩৯. জুলুম-নির্যাতন -----	৩৩৪
৪০. বার্ষক্য -----	৩৪৭
৪১. রিবা -----	৩৫২
৪২. গুনাহ -----	৩৫৭
৪৩. বয়ঃসন্ধিকাল -----	৩৬৫
৪৪. চিন্তানৈতিক প্রান্তিকতা -----	৩৭১

৪৫. কারাগার ও কারাবাস -----	৩৮২
৪৬. স্থূলতা: ক্ষতিকর প্রভাব ও করণীয় -----	৩৮৭
৪৭. ধূমপান -----	৩৯১
৪৮. আসক্তি ও নেশা -----	৩৯৯
৪৯. অন্ধ অনুকরণ -----	৪০৫
৫০. যাদু -----	৪১৩
৫১. জাতীয়তাবাদ -----	৪২২
৫২. সমালোচনা -----	৯২৯
৫৩. কুরআন-বিমুখতা -----	৪৩৬
৫৪. বিস্মৃতি -----	৪৪৩
৫৫. সড়ক দুর্ঘটনা -----	৪৫২
৫৬. অবসর -----	৪৫৮
৫৭. অপচয় -----	৪৬৫
৫৮. দারিদ্র্য -----	৪৭৩
৫৯. দুর্বল ব্যক্তিত্ব -----	৪৮৫
৬০. গুজব -----	৪৯৮
৬১. প্রবাস-পরবাস -----	৫০২
৬২. অনধিকার চর্চা -----	৫০৮
৬৩. বন্ধ্যত্ব -----	৫১৪
৬৪. অসুস্থতা -----	৫২০
৬৫. মৃত্যু -----	৫৩৩

সমস্যা-সংকট

বিপদ-আপদ, সমস্যা-সংকট, দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও কালের ঘাত-প্রতিঘাত হলো মানব-জীবনের বাস্তব ও তিক্ত অনুসঙ্গ। তা জীবনের সাবলিলতা ও স্বতস্ফূর্ততায় বিঘ্নতা সৃষ্টি করে। মানবমনকে বিষণ্ণ ক্লান্তক্লিষ্ট করে ফেলে। তার মন-মানসিকতা ও ভাবনার জগতকে বিশ্রান্ত করে ছাড়ে। তবুও তা মানবজীবনের অবধারিত অনুসঙ্গ। মানুষের সাধ্য নেই তা এড়িয়ে যাওয়ার, তা থেকে স্থায়ী মুক্তি লাভ করার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَّاتِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ১৫৫]

অর্থ: ‘আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।’ (বাকারা, ২: ১৫৫)

“সমস্যার সমাধান” বিষয়টি নগণ্য সাধারণ নয়। সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আপনি যদি ভুল পথ-পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে ক্রমশ জটিলতা বৃদ্ধি পাবে, আপনি আরও কঠিন জটিল সমস্যায় ফেঁসে যাবেন।

সংকট কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে আপনি যদি সঠিক উপায় অবলম্বন করেন, বাস্তবানুগ কার্যকর পন্থা অবলম্বন করেন, তাহলে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতির মধ্য থেকেও আপনি সফলতার পথ খুঁজে পাবেন, প্রতিকূলতাকে অনুকূলতায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবেন।

জীবনের নানা সমস্যা-সংকট থেকে উত্তরণের পথ-পন্থা ও দিকনির্দেশনা নিয়েই “আল-হালু” বইটি রচিত।

আমাদের সঙ্গেই থাকুন, আমরা আপনাকে পরম শান্তি ও কাজিফত সৌভাগ্যের পথ দেখাব। সুখ-দুঃখ, সফলতা-বিফলতা, জয়-পরাজয়, শঙ্কা ও নিরাপত্তার মিশ্রণে গড়া জীবন চলার পথে আমরা আপনাকে মুক্তির উপায় বাতলে দিব। আপনার জন্যই পেশ করছি যেকোনো বিপদ থেকে মুক্তির বার্তা:

সমাধান:

১. যে কোনো সংকট থেকে উত্তরণের প্রথম চাবিকাঠি হলো, সংকট উপেক্ষা না করে তা মেনে নেওয়া এবং সংকট মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কেননা সমস্যা-সংকট হলো এমন জখম, আপনি তাকে যতোই উপেক্ষা করবেন, তা ক্রমশ ফুলে-ফেপে ভয়বহ আকার ধারণ করবে।
২. আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করুন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হোন এ জন্য যে, আপনি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, তার চেয়ে কঠিন সংকট ও মহাবিপদে আরও কতোশতো মানুষ জর্জরিত! সে তুলনায় আপনার বিপদ নিতান্ত নগণ্য।
৩. সমাধান উদ্ঘাটনের আগে সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে ভালোভাবে জানুন। এর পূর্বাপর ও অন্তর্গত খুটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখুন। এরপরই সমাধানের পথ সন্ধান করুন। এভাবে কার্যকর উপায় অবলম্বন করা সহজতর হবে।
৪. যেকোনো সমস্যা সমাধানে চতুর্মুখী চিন্তা-ভাবনা করুন এবং সমাধানের সকল পথ-পন্থা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করুন। তার মধ্যে যে পন্থাটি সবচেয়ে কার্যকর ও বাস্তবানুগ, সেটিই অবলম্বন করুন।
৫. বিশ্বাস রাখুন, যেকোনো সমস্যার সমাধান রয়েছে এবং এ বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিন। সমস্যাকে বড় করে না দেখে ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ করে ফেলুন। তাহলেই সংকট কাটিয়ে উঠা সহজ হবে এবং পরিস্থিতি অনুকূল হয়ে উঠবে। সমস্যা-সংকটকে যতো বড় করে দেখবেন, মনোবল দুর্বল হতে থাকবে এবং বিপদ কাটিয়ে উঠার মানসিকতা ক্রমশ শক্তিহীন ও নিস্তেজ হয়ে পড়বে।
৬. যেকোনো প্রতিকূলতার মুখে নিয়তির ফায়সালার প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখুন। আপনার ভাগ্যে যা অবধারিত হয়ে আছে, তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিন এবং তাতেই তুষ্ট থাকুন। জেনে রাখুন, আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা ব্যতীত কোনো অকল্যাণ আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۖ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ৫১]

অর্থ: ‘আপনি বলে দিন, আমাদের উপর কোনা বিপদ আসতে পারে না, কিন্তু তা-ই, যা আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক, আর মুমিনদের কর্তব্য, যেন নিজেদের যাবতীয় কাজ আল্লাহ তা‘আলারই প্রতি সমর্পণ করে রাখে।’ (তাওবা, ৯: ৫১)

৭. হতাশা ও নিরাশা-প্রবণতাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন নয়। তাহলেই তা আপনার উপর জেঁকে বসবে এবং আপনাকে পরাভূত করে ছাড়বে। সংকট মোকাবেলা এবং তা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে আপনি হীনম্মন্যতা ও মানসিক অক্ষমতার স্বীকার হবেন।

পরিস্থিতি যতো কঠিন ও জটিল আকার ধারণ করুক-না-কেন, মনোবল হারাবেন না। দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এবং আসন্ন সৌভাগ্যে আশাবাদী হয়ে সংকট কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করুন। আত্মবিশ্বাস ও নিরন্তর প্রচেষ্টাই আপনাকে পরম সৌভাগ্যে চূড়ায় পৌঁছে দিবে।

৮. আপনার সমস্যা সমাধানে সমাজের বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা গ্রহণ করুন; স্বজন-বন্ধুজনদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশনা:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [البقرة: ১৫৫]

অর্থ: ‘আর তাদের নিকট হতে বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকুন।’ (আলে-ইমরান, ৩: ১৫৯)

৯. সমস্যা সমাধানে ত্বরাপ্রবণ হবেন না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে স্থিরচিন্তে ভাবুন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাস্তবায়নের পূর্বে আরেকবার ভেবে দেখুন। ধীরস্থিরতা, চিন্তা-ভাবনা ও দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন আপনার অনুপম আদর্শ।

১০. সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছেন? কোনো সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না? তাহলে স্থান পরিবর্তন করুন। কেননা অনেক সময় স্থান-কাল-পাত্র

ব্যক্তির মধ্যে নেতিবাচক মানসিকতা ও নিরাশা-প্রবণতা সৃষ্টি করে। তাই এমন কোনো স্থানে চলে যান, যেখানে আপনি মানসিক প্রশান্তি বোধ করেন। এরপর সমস্যা-সমাধানে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং সঠিক সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

১১. যেকোনো বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে প্রতিদানের প্রত্যাশা করুন। বিপদের মুখে ধৈর্য ধারণ ও প্রতিদানের প্রত্যাশা আল্লাহ তা‘আলার নিকট আপনার মর্যাদা বৃদ্ধ করবে। নিয়তির ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন এবং আপনার যাবতীয় বিষয় আপন রবের যিম্মায় ন্যস্ত করুন।

১২. সংকট থেকে উত্তরণের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো আল্লাহ তা‘আলার প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলার প্রতি সুধারণা পোষণ করুন এবং তাঁরই কাছে আপনার যাবতীয় অভিযোগ-অনুযোগ প্রকাশ করুন। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি বারবার পাঠ করুন:

﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾ [الغافر: ৮৮]

অর্থ: ‘আর আমার বিষয়টি আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি।’
(গাফির, ৪০: ৪৪)

১৩. কিছু সমস্যা এমন, যার সমাধান দিতে পারেন বিজ্ঞ চিকিৎসক। যেমন: অসুস্থতা, রোগ-বিরোগ। ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া দোষণীয় কিছু নয়। উপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থতা ফিরে পেতে চিকিৎসকই হলেন আপনার অন্যতম সহায়ক।

১৪. সবার ও সালাতের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহ তা‘আলার পরম আশ্রয় গ্রহণ করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ১৫৩]

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! সবার ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবারকারীদের সাথে আছেন।' (বাকারা, ২: ১৫৩)

বিপদ যত কঠিনই হোক-না-কেন, সংকট যত ভয়ানকই হোক-না-কেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার সর্বোত্তম পন্থা হলো সবার ও সালাত। সুতরাং আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সম্ভ্রষ্টচিত্তে ধৈর্যধারণ করুন এবং বিনয়াবনত হয়ে নামাযে মশগুল হোন। রাসূল ﷺ যখন কোনো গুরুতর বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, নামাযে মশগুল হতেন। কেননা সবকিছুর চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার প্রধান মাধ্যম হলো নামায।

১৫. যতক্ষণ না মনের ভয়-সংশয় দূর হয়ে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা ফিরে আসে, আল্লাহ তা'আলার যিকির ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠে মগ্ন থাকুন। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতে যত্নবান হোন। মানসিক অস্থিরতা ও ভয় কাটিয়ে উঠার জন্য এবং আত্মিক স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করার জন্য আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত হলো শ্রেষ্ঠ উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿الْأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ২৮]

অর্থ: 'মনে রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।' (রা'দ, ১৩: ২৮)

নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় মাসনূন দু'আ পাঠ করুন। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অবহেলা ও গাফলতি ঠিক নয়। কেননা এ দু'আগুলো আপনার অকল্যাণ প্রতিরোধে মজবুত রক্ষাকবচ। তাতে এমন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিহিত আছে যা আপনার মন-মানসিকতায় ভয়ের ছাপ পর্যন্ত ফেলতে দিবে না।

১৬. কোনো ক্ষেত্রে যদি শঙ্কিত হন এবং সময়ের সাথে সাথে শঙ্কার মাত্রা বাড়তে থাকে, বিপদমুক্তির ওয়ীফা পাঠ করুন। বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি বারবার পাঠ করুন:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

অর্থ: ‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতোই না শ্রেষ্ঠ অভিভাবক।’

বিপদে-আপদে, বাধা ও প্রতিকূলতায় এ দু’আটি মু’মিনের পরম আশ্রয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۖ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤]

অর্থ: ‘যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেইসব লোক সমবেত হয়েছে; অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্ধিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল; আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক। অনন্তর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল, তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করেনি।’ (আলে-ইমরান, ৩: ১৭৩-১৭৪)

১৭. যেকোনো বিপদ ও সংকট হলো মেঘের মতো-তার শুরুতে বিজলির বিস্ফোরণ ও মেঘের তর্জন-গর্জন, আর পরিশেষে শীতল বৃষ্টি ও আল্লাহ তা‘আলার রহমত। কিংবা বিপদ হলো কাঁচা দুধের ফেনার মতো-কিছুক্ষণ ফুলে-ফেপে থাকে, পরক্ষণেই তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে শুধু কাঁচা খাঁটি দুধ। পবিত্র কুরআনের এর সুন্দর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে:

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي

الْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٧]

অর্থ: ‘অতঃপর ফেনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়, আর যা মানুষের উপকার করে, তা যমীনে থেকে যায়।’ (রা‘দ, ১৩: ১৭)

পারিশিষ্ট:

- ❖ হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন:

قُلْ لِلْعُيُونِ إِذَا تَسَاقَطَ دَمْعُهَا اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ هَمِّي وَأُخْزَانِي.

قُلْ لِلْفُؤَادِ إِذَا تَعَاطَمَ كَرْبُهُ رَبُّ الْفُؤَادِ يُلْطِفُهُ يَرْعَانِي.

قُلْ لِلْأَسَى فِي الْقَلْبِ يَكْبُرُ إِنَّمَا فَرَجُ الْإِلَهِ إِذَا أَتَى يَغْشَانِي.

অর্থ: ‘অশ্রু-ঝরা চোখকে বলুন, ‘আমার কষ্ট-যাতনার চেয়ে আল্লাহ অধিক মহান।’

কঠিন সংকটে-জর্জরিত মনকে বলুন, ‘তোমারা প্রভু নিজ অনুগ্রহে তোমাকে রক্ষা করবেন।’

মনের মধ্যে জমাট-বাঁধা প্রবল কষ্ট-যাতনাকে বলুন, ‘আমার রবের পক্ষ থেকে মুক্তির ফায়সালা যখন কার্যকর হবে, হৃদয়মন প্রশান্তিতে ভরে উঠবে।’

- ❖ স্কটিশ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘আকাশের গাঢ় অন্ধকারের মাঝেই আপনি উজ্জ্বল তারকার সন্ধান পাবেন।’

- ❖ মানবসম্পদ বিকাশের ক্ষেত্রে লেখক, প্রশিক্ষক ও প্রভাষক, ইবরাহীম এলফিকি (১৯৫০-২০১২ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘একটা সমস্যার জন্য যার রয়েছে একাধিক সমাধান, সে-ই পেয়েছে সফলতার শীর্ষ চূড়ার সন্ধান।’

- ❖ বিখ্যাত মার্কিন ইতিহাসবেত্তা ও কূটনীতিক ওয়াশিংটন আরভিং (১৭৮৩-১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতার কবলে গড়পড়তা মানসিকতা ধ্বসে পড়ে। আর মহৎপ্রাণ ও দৃঢ় মনোবল আরও মহৎ ও সুদৃঢ় হয়ে উঠে।’

❖ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) (১৫০-২০২ হি.) বলেছেন:

‘সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা করে। দৃঢ় প্রত্যয় তাকে অতিরঞ্জন ও অবহেলা থেকে মুক্ত রাখে। গভীর চিন্তা-ভাবনা ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা সমৃদ্ধ হয়, এবং বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শের দ্বারা মনোবল পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চিন্তা-ভাবনা করুন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পূর্বে পরামর্শ করুন।’

পারিবারিক সমস্যা

বিবাহিত জীবনের মূল উদ্দেশ্য হলো, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদে না জড়িয়ে নির্বাণ্ণাট প্রশান্তিময় জীবন-যাপন করা। কিন্তু নিয়তির চিরাচরিত রীতি হলো, পরিবেশ-পরিস্থিতি সবসময় বান্দার অনুকূল হয় না। মানুষ চাইলেও সবসময় নিজ ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না।

এ পর্যায়ে একটি বিষয়ে হয়ত সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যতই পারস্পরিক বোঝাপড়ার সমন্বয়ে গড়ে উঠুক, যতই আন্তরিক ভালোবাসাপূর্ণ হোক, সম্পর্ক যতই সুদৃঢ় মজবুত হোক, পৃথিবীর কোনো একটি ঘর, কোনো একটি পরিবারও পারিবারিক সমস্যামুক্ত নয়।

তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যখন সমস্যা সমাধানে সচেষ্টিত হবে, এ লক্ষ্যে কাক্ষিত পথ-পন্থা অবলম্বন করবে, তখন পরিবারে নিজেদের মাঝে কদাচিত ঘটে যাওয়া নানা অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রীতিকর পরিস্থিতিগুলো তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটাতে পারবে না, সম্পর্কের মাঝে এক বিন্দু চির ধরাতে পারবে না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কেউ যদি শুরুতেই পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সচেষ্টিত না হয়, তাহলে অতিসামান্য নগণ্য বিরোধও দিন দিন বাড়বাড়ন্তের রূপ ধারণ করবে এবং তার নিষ্পত্তিও দুরূহ হয়ে উঠবে।

স্বামী-স্ত্রীর বিরোধের বড় ক্ষতি হলো, তা শুধু পারিবারিক জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে না; জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানা জটিলতা সৃষ্টি করে এবং মন-মানসিকতা বিদগ্ধটে করে তোলে। যেমন: কর্মস্থলে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, আত্মীয়স্বজনের সাথে ও নিজের আচার-আচরণে।

যে ব্যক্তি নিজ ঘরেই স্ত্রীর সঙ্গে নির্বাণ্ণাট প্রশান্তিময় জীবনযাপন করতে পারে না, সে পৃথিবীর অন্য কোনো ক্ষেত্রেই ঝামেলামুক্ত সুস্থির থাকতে পারবে না।

তাহলে এই জটিল সমস্যার সমাধান কীসে?

সমাধান:

১. স্বামী যখন রাগ করবে, স্ত্রী যেন নিশ্চুপ থাকে। স্ত্রী যখন রাগ করবে, স্বামীও যেন কোনো প্রত্যুত্তর না করে। উভয় দিকে থেকে ক্ষুব্ধ মনোভাব ও আক্রমণাত্মক মানসিকতা-তা নেভানো বড় দায়। এর জেড় ধরে ঘটে যেতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা।
২. বিবাদ-বিসংবাদে না জড়িয়ে আলোচনা ও সমঝোতার পথ অবলম্বন করুন। পরস্পর গালমন্দ করে, মারপিট করে এবং সর্বশেষ তালাক দিয়ে সম্পর্কের ইতি টানার চেয়ে এটাই প্রকৃত সমাধানের পথ।
৩. স্বামীর উদ্দেশ্যে বলছি, প্রথম সাক্ষাতেই হাসিমুখে সালাম প্রদান করুন, উত্তম কথা বলুন। হাসিমুখে বিনম্র কথা ও আন্তরিক আচার-আচরণও অনেক কঠিন ও জটিল সমস্যার সহজ সমাধান।
৪. স্বামী-স্ত্রী, আপনাদের কেউ ভাববেন না যে, পৃথিবীর কোনো পরিবার কিংবা কোনো একটি ঘর পারিবারিক সমস্যামুক্ত ছিল কিংবা আছে। এমনকি রাসূল ﷺ-এর ঘরও এ ধরনের সমস্যা হতে মুক্ত ছিল না। অন্যদের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সচরাচর বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। সমস্যার সমাধানের পথ বেছে নিয়েই চলতে হবে।
৫. ধৈর্যধারণ করা, সহনশীলতা অবলম্বন, ক্রোধ দমন করার মানসিকতা অর্জন করুন। এগুলো হলো শ্রেষ্ঠতম মানবিক গুণাবলি। সুতরাং এ ধরনের গুণাবলি অর্জনে সচেষ্ট হোন এবং জীবনাচারে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করুন। নিজেদের সন্তানদেরও এ ধরনের মহৎ গুণাবলির শিক্ষা দান করুন।
৬. পারিবারিক যেকোনো বিষয় ভালোভাবে না বুঝে, যাচাই না করে তড়িৎ লক্ষ্যবাক্য করা উচিত নয়। অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানোর প্রবণতা, আগপিছ না ভেবে নিজের যেকোনো ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটানোর মানসিকতা পরিহার করতে হবে। অন্যথায় যে বিপত্তি ঘটবে, তা হয়ত আপনার পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না। আল্লাকে ভয় করুন এবং নিয়তির ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন। এতেই আপনার পারিবারিক প্রশান্তি নিহিত।

৭. পরিবারে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তবে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা হবে অগ্নিনির্বাপণ টিমের মতো-আগুন নেভানোর জন্য তারা যেমন নিরাপদ দূরত্বে থেকে আগ্রাপণ চেষ্টা করে, স্বামী-স্ত্রীও তেমনি সমস্যার গভীরে না গিয়ে তা থেকে উত্তরণের পথ অবলম্বন করবে।
৮. স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সন্তানদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়ে থাকুন। পরিবারের সবার মাঝে শ্রেষ্ঠ আদর্শবান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিন। পরিবারের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ, শোরগোল-চেচামেচি থেকে বিরত থেকে সুখ-শান্তি ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখুন। ফলে আপনার ঘর হবে জান্নাতের টুকরো।
৯. স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর সাংঘাতিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে, নিজেদের পক্ষে মীমাংসা করা সম্ভব না হয়, তাহলে মধ্যস্থতা করার জন্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে ও স্বামীর পক্ষ থেকে বিজ্ঞজনদের দ্বারস্থ হতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর কল্যাণ বিবেচনা করে তাদের ন্যায়ানুগ ও আন্তরিক ফায়সালা বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে হবে।
১০. উত্তম হলো, কিছুকাল পরপর একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের হতে পৃথক থাকা। এ সময়ে প্রত্যেকেই পারিবারিক দায়দায়িত্ব থেকে অবসর যাপন করবে। নিজেকে নিয়ে একান্তে সময় কাটাবে। ফলে গতানুগতিক সাংসারিক জীবনের একঘেয়েমি দূর হবে, পাশাপাশি সামান্য সময়ের দূরত্বের কারণে তাদের মধ্যে প্রীতি ও ভালোবাসার নতুন মাত্রা যোগ হবে। জীবনে একজন অপরজনের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।
১১. স্বামীর কর্তব্য, কখনো তালাক ও ডিভোর্সের চিন্তা মনে স্থান না দেওয়া। কেননা তালাক হলো আল্লাহ তা'আলার নিকট বৈধ; কিন্তু সর্বাধিক ঘৃণিত। তালাক ও ডিভোর্স স্বামী-স্ত্রীর জন্য যতটা না বেদনাদায়ক, সন্তানদের জন্য তার চেয়ে বেশি মর্মবিদারক। তবে হ্যাঁ, যদি তালাক ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উপায় না থাকে, তবে ভিন্ন বিষয়। কেননা সর্বশেষ চিকিৎসা হলো, অপারেশন করে কেটে ফেলা।

স্বামীর জন্য কিছু বিশেষ বার্তা:

১২. যখন আপনি ঘরে আসবেন, হাসিমুখে সালাম প্রদান করুন, উত্তমভাবে কথা বলুন। পরিবারের সবার সাথে হাস্যরসিকতায় মেতে উঠুন। ঘরের সবাইকে আনন্দ-উৎফুল্লতায় ভরিয়ে দিন।
১৩. স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত যত্নবান হোন। কেননা সে তার পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ি ছেড়ে, শৈশব-কৈশোরের হাজারো হাসি-আনন্দের স্মৃতি পেছনে ফেলে আপনার টানে চলে এসেছে; আপনার স্বার্থে নিজের অতীত ফেলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিবারের কল্যাণে উৎসর্গ করেছে।
১৪. কখনো স্ত্রীকে এটা বোঝাতে যাবেন না যে, আপনি সঠিক আর সে ভুল; বরং মতভিন্নতা ও সমস্যার শুরুতেই নিজেকে দমিয়ে রাখুন। তার সমস্ত কথা মেনে নিয়ে ভুল স্বীকার করে নিন।
১৫. বিরোধ ও উচ্চবাচ্যের মুহূর্তে নমনীয় সুরে বারবার 'দুঃখিত'-'দুঃখিত' বলতে থাকুন। আপনার এমন আচরণ তার অভিযোগ-অনুযোগের মাত্রা কমিয়ে দিবে। তার রাগ ও ক্রোধের আগুনে শীতল পানি ঢেলে দিবে।
১৬. স্ত্রীর সামনে কখনো নিজের সঠিকতা ও যথার্থতার, আর তার বেঠিকতা ও অনর্থকতার ওপর যুক্তি-প্রমাণ পেশ করবেন না। এতে আপনাদের মাঝে বিদ্যমান সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করবে।
১৭. স্ত্রীকে তার অভিযোগ-অনুযোগগুলো স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ দিন। নীরবে বিনম্রভাবে তার কথাগুলো শুনে যান; কোনো প্রত্যুত্তর করবেন না। নিজেদের মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ মেটানোর এটাই প্রথম সমাধান।
১৮. পরিবারের মাঝে উচ্চবাচ্য ও হুম্বিতম্বি করে নিজেকে হয়ত কর্তৃত্ববান পুরুষের ভূমিকায় সাময়িক দাঁড় করানো যাবে; কিন্তু কখনই ভাববেন না, এভাবে আপনি স্ত্রীর সামনে নিজেকে সুপুরুষ হিসেবে প্রমাণিত করতে পারবেন, তার মন জয় করতে পারবেন, কিংবা তাকে বাগে আনতে পারবেন; বরং হিতে বিপরীত হবে, আপনার কাছে তার মূল্যহীনতার বিষয়টি তার মানসিক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। একপর্যায়ে সে আপনার থেকে একেবারেই বিমুখ হয়ে যাবে।

১৯. ঘরের প্রতিটি বস্তুই প্রশংসা করুন। এমনকি রান্নাঘরের চামচ, ছুরি ও খাবার প্লেটের ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কারের বিষয়টিও আগ্রহভরে বলে যান। এভাবে মুহূর্তেই তার মন জয় করে নিতে পারবেন।
২০. কল্পনার রাজ্যে বাস করে স্ত্রীর কাছে এমন কিছু প্রত্যাশা করা সমীচীন নয়, যা শুধু জান্নাতের হ্র গেলমানদের বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে বাস্তবতা মেনে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় তুষ্ট থাকাই কর্তব্য।
২১. স্ত্রীকে কখনো অন্য মেয়ের সাথে তুলনা করতে যাবেন না। আপনার বোনের মেধা, মাতার ধৈর্য-সহনশীলতা কিংবা দাদির মহানুভবতা, অথবা খালার বিশ্বস্ততা ইত্যাদির কোনোটিই তার কাছে আলোচনায় তুলবেন না। আপনি শুধু আন্তরিকভাবে তার প্রশংসা করে যান।

স্ত্রীর জন্য কিছু বিশেষ বার্তা:

২২. বোন আমার! স্বামীর মধ্যে কখনো এমন বৈশিষ্ট্য খুঁজতে যাবেন না, যা শুধু ফেরেশতা ও নবীদের মাঝেই সম্ভব। মানুষ মাত্রই ভুল ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতার পাত্র। আল্লাহর ফায়সালায় আপনি যাকে পেয়েছেন, তাতেই তুষ্ট থাকুন।
২৩. আপনার ঘরটিকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে রাখুন, যেখানে স্বামী দিনের কর্মব্যস্ততা ও দুনিয়ার ঝঙ্কিঝামেলা শেষে পরম স্বস্তি খুঁজে পাবে।
২৪. স্বামীর আগমনে হাসিমুখে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তার সাথে উত্তমভাবে ও প্রফুল্লচিত্তে কথা বলুন। তাকে পেয়েই নানা সমস্যা ও সংকটের আলোচনা পাড়তে শুরু করবেন না।
২৫. মানুষ মাত্রই প্রশংসা পেতে ভালোবাসে। প্রশংসার কথা শুনে খুশী হয়। আপনি তার ছোট ছোট কাজ হতে শুরু করে পরিবারের গুরুদায়িত্ব পালনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা করুন।
২৬. যে গুণগুলো আপনার স্বামীর মধ্যে নেই, তার প্রশংসা করাও আপনার জন্য বৈধ। কৃত্রিমভাবে সে গুণগুলোর কথা বলে তাকে খুশী করাতে বাধা নেই। যেমন: অতি কৃপণ কিংবা মিতব্যয়ী স্বামীকে খুশী করার

জন্য তাকে বলা যেতে পারে: 'আপনি কত উদার দানশীল! ঠিক যেমন হাতেম তাঈ!'

২৭. সর্বদা স্বামীর পজেটিভ ও ইতিবাচক দিকগুলো লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তা'আলা তাকে যে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, তা ভুলে গেলে চলবে না। মানুষ হিসেবে স্বামীর মধ্যে যে ক্রটিবিচ্যুতি রয়েছে, আলোচনার মাধ্যমে ও সুকৌশলে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করুন।
২৮. মনে রাখবেন, যে তার পরিবারের মাঝে সুখী হতে পারে না, সে জীবনের অন্য কোনো অঙ্গনেই সুখী হতে পারে না। সুতরাং আপনি স্বামী ও পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের দোষক্রটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। এতেই আপনার পরিবারের যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত।
২৯. অন্যের গুণগ্রাহিতা হলো অন্যতম মানবিক বৈশিষ্ট্য। কারো উত্তম কথা ও ইতিবাচক আচরণের বিষয়টি মুখে স্বীকার করাও মানবতা ও ধার্মিকতার শামিল। তাই অকপটে পরিবারের যে কারো অবদান ও কৃতিত্বের কথা স্বীকার করুন।
৩০. স্বামী বাড়িতে থাকাকালীন তাকে সময় না দিয়ে টিভি, মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকা সমীচীন নয়। এতে আপনার প্রতি স্বামীর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা হারাবে।

পারিবারিক সমস্যা সমাধানের যথার্থ উপায়:

স্ত্রীর সাথে যখন মতবিরোধ দেখা দিবে, বাকবিতণ্ডা শুরু হবে, আপনি তখন নীরব ভূমিকা পালন করুন। বাধা না দিয়ে, উচ্চবাচ্য না করে তাকে স্বাধীনভাবে বলতে দিন। 'তুমি ভুল বলছ, মিথ্যা বকছ'—এ ধরনের কিছু বলা থেকে বিরত থাকুন। তার মনে যত নালিশ আছে, যত অভিযোগ-অনুযোগ জমে আছে, এক-এক করে সব বলতে দিন। নারীরা এভাবে বলে সুখ পায়। স্বামীকে মনের খেদ জানাতে পারলে মানসিকভাবে হালকা বোধ করে। সুতরাং এমন মুহূর্তে আপনি আত্মসমর্পণের মানসিকতা অবলম্বন করুন। তার কোনো কথার প্রত্যুত্তর করতে যাবেন না, ন্যায়সংগতভাবেও না। নিশ্চুপ থেকে তার কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করুন। কথা শেষ হলে তার সমস্ত কথা মেনে

নিয়ে ভুল স্বীকার করে নিন। তাকে এ বলে সান্ত্বনা দিন, 'তুমি যা বলেছ, সবই সত্য। স্বীকার করছি, আমিই ভুল ছিলাম। আমি তওবা করছি, তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর কখনো এমন হবে না।'

স্ত্রী আপনাকে অনর্থক ভুল বুঝে থাকলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপনি ধৈর্যধারণ করুন। তার সামনে নমনীয় হয়ে থাকুন। মনে রাখবেন, এসব ক্ষেত্রে শয়তান আপনাদের নিয়ে খেলায় মেতে উঠে। তাকে পরাভূত করাই মূল উদ্দেশ্য; স্ত্রীকে নয়। তাই স্ত্রীর কথা ভুল হলেও মেনে নিন, শয়তানের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিন।

মনে রাখবেন, নারীরা স্বভাবগতভাবেই অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের, সদয় প্রকৃতির। পুরুষের তুলনায় সে অনেক উদার, মহৎ। নিজে অসুস্থ হলেও সে আপনার সেবার ক্ষেত্রে কোনো কার্পণ্য করবে না। সন্তান ও স্বামীর অবস্থান হলো তার হৃদয়ের গহিনে, অন্তরের অন্তস্তলে। নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে সে তাদের সেবা করে।

কিন্তু সামান্য বিবাদেই যদি স্বামী, স্ত্রীর প্রতিটি কথার প্রত্যুত্তর করতে থাকে, কথায়-কথায় তাকে ভুল প্রমাণিত করায় প্রবৃত্ত হয়, স্ত্রী আরও উচ্চবাচ্য করতে শুরু করবে। রেগে অপমানে অগ্নিশর্মা হয়ে স্বামীকে গালমন্দ করা শুরু করবে। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর পাঁটাপাল্টি অভিযোগ খণ্ডন ও বাকবিতণ্ডা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছবে, একে অন্যের গায়ে হাত তুলতেও পরোয়া করবে না। মারপিট ও ঘাত-প্রতিঘাতের মুহূর্তে, রাগ-ক্ষোভের চূড়ান্তে স্বামীর মুখ ফস্কে তিন তালাকের শব্দ বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। ফলে মুহূর্তেই দীর্ঘদিনের সাজানো সংসার, প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তখন উভয় পক্ষের শত আফসোস-অনুতাপেও কোনো কাজ হবে না।

তার চেয়ে বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি উদার ও মহৎপ্রাণের অধিকারী হয়, পরস্পর নমনীয় মানসিকতা ধারণ করে, নির্বিবাদে ভুল স্বীকার করে নেয়, তাহলে পারিবারিক খুঁটিনাটি সমস্যা জটিল আকার ধারণ করবে না। নিজেদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ থেকে শুরু করে অনেক জটিল সমস্যাও দু-এক কথায় কিংবা পরস্পর বোঝাপড়ায় মিটে যাবে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস, প্রীতি ও ভালোবাসার সবচেয়ে মহান আখ্যানটি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খাদীজা (রা.)-এর। ইতিহাসে তা এক প্রবাদতুল্য আখ্যান। নবুয়তের সূচনা লগ্নে ও দ্বীনের দাওয়াতের প্রথম দাওয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনের কঠিন সময় পার করছিলেন, তখন সর্বপ্রথম খাদীজা (রা.) তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। দৃঢ়চেতা সাহসী সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছেন। ভয়ে সাহস যুগিয়েছেন। নিরাশার মুহূর্তে আশার সঞ্চার করেছেন। বিপদে সাহায্য দিয়ে, আপন রবের ওপর ভরসা করে সামনে চলার সাহস জুগিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের সেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে খাদীজা (রা.)-এর ভূমিকা এতটা গুরুত্ব ও মহত্বপূর্ণ ছিল যে, একবার স্বয়ং জিবরাঈল আমীন রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করলেন:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ
أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي
وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ

(صحيح البخاري) ৩৭/৫

অর্থ: ‘হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! ঐ যে খাদীজাহ (রা.) একটি পাত্র নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী, অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের খোশ খবর দিবেন, যার অভ্যন্তর ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার শোরগোল; কোন প্রকার দুঃখ-ক্লেশ।’ (বুখারী, ৫/৩৯)

হাদীস বিশারদগণ বলেন:

‘হাদীসে বর্ণিত জান্নাতের ভবনটি হবে খাদীজা (রা.)-এর দুনিয়ার বাড়ির মতোই। রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর গৃহে যেমন কোনো হৈচৈ ও

শোরগোল ছিল না, নীরব প্রশান্তির আবেশ ছিল, জান্নাতেও তাঁর ভবনটি এমনই প্রশান্তিপূর্ণ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে খাদীজা (রা.) যেমন কোনো কষ্টের লেশমাত্র রাখেননি, তেমনি জান্নাতেও তাঁর বালাখানায় দুঃখ-কষ্টের লেশমাত্রও থাকবে না। অবশ্য জান্নাতের সমস্ত বালাখানাই শান্তি ও আরাম-আয়েশপূর্ণ হবে।

খাদীজা (রা.) যখন ইন্তেকাল করেন, রাসূল ﷺ অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন। সে বছরটি হয়ে গেল غَامُ الْحُزْنِ শোকের বছর। আজও ইতিহাসের পাতায় তা غَامُ الْحُزْنِ শোকের বছর নামেই পরিচিত।

খাদীজা (রা.)-এর ইন্তেকালের কয়েক বছর পরও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রাসূল ﷺ-এর হৃদয়-আত্মা জুড়ে বিরাজ করছিল। রাসূল ﷺ যখনই তাঁর কথা স্মরণ করতেন, দু' চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরত। স্ত্রীর প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসার টানে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বান্ধবীদেরও খোঁজখবর নিতেন। তাঁর তরফ থেকে দান-সদকা করতেন। তাঁর মঙ্গলের দু'আ করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই খাদীজা (রা.)-এর প্রশংসা ও স্তুতির কথা আলোচনা করতেন। তাঁর সঙ্গে কাটানো অতীতের দিনগুলোর কথা স্মরণ করতেন। পরস্পর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এমন সব ঘটনা শুনাতেন, যা শুনে চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, হৃদয় বিগলিত হয়।

উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা.)-এর ওপর আল্লাহর পক্ষ হতে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। গোটা নারীজাতির জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ আদর্শ হয়ে আছেন।

❖ এক লোক নিজ গ্রামে স্ত্রীর সাথে বসে ছিল। সামনেই ছোট একটি মাটির ডিবি। স্বামী স্ত্রীকে বলল:

-মনে করো এই মাটিগুলো হলো আটা। আটাগুলো তুমি ছেনে খামিরা তৈরি করে আমার জন্য সুস্বাদু রুটি বানিয়ে আনবে।

-এ কাজ আমি করতে যাব? না, তা আমার পক্ষে সম্ভব না।

-তুমি অবশ্যই পারবে এবং তোমাকেই তা করতেই হবে।

-আমার পক্ষে এ কাজ কিছুতেই সম্ভব নয় ।

-তোমার এত বড় স্পর্ধা! আমার কথা অমান্য করছ? তোমাকে এ কাজটি করতেই হবে । নচেৎ! নচেৎ তিন তালাক হবে!!

-আর যা হবার হোক । আমার পক্ষে এ কাজ কিছুতেই কস্মিনকালেও সম্ভব নয় ।

এরপর স্বামী উঠে স্ত্রীকে বেদম প্রহার করতে লাগল । একপর্যায়ে তাকে তিন তালাক দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হলো ।

সভ্যতা-সংস্কৃতির

বিপর্যয়

যেকোনো জাতিগোষ্ঠীর প্রধান উপজীবিকা হলো তার সভ্যতা-সংস্কৃতি । একই সঙ্গে তা সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগলক । পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্বের সূচনালগ্ন থেকেই সংস্কৃতির পদযাত্রা শুরু হয়েছে । মানবজাতি তার জন্মলগ্ন থেকেই সংস্কৃতির অনুগামী হয়ে আছে ।

সভ্যতা-সংস্কৃতির অধঃপতন যেকোনো জাতি-গোষ্ঠীর চূড়ান্ত জড়গ্রস্ততা ও অচলতার লক্ষণ । যে জাতি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপর্যয়ের শিকার সে জাতি কখনো মানবতার পৃষ্ঠপোষকতায়, উন্নতি-অগ্রগতিতে ও জীবন-জগতের বিচিত্র প্রেক্ষাপটে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না । যুগোপযোগী বার্তা বহন করতে পারে না । নীতি-নৈতিকতা ও আত্মোন্নয়নে তার যাবতীয় ভূমিকা অকার্যকর হয়ে পড়ে । জাগতিক উন্নয়ন তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সে শতক্রুশ দূরে অবস্থান করে ।

মোটকথা, সভ্যতা-সংস্কৃতির অধঃপতন যেকোনো জাতি-গোষ্ঠীকে স্বকীয় আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনা থেকে বিচ্যুত করে ছাড়ে । আবিষ্কার ও সৃজনশীলতায় চরম সংকট ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয় । বিশ্বের দরবারে তার অধোগতি, লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার চূড়ান্ত করে ছাড়ে ।

একটি জাতির উন্নতি-অগ্রগতি সচল রাখার জন্য এবং কোনো জাতির পুনরুত্থান ও পুনর্গঠনের জন্যও স্বকীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির লালন করতে হবে, এর যথার্থ চর্চা ও পরিচর্যা সুনিশ্চিত করতে হবে ।

কিন্তু এর উপায় কী? এ লক্ষ্যে আমাদের করণীয় কী?

সমাপ্তি:

১. মহান পূর্বসূরিদের গৌরবগাঁথা-অতীতের গান গেয়ে মুখে ফেনা তুললেই হবে না, জ্বলজ্বলে বর্তমানের দাবি অনুধাবন করতে হবে। সভ্য-সংস্কৃতির অধঃপতন মেনে নিয়ে তা থেকে উত্তরণের পথ বের করতে হবে। সর্বোপরি অতীতের গৌরবময় সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনঃজাগরণ ঘটিয়ে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
২. সভ্যতা-সংস্কৃতিতে নিজেদের পশ্চাদগামিতার কারণগুলো চিহ্নিত করতে হবে। বিশ্বে অন্যান্য সফল জাতিবর্গের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করে তাদের ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করতে হবে। নেতিবাচক দিকগুলো পরিহার করে নিজেদের সংকট কাটিয়ে উঠার পথ আবিষ্কার করতে হবে।
৩. নিজেদের যাবতীয় ভুল-বিচ্যুতির দায় আসমানি ফায়সালার ওপর চাপিয়ে এবং অধোগতির পেছনে বহিঃশক্তি-বাহ্যিকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দায়সারা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। বর্তমানের কর্তব্য নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে। নিজেদের ভুল সংশোধনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آلْ عِمْرَان: ১৭৫]

অর্থ: আপনি বলুন, 'এটা তোমাদের নিজেদের কারণেই হয়েছে।'
(আলে ইমরান, ১৬৫)

৪. শিক্ষা বিভাগের প্রতিটি সেক্টরে যারা পরীক্ষিত মেধাবী ও প্রতিভাবান, উন্নত রাষ্ট্রগুলোর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। যেন তারা আরও উন্নত শিক্ষা ও গবেষণার আলোকে নতুন অভিজ্ঞতা এবং উদ্ভাবনী শক্তি অর্জন করতে পারে। দেশ ও দশের উন্নতি-অগ্রগতিতে যুগোপযোগী ভূমিকা রাখতে পারে।
৫. শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও যুগোপযোগী আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট পাশ করার পাশাপাশি ব্যবসায়ী ও বিত্তবান শ্রেণিকেও এ ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে হবে।

৬. দেশের উচ্চ শ্রেণি থেকে নিম্ন শ্রেণি, পত্যেককেই দেশ ও সমাজের ক্ষুদ্র হতে শুরু করে গুরুতর প্রতিটি আইন-কানূনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করতে হবে। যারা দেশের সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত সুযোগ-সুবিধার আড়ালে অন্যায়ভাবে ফায়দা লুটার চেষ্টা করে এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে তাদের সতর্ক করার লক্ষ্যে আর্থিক জরিমানা কিংবা উপযুক্ত শাস্তির বিধান কার্যকর করতে হবে।
৭. যুবক শ্রেণি ও গ্রাজুয়েট শ্রেণির প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে হবে। উদ্দেশ্য, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের লক্ষ্যে এমন একটি প্রতিশ্রুতিশীল ও কর্মদক্ষ শ্রেণি গড়ে তোলা, যারা সময়োপযোগী দায়িত্ব গ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকবে এবং বিভিন্ন অঙ্গনে উন্নয়ন ও অগ্রতি সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। মনে রাখতে হবে, দেশ গড়ার আগে যোগ্য ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
৮. নীতি-নৈতিকতা, উত্তম শিষ্টাচার ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা হতে শুরু করে শিক্ষক ও সমাজের মহৎ জ্ঞানী-গুণীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজের তরুণ প্রজন্মকে মহৎ চারিত্রিক শিক্ষা, মানবীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে হবে। এ বিষয়গুলো তাদের চিন্তা-চেতনা ও গবেষণায় প্রথিত করে দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ১১]

অর্থ: 'নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' (সূরা রাদ, ১১)

৯. প্রত্যেক শহর-পল্লিতে লোকদের স্বেচ্ছাসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রত্যেক এলাকা ও শহরে কফিশপ, রেস্টুরেন্টগুলোতে নৈতিক শিক্ষামূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেন লোকেরা অবসর ও গল্পগুজবের সময়গুলোতেও শিক্ষা ও নীতি-নৈতিকতার ছোঁয়া পায়।

১০. অনর্থক অন্যায় অপচয় ও মাত্রাতিরিক্ত ভোগবিলাসের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কেননা অপচয় ও ভোগবিলাস অতীতের অনেক জাতিবর্গকে নিঃশ্ব করে ছেড়েছে, অনেক উন্নত রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অধঃপতন ডেকে এনেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।
১১. সমাজের সকল শ্রেণিকে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমগুলোতে একাকী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ পর্যায়ে কাজগুলো সকলে মিলেই বাস্তবায়িত করতে হবে। কেননা একক উদ্যোগে বাস্তবায়িত কাজে একার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। পক্ষান্তরে, সকলের অংশীদারিত্বে বহু পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে। তন্মধ্যে যে পরামর্শ ও অভিজ্ঞতা যৌক্তিক ও বাস্তবমুখী, তা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ হয়।
১২. ব্যক্তিতত্ত্ব, স্বজনপ্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ মূলোৎপাটন করে, আদর্শিক রাজনৈতিক ও জাতিগত বিভেদ ভুলে, জাতীয় কল্যাণে এক হয়ে কাজ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:
 ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [আল عمران: ১০৩]
 অর্থ: আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। (আলে ইমরান, ১০৩)
১৩. দ্বীন-ধর্ম ও মাতৃভূমির কল্যাণে, নেক আমল ও তাকওয়া অবলম্বনে পরস্পর সহযোগিতায় এবং অন্যায় এবং পাপাচারে নিষেধ ও প্রতিরোধে জাতির প্রত্যেক সদস্যকে এক হয়ে কাজ করতে হবে। ধোঁকা-প্রতারণা ও দেশের শত্রুদের সহযোগিতা বর্জন এবং জাতীয় ধোঁকাবাজ ও প্রতারণাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
১৪. দেশের প্রতিটি শ্রেণি ও পেশার মানুষকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। নিম্নশ্রেণি ও সাধারণ পেশার লোকদের অবহেলা ও অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখা অনুচিত। তাদের মানবিক ও নৈতিক অধিকারগুলো সুনিশ্চিত করে কর্মক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা বজায় রাখতে হবে। কেননা একটি

জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পথে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণির বিদ্যা-বুদ্ধির পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির শ্রম-পরিশ্রম সমান গুরুত্বপূর্ণ। এর একটিকে ছাড়া অপরটি অচল।

১৫. ধনীদের টেক্স আদায়ে সচেষ্টি ও আন্তরিক হতে হবে এবং দরিদ্রদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধি করতে হবে। যুবসমাজের জন্য পর্যাপ্ত কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। সর্বোপরি দেশের উন্নয়নে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করা কর্তব্য।

১৬. কৃষি ও শ্রমক্ষেত্রে এতটা উন্নয়ন সাধন করতে হবে, এ ক্ষেত্রে যেন দেশ স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে। খাদ্যপণ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে উন্নত কৃষিব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই। রপ্তানি আয়ের খাতগুলোতে উন্নতি লাভে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কৃষি ও রপ্তানি হলো পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে চীন আমাদের জন্য প্রবাদতুল্য রাষ্ট্র।

১৭. মিডিয়াকে ভিজ্যুয়াল, প্রিন্ট এবং অডিও ফর্ম্যাটগুলোতে উন্নত করতে হবে। মিডিয়ায় সম্প্রচারিত বিষয়গুলো গঠনমূলক, কল্যাণমুখী, সঠিক রুচিবোধের অনুগামী, দেশের উন্নয়ন ও পরিশীলন সহায়ক কি না-তা নিশ্চিত করতে হবে।

১৮. একটি সুনির্দিষ্ট উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি বাস্তবমুখী সময়সীমা নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

এক্ষেত্রে জাপান হলো আমাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮৭৬ সালে জাপানের শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি সময়াবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। তা হলো, আগামী বিশ বছরের মধ্যে জাপানের ভূমি থেকে মূর্থতা ও নিরক্ষরতা দূর করা। বাস্তবে তারা সফলও হয়েছে। ১৮৯৬ সালের মধ্যে বিশ্ব দরবারে নিজেদের সুশিক্ষিত জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়েছে।

৯. আধুনিক শক্তিশালী সামরিক শক্তি ও দৃঢ় সংঘবদ্ধ পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি বহিঃশক্তির

আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নিশ্চিদ্র নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। ফলে দেশের শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের অর্থ-সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেশকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সংস্থাগুলোর বিনিয়োগের নিরাপদ উর্বর ভূমিতে পরিণত হবে।

২০. দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য, রুটিনমাসিক জীবনযাপন করা এবং সময়ের যথাযথ মূল্যায়ন করা। যেমন: ট্রেন চালক যদি নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে বিলম্ব করে তাহলে এক ব্যক্তির বিলম্বের কারণে কত হাজার চাকরিজীবী ও শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হতে বিলম্ব হবে। যা স্বাভাবিকভাবেই দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে।

২১. কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকের উচিত, সুনিপুণভাবে নিজের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। কেননা যেকোনো কাজই নিখুঁতভাবে সম্পাদিত না হলে তার কাঙ্ক্ষিত সুফল অর্জিত হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ"

(শু'ব আল-ইমান) ৭/২৩৩

অর্থ: তোমাদের কেউ যখন কোনো কাজ করবে সে যেন তা নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। (শুআবুল ইমান, ৭/২৩৩)

২২. যেকোনো ক্ষেত্রে সামান্য পর্যায়ে দুর্নীতিকেও আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে সকল প্রকার দুর্নীতি স্থায়ীভাবে মূলোৎপাটন করতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বিনির্মাণ ও উন্নয়নে উৎসাহিত করে গোলযোগ ও দুর্নীতি থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ৫৬]

অর্থ: পৃথিবীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠার পর তাতে অশাস্তি সৃষ্টি করো না।
(আরাফ, ৫৬)

২৩. কামপ্রবৃত্তি ও অন্যায় ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নামাযের প্রতি পূর্ণ যত্নবান হতে হবে। নামাযের মাধ্যমেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় প্রত্যয় ও কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। যে নামাযে অবহেলা করবে, নামাযের হক নষ্ট করবে সে এসব কিছু থেকে বঞ্চিত হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴾ [মরীম: ৫৭]

অর্থ: 'তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হলো। সুতরাং অচিরেই তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে।' (মারয়াম, ১৯: ৫৯)

২৪. সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির উন্নয়নে কাজ করতে হবে এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক সেবা-পরিসেবা সক্রিয় রাখা কর্তব্য। এ দু'টি ক্ষেত্রে সহনীয় মূল্যে উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে হবে।
২৫. অতীতের গৌরবগাঁথা সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে আত্মতুষ্ট হয়ে নির্ভয়ে বসে থাকলে চলবে না। আবার পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণও নিরাপদ নয়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নত জাতিবর্গের ইতিবাচক দিকগুলো সযত্নে গ্রহণ করার পাশাপাশি নেতিবাচক দিকগুলো পরিহার করা কর্তব্য। নিজের স্বাভাবিকতা ও স্বকীয়তা বিকিয়ে দিয়ে নিঃস্ব পরমুখাপেক্ষী হওয়ার চেয়ে অপমান ও লাঞ্ছনা আর কিছুই হতে পারে না। এক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র.)-এর বাণীই যথার্থ:

لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا.

অর্থ: 'মহান পূর্বসূরিদের পথেই এই উত্তরসূরিদের কল্যাণ নিহিত।'।

২৬. পরিস্থিতি-পরিবেশ যতই প্রতিকূল হোক, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে যতই বাধা-প্রতিবন্ধকতা আসুক, মন-মানসিকতায় কিছুতেই যেন নিরাশার ছাপ না পড়ে। উন্নতি-অগ্রগতি ও সফলতা অর্জনে নিরাশাই এক কঠিন বাধা।

পরিশিষ্ট:

- ❖ বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মালেক ইবনে নবী (১৯০৫-১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘যেকোনো সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার গুণগত মান ও পরিমাণের মাঝে সামঞ্জস্যতার ভিত্তি মজবুত হতে হবে। বাহ্যিক উপায়-অবলম্বনের সঙ্গে হৃদয়াত্মার সংযোগ থাকতে হবে। কার্জিকত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তবমুখী উপায় অবলম্বন করতে হবে। এর কোনো একটি ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিলে সে সভ্যতার অধঃপতন সুনিশ্চিত।’
- ❖ প্রখ্যাত মিশরীয় ইসলামি চিন্তাবিদ শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুল (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘যেকোনো জাতির মাথা উঁচু করে টিকে থাকার বিষয়টি সুনিশ্চিত হয় তার যুগোপযোগী প্রস্তুতির মাধ্যমে। সময়ের সাথে যে টেকা দিতে যায়, সময় তাকে কাবু করে ফেলে।’
- ❖ জাপানের প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করা হলো, ‘তাদের উন্নয়নের প্রধান রহস্য কী?’ উত্তরে বললেন, ‘অন্যরা যেখানে এসে থেমেছে, তাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা সেখান থেকে অগ্রসর হয়েছি।’
- ❖ সভ্যতা-সংস্কৃতি হলো মানবজাতি ও স্থান-কাল-পাত্রের গতিময়তা ও আন্দোলন। আসমানি শরীয়ত ব্যতীত যা কখনো পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হতে পারে না।’ -আয়েয করনী

ফাসাদ

ও

দুর্নীতি

ফাসাদ ও দুর্নীতি হলো ন্যায় ও ন্যায়ানুগতা, সততা ও নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতি। সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য দুর্নীতি এক দুরারোগ্য ব্যাধি ও ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়। যা ব্যক্তি হতে শুরু করে সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রযন্ত্রের রগরেশায় ছড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে অন্যায়-অনাচার, ধোঁকা-প্রতারণার জাল বিস্তার করে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকা স্থবির করে দেয়।

দুর্নীতির উপসর্গগুলো হলো, ঘুষ, ছিনতাই, অপহরণ, জনসাধারণের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যের অধিকার হরণ ইত্যাদি। কোনো সমাজের সর্বত্র যখন দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে এবং শিকড় গেড়ে বসে তখন তা নির্মূল করা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিদমন কমিশন ফাসাদ ও দুর্নীতিকে ‘ব্যক্তিগত লাভ এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার’ বলে আখ্যায়িত করেছে।

ফাসাদ ও দুর্নীতির বহু ধরন রয়েছে। যেমন: মানুষের নীতি-নৈতিকতা, চিন্তা-চেতনার অধঃপতন, বোধ ও বিশ্বাসের ভ্রষ্টতা, সামাজিক কৃষ্টিকালচারের বিচ্যুতি, শান্তি ও নিরাপত্তার সংকট, আর্থিক দুর্নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম ও রাজনৈতিক অনাচার ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও অসংখ্য বিচিত্র দুর্নীতি রয়েছে। যা মানুষের দেশ, বর্ণ, ধর্ম ও মতাদর্শের ভিন্নতার কারণে হয়ে থাকে। বর্তমান বিশ্ব এই মহাসংকটে জর্জরিত।

এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী? দুর্নীতি থেকে বাঁচার উপায় কী?

সমাধান:

১. বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক শিক্ষাদীক্ষা ও সুস্থ চিন্তা-চেতনার আলোকে গড়ে তুলতে হবে। তাদের নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মপরায়ণতায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। যেন দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলার পাশাপাশি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শেখে।
২. তরুণ প্রজন্মকে দেশ, জাতি ও সমাজের উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং তা শুরু হবে পরিবার থেকে, মা-বাবার পক্ষ থেকে। পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও মসজিদের মিম্বরে আলেমগণের পক্ষ থেকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।
৩. পূর্ববর্তী জাতিবর্গ তাদের বোধ-বিশ্বাস, স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতায় অনাচারের কারণে যে অধঃপতন ও বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, সে সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করতে হবে।
৪. আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস পরিশুদ্ধ করে সকলকে কল্যাণ ও উন্নতির দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়, বিশৃঙ্খলা, ধ্বংস ও বরবাদির পথ থেকে বারণ করা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে দ্বীনের দায়ী, খতীব, শিক্ষক, চিন্তাবিদ ও লেখক-প্রত্যেককেই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। যেন গণমানুষের স্বভাবজাত প্রবণতাই হয়ে উঠে সংশোধন ও কল্যাণমুখী, অনিষ্ট ও অকল্যাণ-বিমুখ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ *

الْإِنَّمَا هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ১১, ১২]

অর্থ: 'আর যখন তাদের বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিস্তার করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী। মনে রেখ, এরাই বিশৃঙ্খলা বিস্তারকারী। কিন্তু এর উপলব্ধি তাদের নেই।' (বাকারা, ২: ১১, ১২)

৫. কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ ও যাচাই-বাছাই করে নিয়োগ দেওয়া কর্তব্য। সৎ, নীতিবান, বিবেকবান, বিচক্ষণ, যোগ্য ও

অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। “যোগ্য পদে যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ”- এ মূলনীতি যেন ঠিক থাকে। এতে করে দুর্নীতির পথ বন্ধ হবে। ন্যায়-নীতি, সততা ও কল্যাণের পথ সুগম হবে। শ্রমিক ও কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা হলো প্রধান মানদণ্ড। পবিত্র কুরআনেই রয়েছে এর দিকনির্দেশনা :

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصاص: ২৭]

অর্থ: আপনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাউকে কাজে নিতে চাইলে সেজন্য এমন ব্যক্তিই উত্তম, যে হবে শক্তিশালী এবং আমানতদারও। (কাসাস, ২৮: ২৬)

﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ৫৫]

অর্থ: ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের (ব্যবস্থাপনা) কার্যে নিযুক্ত করুন। নিশ্চিত থাকুন, আমি রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো পারি এবং আমি (এ কাজের) পূর্ণ জ্ঞান রাখি। (ইউসুফ, ১২: ৫৫)

৬. তরুণ নেতৃবৃন্দ, যারা উন্নতি-অগ্রগতিতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, প্রয়োজনীয় নিত্যনতুন আবিষ্কার ও সংস্কারে সচেষ্ট, দেশ ও জাতির কল্যাণে গঠনমূলক সংস্কারে তৎপর, তাদের তারুণ্যদীপ্ত সৎ নেতৃত্বগুণকে কাজে লাগাতে হবে। যেন তারা কাক্ষিত অগ্রগতি সাধন করে যুগের দাবি ও চাহিদা মেটাতে পারে।
৭. কোনো কর্মকর্তাকে একই পদে দীর্ঘ দিন বহাল রাখা সমীচীন নয়। যেন অসৎ শ্রেণি স্থায় পদ, খ্যাতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে। যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে যদি দীর্ঘ দিন উন্নত পদে বহাল রাখতে হয় তাহলে তার ওপর পূর্ণ নজরদারি বহাল রাখতে হবে।
৮. চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতন রোধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সমাজের প্রতিটি শ্রেণি, বিশেষভাবে যুব শ্রেণির মধ্যে নৈতিক ও ধর্মীয় প্রেরণা মজবুত করতে হবে। তাদেরকে মহৎ চরিত্র ও উত্তম শিষ্টাচারে অনুপ্রাণিত করতে হবে। দেশ ও জাতির আসন্ন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় দায়দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে।

যে সমস্ত টিভি ও ইন্টারনেট চ্যানেল অশ্লীলতা ছড়ায়, নৈতিক ও ধর্মীয় অনাচারে প্ররোচিত করে, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের পথে ধাবিত করে, তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিতে হবে।

৯. সমাজে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির সমস্ত অপচেষ্টাগুলো সমূলে নির্মূল করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। কেননা সমাজে নিরাপত্তা ও সুরক্ষাহীন পরিবেশ অসৎ শ্রেণির মধ্যে যাবতীয় অন্যায়-অপকর্মের প্রবণতা সৃষ্টি করে। তাদের সামনে ঘুস, আত্মসাৎ ও অন্যের অধিকার হরণের পথ খুলে দেয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ১১২]

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা এক জনবসতির দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যা ছিল বেশ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ। চতুর্দিক থেকে তার জীবিকা চলে আসত পর্যাপ্ত পরিমাণে। তারপর তারা আল্লাহর নে'আমতের অকৃতজ্ঞতা শুরু করে দিল। ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আশ্বাদন করালেন।' (নাহল, ১৬: ১১২)

১০. সরকারি দায়িত্বে ও কার্যনির্বাহে আমলাতন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য রদ করে তাদের জনগণের সেবক ও প্রশাসকরূপে গড়ে তুলতে হবে। কেননা আমলাতন্ত্রে স্বাধীনতা কোনো কোনো আমলাকে দুর্নীতিবাজ করে তোলে। তারা নিজেদের নৈতিক-অনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারি পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে। জনস্বার্থে সামান্য পরিশ্রমের মামুলি কাজ করার জন্যও তারা অত্যন্ত পাবন্দির সঙ্গে 'উপটোকন' নেওয়ার ব্যাপারে তারা বেশ সিদ্ধহস্ত।

১১. প্রযুক্তিসেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি তা নিখুঁত ও ফাঁক-ফোকরমুক্ত করতে হবে। আর্থিক লেনদেনগুলোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির পাশাপাশি মানবশক্তিকেও যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। ইলেক্ট্রনিক ও ইন্টারনেট সেবা-পরিসেবাগুলোর মানোন্নয়ন করে তা এমনভাবে সচল রাখতে হবে, যেন দেশের যেকোনো নাগরিক ইন্টারনেটে অত্যন্ত সহজে দ্রুত আর্থিক লেনদেন করতে পারে।

১২. প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মকর্তা নিয়োগের সময় তার ও পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির হিসাব-বিবরণী গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে চাকরি থেকে অব্যাহতির সময় এ বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখতে হবে। জন-অর্থ-সংরক্ষণ অধিদফতরকে তার কার্য সম্পাদনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মকর্তা তার কাজের মানোন্নয়ন, দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে শতভাগ বিশ্বস্ততা ও সুনিপুণতার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ হওয়া কর্তব্য। বিশেষ কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও অন্যের ক্ষতিসাধন রোধে কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৩. একটি গঠনমূলক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যার ভিত্তিতে কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও নিপুণতা যাচাই করা হবে। যারা নিজেদের দক্ষতা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারবে এবং তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারবে, বাৎসরিক সম্মেলনে তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান ও মূল্যবান পুরস্কার প্রদান করা কর্তব্য। এতে প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মকর্তা নিজের যোগ্যতা প্রমাণে সচেষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হবে। পাশাপাশি যেকোনো ব্যক্তির অবহেলা ও দুর্নীতি প্রমাণিত হবে, তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে, যেন অন্যদের জন্য তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তিই দুর্নীতি শনাক্ত করতে পারবে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করা কর্তব্য। এর ফলে প্রত্যেক নাগরিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।

প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্বই হলো নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ،
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

অর্থ: ‘তোমাদের মধ্যে যে-ই কোনো অন্যায় দেখবে, সে যেন নিজ হাতে তা প্রতিহত করে। যদি তার এ সামর্থ্য না থাকে, তবে মুখে (যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।) এতটুকু সামর্থ্যও যদি না থাকে, তবে মনে মনে (সে যেন অন্যায়কে ঘৃণা করে।)’ (মুসলিম, ১/৬৯)

১৪. পদোন্নতির ক্ষেত্রে, প্রবীণ হওয়া ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাই একমাত্র ও চূড়ান্ত মানদণ্ড নয়। তাই অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রত্যেকের মাসিক ও বাৎসরিক কাজের পরিমাণ ও গুণগত মান যাচাই করে দেখতে হবে। কর্মচারীদের জ্ঞানগভীরতা, কর্মদক্ষতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রতিষ্ঠানে তাদের ভাবমর্যাদা ইত্যাদি দিকগুলো বিবেচনা করতে হবে।

১৫. সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, অবিচলতা ও কর্মনিপুণতায় যারা নিজেদের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রমাণ করতে পেরেছে, সমাজের সামনে তাদের সফলতা তুলে ধরতে হবে। তাদের ব্যক্তিত্বগুণকে উত্তম আদর্শরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যেন পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র-প্রতিটি অঙ্গনেই মানুষ তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়। তাদের আদর্শগুণে মুগ্ধ হয়ে তাদের অনুসরণে সচেষ্ট হয়।

১৬. দুর্নীতি প্রতিরোধ-ব্যবস্থামূলক কঠোর আইন প্রণয়ন করে সকলের ক্ষেত্রে তা সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। সমাজের উচ্চ শ্রেণি, নিম্ন শ্রেণিভেদে আইনের মধ্যে কোনো বৈষম্য হতে পারবে না। প্রত্যেক অপরাধীই যেন উপযুক্ত শাস্তির সম্মুখীন হয় এবং তাদের শাস্তি অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে কোনো স্বজনপ্রীতি কিংবা শ্রেণিবৈষম্য যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। তাহলে সমাজ চরম বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার শিকার হবে।

প্রায় পনেরোশ বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَائِمُّ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا» (صحيح البخاري) ১৬০/৮

অর্থ: ‘হে লোকসকল, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ ছিল, কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি চুরি করত, তারা তার সাজা মওকুফ করে দিত। কিন্তু দুর্বল শ্রেণির কেউ চুরি করলে তার শাস্তি যথাযথভাবে কার্যকর করে ছাড়তো। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে মুহাম্মদ তার হাত কেটে দিবে।’

(বুখারী, ৮/১৬০)

১৭. সার্বক্ষণিক নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা সক্রিয় রাখতে হবে। কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার নীতি বজায় রাখতে হবে। প্রতিটি কাজেই একটি মৌলিক প্রশ্নের জবাবদিহিতা থাকতে হবে। প্রশ্নটি হলো, “এই কাজটির যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা কী?”
১৮. একটি দুর্নীতি দমন কমিশন চালু করে সৎ, নীতিবান ও বিশ্বস্ত লোকদের মাধ্যমে তা পরিচালনা করতে হবে। সমাজের আনাচে-কানাচে, আড়ালে-আবডালে যত অন্যায়-অনাচার চলছে, তার বিরুদ্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হবে তাদের প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।
১৯. সমতা ও বৈষম্যহীনতা হলো একটি জাতির উন্নতি-অগ্রগতির মূল ভিত্তি। যে জাতি নিজের মাঝে শ্রেণিবৈষম্য নির্মূল করে সাম্য ও সমতার নীতি অবলম্বন করেছে তারা উদারতা, নির্মলতা, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [হুদ: ১১৮]

অর্থ: তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি জনপদসমূহ অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন; অথচ তার বাসিন্দাগণ সদাচারী।

(হুদ, ১১: ১১৭)

২০. কোনো জাতির পতন, অধঃপতন, পর্যায়ক্রমে চূড়ান্ত ধ্বংসের মূল কারণ হলো অন্যায় ও দুর্নীতি—এ চরম বাস্তবতা সমাজের প্রতিটি শ্রেণি, প্রত্যেক ব্যক্তির মনে বদ্ধমূল করা আবশ্যিক। সমাজবিজ্ঞানী আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন’-এর মধ্যে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন:

‘অন্যায় ও দুর্নীতির অপরিহার্য পরণতি হলো সীমাহীন অপব্যয় ও লাগামহীন বিলাসিতা। যা কোনো জাতিকে অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।’

পবিত্র কুরআনের এ সত্য প্রতীয়মান:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ১৬]

অর্থ: ‘যখন কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তাদের বিত্তবান লোকদের (ঈমান ও আনুগত্যের) হুকুম দেই। তখন তারা তাতে নাফরমানিতে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের সম্পর্কে ফায়সালা চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি।’ (বনী ইসরাঈল, ১৭: ১৬)

২১. স্বভাবতই অজ্ঞতা-মূর্খতা ও অভাব-অনাটনের কবলে মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংসে পড়ে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ প্রাণশক্তিহীন হয়ে পড়ে। তাই সমাজ থেকে মূর্খতা ও অশিক্ষা দূর করার পাশাপাশি অভাব ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বেকারত্বের কবলে পড়ে, দারিদ্র্যের শিকার হয়ে দেশের একটি নাগরিকও যেন অন্যায় ও দুর্নীতির পথে পা না-বাড়ায়, সে লক্ষ্যে প্রতিটি নাগরিকের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২২. অডিও-ভিজ্যুয়াল, প্রিন্ট মিডিয়া ও সোস্যাল মিডিয়ায় অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস ও বাণিজ্যিক কোম্পানির পক্ষ থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা কর্তব্য। যেখানে দ্বীনের একনিষ্ঠ আহ্বায়ক ও সমাজের জ্ঞানী-গুণীজন মানুষের সামনে দুর্নীতির জঘন্যতা, ভয়বহতা তুলে ধরবেন। ইহকাল ও পরকালে দুর্নীতির কঠোর শাস্তির ব্যাপারেও সতর্ক করবেন। অতীতের যে সমস্ত জাতিবর্গ অন্যায় ও দুর্নীতির কারণে যে অবক্ষয় ও ধ্বংসের শিকার হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে, মানুষের সামনে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন। এর ফলে দেশের নাগরিকদের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনের সকল অঙ্গনে নৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হবে।

২৩. যাবতীয় অনাচার-পাপাচার, গুনাহ ও নাফরমানি পরিহার করতে হবে। কুপ্রবৃত্তি ও অন্যায় বোঁক-প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা তা সমস্ত নষ্টের মূল। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কখনো কোনো নাফরমানি হয়ে গেলে, তার বিপরীতে নেক আমল ও তওবাই হলো একমাত্র প্রতিকার। তাই নিয়মিত নামায, ইবাদত ও রবের আনুগত্যের সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে যেতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الرُّوم: ৩১]

অর্থ: জলে-স্থলে যে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে তা মানুষের কৃতকর্মের ফসল। আল্লাহ তাদের কতক কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করাবেন।

হয়ত (এর ফলে) তারা ফিরে আসবে। (রুম, ৩০: ৪১)

২৪. যে কোনো কর্মী, চাকরিজীবী ও দায়িত্ববানদের প্রতি আমার উপদেশ হলো, 'একনিষ্ঠতার সাথে ও সুচারুরূপে আপনার দায়িত্ব পালন করুন। এটা আপনার প্রধান দায়িত্ব। মনে রাখবেন, কাজেকর্মে মালিকের চোখ ফাঁকি দিলেও আসল মনিব আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়।' মানুষের ফাঁকিবাজির স্বভাবদোষকে আল্লাহ কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾
[النساء: ১০৮]

অর্থ: 'তারা মানুষ থেকে তো লজ্জা করে; কিন্তু আল্লাহ থেকে লজ্জা করে না। অথচ তারা রাতের বেলা যখন আল্লাহর অপছন্দনীয় কথা বলে তখনো তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারা যা-কিছু করছে তা সবই আল্লাহর আয়ত্তে।' (নিসা, ৪: ১০৮)

পরিশিষ্ট:

❖ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عُمَرَ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي، أَهْدِي لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أَهْدِي لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ"، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ، هَلْ بَلَغْتُ؟» مَرَّتَيْنِ. صحيح مسلم (১৬৬৩/৩)

অর্থ: আবু হুমায়দ সায়েদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসদ্ গোত্রের জনৈক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিযুক্ত

করলেন। যাকে ইবনুল লুথবিয়া নামে অভিহিত করা হতো। রাবী আমর ও ইবনু আবু উমার বলেন, ‘সদকা উসূলের জন্য’ (তাকে নিযুক্ত করা হয়)। যখন সে ব্যক্তি ফিরে এলো তখন সে বলল, ‘এটা আপনাদের (অর্থাৎ বায়তুল মালের) আর এটা আমাকে উপটোকন হিসেবে দেওয়া হয়েছে।’ বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপরে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করার পর বললেন, সে কর্মচারীর কী হলো, যাকে আমি (তহশীলদাররূপে) প্রেরণ করেছি। আর সে বলে, ‘এটা আপনাদের, আর এটা আমাকে উপটোকন দেওয়া হয়েছে। সে তার পিতার বা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখুক না, তাকে উপটোকন দেওয়া হয় কিনা? মুহাম্মদের প্রাণ যে পবিত্র সত্তার হাতে তাঁর কসম! যে কেউ এরূপ সম্পদের কিছুমাত্র হস্তগত করবে, কিয়ামতের দিন সে তা নিজ ঘাড়ে বহন করে নিয়ে আসবে। (তার ঘাড়ের উপর) চিৎকাররত উট হবে অথবা হাম্বা-হাম্বারত গাভি হবে অথবা ম্যাঁ-ম্যারত বকরি হবে। তারপর তিনি দু’হাত উপরের দিকে উঠালেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, আমি কি (আপনার নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছি।’ এ কথা তিনি দু’বার বললেন। (মুসলিম, ৩/১৪৬৩)

❖ সিঙ্গাপুরের সুদীর্ঘ তিন দশকের প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ (১৯২৩-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘সিঁড়ি পরিষ্কার করার মতো দুর্নীতি সাফ করুন। সর্বোচ্চস্তর থেকে শুরু হবে, সর্বনিম্নস্তরে এসে শেষ হবে।’

❖ বিখ্যাত আরব কবি আবু তায়েব মুতানাব্বি (৩০৩-৩৫৪ হি.) বলেছেন:

فَلَا تَغْرُرْكَ أَلْسِنَةُ مَوَالٍ	تَقْلِبُهُنَّ أَفَادَةٌ أَعْدَادٍ
وَكُنْ كَالْمَوْتِ لَا يَرِثِي لِبَاكِ	بَكَى مِنْهُ وَيَرَوِي وَهُوَ صَادٍ
فَإِنَّ الْجُرْحَ يَنْفِرُ بَعْدَ حِينٍ	إِذَا كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى فَسَادٍ

অর্থ: 'পিতার মৃত্যুর পর অভিভাবক ও মনিব শ্রেণির চটকদার কথা যেন তোমাকে প্রতারণিত না করে। কেননা তাদের শত্রুতা-পুষে-রাখা মন এর ঠিক উল্টো।

তাদের ক্ষেত্রে তুমি হবে এমন ভয়াবহ মৃত্যু, কোনো শোকাহতের শোকে যার হৃদয় গলে না; প্রাণ হরণ করে, দেহের তাজা রক্ত পান করেই যে পরম তৃপ্তি লাভ করে।

তারা হলো এমন ফোঁড়ার মতো, দেহের অন্তরালে পচন থাকার কারণে যা থেকে ফুলে-ফেপে উঠে।'

পারিবারিক সহিংসতা

পারিবারিক সহিংসতা অন্যতম বৈশ্বয়িক সংকট। বহু পরিবার এ সংকটে জর্জরিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহিংসতার পরিচয়ে বলেছে:

‘পরিবারের যেকোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিবারের অন্য এক কিংবা একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষমতা ও শক্তির অপব্যবহার করা। এর কারণে পীড়িত ব্যক্তি ক্ষতির শিকার হয়। মানসিক কষ্টে ভোগে। লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়।’

অথবা পারিবারিক সহিংসতা হলো:

‘পরিবারের কোনো ব্যক্তি কর্তৃক স্বামী, স্ত্রী কিংবা সন্তানদের কারো বিরুদ্ধে ক্ষমতা ও পেশিশক্তির অপব্যবহার। যার কারণে ভুক্তভোগী শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অশান্তি ও নিরাপত্তার শিকার হয়। পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে যায়। সর্বোপরি পারিবারিক সম্পর্কগুলোতে অবনতি ঘটে। সামাজিক বন্ধনে ফাটল ধরে। একটি সুন্দর পরিপাটি সমাজের মৃত্যু হয়। কেননা পারিবারিক বন্ধনই হলো সুষ্ঠু সমাজের মূল ভিত্তি।’

পারিবারিক সহিংসতার সমাধানে অনেক গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে। অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর গুরুত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে বহু পথ-পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সমাধান কোথায়?

সমাধান:

১. পারিবারিক সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিবাহের প্রথম ধাপ থেকেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ এমন পাত্রী নির্বাচন করবে, যে শিক্ষিত, ভদ্র, মার্জিত, ধার্মিক, চাত্রিক গুণাবলি ও শিষ্টাচারের অধিকারী। একইভাবে পাত্রী পক্ষও এমন পাত্র নির্বাচন করবে, যে এসব মহৎ গুণের অধিকারী।
২. বিবাহের পূর্বে অবশ্যই পাত্র ও পাত্রী উভয় পক্ষকেই স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করাতে হবে। তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ-সবল কিনা-এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এ কথা সত্য যে, সুস্থতা-অসুস্থতা আল্লাহ তা'আলার হাতে। এ দুয়ে মিলেই তো জীবন। তবুও স্বাস্থ্য-পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া কর্তব্য-কে কতটুকু সুস্থ কিংবা অসুস্থ।
৩. পাত্র-পাত্রী পক্ষের শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাদের সুস্থ মনমানসিকতা পারিবারিক সচেতনতা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে। যেন সংসার জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে সন্তান লালন-পালনে কোনো প্রকার সহিংসতার অশঙ্কা না থাকে এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে পরস্পর বোঝাপড়া ও ফলপ্রসূ আলোচনাই প্রাধান্য পায়।
৪. পারিবারিক অধিকার, পারিবারিক সহিংসতা মোকাবিলা, এর যথার্থ সমাধান ও তা থেকে সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে পরস্পর সদয়তা, আন্তরিক বোঝাপড়া ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ইত্যাদি মহৎ মানসিকতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে পারিবারিক সহিংসতা বর্জনে উদ্বুদ্ধ করে এর ক্ষতিকর দিকগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।
৫. এ ক্ষেত্রে মিশরে খতীব সাহেবের বয়ান, প্রচার মাধ্যমের ঐকান্তিক সম্প্রচার ও পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য শিক্ষাদীক্ষামূলক আলোচনা অত্যন্ত কার্যকর। এ সমস্ত মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতার নেতিবাচক ও ক্ষতিকর দিকগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে। সাথে সাথে ইসলামে যে দয়া, সদয়তা, বিনম্রতা ও আপস-মীমাংসার মহৎ শিক্ষা রয়েছে, তা আঁকড়ে ধরতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৬. কুরআন-সুন্নাহর যেখানে গ্রহণের কথা বলা হয়েছে, ইমাম, খতীব ও দ্বীনের আহ্বায়কগণের পক্ষ থেকে এর সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা কর্তব্য। যেন কোনো অজ্ঞ-মূর্খ এর অপব্যবহার করে পারিবারিক সহিংসতা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত না হয়। পারিবারিক জীবনে রাসূল ﷺ কেমন ছিলেন, স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আচার-ব্যবহার কেমন ছিল—বিষয়টি জাতির সামনে সুস্পষ্ট থাকতে হবে। কেননা তিনিই আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।
 ৭. পরিবার ও সমাজে শিশুদের প্রতি যে ধরনের অন্যায় ও সহিংসতা দেখা দেয়, এ ব্যাপারে শিশুদের পূর্ব-সতর্ক করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে তাদের যথোপযুক্ত করণীয় কী হবে, তা-ও শিখিয়ে দিতে হবে। কোনো অন্যায় ও সহিংসতার শিকার হলে অভয় দিয়ে সাহস যোগাতে হবে। যেন ভয়-ভয় না রেখে তার সাথে ঘটে-যাওয়া অন্যায়ের কথা সে বলতে পারে, এর প্রতিবাদে সরব হতে পারে।
 ৮. পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক একটি বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে, পারিবারিক সংক্ষুদ্ধ^৩ ব্যক্তিদের অভিযোগ গ্রহণ করা। যথাযথভাবে অভিযোগ যাচাই করা। কোনো প্রকার অবহেলা ও কালবিলম্ব না করে এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এর সাথে সাথে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিদের সাহস যোগাতে হবে, যেন তারা নির্বিঘ্নে নিঃসংকোচে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।
- স্পর্শকাতর বিষয়ে তাদেরকে শতভাগ গোপনীয়তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। কোনো ধরনের প্রচার-সম্প্রচার ব্যতীত বিষয়টি সমাধান করতে হবে। প্রতিটি সমস্যার প্রথম ধাপেই তা সমাধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেননা যেকোনো সমস্যা দীর্ঘায়িত হলে পর্যায়ক্রমে তা এমন ঘোলাটে ও জটিল হয়ে পড়ে, যার সমাধান কখনো কখনো ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

^৩ "সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি" অর্থ: কোন শিশু বা নারী যিনি পারিবারিক সম্পর্ক থাকিবার কারণে পরিবারের অপর কোন সদস্য কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতার শিকার হইয়াছেন বা হইতেছেন বা সহিংসতার ঝুঁকির মধ্যে রহিয়াছেন।

৯. পারিবারিক সহিংসতার বিচার বিশেষ আদালতে দ্রুত সম্পন্ন করে প্রকৃত অপরাধীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার বিলম্ব ও অবহেলার সুযোগ নেই। কেননা বিচার বিভাগের সামান্য গাফলতি ও অবহেলার কারণে যেকোনো অপরাধী ও অপরাধ ও প্রশয় পায়, সমাজের রক্তে রক্তে নির্বিঘ্নে ছড়িয়ে পড়ে।
১০. পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে মা-বাবাই যদি প্রধান দায়ি হয়ে থাকে, তাহলে প্রয়োজনে সন্তানের প্রতি তাদের দায়-দায়িত্ব প্রত্যাহার করে এমন নিকটাত্মীয়ের দায়িত্বে ন্যস্ত করতে হবে, যারা তাদের প্রতি যত্নশীল হবে। তাদের যথাযথ দেখভাল করবে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি কোনো প্রকার মানসিক কিংবা শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে তার দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. সংক্ষুব্ধ শিশুর যাবতীয় অধিকার রক্ষা করে তার জন্য সুস্থ নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। তাকে পর্যাপ্ত শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ দিয়ে দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যেন সে ভবিষ্যতে দেশ ও দশের উপকারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
১২. সন্তান লালন-পালনে ভুল পন্থাগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন : মারপিট করে শারীরিক শাস্তি দেওয়া। কঠোর ও রুঢ় কথা বলে, গালমন্দ করে মানসিক অস্থিতিতে ফেলা। এর বিপরীতে আরও ফলপ্রসূ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বোঝানোর মাধ্যমে সন্তানের ভুলগুলো শুধরে দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগাতে হবে। তার ছোট ছোট সফলতার প্রশংসা করে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
১৩. প্রত্যেক মা-বাবার প্রতি আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো:
সন্তান লালন-পালনের অর্থ শুধু অন্নবস্ত্রের বন্দোবস্ত ও ব্যয়ভার বহন করাই নয়; বরং সন্তানের প্রতি আন্তরিকতা, সযত্ন ভালোবাসা, সদয়তা-দয়াদ্রুতা ও সঠিক শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই মা-বাবাকে সন্তানের বন্ধু সেজে তাদের সঙ্গে মিশে চলতে হবে। সন্তানের কাছাকাছি থেকে তাদের সমস্যাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। যেকোনো সমস্যায় সবার আগে মা-বাবাকেই তাদের পাশে দাঁড়াতে

হবে। পৃথিবীতে প্রতিটি সন্তান তার মা-বাবার সদাচারের প্রথম হকদার। মা-বাবা যদি তার চোখের অশ্রু মুছে না দেয়, ধীরে ধীরে শত-সহস্র অশ্রুফোঁটা জমাট বেঁধে পুঞ্জীভূত ক্রোধের রূপ ধারণ করে।

১৪. প্রত্যেক পিতার কর্তব্য হলো, পরিবারের কাছে এতটা প্রিয় হওয়া, যেন পরিবারের প্রতিটি সদস্যই তার আগমনের অপেক্ষায় থাকে। যেমন শুষ্ক ভূমি অঝোর বৃষ্টির জন্য অধীর থাকে।

পরিবারের মাঝে কখনো সিংহের মতো গম্ভীর কঠোরপ্রাণ হওয়া, আবার গান্ধীর মূহূর্তে বালখিল্যতা করা—কোনোটাই বাঞ্ছনীয় নয়। রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ আদর্শ অবলম্বন করাই যথার্থ। রাসূল ﷺ যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। শিশুদের সাথে হাস্যরসিকতা করতেন। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» سنن الترمذي

(৭০৭/৫)

অর্থ: “তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে নিজ পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। আমার পরিবারের নিকট আমিই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।” (তিরমিজী: ৫/৭০৯)

১৫. পরিবারের সদস্যদের মাঝে পরস্পর সহযোগিতা, মমতাপূর্ণ মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাদের মাঝে সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত ও অটুট রাখতে হবে। ইসলাম পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকলের মাঝে সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন অটুট রাখতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাহলে যে পরিবারের মাঝে রক্তের বাঁধন, সেক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মায়া-মমতার বন্ধন কতটা সুদৃঢ় হওয়া আবশ্যিক? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ১০৩]

অর্থ: আর আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখো। পরস্পর বিভেদ করো না। (আলে ইমরান: ৩: ১০৩)

১৬. সমাজে যে পরিবার শিক্ষা-দীক্ষা, মহৎ চরিত্র, শিষ্টাচার ও মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিবে, পুরস্কৃত করে তাদের অনুপ্রাণিত করা কর্তব্য। বিপরীতে যে পরিবারে শিক্ষা-দীক্ষার কোনো বালাই নেই, পারিবারিক বন্ধন উপেক্ষিত, পারিবারিক সহিংসতাগ্রস্ত, তাদের ভৎসনা ও তিরস্কারের মাধ্যমে তাদের সতর্ক করা কর্তব্য। যেন অন্যান্য পরিবারগুলোও এ ধরনের মানসিকতা বর্জন করে সচেতন হতে পারে।

ব্যক্তি খারাপ কাজ করলো, সমাজে কেউ তাকে তিরস্কার করলো না, আরেক ব্যক্তি ভালো কাজ করলো, কারো পক্ষ থেকে সে পুরস্কৃত হলো না, বুঝতে হবে সমাজে অবক্ষয় চলছে।

১৭. পরিবারের সদস্যদের মাঝে মীমাংসা ও সুরাহা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা-

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ১২৮]

অর্থ: 'আর মীমাংসাই উত্তমপন্থা।' (নিসা, ৪: ১২৮)

কোনো জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর জন্য হোক কিংবা স্বামীর তরফ হতে স্ত্রীর জন্য হোক; অথবা সন্তানদের পক্ষ থেকেই হোক, মোটকথা মেনে নেওয়া ও নমনীয় মানসিকতার ভিত্তিতে যে মীমাংসা হবে, তাতে পরিবারের মাঝে আন্তরিকতা, ভালোবাসা, মায়া-মমতার বন্ধন অটুট থাকবে।

১৮. এ কথা মনে রাখতে হবে যে, পারিবারিক সহিংসতা একটি পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ফলে সামাজিক ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ে। বংশের সুনাম নষ্ট হয়। সন্তানরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে ধাবিত হয়। সন্তানের বিচ্ছেদে মা-বাবার জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ। তারা বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বন ও সার্থকতা খুঁজে পায় না।

তাই পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার ক্ষেত্রে সদাসতর্ক থাকতে হবে। পরিবারের মাঝে ধর্মীয় অনুশাসন বজায় রাখতে হবে। নামায হতে শুরু করে প্রতিটি ইবাদত সমান গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে এবং

যাবতীয় গুনাহ ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করবে, ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ তাকে সুখময়, সাচ্ছন্দ্যময় জীবন দান করবেন।

১৯. ইসলাম হলো শান্তি-নিরাপত্তা, দয়া ও মমতার ধর্ম। যা মানুষকে কঠোরতা ও বর্বরতা থেকে বারণ করে। ছোটদের স্নেহ করা, বড়দের শ্রদ্ধা করা এবং স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করা-এগুলো হলো ইসলামের মৌলিক শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আদেশ-

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ১৭]

অর্থ: 'আর তাদের (স্ত্রীদের সাথে) সদ্ভাবে জীবনযাপন করুন।' (নিসা: ৪: ১৯)

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ»

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ হযরত হাসান (রা.)-কে চুমু খেলেন। আকরা ইবনে হাবেস তামীমী (রা.) পাশেই বসা ছিলেন। বললেন, 'আমার দশটি সন্তান রয়েছে। তাদের কাউকে আমি কখনো চুমু খাইনি।' রাসূল ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যে দয়া করতে জানে না, সে দয়াপ্রাপ্ত হয় না।' (বুখারী: ৭/৮)

২০. কর্ম জীবনের যত ঝামেলা ও ঝগড়া-তা ঘরের বাইরে রেখে আসতে হবে। এসব বিষয় নিয়ে পরিবারে আলোচনা-পর্যালোচনা সমীচীন নয়। কেননা তা থেকে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কর্তব্য হলো পরিবারের মাঝে শান্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখা। স্নেহভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা। মায়া-মমতা ও

সদয়তার ক্ষেত্রে তারা হবেন সন্তানদের জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ। রাসূল ﷺ বলেছেন:

مَا كَانَ الرَّفْقُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا عُزْلٌ عَنْهُ إِلَّا شَانَهُ.
(مسند أحمد ١/ ٤٢٠)

অর্থ: “সদয়তা ও বিনম্রতার পরশে যেকোনো বিষয়ই শোভামণ্ডিত হয়। নম্রতা ও কোমলতা ছাড়া যেকোনো কিছুই তার সৌন্দর্য হারায়।” (মুসনাদে আহমদ)

২১. মা-বাবাকে একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, কখনো যেন সন্তানদের সামনে তারা বিবাদে না জড়ান। কেননা সন্তান মা-বাবাকে ভীষণরকম অনুকরণ করে। মা-বাবার পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে তারা নেতিবাচক মানসিকতায় প্রভাবিত হয়। ঝগড়া-বিবাদের আশঙ্কা হলে নিকটাত্মীয় কাউকে সুরাহাকারী মেনে নেওয়া এবং তাত্ক্ষণিক বিবাদ থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

২২. মা-বাবার কর্তব্য হলো, সন্তানদের জন্য বেশি বেশি দু‘আ করা। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকবে, সন্তানদের মাঝে সমতা বজায় রাখা। তাদের কোনো আচার-আচরণে যেন কোনো সন্তানের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না হয়। সাথে সাথে নেক আমলেও তাদেরকে যথেষ্ট সচেষ্ট হতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ৯০]

অর্থ: আর তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্যতা সম্পন্ন করেছিলাম; তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত। (আম্বিয়া: ২১: ৯০)

২৩. সন্তানদের নিকট মানবীয় উত্তম গুণাবলি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং তা অমলম্বন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর প্রতিদানে ইহকাল ও পরকালে উত্তম প্রতিদানের সুসংবাদ প্রদান করে অনুপ্রাণিত

করতে হবে। সাথে সাথে তাদের মনে অসদাচার ও মানবিক বিচ্যুতিগুলোর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে। এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক ও সচেতন করে তুলতে হবে।

২৪. প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য হলো, কন্যাদেরকে পূত-পবিত্রতা, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও প্রতিশ্রুতিশীলতা ইত্যাদি মানবিক গুণের দীক্ষা প্রদান করা। তাদেরকে জগতের শ্রেষ্ঠ নারীগণ 'উম্মাহাতুল মু'মিন' (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ)-এর জীবনাচার অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা।

২৫. সন্তানের দোষ-ত্রুটি ও নৈতিক বিচ্যুতির ক্ষেত্রে তাকে প্রকাশ্যে তিরস্কার না করে নম্রভাবে বুঝিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

২৬. অসৎ সঙ্গের কবল থেকে সন্তানের সুরক্ষা এবং সৎ সঙ্গ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যা তাদের সফলতা ও উন্নতির পথ সুগম করবে। বিকৃত রুচির টিভি-অনুষ্ঠান কিংবা অনলাইন-প্রোগ্রাম থেকে বিরত রাখতে হবে। সমাজে যেকোনো ধরনের সহিংসতা, অন্যায়-অত্যাচার, যা তাদের মনমানসিকতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এর ভিডিও ফুটেজ দেখা থেকে বিরত রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট:

❖ পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَلْتَنَّهُمْ مِنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

[الطور: ২১]

অর্থ: 'আর যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলিত করব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমান না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে।'

(তুর, ৫২: ২১)

❖ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা হতে বর্ণিত:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (صحيح مسلم ٤/ ٨١٤)

অর্থ: আয়েশাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্বহস্তে কোন দিন কাউকে আঘাত করেননি, কোন নারীকেও না, সেবককেও না, আলাহুর রাস্তায় জিহাদ ব্যতীত। আর যে তাঁর অনিষ্ট করেছে তার থেকেও প্রতিশোধ নেননি। তবে আলাহুর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় এমন বিষয়ে তিনি তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছেন।
(মুসলিম: ৪/৮১৪)

❖ 'দয়াদ্রুতা, ভালোবাসা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে চরম শত্রুকে পরম বন্ধুতে পরিণত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যা মহৎ বিজ্ঞানজনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর রুঢ়তা ও অসদাচারের মাধ্যমে পরম বন্ধুকে চরম শত্রুভাবাপন্ন করা মূর্থতার পরিচয়। ক্রোধের আগুন বাইরে জ্বলার আগে হৃদয়ে দাউদাউ করে জ্বলে। সুতরাং আগে তোমার মনের আগুন নেভাও। সহিংসতার আগুন আপনাতেই নিভে যাবে। পরিবারের সাথে হাসিখুশি থাক। হাস্যরসিকতায় সময় কাটাও। এ জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। হতে পারে আজকের পর কাল পরিবারের মুখ দেখার ভাগ্য না-ও হতে পারে।' -আয়েয আল-কারনী

তাসাখুত

আত-তাসাখুত হলো আল্লাহর ফায়সালা, অবধারিত নিয়তি ও ভাগ্যের প্রতি অসন্তোষ। বান্দার জন্য রিযিকের যে ফায়সালা চূড়ান্ত তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং বিশ্বজগত পরিচালনায় আল্লাহ তা'আলার কার্যপদ্ধতিতে আপত্তি উত্থাপন করা।

এমন ব্যক্তি মানসিক সংকীর্ণতা, অস্থিরতা ও বিমর্ষতায় ভুগে। নিজের ভাগ্যে কখনো সন্তুষ্ট হতে পারে না। উপার্জিত রিযিকে তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর কোনো ফায়সালায় সে স্থিরচিত্ত ও সুস্থির হতে পারে না। সে অসহনীয় মানসিক অস্থিরতা, দুর্ভাগ্য ও বিমর্ষতায় জীবনযাপন করে।

নিয়তি ও ভাগ্যের প্রতি অসন্তোষ কিয়ামতের আলামত। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ... اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى
الرَّجُلُ مِائَةً دِينَارٍ فَيَظْلُ سَاخِطًا. (صحيح البخاري ٤/ ١٠٢)

অর্থ: (আউফ ইবনে মালেক (রা.)- কে উদ্দেশ্য করে) রাসূল ﷺ বলেন, 'কিয়ামতের ছয়টি আলামত গণনা করো। ... অর্থ- সম্পদের এমন প্রাচুর্য যে, ব্যক্তিকে একশত দিনার দান করা হবে। কিন্তু এতেও সে সন্তুষ্ট হবে না।' (বুখারী ৪/১০২)

তাকদির ও নিয়তির ফায়সালায় আপনি সন্তুষ্ট কি না-এ বিষয়টি যদি যাচাই করে দেখতে চান, তবে নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করুন:

১. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আপনি যে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাতে কি ধৈর্যধারণ করেন, না কি অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়ান?
২. কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আপনি কি এ ধরনের কথা উচ্চারণ করেন কিংবা মনে মনে ভাবেন যে, 'হে আল্লাহ! আমাকে কেন এমন পরিস্থিতির শিকার করলেন?'

৩. অন্যকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতায় থাকতে দেখে আপনি কি মানসিক সংকীর্ণতা ও নিরাশাগ্রস্ত হন? অনুতাপ ও আফসোসের জ্বালায় পুড়েন?
৪. কোনো সংকটের মুখে পড়ে আপনি সম্ভ্রষ্ট চিন্তে ধৈর্যধারণ করতে পারেন, না কি অধৈর্য, অস্থির ও ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন?
- এসব প্রশ্নের উত্তর হয় যদি 'হ্যাঁ', তবে আপনার সমাধানের পথ হলো:

সমাধান:

১. শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ তিন ধরনের অসন্তোষ ও অভুষ্টি থেকে বিরত থাকুন:
- তাকদির ও নিয়তির প্রতি মনে মনে চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ পোষণ করা। এ ধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহ যে ফায়সালা করেছেন, তাতে তিনি আপনার উপর জুলুম করেছেন।
 - ভাগ্যলিপির ওপর মনের চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ মুখে প্রকাশ করা। সর্বদা নিজের হতভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কথা বলে বেড়ানো। এমন সব কথা উচ্চারণ করা, যা আল্লাহর ফায়সালার প্রতি আপনার অসন্তোষ প্রকাশ করে।
 - ভাগ আচার-আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করা। যেমন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও বঞ্চনার শিকার হয়ে, নিজের নিয়তির প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে কপাল চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন করা।

এ ধরনের যেকোনো কাজই শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ

ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (سورة الحج: ١١)

অর্থ: “মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে আল্লাহর ইবাদত করে এক প্রান্ত থেকে। যদি (দুনিয়ায়) তার কোনো

কল্যাণ লাভ হয়, তবে তাতে সে আশ্বস্ত হয়ে যায়। আর যদি সে কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে (কুফরের দিকে) চলে যায়। এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াও হারায় এবং আখেরাতও। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (হাজ্ব, ২২: ১১)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.» صحيح مسلم (১/ ৭৭)

অর্থ: ‘যে গাল-চাপড়ায়, জামা-কাপড় ছিড়ে ফেলে অথবা জাহেলি যুগের মতো বিলাপ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’ (মুসলিম: ১/৯৯)

২. মনে রাখবেন, তাকদির (নিয়তি) ও আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা গুরুতর শিরকের নামান্তর। কেননা যখন আপনি তাকদিরের প্রতি অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, আপনি যেন আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালার যৌক্তিকতা ও যথার্থতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করলেন। এ যেন আসমানি ফায়সালা অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা তাকদিরের ভালো-মন্দের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ।
৩. কাক্ষিত সুবিধাজনক অবস্থানে উৎফুল্ল হওয়া, আর অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে ক্ষুব্ধ হওয়া—আল্লাহর ফায়সালা দেখে মুনাফিকদের মতো এমন আচরণ করা সমীচীন নয়। প্রকৃত মু‘মিন বান্দার বৈশিষ্ট্য হলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা; তাকদিরের ভালো-মন্দ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা। সুতরাং আপনার কর্তব্য হলো মু‘মিনের এ অনন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করা এবং নিয়তির প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তোষ পরিহার করা, কেননা তা মুনাফিকের “খাসলত”^৪।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন:

^৪ স্বভাবজাত বদভ্যাস।

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: ৫৮]

অর্থ: তাদের (অর্থাৎ, মুনাফিকদের) মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা সদকা (বন্টন) সম্পর্কে আপনাকে দোষারোপ করে। সদকা থেকে তাদেরকে তাদের (মনমতো) দেওয়া হলে তারা খুশি হয়ে যায়। আর তাদেরকে যদি তা থেকে না দেওয়া হয়, অমনি তারা ক্ষুব্ধ হয়। (তাওবা, ৯: ৫৮)

৪. তোমার ভাগ্যে যা আছে, তা অবশ্যম্ভাবী, এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে। কিন্তু যা তোমার ভাগ্যে নেই, তা কিছুতেই তোমার অর্জিত হবে না। বিশ্বজগতের পরিচালনার চাবিকাঠি একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহর হাতে। তাঁর প্রতিটি ফায়সালা, প্রতিটি সিদ্ধান্তে নিগূঢ় কোনো তত্ত্ব রয়েছে, যা আমাদের বোধগম্য নয়।
৫. তাকদিরের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে নিজের নেক আমলসমূহ নষ্ট করবেন না। ইতঃপূর্বে আপনি যত মহৎ নেক আমলই করেন না কেন, তাকদিরের প্রতি অসন্তোষ ও ঘৃণা তা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পবিত্র কুরআনের বিধান:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ২৮]

অর্থ: ‘এটি এ জন্য যে, তারা এমন সব বিষয়ের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করেছে এবং তারা তাঁর সন্তোষকে অপছন্দ করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।’ (মুহাম্মদ, ৪৭: ২৮)

৬. সন্তুষ্ট চিন্তে আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিন। তার চূড়ান্ত বিধানের সামনে নিজেকে সমর্পণ করুন। এ বিশ্বাস ধারণ করুন যে, নিজের কল্যাণে আপনার সিদ্ধান্তের চেয়ে আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালাই অধিক সংগত ও কল্যাণকর। আপনার সন্তোষ ও তুষ্টির মানসিকতা উত্তম পাথর। কেননা মনের সচ্ছলতাই প্রকৃত সচ্ছলতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ".

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যে ফায়সালা করেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাক। তবেই আপনি মানুষের মাঝে প্রকৃত সচ্ছল ও ধনী হতে পারবে।' (তিরমিজী ৪/১২৭)

৭. নিকৃষ্ট বিতারিত ইবলিসের শিষ্য হতে যাবেন না, সে মানুষের মনে তাকদির ও নিয়তির বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে; বান্দার ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা এবং আল্লাহর তা'আলার ফায়সালা ও নিয়তির বিষয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে দুর্বোধ্য করে তোলে।

বিশ্বজগতে সর্বপ্রথম যে অবাধ্যাচার ও নাফরমানি ঘটেছিল, তা আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার প্রতি অসন্তোষের কারণেই হয়েছিল। আদম-কে সিঁজদা করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছিল, ইবলিস তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারেনি। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে আযাবে পাকড়াও করলেন।

৮. আপন রবের প্রতি গভীরভাবে এ বিশ্বাস ধারণ করতে হবে যে, জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। এর মাধ্যমে মূলত তিনি আপনাকে তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হওয়ার সুযোগ দান করেন। বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন করেন রবের উপর আস্থা ও বিশ্বাস, ধৈর্য ও অবিচলতা পরখ করার জন্য, আপনার তাসবীহ^৫, তাহলীল^৬, আল্লাহ তা'আলার দরবারে সবিনয় কাকুতি-মিনতি ও ক্রন্দন দেখার জন্য। কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব আমলের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর দরবারে তার মাকাম উচ্চ হতে উচ্চস্তরে উন্নীত হয়।

৯. আপন রবকে অসন্তুষ্ট করে শয়তানকে খুশি করবেন না। আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদিরের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে আপনার পরিবার-

^৫ আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্বের ঘোষণা।

^৬ আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের ঘোষণা।

পরিজনকে কষ্টে ফেলবেন না; বরং জীবনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই হাসিমুখে প্রসন্নচিত্তে বরণ করুন। এতে মহান রবের পক্ষ হতে প্রতিদানপ্রাপ্ত হবেন, তাঁর সম্ভৃষ্টি লাভে ধন্য হবেন। পরিবার-পরিজন ও বন্ধুসজন আপনার মানসিকতায় আশ্বস্ত হবে।

১০. সর্বদা নিজেকে এ কথা বলুন যে, আপনি আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তিনি যদি আপনার মঙ্গলের ফায়সালা করেন, আপনার কর্তব্য তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করা। তিনি যতি আপনার অমঙ্গলের ফায়সালা করেন, তাহলে পুণ্য লাভের আশায় সম্ভৃষ্টিচিত্তে ধৈর্যধারণ করাও কর্তব্য। কেননা তিনি আপনার খালিক-মালিক (স্রষ্টা ও কর্তৃত্বাধিকারী)।
১১. আল্লাহর ফায়সালার প্রতি অসম্ভৃষ্টি ও ক্ষুব্ধ না হয়ে যদি প্রফুল্ল চিত্তে ধৈর্যধারণ করতে পারেন, তবে রাসূল ﷺ-এর যবানে বিরাট প্রতিদান ও মহা পুণ্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (صحيح مسلم ৪/২২৯৫)

অর্থ: মু'মিন বান্দার অবস্থা বড়ই আশ্চর্যের! তাঁর প্রতিটি অবস্থাই তো তার জন্য মঙ্গলজনক। প্রকৃত মু'মিন বান্দাই এ কল্যাণের হকদার। সে কোনো সুসংবাদ ও আনন্দ পেলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। যা তার জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। কোনো দুঃসংবাদ ও দুঃখের সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য মঙ্গল বয়ে আনে।" (মুসলিম ৪/২২৯৫)

১২. আপনি যে বিপদ ও সংকটে পড়েছেন, তার চেয়েও বড় বিপদ ও গুরুতর সংকটের আশঙ্কাও রয়েছে, তাতেও তো আক্রান্ত হতে পারতেন—এ কথা মনে করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, বিপদের চেয়ে মহাবিপদ বিদ্যমান। সংকটের চেয়ে মহাসংকট বর্তমান।

যেমন: কোনো ব্যক্তি পুত্রের মৃত্যু শোকে বিহ্বল হয়েও আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করল যে, আমি তো একটিমাত্র সন্তান হারিয়েছি, যদি সকল সন্তানকে হারাতাম! আল্লাহ মেহেরবান! বাকিরা তো সুস্থ স্বাভাবিক বেঁচে আছে। কারো পা ভেঙে যাওয়ার পরও আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করল যে, আমার পা ভেঙেছে মাত্র। পঙ্গু অকেজো হয়ে যাইনি। চিকিৎসা গ্রহণ করে আমি পুনরায় সুস্থ-স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারব।

১৩. দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনার অনুভূতি ব্যক্ত করা ব্যতীত আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট ও প্রসন্নচিত্ত হতে হবে—এমন কোনো বিধিবদ্ধ বিধান নেই। অসুস্থ ব্যক্তি ব্যথায় কাতরাতে-কাতরাতে তিতা ওষুধ সেবন করছে; কিন্তু মনে-প্রাণে সে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট। রোযাদার গরমের দাবদাহ সহ্য করেও রোযা রাখছে। প্রসন্নচিত্তেই সে গরমের এ কষ্টটুকু সহ্য করে যাচ্ছে। এ কষ্টে তার কোনো অভিযোগ-অনুযোগ নেই। সুতরাং তাকদির ও নিয়তির ভালোমন্দ মেনে নিয়ে, শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন না করে, দুঃখ-বেদনা ও দুর্দশার কথা ব্যক্ত করা যেতে পারে। তাতে কোনো বাধা নেই।

১৪. আল্লাহর ফায়সালা ও তাকদিরের ভালোমন্দ মেনে নেওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে:

সর্বোচ্চ স্তর হলো সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করা। মধ্যস্তর হলো নিয়তির সামনে নিজেকে সাঁপে দিয়ে ধৈর্যধারণ করা। নিম্নস্তর হলো অসন্তোষ, বিরক্তি ও ক্ষোভ প্রকাশ করা।

সর্বোচ্চ স্তর হলো পুণ্যবান মুত্তাকীদের অবস্থা। মধ্যস্তর হলো মধ্যম পর্যায়ের মুমিন বান্দার অবস্থা। নিম্নস্তর হলো ক্ষতিগ্রস্ত ও যালিম বান্দার অবস্থা। সুতরাং আপনি তুষ্টি ও সন্তুষ্টি, শোকর ও কৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ স্তর অর্জনে সচেষ্ট হোন।

১৫. এমন কেউ নেই যে, অদৃশ্যে জ্ঞাত। কারো এ সামর্থ্য নেই যে, কী ঘটতে যাচ্ছে, সে তা আগাম সংবাদ দিতে পারে। এমনকি এর ওপর ভিত্তি করে কী মঙ্গল বয়ে আসছে কিংবা অমঙ্গল ধৈয়ে আসছে, তাও

জানিয়ে দিতে পারে।

একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্যে জ্ঞাত, অদৃষ্টির দ্রষ্টা। সুতরাং তাঁর বিধানই সস্তুষ্ট থাকুন। তাঁর ফায়সালার সামনে নিজেকে সমর্পণ করুন। লোকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে অসীযত^৭ করেছিলেন:

‘আমি তোমাকে কয়েকটি মহৎ গুণ অর্জনের উপদেশ দিচ্ছি, যার মাধ্যমে তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে এবং তাঁর ক্রোধের পাত্র হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে শিরক করবে না। ভালো-মন্দ সবক্ষেত্রে আল্লাহ ফায়সালায় সস্তুষ্ট থাকবে।’

১৬. আকৃতি-অবয়বে, জীবিকা-উপার্জনে, পদ ও সম্মানে, স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে আপনার নিম্নশ্রেণির লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করুন। ফলে আপন রবের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ বজায় থাকবে। রাসূল ﷺ-এর বাণী স্মরণ করুন:

«انظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ،
فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ». صحيح مسلم (২২৭০/৬)

অর্থ: তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তবে তোমাদের চেয়ে উঁচু স্তরের লোকদের দিকে লক্ষ্য করো না। কেননা আল্লাহর নি'আমাতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা।
(মুসলিম ৪/২২৭৫)

১৭. ইহজাগতিক বাস্তবতার সাথে নিজের মন-মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা সর্বোপরি নিজেকে মানিয়ে নিন। জাগতিক জীবন হলো বিপদ-আপদ, সংকট-সংকীর্ণতায় আকীর্ণ। যত দিন আপনি এ জীবনযাপন করবেন, আপনাকে দুঃখ-দুর্দশা মোকাবিলা করে বেঁচে থাকতে হবে। প্রকৃত সুখ, চিরস্থায়ী শান্তি শুধু জান্নাতেই লাভ করতে পারবেন। তখন এ ঘোষণা গুনতে পাবেন:

^৭ উপদেশ।

﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ﴾ [الحجر: ৮৮]

‘তোমরা তাতে প্রবেশ কর নিরাপদে নিশ্চিন্তে।’ (হিজর, ১৫: ৪৬)

১৮. আপনি যদি আল্লাহর অবধারিত হুকুম মেনে নিতে না চান, তাঁর ফায়সালার সামনে নিজেকে সমর্পণ করতে প্রস্তুত না থাকেন, তবে আপনার কি-ই বা করার আছে? এর বিকল্পে আপনার কি-ই বা ইচ্ছাশক্তি ও কার্যক্ষমতা আছে? কপালে জুটবে শুধু মানসিক সংকীর্ণতা, অস্থিরতা, অনর্থক অভিযোগ-অনুযোগ, চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ। এসব মানসিক অস্থিরতা আপনার জীবিকায় সচ্ছলতা ফিরিয়ে দিবে না, শারীরিক সুস্থতা দান করবে না, আপনার হারানো সন্তান পুনর্জীবিত করতে পারবে না। উল্টো আপনার মধ্যে আক্ষেপ-অনুতাপ, মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিবে। আপন রবের ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে ধৈর্যধারণ করার মহা প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«عِظُمُ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ»

অর্থ: বিপদ-আপদ যত কঠিন হবে, এর ধৈর্যের প্রতিদানও তত বিরাট হবে। আল্লাহ তা‘আলা যদি কোনো সম্প্রদায়কে পছন্দ করেন, তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। যে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। আর যে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়, সে আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়। (সহীহ ইবনে মাযাহ ২/১৩৩৮)

১৯. নবীগণদের জীবনচরিত পড়ে দেখুন, নেককার বান্দাদের জীবনচরিত পড়ে দেখুন, কীভাবে তাঁরা জীবনের পদে-পদে কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন! কত মহা বিপদ-দুর্যোগ মোকাবিলা করেছেন! তাঁদের তুলনায় আমাদের জীবনের সংকটগুলো তো নিতান্তই নগণ্য, তুচ্ছ। তা সত্ত্বেও তাদের হৃদয়াত্মা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টিতে পরিতৃপ্ত, আত্মসমর্পণের পরম সৌভাগ্যে অপূত, দেহের প্রতিটি

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরীক্ষায় সদা অনড়। তাঁরা আল্লাহর ফায়সালায় সম্ভুষ্ট। আল্লাহ তা'আলাও তাঁদের ফায়সালায় সম্ভুষ্ট।

২০. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ৮৭]

অর্থ: কেবল (সাফল্য লাভ করবে) সে ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট আসবে। (শুআরা, ২৬: ৮৯)

সুতরাং শুদ্ধ ও নিষ্কলুষ মন ব্যতীত আমরা মুক্তি পেতে পারি না। সম্ভুষ্টচিত্তে তাকদিরের ভালোমন্দের ফায়সালা মেনে নেওয়া ব্যতীত হৃদয়াত্মার পরিশুদ্ধি ও নিষ্কলুষতা সাধিত হতে পারে না। তাই হিংসা-বিদ্বেষ, ক্ষোভ-আক্রোশ, ধোঁকা-প্রবঞ্চনা থেকে অন্তর পবিত্র করে আল্লাহর প্রতি সম্ভুষ্টি লালন করুন।

২১. আপনি যদি আপন রবের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস, সম্ভুষ্টি, সমর্পণ, তাকদিরের ভালোমন্দ সাদরে গ্রহণ করার মতো বিরাট নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে তোমার রবের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। কেননা আপনি অন্তর্জাগতিক বিরাট নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ঈমানের উচ্চস্তর লাভ করেছেন। আখেরাতের বিশাল ধনভাণ্ডার সঞ্চয় করে নিয়েছেন।

২২. বিশ্বনন্দিত কোনো ইঞ্জিনিয়ার যদি বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করে, বড় বড় দরজা-জানালা ও প্রবেশপথ দিয়ে ভবনের প্রতিটি স্তর সাজায়, এরপর সে আবার ভাঙা-গড়ার কাজ শুরু করে, নতুনভাবে ভবনটি নির্মাণ করে, তবেও কি কারো সাধ্য আছে যে, তার নির্মাণশৈলীর সমালোচনা করবে? তাহলে যিনি মহা প্রজ্ঞাবান, যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণের দ্রষ্টা, তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি কীভাবে অসন্তোষ ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে? তাঁর ভালোমন্দের ফায়সালা কি বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া সমীচীন নয়?

২৩. ব্যক্তি যখন তার আপাদমস্তক বিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে সঁপে দেয়, ডাক্তার প্রয়োজনবোধে কোনো অঙ্গ অবশ করেন, অথবা কেটে ফেলেন, কিংবা কোথাও অপারেশন করেন। সকলেই বলে, 'ডাক্তার যথার্থ করেছেন।'

চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার কারণেই সবাই নির্দিধায় তার চিকিৎসার প্রশংসা করে। তাহলে যিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, বিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় বিষয়ে সর্বজ্ঞ সত্তা, তিনি যদি আপনাকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করেন, কোনো সংকটে ফেলেন, তবে নিজ প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতার গুণেই তিনি তা করেছেন। তাই তাঁর ভালোমন্দের ফায়সালার সামনে নিজেকে সমর্পণ করুন। পবিত্র কুরআনের বাণী স্মরণ করুন:

﴿الَّذِي يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [المالك: ১৮]

অর্থ: যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক জ্ঞাত। (মুলক, ৬৭: ১৪)

২৪. আল্লাহর তরফ থেকে অবধারিত তাকদিরের ভালোমন্দের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন। নিজের মন-মানসিকতা এভাবে প্রস্তুত করে নিন যে, ইহজাগতিক জীবনে কাক্ষিত যত সুখ-শান্তির ছোঁয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত যত দুঃখ-বিষাদের থাবা, সবই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষে থেকে পূর্বনির্ধারিত ও চূড়ান্ত অবধারিত, এর কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন:

وَأِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» صحيح مسلم (২০৫২/৬)

অর্থ: যদি কোনো কিছু (বিপদ) তোমার উপর আপতিত হয় তবে এরূপ বলবে না যে, যদি আমি তেমনটি করতাম তাহলে এমনটি হতো; বরং বলুন যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, আপনার لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের আমলের দুয়ার খুলে দেয়। (মুসলিম ৪/২০৫২)

২৫. এ কথাটি মনে মনে পাঠ করতে থাকুন:

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا.

অর্থ: 'আমি রব ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহকে পেয়ে, ধর্ম হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সন্তুষ্ট।'

এতে আপনি পরম সৌভাগ্য ও ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا. صحيح مسلم (১/৬২)

অর্থ: যে ব্যক্তি রব ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহকে পেয়ে, ধর্ম হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সন্তুষ্ট, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ আশ্বাদন করতে পারবে। (মুসলিম: ১/৬২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যত্র বলেছেন:

مَنْ قَالَ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. صحيح ابن حبان - محققا (১৬০/৩)

অর্থ: যে ব্যক্তি বলবে, আমি রব ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহকে পেয়ে, ধর্ম হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সন্তুষ্ট, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান: ৩/১৪৫)

২৬. প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় হলো, যে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সামনে আত্মসমর্পণ করে। তাঁর সমস্ত বিধিবিধান ও ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। নিয়তির ভালোমন্দ ফায়সালা সম্পর্কে তার কোনো অভিযোগ-অনুযোগ থাকে না। সর্বোপরি ইহজাগতিক জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা মেনে নিয়েই সে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকে। আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে। আল্লাহ তা'আলা যে তার মতো নগণ্য বান্দার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তার যাবতীয় বিষয়

পরিচালনা করছেন, এর জন্য তাঁর দরবারে স্বপ্রশংস কৃতজ্ঞচিন্তা থাকে।
সুতরাং আপনিও নিজেকে এভাবে গড়ে তোলায় সচেষ্ট হোন।

২৭. আপনি যদি প্রকৃত সুখ-শান্তি, আনন্দ ও প্রশান্তি পেতে চান, তাহলে তুষ্টি ও সন্তুষ্টির মানসিকতা লালন করুন। ইহকালেই তা আপনার সামনে জান্নাতের দ্বার উন্মোচন করবে। আর অসন্তোষ ও ক্রোধ হলো দুঃখ-কষ্ট ও আফসোস-অনুতাপের কারণ। যা আপনার মনে দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি করবে; আপনাকে আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত করবে। সুতরাং আপন রবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তাঁর ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করুন।

পরিশিষ্ট:

- ❖ বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে ফারেস শুধু রুটি ও পানি খেয়েই জীবনধারণ করতেন। লোকেরা তাঁর কাছে জানতে চাইল:

‘আপনি কীভাবে জীবন-যাপন করেন?’

বললেন:

‘আমি তো আল্লাহ প্রতি সন্তুষ্ট অবলম্বন করেই বেঁচে আছি।’ এরপর তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করেন:

ذَاكَ التَّعِيمُ الْأَجَلُ.

مَاءٌ وَخُبْرٌ وَظِلٌّ

إِنْ قُلْتُ: إِنِّي مُقِلٌّ.

كَفَرْتُ نِعْمَةً رَبِّي

অর্থ: পানি, রুটি ও ছায়াদার বাসস্থান, এ-ই তো আমার জন্য বিরাট নিয়ামত। যদি বলি, এতো আমার জন্য অতি সামান্য, তাহলে আমি হবো আমার রবের নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

- ❖ আমেরিকার বিখ্যাত লেখক ডেল কার্নেগী (১৮৮৮-১৯৫৫ খৃস্টাব্দ) একটি ঘটনা লিখেছেন:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রধান জাপানের সমুদ্রে ডুবে গেলেন। এক পর্যায়ে তার মনে হলো, প্রাণ নিয়ে আর তীরে ফিরতে পারবেন না। কিন্তু নৌবাহিনীর অন্য সদস্যদের সাহায্যে তিনি এ যাত্রায় বেঁচে গেলেন। পরে এ ঘটনায় তার অনুভূতি জানতে চাওয়া হলো।

বললেন, ‘আমি জীবনের একটি শিক্ষা লাভ করেছি—যে ব্যক্তি তার ভাগ্য ও নিয়তি সম্বন্ধে মেনে নিতে পারবে এবং জীবনধারণের জন্য গরম রুটি ও শীতল পানি পাবে, সে সুখী জীবনযাপন করতে পারবে।’

❖ বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) (৩২ হি.) বলেন:

‘আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ন্যায়ানুগতা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে অগাধ বিশ্বাস ও সম্বন্ধের মানসিকতার মধ্যে প্রকৃত সুখ নিহিত রেখেছেন। আর দ্বিধা-সংশয়, অসন্তোষ ও ক্ষোভের মধ্যে দুঃখ-দুর্দশা ও মানসিক অপ্রসন্নতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।’

খেলাধুলা নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি ও পক্ষপাতিত্ব

খেলাধুলা নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ি ও পক্ষপাতিত্ব একটি মানসিক ব্যাধি। যা ব্যক্তিকে তার পছন্দের খেলোয়াড় ও দলের সমর্থনে এবং প্রতিপক্ষের বিপক্ষে প্রান্তিক ও উগ্র করে তোলে। সমর্থনের এই বাড়াবাড়ি ও উগ্রতা কখনো কখনো অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, গালমন্দ, আরেক কদম আগে বেড়ে হাতাহাতির রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, যা খেলাধুলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা ব্যাহত করে। অন্ধ ক্রীড়া উন্মাদনা সমর্থকদের মাঝে পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ ও সম্পর্কচ্ছেদের মতো বিশিষ্ট পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কখনো কখনো তা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে হাতাহাতি ও মারপিটের রূপ পরিগ্রহ করে।

অনেক পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়, তারা এমন এমন রিপোর্ট করছে, যা ক্রীড়ামোদী সমর্থকদের মাঝে ক্রীড়া-উন্মাদনা উস্কে দেয়। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোতে খেলাধুলা নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডা ও তর্কযুদ্ধ দেখা যায়। যার কোনো কোনোটি শেষ অবধি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এভাবে অন্ধ ক্রীড়া-উন্মাদনার কারণে আনন্দ-উৎফুল্লতা বিষাদ-বেদনায় পর্যবসিত হয়, পরস্পর সৌহার্দ্য-ভালোবাসা বিভেদ-বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। কোনো কোনো খেলার ম্যাচ দেখা গেছে সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়ে পুরস্কার উদযাপনের পরিবর্তে গুণ্ডাগোল ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধিয়ে সমাপ্ত হয়েছে।

এ ধরনের ক্রীড়া-উন্মাদনা ও দুর্গতি থেকে আমরা আমাদের প্রজন্মকে কীভাবে রক্ষা করতে পারি, কীভাবে তাদের মাঝে সুস্থ ক্রীড়া-বিনোদনের প্রাণ সঞ্চার করতে পারি, যা তাদের মাঝে বিভেদের পরিবর্তে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করবে; বিদ্বেষের পরিবর্তে আন্তরিকতা বাড়াবে; সম্পর্কচ্ছেদের বন্ধন অটুট করবে?

সমাপ্ত:

১. সামাজিক অঙ্গনে, বিশেষ করে ক্রীড়াঙ্গনে অহংকার-দান্তিকতা ও ঘৃণার সংস্কৃতি বাদ দিয়ে মানবিক উদারতা ও সুস্থ ক্রীড়া-মননশীলতার সংস্কৃতি বজায় রাখতে হবে। যাতে খেলোয়াড়, সমর্থক ও দায়িত্বশীলদের মন-মানসিকতা ও আচার-আচরণে অন্ধ বাড়াবাড়ি ও ক্রীড়া-উন্মাদনার কোনো ছাপ না থাকে এবং বর্তমান প্রজন্মের মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠে। কেননা খেলাধুলা কোনো বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্র নয়। তা হলো শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষার একটি মাধ্যম মাত্র।
২. খেলাধুলা নিয়ে অন্যায় বাড়াবাড়ির বিষয়টি প্রশ্ন না দিয়ে একে শান্তিযোগ্য অপরাধের আওতাভুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে যারাই খেলাধুলার অপব্যবহার করে উগ্রতা উসকে দিবে, অন্ধ উন্মাদনা মাতাবে, তাদেরকে শাস্তির আওতাভুক্ত করতে হবে।
৩. ক্রীড়াঙ্গনে যারা সুস্থ মননশীলতা, উদারতা, নিয়ম-নীতির অনুবর্তিতার পরিচয় দিবে, তাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কৃত করতে হবে। যেন তারা নিজেদের এ বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারে এবং তাদের দেখে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয়।
৪. কথাবার্তায় সংযম, অন্যের প্রতি সদাচার, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ইত্যাদি বিষয়সংবলিত কুরআনের আয়াত ও হাদীস ব্যাপকভাবে প্রচার করা কর্তব্য।
৫. মনে রাখবেন, হোক ক্রীড়াঙ্গন কিংবা যেকোনো অঙ্গন, শরীয়তের দৃষ্টিতে সবক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি, উন্মাদনা ও পক্ষপাতিত্ব এবং এর কারণে যে ঝগড়া-বিবাদ, গালমন্দ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়—তা সবই নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

অর্থ: তারপর লোকেরা তাদের মাঝে তাদের দীনকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল-। (মু‘মিনুন, ২৩: ৫৩)

৬. সমাজের প্রতিটি স্তরে অভিভাবকগণ নিজেদের পরিবার ও ঘরে সন্তানদের মাঝে সৌহার্দ্য, উদারতা, প্রতিযোগিতামূলক চেতনা ও সহনশীল মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি অহংকার, দান্তিকতা, স্বজনপ্রীতির মতো নোংরা স্বভাবগুলো থেকে বিরত রাখতে হবে।
৭. প্রত্যেক দল ও ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে প্রীতি-মিলন সভা আয়োজন কিংবা “ক্রীড়াঙ্গনে স্বজনপ্রীতিকে না বলুন” শিরোনামে প্রীতি ম্যাচের আয়োজন করতে হবে। এ ম্যাচ থেকে অর্জিত আয় এতিম-দুস্থদের কল্যাণ ফান্ডে জমা হবে। যাতে করে খেলোয়াড়, দর্শক ও ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও মানবিকতা ও দয়াদ্রতার অনুভূতি জাগরুক থাকে।
৮. খেলাধুলার বিষয়টি আনন্দ-বিনোদন ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আঙ্গিকে গড়ে তুলতে হবে। একে এমন ছাচে ঢেলে সাজাতে হবে, যেন তা বিশ্বমানবতার দরবারে ধার্মিকতা, নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার মহৎ বার্তার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে মূল্যায়িত হয়। যা মানুষের ইসলামের মহৎ শিক্ষাদীক্ষার বিস্তার ঘটাবে।
৯. খেলোয়াড় ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ কর্মকর্তাগণ বিবৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি কথা, প্রতিটি শব্দ ভেবে চিন্তে উচ্চারণ করবেন। তাদের কোনো কথা যেন পক্ষপাতদুষ্ট না হয় এবং অন্যের জন্য কষ্টদায়ক না হয়। কেননা ক্রীড়া বিভাগের অন্যদের জন্য তারা অনুসরণীয়।
১০. সাংবাদিক ও কলামিস্টদের কর্তব্য হলো সুস্থ ক্রীড়ামননশীলতা ভাব বজায় রেখে রিপোর্ট করা। তাদের লেখায় ক্রীড়া-উন্মাদনা ও পক্ষপাতের কোনো ছাপ না থাকে কিংবা সমর্থকদের মাঝে তা উস্কে দেওয়ার প্রবণতা না থাকে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة : ২]

অর্থ: তোমরা সংকর্ম ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করবে। অন্যায় ও যুলুমের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি অতি কঠিন। (সূরা মায়েদা, ৫: ২)

১১. এ মানসিকতা বদ্ধমূল করতে হবে যে, খেলায় হার-জিত স্বতঃসিদ্ধ ও অবশ্যম্ভাবী। হার কিংবা জিত কোনোটিই স্থায়ী নয়। সুতরাং ফলাফল যা-ই হোক না কেন, পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে।
১২. যে ব্যানার কিংবা প্ল্যাকার্ড দর্শকদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তাদের সমর্থনে আঘাত হানে, তা নিয়ে স্টেডিয়ামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে।
১৩. স্বাস্থ্য সচেতন হোন, এবং উন্মাদনা, বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের কারণে যে ধরনের রোগ-ব্যাধির জন্ম হয় (যেমন: ব্রেইন স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, হার্ট এটাক ইত্যাদি) থেকে বেঁচে থাকুন। সীমাহীন উন্মাদনা ও বাড়াবাড়ির বশবর্তী হয়ে টিভি পর্দায় ও স্টেডিয়ামে অনেককে এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হতে দেখা গেছে।

পরিশিষ্ট:

حَدَّثَنَا - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: «دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ» ح صحيح مسلم (١٩٩٨ / ٤)

অর্থ: সুফইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা (রহ.) জাবির (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, জাবের (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, আমরা এক যুদ্ধে নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তখন একজন মুহাজির একজন আনসারের নিতম্বে আঘাত করল। সে সময় আনসারী চিৎকার করে বলল, 'হে আনসারীরা!' আর মুহাজির ব্যক্তি হাঁক দিল, 'হে মুহাজিরগণ!' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'কী ব্যাপার! জাহিলিয়া যুগের মতো হাঁক-ডাক কেন?' তারা বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! একজন মুহাজির একজন আনসারকে পাছায় আঘাত করেছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা এরূপ কথাবার্তা ছেড়ে দাও। কেননা, এ-তো (দুর্গন্ধময়) ন্যাকারজনক।' (মুসলিম, ৪/১৯৯৮)

- ❖ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন: 'দুধরনের বেশ ধারণ করা থেকে বিরত থাকুন। যে তার কোনো একটা ধারণ করবে, সে তিরস্কার ও ভৎসনার শিকার হবেন।' এক. "জাহেলে মুরাক্কাব"^৮।

দুই. তার চেয়ে জঘন্য হলো স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। আপনি বরং ন্যায়ানুগতার ভূমিকা পালন করুন। এটাই শ্রেষ্ঠ ভূমিকা।'

- ❖ মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী (মহাত্মা গান্ধী) (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন: 'মুষ্টিবদ্ধ হাতের সাথে আপনি কখনো হাত মেলাতে পারবেন না। বিবেক-বুদ্ধিতে জড়তাগ্রস্ত লোকের সঙ্গে তর্ক করে বোঝাতে পারবেন না।'

^৮ যে জানে না। সে যে জানে না, এটাও জানে না।

ব্যর্থতা

ব্যর্থতা হলো মানবজীবনের একটি কঠিনতম মুহূর্ত। আপনি যখন স্বপ্ন পূরণে নিজের অক্ষমতা টের পাবেন, হোক না তা সাময়িক, কাক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজের অপারগতা বুঝতে পারবেন, হোক না তা আপেক্ষিক, তা আপনার জীবনের স্বাভাবিক গতিপথকে ব্যাহত করবে এবং জীবনের পরম সুখ ও সৌভাগ্য অর্জনে আপনার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফল হওয়ার জন্য আপনি যত চেষ্টাই করুন-না-কেন, ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতা আপনাকে কোনো না কোনো মুহূর্তে আশ্বাদন করতেই হবে। এটাই হলো মানবজীবনের এক অবধারিত নীতি। মানুষের ক্ষমতা নেই, শতো সাধ্য-সাধনা করেও জীবনের এ তিক্ত বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার এবং তা থেকে মুক্তি লাভ করার।

লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী মোটকথা জীবনের যেকোনো অঙ্গনেই আপনি যখন ব্যর্থ হবেন, তখন তা আপনার জন্য এক কঠিন পরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে। জীবন-যুদ্ধই হলো জয়-পরাজয়, দুঃখ-বেদনা, দারিদ্র্য-সচ্ছলতা, সফলতা-ব্যর্থতার নাম। আজকের দিনটি আপনার বেশ কাটবে তো আরেকদিন আপনাকে ভীষণভাবে ভোগাবে।

ব্যক্তি উচ্চ মনোবল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য ও সহনশীলতা অনুযায়ী তার ব্যর্থতা বিভিন্ন রকম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, মনোবল হারিয়ে ফেলে। একপর্যায়ে ব্যর্থতার ঘূর্ণাবর্তে তার জীবনটাই হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ স্থবির। কখনো কখনো এ ব্যর্থতা জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে বিরাট দূশ্চিন্তা ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জীবনভর সে অনুতাপ-আক্ষেপে ভুগতে থাকে।

ব্যর্থতার কাটিয়ে সফলতা লাভ করার উপায় কী? জীবনের এ তিক্ততার সম্মুখীন হলে আমাদের করণীয় কী?

সমাধান:

১. প্রথমেই নিজের ব্যর্থতা ও বিফলতার দায় স্বীকার করুন। ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা বোকামি। এতে আপনার কাপুরুষতা ও সামনে অগ্রসর হওয়ার অপারগতা প্রকাশ পাবে। ব্যর্থতার কারণগুলো শনাক্ত করে তা সমাধানের চেষ্টা করুন এবং সফলতা লাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রতিশ্রুতিশীল হোন। তাহলেই সংকট ও প্রতিকূলতা কাটিয়ে সফলতা অর্জনের পথ সুগম হবে।
২. জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী, কাজিফত গন্তব্য কী-এ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর যদি আপনার জানা না থাকে, তাহলে আপনার পক্ষে কিছুতেই সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন। তা বাস্তবায়নে যথাযথভাবে উদ্যোগী হোন। ব্যর্থ, নিরাশাবাদী ও হিংসুক লোকদের কথায় ভ্রক্ষেপ করবেন না।
৩. বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও গুণীজনদের পরামর্শ গ্রহণ করুন। তাদের বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার পাথেয় সংগ্রহ করুন। যে সমস্ত কারণে আপনার ব্যর্থতার আশঙ্কা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে এর যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করুন এবং বাস্তব জীবনে তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।
৪. ধৈর্য, সহনশীলতা ও নিরন্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করুন। তাঁর মহৎ জীবনচরিত পাঠ করুন। তাতে ব্যর্থতা মোকাবেলা করার এবং সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করার পথ ও পাথেয় বিদ্যমান।
৫. জীবন পরিবর্তনশীল, সফলতা ও ব্যর্থতার গণ্ডিতে আবর্তিত। তাই ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতায় ভেঙ্গে পড়া, দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে একাকিত্ব বরণ করা সমীচীন নয়। ধৈর্যধারণ করুন। সহনশীল হোন। বিশ্বাস করুন, এ ব্যর্থতা ও প্রতিকূলতা নিতান্তই আপেক্ষিক। অচিরেই তা কেটে যাবে। আগত ভবিষ্যৎ আরও সুন্দর, আরও উজ্জ্বল। মনে রাখবেন, প্রত্যেক সফল ব্যক্তির আশাবাদী। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা বুকে ধারণ করেই তারা বেঁচে থাকেন। উন্নতি-অগ্রগতির পথে এগিয়ে যান।

৬. সফলতা অর্জনের পথে একের-পর-এক ভুল হওয়ার পরও অনবরত চেষ্টা করতে থাকুন। জীবনের একটি অঙ্গনে বিফল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, সর্বক্ষেত্রেই বিফলতা অনিবার্য। তাই মেধা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন কোনো ক্ষেত্রে চেষ্টা করুন।

চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেখাপড়া-প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি উপায় ও পন্থা যদি কাজে না আসে তবে ভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করুন। একটি পিপীলিকা বারবার চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরই সফল হতে পারে। বিদ্যুৎ আবিষ্কারক এডিসন সাতশতাবারের চেয়েও বেশি ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর বিদ্যুৎ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৭. অনেক পথে অগ্রসর হয়েছেন, বহু উপায় অবলম্বন করেছেন, কিন্তু কোনোটিতেই সফলতার দখল পাননি। অবশেষে এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যা বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ। দুঃসাধ্য সাধন করার মানসিকতা নিয়ে সফলতা লাভের জন্য এ পথেই অগ্রসর হলেন। কিন্তু সফলতা অধরাই রয়ে গেল। তারপরও থেমে যাবেন না। নিরাশ হবেন না। নতুন আরেকটি পথ খুঁজে বের করুন। সে পথে অগ্রসর হোন। অতীতের সব ব্যর্থতার কথা ভুলে যান। নতুনভাবে শুরু করুন।

৮. অতীতের যেকোনো মহামনীষী, মহা আবিষ্কারক ও সফল ব্যক্তিগণ জীবনের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে একবার হলেও ব্যর্থতার শিকার হয়েছেন। তাদের মাধ্যমে সান্ত্বনা গ্রহণ করুন।

৯. কল্পনাপ্রসূত ও বাস্তবতাবিবর্জিত এমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন না, যা বাস্তবায়ন করা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, রীতিমতো অসম্ভব। মেধা ও যোগ্যতা, সাধ্য ও সাধনা অনুযায়ী সম্ভাব্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন। যে কোনো লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বে তার ভালো-মন্দ বিচার-বিশ্লেষণ করে, বিজ্ঞজনের পরামর্শ গ্রহণ করে তবেই শুরু করুন।

১০. ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতা হলো জীবনের এমন এক প্রতিকূল পরিস্থিতি, যখন সহনশীলতা ও ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আপনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিদানপ্রাপ্ত হতে পারেন। মনে করতে হবে, সাময়িক ব্যর্থতা

হলো নিজের ভুল-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। নিজের প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হবে, নিষ্ফল হবে, তখন আল্লাহ তা'আলার এই মহান বাণী স্মরণ করুন:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ২১৬]

অর্থ: তোমরা কোনো বিষয় অপছন্দ করো; কিন্তু আশা করা যায় তাতেই তোমাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে। (বাকারা, ২: ২১৬)

১১. আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করুন। নিজের যাবতীয় গুনাহ, ও নাফরমানি থেকে তওবা করুন। কেননা গুনাহ পাপাচার হলো সমস্ত ব্যর্থতা, অকৃতকার্যতা ও পরাজয়ের অন্যতম কারণ। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উদ্দেশ্যে বলেন (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ১৬৫]

অর্থ: আপনি বলুন, এ পরাজয় তোমাদের নিজেদের কারণেই হয়েছে। (আলে ইমরা, ৩: ১৬৫)

১২. আপনার মন থেকে এ ধরনের শব্দগুলো চিরতরে মুছে ফেলুন—‘আমি পারব না, আমার দ্বারা হবে না, আমি কিছুতেই সফল হতে পারব না, হয়ত আমি ব্যর্থ হব।’ সমস্ত নেতিবাচক চিন্তা-চেতনা ঝেড়ে ফেলুন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও বুক ভরা আশা নিয়ে অনবরত চেষ্টা করুন।
১৩. জীবনের সাময়িক ব্যর্থতা মেনে নিন। ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকে পূঁজি করে সফলতার পথ আবিষ্কার করুন। এ বিপর্যয়কে এতটুকুন প্রশ্ন দেওয়া যাবে না, যা আপনার ওপর চেপে বসে, মন-মানসিকতাকে নিস্তেজ করে ফেলে, আপনার নিরাশা ও হতাশার চূড়ান্ত করে ছাড়ে। জীবনের এই উত্থান-পতনকে জীবনপাঠের ইতিবাচক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করুন।
১৪. বিশ্বাস করুন, ব্যর্থতা হলো আপনার অভিজ্ঞতার পরিমার্জন, ভুল-বিচ্যুতির সংশোধন এবং সফলতার প্রাসাদ গড়ার জন্য এক-একটি পোড়া ইটের মতো। ব্যর্থতা আপনার অভিজ্ঞতা ও চিন্তার জগৎকে আরও প্রসারিত করবে, সফলতার পথে পাথেয় জোগাবে।

১৫. গঠনমূলক আত্মসমালোচনা এবং নিজেকে অনবরত তিরস্কার ভরসনা-এ দু'টি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন। আপনাকে অতি অবশ্যই নিয়মিত আত্মসমালোচনা করতে হবে এবং তা হতে হবে গঠনমূলক। নিজের ভুল-বিচ্যুতিগুলো সংশোধন করার এবং তা থেকে শিক্ষণীয় পাথেয় অর্জন করার ক্ষেত্রে এটা কার্যকর উপায়।

জেনে রাখুন, কোনো একটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এটা প্রমাণ করে না যে, সর্বক্ষেত্রেই আপনি ব্যর্থ অকৃতকার্য; বরং এর মাধ্যমে আপনি এমন একটি পথ সম্পর্কে জানতে পারলেন, যা আপনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য উপযুক্ত ছিল না।

১৬. আপনার ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। আসল সমস্যা কোথায়-তা চিহ্নিত করুন। তা কি আপনার অনুসৃত পথ- পন্থায় না কি স্বয়ং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে। কেননা আমাদের অনেকেই যখন ব্যর্থ হয়, আপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুগতে শুরু করে। অথচ সমস্যাটা ভিন্ন জায়গায়, তার অনুসৃত পথ ও পন্থায়। আবার কখনো কখনো সমস্যা লুকিয়ে থাকে স্বয়ং উদ্দেশ্যের মধ্যেই। তাই প্রথমেই তা চিহ্নিত করে খুঁজে বের করতে হবে এরপর সে অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৭. অতীতের যত নিষ্ফল কার্যকলাপ, ব্যর্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, তার কথা স্মরণ করে আফসোস-অনুতাপে ডুবে থাকবেন না। হা-ভুতাশ করে কেঁদে মরবেন না। এভাবে সান্ত্বনা গ্রহণ করুন, অতীতের বিফলতায় শিক্ষার অনেক কিছুই আছে, যা আপনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে। জীবনের এ বাস্তব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অমূল্য সম্পদ।

১৮. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আপনি দৃঢ়চেতা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। যত অবহেলা-অলসতা সব ঝেড়ে ফেলুন। আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর ভরসাকারীদের পছন্দ করেন।

১৯. আলবার্ট আইনস্টাইনের কথা চিন্তা করুন, চার বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একটি কথাও শিখে উঠতে পারেননি। নয় বছর বয়স অবধি লিখতেও জানতেন না। জীবনের প্রথম ধাপেই এই পিছিয়ে পড়া, এই অধঃপতন

তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। নিরাশা ও হতাশা তাকে গ্রাস করতে পারেনি। অদম্য মানসিকতা ও নিরন্তর অধ্যবসায় তাকে ইতিহাসের মহামনীষীদের কাতারে শামিল করেছে।

২০. ব্যর্থতার পর্যায় অতিক্রম করে সফলতার গন্তব্যে পৌছতে হলে আপনাকে নিজের দুর্বলতার দিকগুলো চিহ্নিত করতে হবে। সামর্থ্য ও শক্তিমত্তার দিকগুলোও সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এর মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে যোগ্যতার সফল প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন।

২১. দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে একটি ছকে বেঁধে নিন। রুটিন মাসিক জীবনযাপন করুন। প্রতিদিনের একটি কার্যপরিকল্পনা নির্ধারণ করুন। তা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন। প্রতিদিনের দু'-এক কদম করে অগ্রসর একদিন আপনাকে সুদূর লক্ষ্যে পৌছে দিবে।

আর সময় নষ্ট করা এবং অনর্থক কাজে পড়ে থাকা কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। পরিকল্পনাহীন কাজ, ছাড়া লাগামহীন জীবনযাপন আপনাকে নানামুখী ও বিধ্বস্ত করে ফেলবে। উদ্দেশ্যহীন নানা লক্ষ্যের দিকে ছুটে কাক্ষিত গন্তব্য বিপন্ন হবে।

২২. চেষ্টা করুন। পরিশ্রম করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যেমন আদেশ করেছেন, তা মেনে চলুন। আপনার যাবতীয় কল্যাণের ফায়সালা তাঁর হাতেই ন্যস্ত করুন। এমন লোকদের মতো হবেন না, যারা কোনো চেষ্টা-পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ছাড়া অথর্ব জড়পদার্থের ন্যায় পড়ে থাকে, বসে বসে সফলতার দিন গুণে, কৃতকার্যতার আকাশকুসুম কল্পনা করে।

২৩. আত্মবিশ্বাসী হোন। নিজের সামর্থ্য ও শক্তিমত্তার প্রতি সজাগ হোন। অনাস্থা ও হীনমন্যতা, সৃজনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতায় আপনার সামর্থ্যকে দুর্বল করে দিবে, দ্রুত ব্যর্থতা ও হতাশার পথে ঠেলে দিবে।

২৪. বিশ্বাস করুন, আপনার সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই আছে। ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতাই আপনাকে সফলতার পথ দেখাবে। স্মরণ করুন মহান রবের শক্তিমত্তার কথা, কোনো কিছুই যাকে অক্ষম করতে পারে না, যে সত্তা রাতের অন্ধকারের পর আলোকময় ভোর উদিত করেন, সে সত্তা আপনার সমস্যার সমাধানও করতে জানেন।

২৫. উজ্জ্বল আগামীর প্রতি আশাবাদী হোন। দিল-দেমাগ থেকে যত নেগেটিভ চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলুন। সবসময় পজেটিভ ও ইতিবাচক চিন্তা করতে শিখুন। কেননা জীবন তো চিন্তা-চেতনারই বাস্তব চিত্র।

স্বপ্নবান ও আশাবাদী ব্যক্তিদের সঙ্গে উঠাবসা করুন। ব্যর্থ ও নিরাশাবাদী লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন।

২৬. যেকোনো দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সুচারুভাবে সম্পন্ন করুন। সমস্ত অলসতা ও হতাশা ঝেড়ে ফেলে আপন লক্ষ্যে নিরন্তর এগিয়ে যান। কয়েক দিন লক্ষ্যবাহু করে কিছু দিনের মধ্যেই সফলতা অর্জন করে ফেলার চিন্তা অবাস্তব। নিজের কাজগুলো নিখুঁতভাবে করে যান। জগতের চির অবধারিত রীতি অনুযায়ী সফলতা আপনার হাতে ধরা দিবে। আল্লাহ তা'আলার বানী স্মরণ করুন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ১৭৫]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই উত্তম আমলকারীদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না। (তওবা, ৯: ১২০)

পরিশিষ্ট:

❖ বিশিষ্ট জার্মান ধর্মযাজক ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মবিপ্লবের সূতিকাগার (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘গভীর আস্থা ও অগাধ আত্মবিশ্বাস নিয়ে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রথম ধাপটি শুরু করে দিন। চূড়ান্ত লক্ষ্যে আপনাকে পৌঁছতেই হবে—এমন আবশ্যকীয়তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। আপনি যখন সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপটি দেখতে পাচ্ছেন, তখন সিঁড়ির প্রথম ধাপটি নিশ্চিত্তে অতিক্রম করতে পারেন।’

❖ বিখ্যাত আরব কবি আবু তায়েব মুতানাব্বি (৩০৩-৩৫৪ হি.) বলেছেন:

إِذَا غَامَرْتَ فِي شَرَفٍ مَرُومٍ فَلَا تَقْنَعْ بِمَا دُونَ التَّجْوِمِ
فَطَعْمُ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ حَقِيرٍ كَطَعْمِ الْمَوْتِ فِي أَمْرِ عَظِيمِ

অর্থ: 'আপনি যখন শীর্ষ চূড়ায় উঠে পড়েছেন, তখন আকাশের তারা না ছুঁয়ে দমে যাবেন না। কেননা হীন তুচ্ছ কাজে মৃত্যুর স্বাদ আর বিরাট মহৎ কাজে মৃত্যুর স্বাদ-দুটি একই রকম।'

❖ আলজেরিয়ান বিশিষ্ট লেখিকা ও ঔপন্যাসিকা আহলাম মুসতাগনেমি (জন্ম: ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

'ব্যর্থতার মতো সফলতাও একটি দারুণ অভিজ্ঞতা, যা আপনার চারপাশের মানুষকে দারুণভাবে উপকৃত করতে পারে। যে আপনার কাছের মানুষ বন্ধুজন, আপনার সফলতাকে পূজি করে সে নিজের উন্নতি-অগ্রগতিতে কাজে লাগাবে। কিন্তু যে আপনার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, আপনার সফলতা তার ব্যর্থতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিবে। আর যে সফলতা লাভ করতে গিয়ে ব্যর্থতার শিকার হয়েছে, আপনার সফলতা দেখে সে নিজের জীবনে সতর্কতা অবলম্বন করবে।'

❖ সিরিয়ার প্রবাসী কবি ইলিয়াস কানসাল (১৯১১-১৯৮১ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

جَرَّدَ مِنَ الْعِزْمِ سَيْفًا تَسْتَعِينُ بِهِ

إِنَّ التَّرَدُّدَ بَابُ الضَّعْفِ وَالْكَسَلِ

وَالسَّعْيُ حَتَّى وَإِنْ أَفْضَى إِلَى خَطَأٍ

خَيْرٌ مِنَ الْجُبْنِ وَالتَّشْكِيكِ وَالْوَجَلِ

سَاءَ الْفُتُورُ وَلَوْ سَمِيَتْهُ حَذْرًا

مَا أَصْغَرَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالشَّلَلِ

مَجْدُ الْحَيَاةِ لِمَنْ يَبْغِيهِ مَقْتِنَعًا

مَامِنْ نَجَاحٍ إِذَا فَكَّرْتَ بِالْفَشْلِ!

অর্থ: দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার তরবারি খাপ মুক্ত কর।
এর সাহায্যে আপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কর। দ্বিধা, সংশয়
মানুষের মাঝে যত দুর্বলতা, হীনমন্যতা ও অলসতা সৃষ্টি করে।

চেষ্টা-প্রচেষ্টা যতই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোক-না-কেন, ভীর্ণতা
দ্বিধা-সংশয়, অলসতা থেকে তা হাজার গুণে উত্তম।

অলসতা শৈথিল্য অধর্বতা-এগুলোকে অসতর্কতা ও অসাবধানতা
বলে যতই চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করো-না-কেন, তা কতই না
মন্দ। মৃত্যু ও প্যারানাইসিস-এর মধ্যে পার্থক্য কতই না ক্ষুদ্র।

জীবনের মর্যাদা ও গৌরব তো এমন ব্যক্তির জন্যই, জীবনে সফল
হতে পেরে যে তৃপ্ত পরিতৃপ্ত। যেকোনো সফলতা, কৃতকার্যতা নিয়ে
চিন্তা করে দেখো, তাতে সামান্য হলেও ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতার
অবদান রয়েছে।

মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের অবাধ্যতা

মা-বাবা কখনো কখনো ছেলে-মেয়ের অবাধ্যাচারে চরম ভোগান্তির শিকার হন। পরস্পর ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ক্ষোভে পরিণত হয়। পরিবারে মা-বাবা ও সন্তানদের মাঝে ঘৃণা ও অবজ্ঞার এক অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সন্তানদের চরম অবাধ্যতার একটি পর্যায়ে এসে অনেক মা-বাবাই তাদের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়েন এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

তাদের কেউ কেউ গায়ের জোর ও শক্তি খাটিয়ে, কঠোরতা ও শাস্তি প্রয়োগ করে সন্তানদের অবাধ্যতা রোধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তা হিতে বিপরীত হয়। মা-বাবার কঠোর অবস্থান ও বাধ্যবাধকতার মানসিকতা সন্তানদের অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।

আবার কোনো কোনো মা-বাবা আদর-সোহাগ ও মায়া-মমতা দিয়ে সন্তানকে বোঝাতে চান। চেষ্টা করেন তাকে অবাধ্যতার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু অনেক সন্তানই বাধ্য হওয়ার পরিবর্তে মা-বাবার আদর-সোহাগকে দুর্বলতা ও অপারগতা ভেবে অবাধ্যতা ও স্বৈচ্ছাচারিতাতেই মজে থাকে।

মা-বাবা সন্তানদের থেকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হয়ে তাদের অভিযোগ-অনুযোগের আর কোনো শেষ থাকে না। সন্তানকে নিয়ে তাদের ভেতর মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা কাজ করে। যে পারিবার হয়ে উঠার কথা ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জান্নাতের টুকরা, মা-বাবার প্রতি সন্তানের অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচারিতায় একসময় তা-ই হয়ে উঠে জাহান্নামের গহীন গর্ত।

অবস্থা তো কখনো কখনো এমন সঙ্গিন আকার ধারণ করে যে, পিতা-মাতা সন্তানকে ঘরছাড়া করতে বাধ্য হন। সন্তানের অবাধ্যতায় ক্ষোভ ও ঘৃণা, অসন্তোষ ও দুশ্চিন্তা এমন চরম পর্যায়ে এসে ঠেকে, মা-বাবা নিজেকে এ

প্রবোধ দিয়েই সান্ত্বনা গ্রহণ করেন যে, তারা কোনো সন্তানের জন্য দেননি। কোনো শিশু মানব-মানবীর চেহারা দেখেননি। এ হলো একজন মা-বাবার জীবনে চরম বঞ্চনা ও নিরাশার পরিস্থিতি।

পিতা-মাতা সমাজের জ্ঞানীশূণী বিজ্ঞজনদের নিকট নানাভাবে বহু প্রশ্ন করে তাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ ও পস্থা জানতে চান। অস্থির চিন্তে তারা তাদের গুরুতর সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজেন। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্যার সমাধান কী? এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী?

সমাধান:

১. সন্তানের প্রতি যত্নবান হোন তাদের সাথে সহজ সরল ও আন্তরিকভাবে মিশে থাকুন। মায়া মমতা ও হাসি-আনন্দে তাদের জীবনকে ভরিয়ে তুলুন। একটি শুষ্ক ভূমি যেমন অবিরাম বৃষ্টির প্রতীক্ষায় থাকে, তেমন সন্তানরাও যেন আপনার আগমনের অপেক্ষায় অধীর থাকে।
২. সন্তানদের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে দোয়া করুন। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওফিক কামনা করুন। সন্তানদের সাথে কোনো প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না। আপনার ঐকান্তিক চেষ্টা থাকবে, সন্তানদের প্রতি সমান আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দেওয়া।
৩. সন্তানদের ছোটোখাটো ভুল-ত্রুটিতে কিংবা গুরুতর কোনো ভুলই হোক-না-কেন, অন্যদের সামনে তাদের বকাঝকা করা, তিরস্কার-ভর্সনা করার মানসিকতা পরিহার করুন। কারণ, এর ফলে সন্তানের মনে আপনার প্রতি যে বিশ্বাস ছিল, তা ভেঙে যাবে এবং তারা আত্মবিশ্বাস হারাবে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলা আত্মহত্যারই নামান্তর।
৪. সন্তানদের ধর্মকর্মে অনুপ্রাণিত করুন। কেননা তারা যখন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে শিখবে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে এমন মহৎ কাজগুলো করতে থাকবে যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করতে পারে। আর মা-বাবার প্রতি সদাচার করা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম।

৫. সন্তানদের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা করুন। তাদের জীবনের নানা বিষয় সম্পর্কে তাদের মতামত ও অভিব্যক্তি জানতে চেষ্টা করুন। কোনো ভুল-বিচ্যুতি চোখে পড়লে সুন্দরভাবে তা বুঝিয়ে দিন। কঠোর ভাষা ও গালমন্দের ভাষা পরিহার করুন।
৬. মা-বাবার প্রতি সদাচারী হোন। আপনার সদাচার সন্তানদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হবে। এ যেন প্রকারান্তরে আপনার কর্মের প্রতিফল। বিজ্ঞজনদের বাণী, 'তুমি তোমার মা-বাবার প্রতি সদাচারী হোন, সন্তানরাও আপনার প্রতি সদাচারী হবে।'
৭. সন্তানদের লালন-পালন ও তাদের শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে মা-বাবার পরস্পর সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মা-বাবার পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, বৈরিতাপূর্ণ আচার-ব্যবহার পরিবারের মাঝে অস্থিরতা, বিক্ষুব্ধতা সৃষ্টি করে। যা সন্তানদের মন-মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দিন-দিন তারাও মা-বাবার পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তাই পারিবারিক বন্ধন মজবুত করুন। পরস্পর সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার মানসিকতা অবলম্বন করুন।
৮. পারিবারিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সন্তানদের মতামত যাচাই করুন। বাস্তব জীবনের নানা-বিষয়ে তাদের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার সুযোগ দান করুন। যৌক্তিকতা ও যথার্থতার ভিত্তিতে প্রয়োজনে তাদের মতামত গ্রহণ করুন। এ ক্ষেত্রে তাদের মেধা ও বুদ্ধির প্রশংসা করে তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলুন।
৯. সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসঙ্গ আপনার সন্তানকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর অসং সঙ্গ তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবনতি ঘটাবে। তাদেরকে বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবাধ্যতায় দুঃসাহসী করে তুলবে।
১০. কথা-কাজের অমিল হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। অনেক মা-বাবাই সন্তানদের একরকম শেখায়, আর নিজেরা অন্য রকম করে। কথা-কাজের এমন অমিল সন্তানদের চোখে মা-বাবার ব্যক্তিত্বকে খাটো করে। তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

জ্ঞানদেব প্রতি কয়েকটি মূল্যবান উপদেশ:

১. মা-বাবার সাথে সদাচারের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করুন। তাঁরা হলেন আপনার জন্য জান্নাতের খোলা দরজা। আপনার কুকির্তীর কারণে তা যেন বন্ধ না হয়ে যায়।
২. কোনোভাবে যদি আপনি আপনার মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন, তাদের দু'আ লাভ করতে পারেন, তাহলে তা হবে আপনার সফলতা ও সৌভাগ্যের বিরাট অর্জন।
৩. মনে রাখবেন, আপনি যতই উচ্চশিক্ষিত হোন না, যতই উচ্চপদস্থ হোন না কেন, আর মা-বাবা যতই অজ্ঞ-সাধারণ হোন না কেন, আপনি যখন তাঁদের কাছে অবস্থান করবেন, তাদের অনুগত সেবক হয়ে থাকবেন।
৪. মা-বাবার উদ্দেশ্যে কিছুতেই এমন শব্দ উচ্চারণ করবেন না, যাতে তাদের মনে এতটুকুন ব্যথার উদ্বেগ ঘটে। এ হলো আপনার প্রতি মাহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ২৩]

অর্থ: আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল। (বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৩)

৫. মা-বাবার কোনো একজন যখন আপনাকে ডাকবে, যত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন-না-কেন, সব ছেড়ে তাদের ডাকে সাড়া দিন। প্রথমে তাদের আদেশ পালন করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ২৬]

অর্থ: 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।' (বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৪)

৬. প্রত্যেক নামাযে, প্রত্যেক ইবাদতে, যেকোনো দু'আর উপলক্ষ্যে মা-বাবার জন্য দু'আ করতে ভুলবেন না। দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্তগুলোতে মা-বাবার জন্য বেশি বেশি করে দু'আ করুন।
৭. মা-বাবা যখন কথা বলবে, তাদের কথার মাঝে কথা বলবেন না। উচ্চ স্বরে কথা বলবেন না। পূর্ণ মনোযোগ ও আগ্রহ ভরে তাদের কথা শুনুন। আপনার কিছু বলার থাকলে বিনম্রভাবে বলুন।
৮. আপনার স্বার্থে মা-বাবা যে ত্যাগ শিকার করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আপনার প্রয়োজনের আগে তাঁদের প্রয়োজনের কথা ভাবুন। আপনার কাজটি সমাধা করার আগে তাঁদের কাজ সমাধা করুন।
৯. কোনোক্রমেই মা-বাবার সঙ্গে বাগড়ায় জড়াবেন না, এমনকি তাঁদের ভুল-বিচ্যুতিতেও না। এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হবে বিনম্রভাবে যথার্থ বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করা। কখনো স্ত্রী, সন্তান ও বন্ধু-বান্ধবদের, মা-বাবার ওপর প্রাধান্য দিবেন না।
১০. বিভিন্ন আয়োজন-উপলক্ষ্যে মা-বাবাকে উপহার প্রদান করুন। এতে তাঁদের প্রতি আপনার সম্মান ও আন্তরিকতাবোধ প্রকাশ পাবে। উপহার-উপঢৌকন হলো পরস্পর সম্পর্কোন্নয়ন ও আন্তরিকতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায়।

পরিশিষ্ট:

- ❖ মুফাসসির সাআলাবী ও আরও কয়েকজন মুফাসসির এ ঘটনাটি বর্ণনা করেন:

এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে হাযির হলো। কেঁদে-কেঁদে অভিযোগ-অনুযোগ করতে লাগলো। নিজ সন্তানের ব্যাপারেই তার সব অভিযোগ-অনুযোগ:

‘আমি কত রাত জেগেছি, যেন সে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। আমি ক্ষুধার্ত থেকেছি, যেন সে তৃপ্তিভরে আহার করতে পারে। তার সুখের জন্য আমি কত কষ্ট করেছি। এখন সে শক্তিশালী যুবক। আর আমি দুর্বল বৃদ্ধ। পিতা হিসেবে তার ওপর আমার যে অধিকার রয়েছে, নির্লজ্জভাবে সে তা অস্বীকার করেছে। তার ওপর আমার যে অবদান ও অনুগ্রহ রয়েছে, সে তার প্রতি অবজ্ঞা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। সে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিক।’ এতটুকু বলেই লোকটি আবার কাঁদতে লাগল। সে ছিল কবি। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন: ‘এ নিয়ে কি কোনো কবিতা রচনা করেছ?’ বলল, ‘হ্যাঁ।’ এরপর লোকটি আবৃত্তি করতে শুরু করলো:

غَدَوْتُكَ مَوْلُودًا، وَمُنْتُكَ يَافِعًا

تُعَلُّ بِمَا أُجْرِي عَلَيْكَ، وَتَنْهَلُ

إِذَا لَيْلَةٌ ضَافَتْكَ بِالسُّقْمِ لَمْ أَبْتَ

لِسُقْمِكَ، إِلَّا بَاكِيًا أَتَمَلَّلُ

كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي

طَرَقَتْ بِهِ دُونِي، وَعَيْنِي تَهْمَلُ

فَلَمَّا بَلَغْتَ السَّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي

إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُؤَمِّلُ

جَعَلْتَ جَزَائِي غِلْظَةً وَقَظَاطَةً

كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعَمُ الْمُتَفَضَّلُ

فَلَيْتَكَ، إِذْ لَمْ تَرَعْ حَقَّ أَبَوَيَّ

فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمَجَاوِرُ يَفْعَلُ

وَسَمَّيْتَنِي بِاسْمِ الْمُفَنِّدِ رَأْيُهُ

وَفِي رَأْيِكَ التَّفْنِيدُ لَوْ كُنْتُ تَعْقِلُ

অর্থ: 'আমি তোমাকে লালন-পালন করেছি, তখন তুমি শিশু ছিলে। যখন তুমি যুবক হয়েছ, তখনো আমি তোমার পরিপূর্ণ দেখভাল করেছি। আমার সাধ্য ও সামর্থ্যের সবটুকু ব্যয় করে তোমার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছি। কত রাত তোমার অসুস্থতায় শিয়রে বসে বিন্দ্র রজনী কাটিয়েছি। তোমার অসুস্থতার পীড়া দেখে এমন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছি, দু'চোখ এমন ভীষণভাবে অশ্রু বিসর্জন করেছে, যেন স্বয়ং আমিই অসুস্থ। আজ আমার জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসে তুমি যখন যৌবনে পদার্পণ করেছ, কঠোরতা ও রুঢ়তার তিক্ত প্রতিদানে তুমি আমাকে জর্জরিত করলে। ভাবখানা এমন যে, এতকাল ধরে তুমিই আমার ওপর অনুগ্রহ করে এসেছ। আমি ছিলাম তোমার অনুগ্রহ প্রার্থী। হায় আফসোস! তুমি যদি আমার পিতৃত্বের সম্মানটুকুও দিতে না পার, তবে তা-ই কর। যেমন অনেক দুষ্ট লোক তার প্রতিবেশীর সাথে করে। আমাকে তুমি বিকারগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করো। অথচ তোমার বোধ-বুদ্ধি বিকারগ্রস্ততায় জর্জরিত।'

তার কবিতা শুনে রাসূল ﷺ ও উপস্থিত সাহাবাগণ কেঁদে ফেললেন। রাসূল ﷺ তার ছেলেটিকে ডেকে পাঠালেন। তাকে তিরস্কার ও ভৎসনা করলেন এবং ছেলেটির জামা ধরে তার উদ্দেশ্যে বললেন:

‘তুমি ও তোমার তোমার সম্পদ তোমার পিতার কল্যাণে।’^৯

- ❖ হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মা-বাবার প্রতি সম্ভ্রষ্ট হোন। তাঁদের মধ্যে যারাই জীবিত আছেন, তাদেরকে সুস্থতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করুন। তাঁদের মধ্য হতে যারা কবরবাসী হয়েছেন, তাদেরকে আপনি ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহম করুন। আমীন।

^৯ البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (১৭৩/৩)

বিপদ-আপদ

এ পৃথিবীতে প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো বিপদ-আপদ, সমস্যা ও সংকটে জর্জরিত। জীবনের এই প্রতিকূলতা ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ। এ হলো আমাদের ধৈর্য ও সহনশীলতা, আল্লাহ তা'আলার ফায়সালার সামনে নিজেকে আপত্তিহীন ও প্রশ্নাতীতভাবে সমর্পণের পরীক্ষা।

বিপদ-আপদ হলো জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিকূল পরিস্থিতি। ব্যক্তি-জীবন, পারিবারিক জীবন, লোকসমাজ অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। অর্থ-সম্পদ, সুনাম-সুখ্যাতি, পদমর্যাদা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার শিকার হয়। যেমন: কাজেকর্মে বিফলতা, লেখাপড়ায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থতা, ব্যবসা-বাণিজ্যে আর্থিক লোকসান, নিকটজন ও আপনজনের পক্ষ থেকে প্রতারণা, রোগ-বিরোগ, কারাবরণ, গুম-হত্যা ও মৃত্যু ইত্যাদি।

এ ধরনের বিপদ-আপদ জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রাণচঞ্চলতাকে ব্যাহত করে। ব্যক্তির মন-মানসিকতায় ও চিন্তা-চেতনায় গভীর রেখাপাত করে। তার অনুভব-অনুভূতিকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করে।

ফলে বিপদ ও সংকটের সঙ্গে সঙ্গে সে মানসিক অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার বোঝা বয়ে বেড়ায়। পরিণতিতে কেউ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়, কেউ হার্ট স্টোক করে, কেউ বা জ্ঞান হারায়। জীবনের এই কঠিন বাস্তবতা মোকাবিলা করার উপায় কী? এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী?

সমাধান:

১. নিয়তির অবধারিত লিখন ও আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন। যাবতীয় বিষয় আল্লাহ তা'আলার যিম্মায় ন্যস্ত করুন। মনে রাখবেন, আপনি যে সংকটে পড়েছেন, তা অবধারিত ছিল। তা খণ্ডানোর কোনো উপায় নেই। জীবনের এক-একটি বিপদ দুর্যোগ আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। আপনি যদি সন্তুষ্টচিত্তে, অম্মান বদনে ধৈর্যধারণ করতে পারেন, তবে মনে রাখবেন, ধৈর্য হলো ইবাদতে যত্নশীল বান্দার জ্ঞানাত ও ধর্মভীরু ব্যক্তির জন্য মুক্তির উপায়।

২. বিপদ-আপদ মোকাবিলা করার কয়েকটি পর্যায় রয়েছে:

(ক) আল্লাহর ফায়সালা সন্তুষ্ট থাকা এবং কৃতজ্ঞচিত্তে সংকট মোকাবিলা করা। এটাই শ্রেষ্ঠতম পন্থা।

(খ) উত্তম প্রতিদানের আশায় ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে বিপদ মোকাবেলা কর। এটা মধ্যম পন্থা।

(গ) বিপদের সম্মুখীন হয়ে অস্বস্তি ও বিরক্তি প্রকাশ করা এবং ক্ষোভে ফেটে পড়া-শরীয়তের দৃষ্টিতে এমনটি হারাম। আপনার কর্তব্য হলো প্রথম পন্থাটি অবলম্বন করা। যা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُّهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ مِنْ

خَطَايَاهُ» مسند أحمد (১৩/৩৭৭)

অর্থ: মু'মিন বান্দা যে কষ্ট-ক্লান্তি ও রোগ-ব্যাধির শিকার হন, যে রোগ-ব্যাধি ও দুঃখ-যাতনায় আক্রান্ত হন, এমনকি তার দেহে যে একটি কাঁটা ফুটে, তার বিনিময়েও আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করেন। (মুসনাদে আহমদ: ১৩/৩৯৭)

৩. নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে, ইহজাগতিক এ জীবন হলো বিপদ-দুর্যোগ, সমস্যা ও সংকটবহুল। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ১০০]

অর্থ: আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। (বাকারা, ২: ১৫৫)

৪. যেকোনো বিপদের থেকে মুক্ত হওয়ার গোপন রহস্য ও মূল চাবিকাঠি হলো:

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ১০৬]

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আলাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (বাকারা, ২: ১৫৬)

প্রথম পর্যায়েই আপনি মুক্তির এ চাবিকাঠি অবলম্বন করুন। এতে আসন্ন বিপদমুক্তি ও সুখ-সৌভাগ্যের পথ ত্বরান্বিত হবে। মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তিনটি মহান পুরস্কার লাভ করতে পারবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন:

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ১০৭]

অর্থ: তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (বাকারা, ২: ১৫৭)

৫. চরম অস্থিরতায় ও শোচনীয় পরিস্থিতিতেও স্থির প্রশান্ত থাকার চেষ্টা করুন। বিশ্বাস করুন, আপনি একাই এমন প্রতিকূলতার শিকার নন, অতীতে বহু লোক এর চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, বর্তমানেও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। তাদের তুলনায় আপনি বরং ভালো অবস্থানেই আছেন। ধৈর্যের সঙ্গে আসন্ন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করুন। আলোর পর আঁধার, অসুস্থতার পর সুস্থতা-এটাই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ৫, ৬]

অর্থ: 'প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকে।' (ইনশিরাহ, ৯৪: ৫, ৬)

৬. মনে রাখবেন, এ পৃথিবী যেমন নশ্বর, পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সবই নশ্বর। সর্ববৃহৎ বস্তু ও অতিক্ষুদ্র কণা, কোনো কিছুই তাতে অবশিষ্ট থাকবে না। ধ্বংসশীল এ পৃথিবীতে রাসূল ﷺ স্থায়ী অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

كَرَاكِبٍ سَارٍ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

অর্থ: (ইহকালের কোনো বাসিন্দা হলো) 'এমন এক মুসাফির, যে গ্রীষ্মকালের কোনো এক দিনে সফরে বের হয়েছে। কোনো একটি ছায়াদার গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ইহকাল ত্যাগ করেছে।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং: ২৭৪৪)

বিশ্বাস করুন, জীবনের কোনো অবস্থাই স্থায়ী নয়। তাই জীবনের পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে নিজেকে সুন্দরভাবে মানিয়ে নিন। বিপদ ও সংকটের মুহূর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতায় অভ্যস্ত হোন। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই এ পৃথিবী পরিবর্তনশীল। মানবজাতির জন্য তা এক বিরাট পরীক্ষার ক্ষেত্র। মনীষীগণ বলেছেন:

'যে সতর্ক ও সচেতন, সে অস্থির ধৈর্যহারা হবে না। যে আল্লাহকে ভয় করবে, সে অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না। যে কল্যাণের আশাবাদী হবে, দুঃখ-বেদনা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।'

৭. সর্বদা প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মানসিকতা ধারণ করুন। তিরমিজী শরীফে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَانًا، وَأَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ: أَلَا أَبَشِّرُكَ يَا أَبَا سِنَانٍ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّهُ بَيْتُ الْحَمْدِ. (سنن الترمذي: ۳/۳۳۲)

অর্থ: আবু সিনান (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, ‘আমার ছেলে সিনানকে দাফন করছিলাম। সে সময় আবু তালহা আল-খাওলানী কবরের কিনারায় বসা ছিলেন। পরে আমি যখন কবর থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন তিনি আমার হাত ধরলেন এবং বললেন, ‘হে আবু সিনান, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দিব?’ আমি বললাম, ‘অবশ্যই দিন।’ তিনি বললেন, ‘যাহ্‌হাক ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আরযাব (রহঃ) আমাকে আবু মূসা আল-আশআরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ তা‘আলা ফেরিশতাদের বলেন, ‘তোমরা আমার বান্দার সন্তান কবর করে নিয়ে এলে?’ তার বলে, ‘হ্যাঁ।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমরা তার হৃদয়ের ফল কবর করে নিয়ে এলে?’ তার বলে, ‘হ্যাঁ।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমার বান্দা কী বলেছে?’ তারা বলে, ‘আপনার প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করেছে এবং “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” পড়েছে।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নামকরণ কর “বায়তুল হামদ” বা প্রশংসালয়।’ (তিরমিজী, হাদিস নম্বর: ১০২১)

যারা আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তাদের বিরাট প্রতিদান দান করেন। শতো প্রতিকূলতার মুহূর্তেও তাদের সঠিক পথে অবিচল রাখেন। সুতরাং

চরম বিপদের মুহূর্তেও আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতে, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলবেন না। মনে রাখবেন, আপনি যে সংকটের সম্মুখীন হবেন, তা সর্বোচ্চ আপনার জাগতিক জীবনের সাময়িক কিছু ক্ষতি করবে, পরকালের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

৮. বিপদের সম্মুখীন হলে একটি সুসংবাদ গ্রহণ করুন! বিপদ হলো আপনার ভুল-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত, গুনাহ-পাপাচার হতে পরিশুদ্ধি এবং মহান রবের পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন। আশা করা যায়, তাতে এমন অনেক কল্যাণ নিহিত আছে, যা আপনার অজানা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا

وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ২১৬]

অর্থ: এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (বাকারা, ২: ২১৬)

৯. বিপদের মুহূর্তে বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকুন। অসহায় অভিযোগ-অনুযোগ থেকে বিরত থাকুন। বারবার এ দু'আটি পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. صحيح مسلم

(৬৩১/২)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে বিপদমুক্ত করুন। এর বিনিময়ে আমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। (মুসলিম: ২/৬৩১)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

[البقرة: ১৫৬], اللَّهُمَّ أَجْرِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا،

إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا».

অর্থ: যে কোনো বান্দাই বিপদগ্রস্ত হয়ে এই দু'আ পাঠ করবে:

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اللَّهُمَّ أَجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.

(আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! এ বিপদে আমাদের আশ্রয় দান করুন। এর বিনিময়ে আমাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন) আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদে আশ্রয় দান করবেন এবং এর বিনিময়ে তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।" (মুসলিম: ২/৬৩২)

১০. মনটাকে আশ্বস্ত করুন, হৃদয়টাকে প্রশান্ত করুন। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» صحيح مسلم (২২৯০/৬)

অর্থ: 'মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে শুকর-গুজার করে আর অস্বচ্ছলতা বা দুঃখ-মুসীবতে আক্রান্ত হলে সবর করে, প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর।" (৪/২২৯৫)

১১. হাসান বসরী (রহ.) বলেন, 'আপনার ওপর যত বিপদ-আপদ, সংকট ও দুর্যোগ আসুক না কেন, আপনি তাতে ক্ষুব্ধ হবেন না। কেননা আপনার অপছন্দের এমন অনেক বিষয় আছে, যাতে আপনার কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। আবার পছন্দের এমন অনেক বিষয় আছে, যাতে আপনার ক্ষতি ও অকল্যাণের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।'

১২. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ১৫০]

অর্থ: সবর (ধৈর্য) ও সালাতের (নামাযের) মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। (বাকারা, ২: ৪৫)

বিপদ যত কঠিন হোক-না-কেন, সংকট যত ভয়ানক হোক-না-কেন, আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করার সর্বোত্তম পন্থা হলো সবার ও সালাত^{১০}। সুতরাং আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সম্ভ্রষ্টচিত্তে ধৈর্যধারণ করুন এবং বিনয়াবনত হয়ে নামাযে মশগুল হোন। রাসূল ﷺ যখন কোনো গুরুতর বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, নামাযে মশগুল হতেন। কেননা সবকিছুর চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার হাতে। তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার প্রধান মাধ্যম হলো নামায।

১৩. বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। এই দু‘আটি বারবার পাঠ করে আল্লাহ তা‘আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহ লাভ করুন:

﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (১৮) فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ ۖ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ [آل عمران: ১৭৩, ১৭৪]

অর্থ: ‘এবং তারা বলেছিল, “আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক!” অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ। কোন মন্দ তাদের স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সম্ভ্রষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।’ (আলে ইমরা, ৩: ১৭৩, ১৭৪)

১৪. পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿إِلَّا يَذْكُرِ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ২৮]

অর্থ: স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। (রা‘দ, ১৩: ২৮)

^{১০} ধৈর্য ও নামায।

যখনই কোনো প্রতিকূলতার শিকার হবেন, কোনো বিপন্নতার সম্মুখীন হবেন, আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন হোন। এতে আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হবে, বিপদ ও প্রতিকূলতার চাপ লাঘব হবে, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তাজনিত কারণে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধি থেকে থেকেও মুক্ত থাকবেন, ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ১১]

অর্থ: কোনো মুসিবতই আল্লাহ তা'আলার হুকুম ছাড়া আসে না। যে কেউ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে হেদায়াত দান করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (তাগাবুন, ৬৪: ১১)

১৫. বেশি-বেশি ইস্তেগফার^{১১} করুন। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ فَرْجٍ، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»
مسند أحمد (১০৬/৬)

অর্থ: 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তেগফার করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সামনে সমস্ত বিপদ হতে মুক্তির পথ খুলে দিবেন। যেকোনো প্রতিকূলতা থেকে নিষ্কৃতির পথ দেখিয়ে দিবেন। তাকে এমন ক্ষেত্র থেকে রিযিক দান করবেন, যা সে কল্পনাও করত না।' (মুসনাদে আহমাদ: ৪/১০৪)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

বারবার পাঠ করতে থাকুন। কেননা তা জান্নাতের অন্যতম খাযানা। এর মাধ্যমে যত বাধা-বিপত্তির অবসান হয়। শতো প্রতিকূলতার ঝঞ্ঝাট দূর হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা খুশি হন।

১৬. বিশ্বাস করুন, বিপদ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসার আলামত ।
এ যেন এমন ওষুধ, যা স্বাদে তিক্ত, ফলে মিষ্ট । কিছু ওষুধ আছে, যা
স্বাদে ভীষণ তিক্ত হলেও মধুর চেয়ে কার্যকর । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا
ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ» سنن

الترمذي (৬০১/৬)

অর্থ: ‘বিপদ-আপদ যত বিরাট ও কঠিন হবে, এর প্রতিদানও
বিরাট হবে । আল্লাহ তা‘আলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে পছন্দ
করেন, তাদের পরীক্ষা করেন । (পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে) যে সন্তুষ্ট
থাকে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে । আর যে অসন্তোষ
প্রকাশ করে, ক্ষুব্ধ হয়, সে আল্লাহ তা‘আলার ক্রোধের পাত্রে
পরিণত হয় ।’ (তিরমিজী: ৪/৬০১)

১৭. যে ব্যক্তি বিপদের সংবাদ দিবে, তার কর্তব্য হলো, বিষয়টিকে যথাসম্ভব
সহজভাবে উপস্থাপন করা । জনৈক সাহাবা (রা.)-এর স্ত্রী যেমনটি
করেছিলেন :

দীর্ঘ সফর থেকে স্বামী যখন ঘরে ফিরে এলেন, অসুস্থ সন্তানের অবস্থা
জানতে চাইলেন । স্ত্রী বললেন, ‘সে তো ভালো আছে । এখন বেশ
প্রশান্ত ।’

সফরের ক্লান্তিতে স্বামী বিশ্রামে চলে গেলেন । যখন সতেজ দেহে,
প্রশান্ত মনে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, স্ত্রী তাকে আসল ঘটনা খুলে
বললেন, ‘তার সন্তান রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে ।’

সাহাবি রাসূল ﷺ-এর নিকট এ ঘটনা খুলে বললেন । রাসূল ﷺ তাঁর
স্ত্রীর অনেক প্রশংসা করলেন ।

এক দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কথা আমিও জানি । ডাক্তার তাকে বলে
দিয়েছেন, ‘আপনার ক্যান্সার হয়েছে । সর্বোচ্চ আর তিন মাস বেঁচে
থাকতে পারবেন । এরপর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ, মৃত্যুর আশঙ্কাই
প্রকট ।’

জীবদশায় নিজ কানে নিজের সুনিশ্চিত মৃত্যুর কথা শুনে রোগী তৎক্ষণাৎ হার্টঅ্যাটাক করে মারা গেল।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

«إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ، فَتَنَفَّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ

شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيَّبُ بِنَفْسِ الْمَرِيضِ» سنن ابن ماجه (১/৬৭২)

অর্থ: ‘তোমরা যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তির কাছে যাবে, (সুস্থ হয়ে) বেঁচে থাকার ব্যাপারে তার মনে আশা জাগাবে। তোমাদের আশান্বিত কথায় তার নিয়তির ফায়সালা খণ্ডাবে না। তবে তাতে অসুস্থ ব্যক্তি মানসিক প্রশান্তি বোধ করবে।’

১৮. এ কথা ভেবে আপনার মনকে প্রশান্ত রাখুন, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বিপদ ও সংকটের বিষয় ছিল সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু ঘটানো এবং ওহি বন্ধ হয়ে যাওয়া। সাহাবায়ে কেরামের জন্য এ যে কত কষ্ট ও বেদনাদায়ক ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আপনি যদি সিরাতের গ্রন্থে রাসূল ﷺ মৃত্যুরোগ ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে পড়ে দেখেন, তবে এর কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন এবং সচরাচর জীবনে আপনার বিপদগুলো নিতান্ত ক্ষুদ্র ও হীনকো মনে হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ، فَلْيَذْكُرْ مُصِيبَتَهُ بِي، فَإِنَّهَا

أَعْظَمُ الْمَصَائِبِ عِنْدَهُ» المعجم الكبير للطبراني (৭/১৬৭)

অর্থ: ‘তোমাদের কেউ যখন কোনো বিপদে আক্রান্ত হবে, সে যেন আমার মৃত্যুতে আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করে। কেননা তা হবে মহাদুর্যোগের একটি।’ (আল মু‘জামুল কাবীর ৭/১৬৭)

১৯. কোনো প্রতিকূলতা ও জটিলতায় ফেঁসে গিয়ে ক্ষোভে লজ্জায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন না। তাহলে আপনার ওপর শয়তান চেপে বসবে এবং আপনাকে মানসিক যন্ত্রণা, অন্যায়, পাপাচার ও কুধারণা ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলবে।

এ পরিস্থিতিতে এমন কাজে মনোনিবেশ করুন, যা নিজের জন্য ও অন্যের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সংস্পর্শে থাকুন, তাদের কাছে সাহুনা পাবেন, সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ পাবেন এবং বর্তমান প্রতিকূলতা লাঘব হবে। পবিত্র কুরআন যেন হয় আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার মতো একনিষ্ঠ বন্ধু দ্বিতীয়টি নেই।

২০. মনে রাখুন, যেকোনো বিপদ আপনার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রতিদান লাভের রাস্তা খুলে দিবে। হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা জীবনেরই অবধারিত অংশ। এসবই নিয়তির লিখন, তা খণ্ডানোর সাধ্য কারো নেই।

হাসি-আনন্দের মুহূর্তগুলো আপনি যেভাবে সাদরে গ্রহণ করেন, দুঃখ-বেদনার পরিস্থিতিগুলোও যদি একইভাবে মেনে নেন, আল্লাহর তা'আলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকেন, ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন, ইল্লালিল্লাহি পাঠ করেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুক্তির পথ ও রহমতের আশা করেন, তবে এমন প্রতিটি আমলের জন্য আপনি বিরাট প্রতিদান লাভ করবেন। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাই তো আপনার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা প্রস্তুত করে দিবে। যার নাম হবে 'বাইতুল হাম্দ'। এমন একটি প্রতিদানই তো আপনার ওপর আপতিত শত কঠিন সংকট থেকে শ্রেষ্ঠ।

‘সুনানে তিরমিজি’ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে:

"يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيطِ
مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوَابِ أَهْلِ الْبَلَاءِ"

অর্থ: 'কিয়ামতের দিন ইহকালে বিপদগ্রস্ত লোকদের প্রতিদানের মহত্ত্ব দেখে সাধারণ মানুষ এই কামনা করবে যে, ইহকালে তাদের দেহের চামড়াগুলো যদি ছুরি দিয়ে কাটা হতো!' (আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী: ৩/৫২৬)

২১. রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ ইত্যাদি চারিত্রিক অন্যায় থেকে বিরত থাকুন। চেহারায়ে আঘাত করা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, নিজের ধ্বংস কামনা

করা, নিয়তির ফায়সালার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা ইত্যাদি অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকুন। এগুলোর প্রত্যেকটা জাহেলি যুগের কুসংস্কার। এ ধরনের কার্যকলাপ আপনার মানসিক শক্তিকে আরও দুর্বল করে দিবে। সবর ও ধৈর্য, রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার প্রতিদান থেকে আপনাকে বঞ্চিত করবে। শয়তান খুশি হবে, আপনাকে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র বানাবে।

২২. বিপদের সম্মুখীন হয়ে কল্যাণের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কঠিন পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করেছেন। তিনি তো বান্দাকে তার ঈমানের স্তর অনুযায়ী পরীক্ষা করেন।

আরেকটি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, বিপদ-আপদের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত করবেন।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত :

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟
قَالَ: "الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَأَلْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى النَّاسُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِمْ،
فَمَنْ تَحَنَّنَ دِينُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَمَنْ ضَعُفَ دِينُهُ ضَعُفَ بَلَاؤُهُ، وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ."

অর্থ: রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত?' বললেন, 'নবীগণ। এরপর পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিবর্গ। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ঈমানের স্তর অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যে ব্যক্তির ধার্মিকতা যত মজবুত, সুসংহত, তার পরীক্ষাও তত কঠিন। যার ঈমান ও ধার্মিকতার কোনো শক্তি নেই, তার পরীক্ষাও সাধারণ নগণ্য। আবার কোনো ব্যক্তি মানুষের মাঝে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তার কোনো দোষ-ত্রুটি নেই, সে-ও বিপদগ্রস্ত হয়।'

(সহীহ ইবনে হিব্বান: ৭/১৮৪)

২৩. আমি, আপনি এমনকি পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই পরকালের শাস্তির ভয়বহতা সহ্য করার। আপনি যদি বিপদগ্রস্ত হন, আল্লাহ তা'আলার

প্রশংসা করুন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এজন্য যে, ইহাকালে লঘু শাস্তির মাধ্যমে পরকালের গুরুদণ্ড থেকে আপনাকে রেহাই দিচ্ছেন, আপনার গুনাহ মাফ করছেন, পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত হয়ে কবরে যাওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছেন। এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
سنن الترمذي (৬০১/৬)

অর্থ: ‘আল্লাহ তা‘আলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, ইহকালেই তার পাপের সাজা ভোগ করান। আর আল্লাহ তা‘আলা যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, ইহকালে তার পাপের সাজা না দিয়ে পরকালে তার পূর্ণ শাস্তিতে পাকড়াও করেন।’ (তিরমিজী: ৪/৬০১)

২৪. জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত হলো, ব্যক্তি যখন আল্লাহমুখী হয়, আপন রবের দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করে, কাকুতি-মিনতি করে প্রার্থনায় মগ্ন হয়। যখন সে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা‘আলাই একমাত্র পরম মুক্তিদাতা, রক্ষাকারী। এরপর যখন সে আল্লাহর অনুগ্রহে বিপদমুক্ত হয়, অনুভব করতে পারে, দুঃখ-কষ্টের পর সুখানন্দ এবং সংকট ও বিপর্যয়ের পর প্রফুল্লতা ও প্রশান্তি কতই না তৃপ্তিদায়ক!

২৫. বিপদ ও সংকট মোকাবেলার অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে: অহংকার, দাস্তিকতা, আত্মতৃপ্তি ও আত্মমুগ্ধতা ইত্যাদি জঘন্য স্বভাবদোষগুলো দূর হতে শুরু করে। ব্যক্তি যখন নিষ্কণ্টক ও নির্বাঞ্ছাট জীবন-যাপন করতে থাকে, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে, সে অহংকারী ও দাস্তিক হয়ে উঠে।

ব্যক্তি যখন নানা প্রতিকূলতার শিকার হয়, জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়, নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা চোখে পড়ে, নিজেকে সে ক্ষুদ্র নগণ্য ভাবতে শেখে। মনের অহংকার দূর হতে থাকে।

আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা অপর অনুগ্রহ হলো, তিনি আমাদের জন্য যেকোনো সমস্যার সমাধান দিয়েছেন এবং যেকোনো সংকট হতে উত্তরণের পথ রাতলে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى﴾ [العلق: ৬, ৭]

অর্থ: বস্তুত মানুষ অবাধ্যতা করছে। কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।' (আলাক, ৯৬: ৬, ৭)

২৬. সাময়িক যে বিপদে আক্রান্ত হয়েছেন, আল্লাহর তা'আলার পক্ষ থেকে তা এক রক্ষাকবচ, যা আপনাকে এমন কোনো জঘন্য অন্যায়-অনাচার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, যাতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কোনো এক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে অবশেষে আপনি তাতে জড়াননি।

আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। কখনো আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন বিপদ-আপদের মাধ্যমে। কখনো অনুগ্রহ করেন নায-নিয়ামতের মাধ্যমে।

২৭. যেকোনো জটিলতা ও প্রতিকূলতা সফলভাবে, শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় মোকাবিলা করার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন, এ হলো আপনার জীবনের অন্যতম পরীক্ষা। তাতে সফল হওয়ার পথ হলো, নিয়তির উপর অগাধ বিশ্বাস এবং আপন রবের ফায়সালার সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

তাকদির ও নিয়তিতে বিশ্বাসের মতো ঈমানের মৌলিক বিষয়টিকে আপনি ঐচ্ছিক ও অপসনাল হিসেবে গ্রহণের কোনো অবকাশ নেই। নিয়তির ফায়সালা আপনার মর্জিমাফিক হলো তো বেজায় খুশি হলেন। আর একটু প্রতিকূলতার গন্ধ পেয়েই অস্বীকার করে বসলেন। আনুগত্য ও ইবাদতের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের মানসিকতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২৮. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করুন, তাহলেই উপলব্ধি হবে, এখনও যে নিয়ামত বর্তমান, তা অগণিত

সীমাহীন; যা থেকে বঞ্চিত, তা নিতান্ত নগণ্য। সুস্থতার দিনগুলোর কথা ভেবে দেখুন, তা দীর্ঘ কত দিন! আর অসুস্থতার দিনগুলো গুণে দেখুন, তা সামান্য কয়েকটা দিন। সুতরাং আধিক্য বিবেচনা করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন এবং সামান্য না-পাওয়া ও বঞ্চনার অভিযোগ-অনুযোগ মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

২৯. বিশ্বাস করুন! যে কোনো বিপদ-তার ফায়সালা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। ভালো-মন্দের চাবিকাঠি তার হাতে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় সম্মত থাকুন। এমনটি ভাবা সমীচীন নয়, ইশ! যদি এমনটি করতাম! আহা, যদি তেমনটি না করতাম! তার চেয়ে বরং এ বিশ্বাস ধারণ করুন, আল্লাহ যা করেছেন, মঙ্গলের জন্যই করেছেন। তাঁর ফায়সালাই অবধারিত। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«وَأِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» صحيح مسلم (২০৫২/৬)

অর্থ: 'যদি কোনো কিছু (বিপদ) তোমার ওপর আপতিত হয় তবে এরূপ বলবে না যে, যদি আমি এরূপ করতাম তবে এরূপ এরূপ হত; বরং বল যে, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কেননা, তোমার لَوْ (যদি) শব্দটি শয়তানের সক্রিয় হওয়ার দুয়ার খুলে দেয়।' (মুসলিম: ৪/২০৫২)

৩০. পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ১০]

অর্থ: 'যারা ধৈর্যধারণ করে, নিশ্চয়ই তাদেরকে বেহিসাব প্রতিদান দেওয়া হবে।' (যুমার, ৩৯: ১০)

বিজ্ঞ আলেমগণের অভিমত হলো, সবর ও ধৈর্য তিন প্রকার:

প্রথমত, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের ওপর অটল-অবিচল থাকা।
দ্বিতীয়ত, সব ধরনের অন্যায়, অনাচার ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা।
তৃতীয়ত, বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা।

সুতরাং ব্যক্তি যখন বিপদগ্রস্ত হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে, ক্ষুব্ধ হয়, ভাগ্যলিপি ও নিয়তিকে গালমন্দ করে, তখন সে ধৈর্য ও সহনশীলতার বিধান লঙ্ঘন করে। বিপদ ও প্রতিকূলতার শুরুতে ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى»

অর্থ: 'বিপদের প্রথম ধাপেই ধৈর্যধারণ করাই পকৃত ধৈর্য।' (বুখারী ২/৭৯, মুসলিম ২/৬৩৭)

৩১. আপনি যে সমস্যা ও সংকটে পড়েছেন, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় হলো, মনে করতে হবে, যা হারিয়েছেন, আপনি তার আসল মালিক নন। সাময়িকভাবে তা আপনার হস্তগত হয়েছিল মাত্র। কোনো একদিন তা হাতছাড়া হতোই। এর প্রকৃত মালিক তো আল্লাহ তা'আলা। তিনি যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, নিয়ে নিতে পারেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

[القصاص: ৮৮]

অর্থ: 'সবকিছুই ধ্বংসশীল। শুধু আল্লাহর সত্তাই ব্যতিক্রম। শাসন কেবল তাঁরই এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।' (কাসাস, ২৮: ৮৮)

৩২. কঠিন দিনগুলোর কথা বারবার স্মরণ করে, অতীতের দুঃখ-বেদনার কথা টেনে এনে কষ্টদায়ক স্মৃতিগুলো জ্বলজ্বলে তাজা করে তুলবেন না। এতে মানসিক প্রশান্তি বিঘ্নিত হবে, অস্থিরতা ও যন্ত্রণা বাড়তে থাকবে। যাকিছু কষ্টদায়ক বেদনাদায়ক, সব ভুলে থাকার চেষ্টা করুন। যে জটিলতা প্রতিকূলতা গত হয়েছে, তার পিছু পড়বেন না। আমিরুল মু'মিনীন, ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন:

«لَا تَسْتَفِزُّوا الدُّمُوعَ بِالتَّذَكُّرِ»

অর্থ: 'অতীতের দুঃখ-কষ্টের স্মৃতিচারণ করে কেঁদে মরো না।'

৩৩. আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করুন। আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। তাঁর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রত্যাশা করুন। সর্বদা এ বিশ্বাস রাখুন, আসমানি ফায়সালার বাইরে আপনার ভাগ্যে কিছুই ঘটবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۖ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ৫১]

অর্থ: ‘বলে দাও, আল্লাহ আমাদের তাকদিরে যে কষ্ট লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো কষ্ট আমাদেরকে কিছুতেই স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহরই ওপর মু’মিনদের ভরসা করা উচিত।’ (তাওবা, ৯: ৫১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئْهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ»

مسند أحمد مخرجا (১৮২/১৫)

অর্থ: ‘প্রতিটি বিষয়েরই মৌলিকতা রয়েছে। কোনো ব্যক্তি ঈমানের মৌলিকতা লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে এ বিশ্বাস ধারণ করবে যে, সে যা লাভ করেছে, তা তার হাতছাড়া হওয়ার ছিল না। আর যা হাতছাড়া হয়েছে, তা কখনো অর্জনের ছিল না।’ (মুসনাদে আহমাদ: ৪৫/৪৮২)

পরিশিষ্ট:

❖ ১৪১৮ হিজরিতে (১৯৯৭ সাল) ঘটে-যাওয়া দুর্ঘটনার কথা আমি ভুলতে পারব না। তা ছিল ভয়াবহ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

মা-বাবা ও ভাই-বোন মিলে সুন্দর সাজানো পরিবার। তায়েফ থেকে ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাচ্ছিল। ছেলে-মেয়ে আলাদা প্রাইভেটকারে। তাদের পেছনে মা-বাবা আলাদা প্রাইভেটকারে।

হাইওয়ের একটি মোড়ে ক্ষিপ্ৰগতির একটি চলন্ত বাসের সঙ্গে সন্তানদের গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসটির গতি এত বেশি ছিল যে, প্রাইভেটকারের যাত্রীরা রাস্তায় ও আশেপাশে ছিটকে পড়ে। আরও মর্মান্তিক হলো, তাদের কারো দেহই অক্ষত নেই। চারপাশে হাত-পা, দেহ-মাথা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে। তাদের গাড়িটি একেবারে পিষে গেছে।

পেছনের গাড়িতে মা-বাবা। তাদের চোখের সামনেই সন্তানদের এমন করুণ মৃত্যু। সন্তানদের এমন নির্মম মৃত্যু দেখে মা নিথর হয়ে পড়লেন। দুঃখে-শোকে পাথর। বাবা কম্পিত পায়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। কেবলামুখী হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। পশ্চিমধ্যেই দীর্ঘক্ষণ সিজদায় পড়ে থাকলেন। মহান রবের দরবারে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে সিজদা থেকে মাথা উঠালেন। বারবার চোখের পানি মুছতে লাগলেন। মুখে একটি কথাই বারবার উচ্চারিত হতে লাগল: “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।”

এরপর তিনি সন্তানদের মৃতদেহের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। জবানে তার একটি কথাই বারবার উচ্চারিত হচ্ছে “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।” বাবার এমন প্রশান্ত চিত্ত মানুষের অযাচিত শোরগোল, হা-হতাশ অনেকটাই স্তিমিত করে দিল।

জীবনের এমন কঠিন মর্মান্তিক মুহূর্তেও মৃত সন্তানদের বাবা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের কঠিনতম মুহূর্তে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এটাই ছিল ঈমান ও শরীয়তের হুকুম, দৃঢ় মনোবল ও আত্মসংবরণের পরিচায়ক। আল্লাহ তা‘আলা তাকে বিরাট প্রতিদান দান করুন। তাকে মাফ করুন। সন্তানদেরকে শহিদী মর্যাদা দান করুন।

এ মহান পিতা পরবর্তীতে পরিচিতজনদের বলতেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার দরবারে লাখো-কোটি কৃতজ্ঞতা জানাই যে, এমন বিরাট পরীক্ষার জন্য তিনি আমাকে ও আমার স্ত্রীকে মনোনীত করেছেন। সন্তানদের শহিদী মৃত্যু নসিব করেছেন আর আমাদের ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করার তাওফীক দান করেছেন।’

❖ কবি যথার্থ বলেছেন:

ثَمَانِيَّةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا عَلَى الْفَتَى
وَلَا بُدَّ أَنْ تَجْرِيَ عَلَيْهِ الثَّمَانِيَّةُ.
سُرُورٌ وَهُمْ وَاجْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ

وَعُسْرٌ وَيُسْرٌ ثُمَّ سُقْمٌ وَعَافِيَةٌ.

অর্থ: ‘মানুষের জীবনে আটটি বিষয় অবধারিত: আনন্দ-বেদনা, মিলন ও বিচ্ছেদ, সচ্ছলতা-দরিদ্রতা, সুস্থতা-অসুস্থতা।’

❖ আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত:

أَتَتْ امْرَأَةً النَّبِيَّ ﷺ بِصَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ اذْعُ اللَّهُ لَهٗ،
فَلَقَدْ دَفَنْتُ ثَلَاثَةً، قَالَ: «دَفَنْتِ ثَلَاثَةً؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «لَقَدْ

اِحْتَضَرْتَ بِحِطَّارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ» صحيح مسلم (২০৩০/৬)

অর্থ: এক নারী তার সন্তানকে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাযির হলো। বলল, ‘হে আল্লাহর নবী! আপনি আমার সন্তানের জন্য দু‘আ করে দিন। এ পর্যন্ত আমার তিন-তিনটি সন্তানের মৃত্যু হয়েছে।’ রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার তিন সন্তানের মৃত্যু হয়েছে?’ বলল, ‘হ্যাঁ।’ রাসূল ﷺ বললেন, ‘তুমি তো জাহান্নামের আগুনের রক্ষা পাওয়ার আশ্রয়কেন্দ্র পেয়ে গেছ।’ (মুসলিম: ৪/২০৩০)

❖ ইবনুল কাইয়্যিম জাওয়ী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন:

‘আল্লাহ যখন কোনো বান্দার মঙ্গল চান, ঈমানের স্তর অনুযায়ী তাকে পরীক্ষা করেন। একের-পর-এক পরীক্ষা করে ধ্বংসাত্মক বহু বিষয় থেকে মুক্ত করেন। অবশেষে তাকে শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ, পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত করেন। তাকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেন। আর তা হলো, আপন রবের ইবাদত-বন্দেগি। পরকালের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত দান করেন। আর তা হলো, আল্লাহ তা‘আলার পবিত্র সত্তার দর্শন ও নৈকট্য-লাভ।’

- ❖ আমিরুল মু‘মিনীন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) যখন বিপদগ্রস্ত হতেন, তিনবার আল্লাহর প্রশংসা করতেন। শোকর আদায় করে বলতেন:
‘আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, এ বিপদ আমার দ্বীনের কোনো ক্ষতি করেনি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যে, তিনি আমাকে এর চেয়ে বড় কঠিন বিপদ থেকে মুক্ত রেখেছেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তিনি আমাকে বিপদে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করেছেন।’
- ❖ আব্বাসীয় যুগের বিশিষ্ট কবি আবুল আতাহিয়া (১৩০-২১৩ হি) বলেন:

إِصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيبَةٍ وَتَجَلَدٍ

وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرَّةَ غَيْرُ مُخْلَدٍ

أَوْ مَا تَرَى أَنَّ الْمَصَائِبَ جَمَّةٌ

وَتَرَى الْمَنِيَّةَ لِلْعِبَادِ بِمَرَصِدٍ

مَنْ لَمْ يُصِبْ مِمَّنْ تَرَى بِمُصِيبَةٍ

هَذَا سَبِيلٌ لَسْتَ فِيهِ بِأَوْحِدٍ

وَإِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّدًا وَمَصَابِيَهُ

فَإِذْكَرْ مُصَابِكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

অর্থ: ‘যেকোনো বিপদে ধৈর্যধারণ করুন। অবিচল থাকুন। মনে রাখবেন, মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। আপনি দেখুন না, পৃথিবীতে মানুষের জীবন কত বিপদসঙ্কুল! মৃত্যু তাকে গ্রাস করার জন্য ওঁত পেতে আছে। কখনো কি এমন কাউকে দেখেছেন, যে আজীবন বিপদমুক্ত!? বিপদ হলো পার্থিব জীবনের এমন অবধারিত অনুষঙ্গ, যা থেকে নিষ্কৃতি নেই। আপনি বরং মুহাম্মদ ﷺ-এর বিপদ-আপদের প্রেক্ষাপটগুলো স্মরণ করে দেখুন। তারপর আপনার বিপদ ও প্রতিকূলতা তুলনা করে দেখুন। নিশ্চয় পরিমাণ ও ভয়াবহতায় আকাশ-পাতাল তফাত হবে।’

দেশাত্মবোধের অভাব

দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধ এমন শব্দ, যা অনেক মহৎ চিন্তা-চেতনা, বোধ-উপলব্ধি ও কর্মকীর্তি ধারণ করে। প্রকৃত দেশাত্মবোধ হলো, নিখাদ দেশপ্রেম, দেশের প্রতি একনিষ্ঠতা, দেশের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া এবং এর উন্নতি-অগ্রগতিতে সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করা।

আল্লাহ তা'আলা যখন রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ প্রদান করলেন, স্বীয় মাতৃভূমি মক্কা নগরী ত্যাগ করে মদিনার উদ্দেশে হিজরত করতে, রাসূল ﷺ মক্কা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। স্বীয় মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছেদের মুহূর্তে তাঁর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হলো এমন মর্মস্পর্শী বাণী, যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার উপযুক্ত, প্রজন্ম পরম্পরায় যা সকলের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে:

«أَمَّا وَاللَّهِ، لَأَخْرُجُ مِنْكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ أَحَبُّ بِلَادِ اللَّهِ إِلَيَّ
وَأَكْرَمُهُ عَلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنَّ أَهْلَكَ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ» مسند

أبي يعلى الموصلي (৬৭/৫)

অর্থ: 'আল্লাহর শপথ! (হে মক্কা নগরী!) আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কোনো সন্দেহ নেই যে, গোটা পৃথিবীর মধ্যে তুমি আমার সর্বাধিক প্রিয় নগরী, আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ নগরী। তোমার অধিবাসীরা যদি আমাকে দেশত্যাগে বাধ্য না করত, আমি কখনো তোমার পবিত্র ভূমি ত্যাগ করতাম না।'

মক্কা নগরীতে আশৈশব জীবন এবং উম্মতের চরম প্রতিকূলতা ও বিপর্যয়ের মুখেও রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জবানের এ কথাগুলোয় স্বদেশের প্রতি তাঁর নিখাত ভালোবাসা, গভীর মমত্ববোধ ফুটে উঠে। মক্কার কাফের দ্বারা রাসূল

☞ যে অমানবিক যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিগ্রহের শিকার হয়েছেন, তা সত্ত্বেও তিনি মক্কার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আবেগ-অনুভূতিতে এতটুকু চির ধরেনি।

বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি দেশে এমন অনেক নাগরিক আছে, দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ যাদের কাছে চরম অবহেলার শিকার। এ বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্র তাগিদ অনুভব করে না। নিজ নিজ কল্যাণ ও স্বার্থসিদ্ধিতে তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে যতই মুগ্ধ হোন-না-কেন, দেশের স্বার্থে ও দেশের কল্যাণে তারা একেবারেই নিরুদ্বিগ্ন নির্জীব। তাদের হৃদয়গুলো অনুভূতিহীন শক্ত পাথর।

কোনো সন্দেহ নেই, দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নতি-অগ্রগতির পথে তা এক জটিল বাধা। এ বাধা কাটিয়ে উঠার উপায় কী? এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী?

সমাপ্তি:

১. বর্তমান প্রজন্মের মাঝে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। কেননা শিশু-কিশোররা পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে যা অর্জন করে, আগামী জীবনে তা প্রেরণা ও কর্মশক্তি হিসেবে কাজ করে।
২. ছাত্রসমাজের মাঝে দেশাত্মবোধের শিক্ষা জাগরুক করার ক্ষেত্রে মাদরাসা ও ইউনিভার্সিটিগুলোর যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের চলমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ছাত্রদেরকে সজাগ-সচেতন করে তোলা কর্তব্য। এক্ষেত্রে তাদেরকে ইতিবাচক কার্যকর ভূমিকা পালনে অনুপ্রাণিত করতে হবে। কেননা তারাই হলো দেশের কল্যাণে আগামীর সূর্য-সন্তান, দেশের সেবক ও রক্ষক।
৩. শিক্ষা-সংস্কৃতি, মিডিয়া ও সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। বিষয়টি যেন তরুণ প্রজন্মের চিন্তা-চেতনায়, তাদের মন-মস্তিষ্কে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায় এবং বিষয়টিকে তারা যেন জীবনের অবিচ্ছেদ্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

৪. বিশ্বাস করুন, ন্যায়-নীতিবান ও মহান ব্যক্তিদের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করে ভিন্ন দেশে পারি জমানো সাধারণ কোনো বিষয় নয়। তাঁদের বিবেক ও মহৎ মানসিকতা কখনো তা সমর্থন করবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা স্বদেশ ত্যাগের বিষয়টিকে আত্মহত্যার সমতুল্যরূপে উল্লেখ করেছেন:

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ

مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ৭৭]

অর্থ: 'আমি যদি তাদের ওপর ফরয করে দিতাম যে, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা নিজেদের ঘর-বাড়ি থেকে বের হয়ে যাও, তবে তারা তা করত না, অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া।' (নিসা, ৪: ৬৬)

৫. মনে রাখুন! যতো দিন বেঁচে আছেন, দেশের কল্যাণে কাজ করা, দেশের মঙ্গলে সচেষ্টিত থাকা আপনার অনিবার্য দায়িত্ব। এই ভূমিতেই আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন। এ মাটি, এ পরিবেশের যত কল্যাণ, আপনি উপভোগ করেছেন।
৬. বিশ্বাস করুন! দেশের প্রতি মমত্ববোধ, ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা, দেশের সুরক্ষা, দেশের সীমান্ত প্রহরা-এ সবই মহত্ত্ব ও মহানুভবতার পরিচায়ক, মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক।
৭. দেশ ও জাতির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দৃঢ়চেতা ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশীয় সংস্থা ও সংগঠনগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা কর্তব্য। দেশীয় সম্পদ ব্যবহারে যেকোনো অপচয় ও দুর্নীতি রোধ করা আবশ্যিক।
৮. এমন কিছু কর্মসূচি সক্রিয় করতে হবে, যা দেশীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা আরও সজাগ ও সুদৃঢ় করবে এবং দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সাম্য, ন্যায়-নীতি ও মানবীয় মূল্যবোধের চেতনা ছড়িয়ে দিবে। মনে রাখবেন, দেশের সন্তানদের মধ্যে যদি দেশাত্মবোধের চেতনার মৌলিক চর্চা ও পরিচর্যা না হয়, তাহলে দেশ সুদীর্ঘ কালের জন্য শত্রুদের নিরাপদ চারণভূমিতে পরিণত হবে।

৯. দেশের মিডিয়া ও প্রচার-মাধ্যমগুলোর কর্তব্য হলো, একচেটিয়াভাবে দেশের সংকট ও দুর্দশার চিত্র তুলে না ধরে দেশের ইতিবাচক দিকগুলোও গুরুত্বের সঙ্গে সম্প্রচার করা। অন্যথায় তরুণ প্রজন্মের মধ্যে স্বদেশের প্রতি হতাশা ও নিরাশা প্রকট হবে। মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে তাদের গর্ব ও গৌরবে চিড় ধরবে।
১০. একটি বিষয় জোর তাগিদ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে—দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেম শুধু কিছু অন্তঃসারশূন্য বুলি, সারবত্তাহীন আচার-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশাত্মবোধ হলো দেশের কল্যাণ-চিন্তা, জাতীয় দায়দায়িত্বে একনিষ্ঠতা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা ও দেশের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার নাম। কোনো প্রকার দ্বিধা-সংশয় ও কালবিলম্ব করা ব্যতীত দেশের প্রতিটি নাগরিকের এ দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য।
১১. মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য একটা শ্রেণি পশ্চিমা জীবনযাপনের অন্ধ অনুকরণে অতি উৎসাহী। স্বদেশের প্রতি দায়িত্ববোধের কথা চরমভাবে বিস্মৃত হয়ে ভিনদেশী চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে মেতে উঠেছে। তাদের সামনে ইসলামের গৌরবগাঁথা ইতিহাস, মহান পূর্বসূরিদের অবিস্মরণীয় কীর্তি, আমাদের মহান বিজয়ের কাহিনী তুলে ধরতে হবে এবং ইসলামের চিরন্তন সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপরেখা উপস্থাপন করতে হবে।
১২. দেশের কল্যাণে সামান্য অবদান ও ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলোকে খাটো করে দেখা সমীচীন নয়। প্রত্যেক নাগরিকের চেষ্টা-প্রচেষ্টার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে জনগণ দেশের কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। দেশাত্মবোধ ও দেশভক্তির চেতনা লালনে অনুপ্রাণিত হবে।
১৩. দেশের তরুণ সমাজ ও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সফরের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে, যেন তারা অতি সহজেই দেশের ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। অতীত ইতিহাসের অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। এর মাধ্যমে তারা দেশের গৌরবময় কীর্তি সম্পর্কে জানতে পারবে। যা তাদের মাঝে দেশের বর্তমান উন্নতি-অগ্রগতির পথে এক নব উদ্যমতা সৃষ্টি করবে, নতুনভাবে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

১৪. আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার মানসিকতা বর্জন করে, ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃভূমির কল্যাণে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
১৫. সবার আগে দেশ ও দেশের কল্যাণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যিক। দেশীয় সংস্থা ও সংগঠনগুলোকে মূল্যায়ন করা এবং দেশীয় সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ করা সমান গুরুত্বপূর্ণ। মতভিন্নতা ও বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রেও জাতীয় স্বার্থ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই আলোচনার মাধ্যমেই জাতীয় ঐক্যের সূত্র খুঁজে বের করতে হবে এবং দেশের জন্য, দেশের জন্য মঙ্গলজনক-এমন একটি ফলপ্রসূ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।
১৬. দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে উদার মানসিকতার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করা কর্তব্য। এ কথা জোর ত্যাগিদ দিয়ে বোঝাতে হবে যে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব শুধু নিরাপত্তাবাহিনীর নয়, প্রতিটি নাগরিকের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে ঐকান্তিকতার সঙ্গে এ মহান দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য।
১৭. মহৎ শিষ্টাচার, নীতি-নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধ-যেমন : অন্যের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া, প্রত্যেক নাগরিক নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীর হক আদায় করা, চারপাশের সমাজ বিনির্মাণে সচেষ্ট হওয়া, স্বার্থপরতার মানসিকতা ছেড়ে পরার্থপরতার মহত্ত্ব অবলম্বন করা এবং দেশের প্রতিটি নাগরিকের মাঝে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ ও আন্তরিক ভালোবাসা বজায় রাখা-ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিশীল ও দায়বদ্ধ হতে হবে।
১৮. মহান পূর্বপুরুষগণের অবিস্মরণীয় কীর্তি ও গৌরবে এতটা মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকা সমীচীন নয়, যার কারণে ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত হয়ে বর্তমানের উন্নতি-অগ্রগতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের কথা ভুলে বসে। এক্ষেত্রে অতীতের মর্যাদা ও গৌরব পূজি করে বর্তমানের পথে এগিয়ে যাওয়া এবং সুন্দর আগামীর পথ সুগম করা কর্তব্য।

১৯. দেশে আকস্মিক কিংবা শত্রুদের পূর্বপরিকল্পিত যেকোনো সংকটজনক সঙ্কিন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। কঠিন পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে হলেও দেশের স্বার্থ রক্ষা করা ও উদ্ধার করা। এ জাতীয় ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে যায়, দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমে কোন শ্রেণির নাগরিক নিখাত একনিষ্ঠ, আর কোন শ্রেণি প্রদর্শনবাদী ও স্বার্থপর।

পরিশিষ্ট:

- ❖ আব্বাসী খেলাফতকালের বিখ্যাত কবি ইবনে রুমী (২২১-২৮৩ হি.) বলেছেন:

وَحَبِّبْ أَوْطَانَ الرَّجَالِ إِلَيْهِمْ

مَا رَبُّ قَضَاهَا الشَّبَابُ هُنَالِكَ

إِذَا ذَكَّرُوا أَوْطَانَهُمْ ذَكَرْتَهُمْ

غُهُودَ الصِّبَا فِيهَا فَحَنُوا لِذَاكَ.

অর্থ: শৈশব, তারুণ্য, যৌবনের সুখস্মৃতিগুলো একজন সুনাগরিকের হৃদয়ে মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে। তাই মানুষ যখন স্বদেশের কথা মনে করে, স্বদেশ তাকে অতীতের সুখস্মৃতিগুলো মনে করিয়ে দেয়। তাই দেশের প্রতি তাদের মন এতটা উদগ্রীব, উতলা হয়ে থাকে।

- ❖ বিশিষ্ট স্কটিশ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘কতই না গৌরবের বিষয়—কোনো নাগরিক স্বদেশের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। তার চেয়ে গৌরবের বিষয় হলো, দেশের স্বার্থে বেঁচে থাকা, দেশের কল্যাণে সক্রিয় থাকা।’

- ❖ ইরাকের বিখ্যাত কবি আব্দুল মুহসিন আল-কাজেমী (১৮৭১-১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

ومن لم تكن أوطانه مفخرة له

فليس له في موطنه المجد مفخر.

ومن كان في أوطانه حامياً لها

فذكره مسك في الأنام وعنبر.

‘যে নাগরিক মাতৃভূমিকে গর্ব ও গৌরবের প্রতীক মনে করে না, মর্যাদা ও গৌরবের ক্ষেত্রে তার কোনো স্থান নেই। আর যে নাগরিক দেশের একনিষ্ঠ কল্যাণকামী ও রক্ষক হয়ে বেঁচে থাকে, তার সুনাম-সুখ্যাতি বিশ্বদরবারে মেশকের সুগন্ধির মতো ছড়িয়ে পড়ে।’

তালাক ও ডিভোর্স

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কলহ-বিবাদ কখনো কখনো এমন ভয়ানক আকার ধারণ করে, যার চূড়ান্ত হলো বিচ্ছেদ ও ডিভোর্স। ডিভোর্স হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অমিল ও কলহ-বিবাদ নিরসনের সর্বশেষ তিক্ত সমাধান, যা আল্লাহ তা'আলার নিকট বৈধ; কিন্তু সর্বাধিক ঘৃণিত।

সামাজিকভাবেও এটি লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়। কেননা দু'জন মানব-মানবীর মাঝে তিলে-তিলে যে প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যে মানবিক মূল্যবোধ ও ঔদার্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে, তালাক ও ডিভোর্সের মাধ্যমে তা এক মুহূর্তেই ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এমন পরিবারে জন্মানো সন্তানরা পারিবারিকভাবে ও সামাজিকভাবে নানা বঞ্চনার শিকার হয়। প্রথমেই তারা সুন্দর সাজানো পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়। বাবা-মা-র আদর-সোহাগ, স্নেহ-ভালোবাসা ও শাসন-অনুশাসন থেকে বঞ্চিত হয়।

তবে যে ব্যক্তি গভীর দৃষ্টিতে ডিভোর্স-এর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে, চূড়ান্ত মুহূর্তে এর প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতার বিষয়টি ভেবে দেখবে, তার কাছে ডিভোর্স কোনো সামাজিক আপদ বলে মনে হবে না। কেননা কখনো কখনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এতটাই অবনতি ঘটে, বিচ্ছেদই এর মন্দের ভালোয় পরিণতি হয়। তখন যদি ডিভোর্সের পথ খোলা না থাকে, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর তিক্ত সম্পর্কের জের ধরে সংসার ভাঙ্গার চেয়ে আরও ভয়ানক আত্মবিধ্বংসী পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে।

তালাক ও ডিভোর্সের কারণে একটি সুন্দর সাজানো পারিবারিক অবকাঠামো ধসে পড়ে। পরিবার-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই মানসিক অস্থিরতা ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়। এক ঘোর অন্ধকার অনিশ্চয়তা তাদেরকে ঘিরে ধরে। একটি সুন্দর, সুশীল পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর দীর্ঘদিনের শত চেষ্টা-শ্রম পণ্ড হয়।

এটাও সত্য যে, পারিবারিক বন্ধন ও বিচ্ছেদ-সবই আল্লাহর ফায়সালা এবং আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ও চরম বাস্তবতার অংশ। একটি সামাজিক ব্যবস্থা, পারিবারিক ব্যবস্থা যতই উন্নত ও ভারসাম্যপূর্ণ হোক, তাতে ডিভোর্স ও তালাকের স্থান অনিবার্য। সুতরাং কথিত অন্তঃসারশূন্য সুশীল সমাজেই নয়; সত্যিকারের সভ্য-সুশীল সমাজে ও পরিবারে তালাকের বাস্তবায়ন ঘণিত; কিন্তু অপরিহার্য।

তালাকের বহু কারণ-উপকরণ, ঘটক-অনুঘটক রয়েছে। যার অনৌচিত্যের ব্যাপারে কারো সন্দেহ নেই। আবার সম্ভাবনার বিষয়টিও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

ডিভোর্স যখন অপছন্দনীয় তখন তা থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী? তালাক যখন অনিবার্য তখন তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পস্থা কী?

সমাধান:

১. ঝগড়াঝাঁটি ও কলহ-বিবাদের সময় স্বামী-স্ত্রীর একজন অপরজনকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। আরও ভালো হয়, তারা যদি নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্য অবসরযাপনের জন্য চলে যায়। অবশ্যই তাদেরকে পৃথকভাবে অবসরযাপন করতে হবে, যেন পারিবারিক দায়দায়িত্বের চাপমুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে নিয়ে সময় কাটাতে পারে। মন-মানসিকতায় প্রশান্তি ও সতেজতা ফিরে আসে। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ নতুনত্ব লাভ করে।

এ সময় তাদের কেউ তালাক ও সম্পর্কচ্ছেদ নিয়ে ভাববে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট তা বৈধ হলেও সর্বাধিক ঘণিত। এতে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে চরম বঞ্চনার শিকার হতে হয়। তবে যদি ডিভোর্স ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে, তাহলে তা-ই শ্রেয়।

২. একপর্যায়ে এসে যদি ডিভোর্স হয়েই যায়, তখন স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীকে সুন্দরভাবে বিদায় জানানো। তার প্রতি সদাচার করা। তার সঙ্গে আন্তরিক ও সুন্দর আচরণ করা। ডিভোর্সের সময় একটি নারী মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এ কঠিন সময়ে স্বামী তার সঙ্গে কঠোর ও রুঢ় আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে।

৩. ডিভোর্স প্রদানকারী স্বামীকে অবশ্যই শরীয়তের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। শরীয়ত সমর্থিত স্ত্রীর প্রতিটি হক যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। স্ত্রীর মোহর বাকি থাকলে তা পরিশোধ করা, তালাক পরবর্তী সময়কালে স্ত্রীর উত্তম ভরণ-পোষণ বন্দোবস্ত করা, স্ত্রীর পরিবার-পরিজনের সাথে সদয় আচরণ করা, স্ত্রীর সমালোচনায় মত্ত না হয়ে তার উত্তম গুণাবলির প্রশংসা করা-এসবই হলো স্বামীর ধার্মিকতা, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি, মানবিকতা ও পৌরুষত্বের পরিচয়।
৪. আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কেননা আল্লাহর ফায়সালায় চূড়ান্ত কল্যাণ নিহিত। এক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষই পবিত্র কুরআনের এ বাণী মনে রাখবে:

﴿وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾

[النساء: ১৩০]

অর্থ: ‘আর যদি উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ নিজের (কুদরত ও রহমতের) প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে (অপরের প্রয়োজন থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দিবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রভূত হিকমতের অধিকারী।’ (নিসা, ৪: ১৩০)

৫. তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর কর্তব্য হলো, পূর্বের স্বামীর দুর্নাম না রটিয়ে তার সুনাম বজায় রাখা। এতে স্ত্রীর সুনামও বজায় থাকবে। যে নারী তার পূর্বের স্বামীর দুর্নাম রটিয়ে বেড়ায়, সমাজও তাকে সুনজরে দেখে না। দীর্ঘ দিনের অতীত সংসার-জীবনে স্বামীর অবদানের প্রতি তার অকৃতজ্ঞতা, দায়বদ্ধহীন মানসিকতা সমাজ কুৎসিতরূপেই বিবেচনা করে।
৬. ডিভোর্সের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে হবে। তাদের মনে করতে হবে, যে সংসার-জীবন অতীত হয়েছে, তা জীবনেরই একটি সুন্দর অধ্যায়, যা সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। ডিভোর্সের মাধ্যমে জীবনের যে নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে, তাতেই হয়ত অধিক কল্যাণ রয়েছে। বাহ্যিকভাবে কত ক্ষতি মানুষের জন্য কল্পনাভীত কল্যাণ বয়ে আনে।

৭. সমাজে এ মানসিকতা দৃঢ়মূল করতে হবে, ডিভোর্স, তালাক কোনো দূষণীয় বিষয় নয়। এটি একটি শরীয়তসম্মত সামাজিক সমাধান। তাই তালাকপ্রাপ্ত নারীকে দোষারোপ করা, তাকে বাঁকা চোখে দেখা, তাকে অবজ্ঞা করা, অপয়া-অলুক্ষণে মনে করা—এসবই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষুদ্রতা ও অসুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক।
৮. তালাক প্রদানকারী স্বামী কিংবা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী! বিশ্বাস করুন, আপনার জীবন কোনো নারী কিংবা পুরুষ সত্তার সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। একজনের জন্য অপরের জীবন থেমে থাকতে পারে না। তাই প্রত্যেকেই নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হোন। আল্লাহর সীমাহীন দান-অনুগ্রহের ওপর গভীর আস্থা রেখে নতুন জীবন শুরু করুন। যা অতীত হয়েছে, স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলুন, যেন তা আদৌ ঘটেনি। আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। যে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আপনার কল্যাণ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।
৯. ডিভোর্সের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষই আফসোস-অনুতাপ করতে থাকে এবং ডিভোর্স হওয়ার নেপথ্যে কাদের ভূমিকা ছিল, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মেতে উঠে। এমনটা করা সমীচীন নয়।
১০. অনুকূল-প্রতিকূল পরিস্থিতি—দুয়ে মিলেই জীবন। সংসার যেমন গড়েছে, তা ভাঙ্গারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কখনো যদি সংসার ভাঙ্গার প্রতিকূলতার শিকার হন, মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়বেন না। আত্মবিশ্বাস রাখুন। সমাজে আপনার ইতঃপূর্বের স্বাভাবিক জীবনযাপন বজায় রাখুন। দুষ্ট লোকদের বাঁকা দৃষ্টির ভয়ে একাকিত্ব বরণ করে ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকবেন না। তালাক ও ডিভোর্স জীবনেরই অংশ। জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা-অনুঘটনার মতো এটাকেও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করুন।
১১. বিশ্বাস করুন, পারিবারিক সম্পর্কচ্ছেদের কারণে আপনার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে—জীবন এত ক্ষুদ্র ও মূল্যহীন নয়। বাস্তবতা মেনে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করুন। যা ঘটেছে, তা থেকে ইতিবাচক শিক্ষা নিয়ে সামনের পথে অগ্রসর হোন।

১২. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কচ্ছেদ জীবনের একটি কঠিন প্রতিকূলতা বটে; কিন্তু এতটা গুরুতর নয় যে, এর কারণে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। মানবজীবন অমূল্য ও সম্ভাবনাময়। প্রতিদিনই নতুন ভোরের স্নিগ্ধতা উপভোগ করে, নতুন সূর্য আলোয় স্নাত হয়। জীবনচাকা নতুন গতিতে চলতে শুরু করে।
১৩. পারিবারিক জীবনে প্রতিবন্ধকতার শিকার হলে নিজের ভুলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। সংসারিক প্রতিকূলতা আপনার জন্য তিক্ত ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। তবে তাতে স্থবির হয়ে পড়ার কারণ নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি জেনে যাবেন, এ অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে কীভাবে অনুকূলতার পথ আবিষ্কার করবেন এবং সামনের পথে অগ্রসর হবেন।
১৪. ডিভোর্স পরবর্তী সময় কোনো বিষয়েই তাড়াহুড়ো করবেন না। এ সময়ে জীবনের এ কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে নতুন কিছুতে জড়াবেন না। হয়ত এভাবে আপনি সাময়িক মানসিক কষ্ট-যাতনা ভুলে থাকতে পারবেন; কিন্তু ভিন্ন কোনো নতুন তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কাও থেকে যাবে। তাই এ ক্ষেত্রে নিজেকে পর্যাপ্ত সময় দিন। নিজেকে নিয়ে ভাবুন। আপনার প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করুন। নিজেকে যখন আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবে, আত্মপোলক্কির মর্মমূলে পৌঁছতে পারবেন, ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির করা সহজ হবে।
১৫. বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছেন, তাতে আপনার ভুলগুলো পর্যালোচনা করে দেখুন। যেন পরবর্তীতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। অন্যকে যাচাই করার আগে নিজেকে যাচাই করুন। বিবেক-বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করুন।
১৬. আত্মবিশ্বাসী হোন। সাহসিকতার সঙ্গে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হোন। দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন চিন্তে একটি নতুন পরিবার গড়ে তোলায় সচেষ্ট হোন। কেননা মানুষ হলো সমাজবদ্ধ প্রাণী। পরিবার ও সমাজ ছাড়া সে সুস্থ-স্বাভাবিক থাকতে পারে না।

পরিশিষ্ট:

- ❖ ‘ভালোবাসার শক্তিতে গ্যালাক্সি রচিত হয়। ভালোবাসার কারণেই মুখে হাসি ফুটে। আনন্দ চিরস্থায়ী হয়। ভোরের মৃদু হাওয়া বয়। পাখিরা গান করে। ভালোবাসাহীন পৃথিবী যেন মরুময়, বাগান ফুলশূন্য, চোখ আলোহীন, কান শ্রবণশক্তিহীন।’ -আয়েয কারনী
- ❖ বিশিষ্ট ফরাসী লেখিকা ও বুদ্ধিজীবী সিমেন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘ডিভোর্স হলো স্বামী-স্ত্রীর কলহ-যুদ্ধে সর্বশেষ গুলি।’
- ❖ সাহিত্য, ইতিহাস ও আইন ও শরীয়াবিশেষজ্ঞ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী দাওয়াহর অঙ্গনে অন্যতম প্রতীক শায়েখ আলী তানতাজী (১৯০৯-১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘ক্যাসেশন কোর্টে দীর্ঘ সাতাশ বছর বিচারক ছিলাম। তখন দেখেছি যে, ডিভোর্স ও তালাকের প্রধানতম কারণ হলো, স্বামীর সীমাহীন ক্রোধ আর স্ত্রীর নির্বোধসুলভ আচরণ।’

নারী-নির্যাতন

নারী কোনো পণ্য নয়, যা কেনা-বেচার জন্য উপস্থাপন করা হবে। নারী হলো এক মহা মানবী। অনুভব-অনুভূতি ও মন-মানসিকতায় নাজুক ও সংবেদনশীল। মায়াবী হৃদয় ও মহৎ প্রাণের অধিকারিণী।

জগতে নারী হলো কারো মা, খালা, ফুফু ও চাচি। কারো বোন, স্ত্রী কিংবা কন্যা। পৃথিবীতে নারীজাতি হলো মানব গড়ার কারিগর। অতীত ও বর্তমানে যত মনীষী ও মহাপুরুষের জন্ম হয়েছে, তার পেছনে কোনো না কোনো নারীর ঐকান্তিক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

জগতে নারীদের ভূমিকাগুলো সর্বদা সমাজ ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। সমগ্র বিশ্বে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের শীর্ষ ছুঁয়েছেন, প্রায় সবার ক্ষেত্রেই কোনও না কোনো নারীর ত্যাগব্রতে নন্দিত ও ললিত হাতের স্পর্শ এবং আকাশ-উদার স্বার্থশূন্য হৃদয়ের প্রণোদনা রয়েছে। সে ভূমিকায় জননী, জায়া, কন্যা-যে কেউ অবতীর্ণ হয়ে দুরন্ত ঢেউয়ের মাথায় দোল খাওয়া ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্নগুলোর সুমধুর সহাবস্থান ঘটিয়ে দিতে পারেন।

মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের কাজে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়। আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাঁর পুত্রের চরিত্রে, স্বামীর কীর্তিতে রচিত হতে থাকে এবং সে লেখায় তাঁর নামোল্লেখ থাকে না।

একজন স্বামী, একটি সন্তান যখন সমাজে সফলতার স্বীকৃতিতে ভূষিত হয়, সবার আগে স্ত্রী ও মায়ের হৃদয়ই আনন্দে গর্বে ভরে উঠে। এ ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সামাজিক স্বীকৃতি না পেলেও সফল সন্তান ও স্বামী কিন্তু অবলীলায় মা ও স্ত্রীর ভূমিকার কথা বেশ গর্ব করেই বলে থাকে। নারী তখন সফলতা ও কৃতকার্যতার যে সীমাহীন আনন্দ ও পুলক অনুভব করেন, তা বর্ণনাভীত।

নারীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা যদি দিতে হয়, তাহলে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ﷺ তার যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَحَدَّثَ الْحَادِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ، وَيَحْكُ بِالْقَوَارِيرِ»

অর্থ: আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার নবী ﷺ (নারীদের সহ) এক সফরে ছিলেন। হুদী^{১০} গায়ক হুদীগান গেয়ে যাচ্ছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'আফসোস তোমার প্রতি ওহে আনজাশা! তুমি কাচপাত্রতুল্য'^{১১} সওয়ারীদের প্রতি সদয় হও।' (বুখারী: ৮/৪৭)

ইসলাম নারীর সুরক্ষা ও নারী-অধিকার প্রদানে অনুপ্রাণিত করেছে। নারীর মর্যাদা রক্ষা ও তার অধিকার সুরক্ষার প্রতিদানে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছে। নারীর অধিকার হরণের পরিণতিতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করেছে।

নারীর স্বভাববৈশিষ্ট্য হলো দুর্বলতা, নাজুকতা ও সংবেদনশীলতা। তাই রাসূল ﷺ নারীদের ব্যাপারে অনেক উপদেশ প্রদান করেছেন। নারী-অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

"اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ"

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি দু'টি দুর্বল শ্রেণি: এতিম ও নারী-অধিকার (হরণ) জঘন্য অপরাধ ও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করছি।' (মুসনাদে আহমাদ: ১৫/৪১৬)

বর্বর জাহেলি যুগে নারী ছিল যুলুম নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার। এ ক্ষেত্রে নির্দয় পিতা, ভাই, অত্যাচারী স্বামী ও অবাধ্য সন্তান-কেউ পিছিয়ে ছিল না। যুগে যুগে মানুষ নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় অনুশাসন থেকে যতই বিচ্যুত হয়েছে, তাদের মাঝে নারীর অধিকার হরণ ও নারী-

১০ উট হাঁকানোর ভালে যে গান গাওয়া হয় তাকে হুদী বলে।

১১ আবু কিলাবা বর্ণনা করেন, কাঁচপাত্রতুল্য শব্দ দ্বারা নবী ﷺ মহিলাদের বুঝিয়েছেন। (বুখারী)

নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে এ সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর প্রকৃত সমাধান কী? এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী?

সমাধান:

১. ইসলামে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হবে। নারী সম্পর্কে কুরআন হাদীসে যে আদেশ-নিষেধ এসেছে, তার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার বিষয়ে যে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, তার চর্চা করতে হবে এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে।
২. শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর সুনির্দিষ্ট অংশ বুঝিয়ে দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ أَمْوَالَهُنَّ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَهُنَّ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ [النساء: ২]

অর্থ: “এতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও আর ভালো সম্পদ মন্দ সম্পদ দ্বারা পরিবর্তন কর না। আর তাদের (এতিমদের) সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিশিয়ে খেও না। নিশ্চয়ই এটা অতি বড় গুনাহ।”^{১৪} (নিসা : ২)

৩. শিক্ষা-দীক্ষা নারীর মানবিক অধিকার। নারীশিক্ষা, বিষয়টি শরীয়ত নির্দেশিত। তাতে অবহেলার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং নারীকে উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। একজন শিক্ষিত নারী ও মায়ের পক্ষেই সম্ভব একটি শিক্ষিত সফল জাতি গড়ে তোলা, যা শিক্ষা-দীক্ষাহীন নারীজাতির পক্ষ থেকে কখনোই আশা করা যায় না।
৪. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হবে। নারী নির্যাতনের সঙ্গে নির্দয় পিতা, ভাই, অত্যাচারী স্বামী ও অবাধ্য সন্তান কিংবা অন্য পক্ষ—যে-ই জড়িত থাকুক-না-কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির বিধান জারি করতে হবে। নারী নির্যাতনের মামলাগুলোর বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

১৪ আয়াতে এতীমের বিষয়টি আলোচিত হলেও যে কোনো দুর্বল ও পতিত শ্রোণি এ আয়াতের ব্যাপক হুকুমের আওতাভুক্ত। (সাক্ষওয়াতুত তাফাসীর)

৫. নারীকে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার আর্থিক স্বাবলম্বিতার পাশাপাশি মান-মর্যাদা ও ইজ্জত আবরুর সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা কর্তব্য। রাসূল ﷺ-এর পবিত্র যুগেও নারীরা ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ এতিমদের লালন-পালন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।
৬. পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে নারীর অংশগ্রহণ, এসব ক্ষেত্রে তাদের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। রাসূল ﷺ উম্মে সালামা (রা.)-এর পরামর্শ চেয়েছিলেন। ওমর (রা.) বিবাহের মোহর বিষয়ে নারীদের মতামত গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের বহু ঘটনা এর উজ্জ্বল প্রমাণ।
৭. একটি সামাজিক সুরক্ষা তহবিল গঠন করে বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত, অভাবী ও প্রয়োজনগ্রস্ত নারীদের কল্যাণে এ তহবিলের অর্থ ব্যয় করতে হবে।
৮. অজ্ঞ, নির্বোধ ও মানবিক মূল্যবোধহীন শ্রেণি, নারীদের প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যপূর্ণ মানসিকতা দূর করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সংসারে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অপরিহার্যতা তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে সোস্যাল মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়া ও সম্প্রচার মাধ্যমগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।
৯. সমাজে প্রকৃত সফল নারীদের^{১৫} তালিকা করে তাদের সম্মাননা প্রদান করতে হবে। নারীজাতির সামনে তাদেরকে আদর্শরূপে তুলে ধরতে হবে। যেন অন্যরাও তাদের মতো মহৎ ব্যক্তিত্ব অর্জনে, কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়।
১০. মনে রাখতে হবে, পরিবার ও সমাজে নারীই হলো সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নারীই হলো মনীষী ও মহাপুরুষ গড়ার কারিগর। একজন নারীই পারে তার সন্তানদের মাঝে নীতি-নৈতিকতা ও মানবীয় মূল্যবোধ বদ্ধমূল করে দিতে।

১৫. পশ্চিমা বিশ্বের আদলে গড়ে উঠা কথিত নারীবাদী সংঘটনগুলোর লোক দেখানো সফল নারী নয়। (অনুবাদক)

১১. প্রচলিত নারী-অধিকার, নারী-স্বাধীনতার পেছনে না পড়ে কুরআন-হাদীসের দিকনির্দেশনার আলোকে নারী-অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। পছন্দের স্বামী নির্বাচন, শিক্ষা-দীক্ষা, উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তবে কোনো ক্ষেত্রেই শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।
১২. কন্যা সন্তান লালন-পালন, তার শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবাহ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো অভিভাবকের জন্যই জাগতিক স্বার্থকে মুখ্য করে দেখা সমীচীন নয়। এসব ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানের সুখ-শান্তি ও তার কল্যাণের বিষয়টিই মুখ্য হিসেবে বিবেচিত উচিত।
১৩. নারীর অর্থ-সম্পদ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে কোনোভাবেই অনধিকার চর্চা করা যাবে না। নারীর সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ সমাজে নানা অন্যায়-অপরাধের পথ খুলে দেয়।
১৪. নারীর প্রতি সদয় হতে হবে। তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হবে। দৈনন্দিন কাজকর্ম, ঘর-সংসার ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করতে হবে।
১৫. নারীর প্রতি সদাচার হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ। এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মান্য করা হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا

مِنَ النَّارِ» صحيح البخاري (৭/৮)

অর্থ: যাকে কন্যা সন্তানদের দিয়ে কোন পরীক্ষা করা হয়, তারপর সে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে প্রতিবন্ধক হবে। (বুখারী: ৭/৮)

১৬. প্রত্যেক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলছি:

‘আপনার মা, বোন ও কন্যার জন্য যে আচার-আচরণ আপনার পছন্দ নয়, অন্য নারীর ক্ষেত্রেও আপনি তা থেকে বিরত থাকুন। আল্লাহ তা‘আলাকে ভয় করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ধর্মপরায়ণ ও খোদাতীকর বান্দাদের পছন্দ করেন।

পরিশিষ্ট:

- ❖ 'যখন তোমার দেহে আত্মা ফুঁকে দেওয়া হয়, তুমি মাতৃগর্ভে থাক। শৈশবে যখন নিরুপায় কান্না জুড়ে দাও, তুমি তখন মায়ের কোলে। যখন তোমার মাঝে প্রেম-ভালোবাসার উদ্বেগ হয়, তখনো তুমি কোনো নারীর হৃদয়ে। সুতরাং নারীর প্রতি সদয় হও। তার জন্য সুখ-শান্তি ও ভরসার প্রতীক হও। নারী হলো তোমার জিন্মায় এক মহৎ আমানত। অন্যায় অবহেলার পাত্র হিসেবে নারীকে সৃষ্টি করা হয়নি।' -আয়েয করনী
- ❖ বিশিষ্ট ফরাসী চিন্তাবিদ ও গবেষক মার্সেল বাওয়াযার বলেছেন:
'আন্দালুসে মুসলমানদের সোনালি যুগে মুসলিম কবিগণই তো ইউরোপের খ্রিষ্ট সমাজকে নারীদের প্রতি সম্মান দেখাতে শিখিয়েছে।'
- ❖ আব্বাসীয় খেলাফতকালীন বিখ্যাত আরব কবি আবু তায়েব মুতানাব্বি (৩০৩-৩৫৪ হি.) বলেছেন:
'নারীজাতিকে আমরা যেভাবে চিনতে পেরেছি, নারীরা যদি তেমন হতো, তাহলে অবশ্যই পুরুষজাতির ওপর নারীজাতির শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হতো। সুতরাং شَمْسٌ (সূর্য) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হওয়াতে দোষের কিছু নেই। আবার هِلَالٌ (নতুন চাঁদ) শব্দটি পুংলিঙ্গ হওয়াতেও গর্বের কিছু নেই।'

আইবুড়ো

আইবুড়ো হলো, তরুণ-তরুণীদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়ার পরও বিবাহ না হওয়া। দেশ ও সমাজ ভিন্নতায় আইবুড়োত্বের বয়সের প্রভেদ হয়ে থাকে। গ্রাম্য ও পল্লি সমাজে নারীদের বয়স বিশের কোঠা পেরোলেই তাদেরকে আইবুড়ো মনে করা হয়। অপরদিকে শহুরে সামাজিকতায় আইবুড়োত্বের বয়সের মাত্রটা প্রায় ত্রিশ।

এক্ষেত্রে একটি প্রাচীন সামাজিক ভুল ধারণা প্রকটভাবে দেখা দেয়। তা হলো, আইবুড়োত্বের তকমাটা সবার আগে মেয়েদের কপালেই সঁটে দেওয়া হয়। ছেলেদের বেলায় যেন আইবুড়োত্বের অস্তিত্ব কল্পনাও করা দায়।^{১৬} এ ধরনের বৈষম্য ঠিক নয়। উভয় শ্রেণির ক্ষেত্রে তা সমানভাবে বিবেচনা করা উচিত। তা না হলে বিবাহের প্রতি ছেলেদের অনাগ্রহ অনীহা প্রকাশ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। আর এটা তো সুনিশ্চিত যে, বিবাহে নারী-পুরুষের একটি শ্রেণি পিছ-পা হলে অপর পক্ষের বিবাহ বিলম্বিত হবে।

বর্তমানে আইবুড়ো সমস্যা যে প্রকট আকার ধারণ করেছে, ক্রমান্বয়ে তা প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকবে। যে পরিবারে আইবুড়োত্বের সমস্যা বিদ্যমান, তারা সর্বদা মানসিক যন্ত্রণা ও অস্থিরতায় ভুগতে থাকে। হীনম্মন্যতা, বিষণ্ণতা, দুঃখ-কষ্ট আঁকড়ে ধরে। তারা সমাজের বাঁকা চাহনি, উপহাস, তাচ্ছিল্য এড়িয়ে চলতে লোকচক্ষুর আড়াল হয়ে থাকতে পছন্দ করে।

এ সমস্যার সমাধান কী? এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী?

১৬. বাংলা ভাষায় এর স্বপক্ষে প্রমাণ হলো, বাংলা ভাষায় আইবুড়ি শব্দ আছে; কিন্তু আইবুড়া শব্দ পাওয়া যায় না। (অনুবাদক)

সমাধান:

১. আইবুড়োত্ব সমস্যা ও বিবাহ বিলম্বের কারণে সমাজে যে নৈতিক ও চারিত্রিক নষ্টাচার দেখা দেয়, তা নিরসনের লক্ষ্যে বহু-বিবাহের বিষয়টি স্বাভাবিক ও সহজাত করতে হবে। এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ইসলামি শরীয়ত বহুবিবাহ অনুমোদন করেছে এবং এর জন্য কিছু সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি বেঁধে দিয়েছে। যদি তা যথাযথভাবে মান্য করা হয়, তাহলে পরিবার ও সমাজ-ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে।
 ২. কল্যাণমূলক সংস্থা ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যারা বৈবাহিক অচলাবস্থা সংশোধনের লক্ষ্যে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে তারা দিকনির্দেশনার ও সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং বৈবাহিক আচার-অনুষ্ঠানগুলোকে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়িমুক্ত করে বিবাহের পুরো বিষয়টিকে সহজসাধ্য করে তুলবে।
 ৩. সমাজে একটি শ্রেণি আছে, যারা বিবাহে আগ্রহী; কিন্তু আর্থিক অসংগতির কারণে তাদের বিবাহ বিলম্বিত হচ্ছে। তাদের বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য বিত্তবান শ্রেণির এগিয়ে আসা কর্তব্য।
 ৪. অবাধ যৌনাচারের কবল থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হবে। এ লক্ষ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার পাশাপাশি সমাজে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার মানসিকতা বদ্ধমূল করতে হবে।
 ৫. নারী-পুরুষকে পারস্পরিক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে প্ররোচিত করে-এমন সমস্ত কাজ নিষিদ্ধ করতে হবে, যেন তরুণ প্রজন্মের কাছে তা বিবাহের বিকল্প 'শর্টকাট' পন্থা হিসেবে আবির্ভূত হতে না পারে।
 ৬. মোহর, আবাসন, ভরণপোষণ-ইত্যাদি বিষয়গুলোতে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি আরোপের মানসিকতা বর্জন করতে হবে। রাসূল ﷺ-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী বিবাহের পুরো কসেপ্টটিকে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য করে তুলতে হবে।
- হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«إِذَا خَظَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ،
إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِضٌ» سنن

الترمذي (৩/৩৮৬)

অর্থ: 'কোনো ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীন-ধার্মিকতা ও চাল-চলন তোমাদের পছন্দ, তাহলে তার কাছে মেয়ে বিবাহ দাও। অন্যথায় যমিনে বিশৃঙ্খলা ও ব্যাপক অনাচার দেখা দিবে।' (সুনানে তিরমিজী: ৩/৩৮৬)

৭. সহজতার জন্য বিবাহের মোহর দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এক ভাগ বিবাহের সময় নগদ প্রদান করতে হবে। দ্বিতীয় ভাগ সময়সাপেক্ষ। যা-আল্লাহ না করুন!-তালাক বা ডিভোর্সের সময় আদায় করতে হবে। এর মধ্যে দু'টি কল্যাণ নিহিত: প্রথমত, বিবাহচুক্তি সহজসাধ্য হবে। দ্বিতীয়ত, তালাক ও ডিভোর্স দুঃসাধ্য হবে।
৮. তরুণ-তরুণীকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। চারিত্রিক অনাচার থেকে আত্মরক্ষা ও পরিবার গঠন মানব-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কত চমৎকারভাবে তা বর্ণনা করেছেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

[الرّوم: ২১]

অর্থ: 'তঁার (আল্লাহ তা'আলার) নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর ভেতর নিদর্শন আছে সেই সব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।' (রুম, ৩০: ২১)

৯. প্রতিটি শহর ও গ্রামে “বৈবাহিক তহবিল বা ফান্ড” গড়ে তুলতে হবে। বিবাহ-উপযুক্ত অসচ্ছল পাত্র-পাত্রীদের সাহায্যে কিংবা ঋণ প্রদানে এ ফান্ডের অর্থ ব্যয় করা হবে। সামাজিক অবস্থা ও পরিস্থিতির বিবেচনায় সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি অনুযায়ী ‘বৈবাহিক ঋণ’ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে।
১০. একটি বিষয়ে মা-বাবা ও অভিভাবকদের মধ্যে এ সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে—কন্যা বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কষ্ট ও ভোগান্তির অন্যতম কারণ হলো, কন্যার সুখ-শান্তি ও কল্যাণের বিষয়টি মুখ্য না ধরে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করার নিকৃষ্ট হীন মানসিকতা। যেমন: মেয়ের উপার্জিত অর্থ ভোগ করা কিংবা পাত্র পক্ষ থেকে অধিক হতে অধিকতর মোহর উসূল করার প্রবণতা। মা-বাবা ও অভিভাবকের এমন আচরণ চরম অন্যায় ও জঘন্য পাপ।

১১. সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশ মনে রাখুন:

”يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ“۔ صحيح البخاري (৩/৭)

অর্থ: ‘হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন সাওম বা রোযা পালন করে। সাওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে।’ (বুখারী ৭/৩)

১২. লেখাপড়ায় বাধা সৃষ্টি হবে—এই ভেবে বিবাহের বিষয়টি এড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিবাহ-শাদী প্রতিবন্ধক হতে পারে না; বরং সহায়ক ও পরিপূরক। কেননা বিবাহের মধ্যে আত্মিক প্রশান্তি, মনে স্থিরতা ও বিবেক-মস্তিষ্কের স্বচ্ছতা নিহিত আছে।
১৩. পাত্র-পাত্রী পছন্দ করার ক্ষেত্রে কোনো স্বপ্নের পুরুষ কিংবা রমণীর সন্ধান করে বেড়ানো বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। এমন বৈশিষ্ট ও গুণাগুণের ভিত্তিতে যাচাই করতে হবে, যা মৌলিক ও বাস্তবসম্মত। বাহ্যিক

রূপমাধুর্য ও চাকচিক্যকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকেও নজর দিতে হবে। টাকা-কড়ি, বাড়ি-গাড়িকে মুখ্য না ভেবে বিদ্যা-বুদ্ধি, ভদ্রতা-নম্রতা ও দ্বীন-ধার্মিকতার মতো মৌলিক বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এতে বিবাহ-শাদী যেমন স্বাভাবিক ও সহজবোধ্য হবে, আগামী ভবিষ্যতের বৈবাহিক জীবনও প্রশান্তিময় হয়ে উঠবে।

১৪. একই অনুষ্ঠানে বহু দম্পতির বিবাহ আয়োজন করার প্রচলন ঘটতে হবে। যেখানে একই সাথে দশ কিংবা একশ দম্পতির বিবাহকার্য সম্পন্ন হবে। এভাবে বিবাহকার্য বেশ স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হবে। বহু দেশ ও রাষ্ট্রে এ ধরনের অনুষ্ঠান বেশ সফলভাবে আয়োজিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

১৫. সমাজে এমন বহু রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণা প্রচলিত আছে, শরীয়তের বিধি-বিধানের সাথে যেগুলোর কোনো মিল নেই। ইসলামি মূল্যবোধ যেগুলোকে বিন্দুমাত্র সমর্থন করে না। যেমন: স্বগোষ্ঠীয় কাউকে বিবাহ করতে হবে। ছোট মেয়ের আগে বড় মেয়েকে বিবাহ দিতে হবে। বোনের বিয়ের আগে বড় ভাইয়ের বিবাহ হতে পারে না ইত্যাদি। এ ধরনের অবাস্তব ধ্যান-ধারণা ও কুসংস্কার বর্জন করতে হবে।

১৬. আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ ও প্রার্থনা করতে হবে। তিনিই পরম আশ্রয় এবং মহান রিযিকদাতা, যিনি আপনাকে রিযিক দান করবেন। তিনিই মহাধনী, যিনি আপনাকে সচ্ছলতা দান করবেন। দু'আ কবুলকারী, আপনার দু'আ করবেন। মহান দাতা, যিনি আপনাকে উত্তম জীবনসঙ্গী ও সন্তান-সন্ততি দান করবেন।

১৭. সমাজের যত মিথ্যাচারী গণক, জ্যোতিষী, তারা আপনার বিবাহ বিলম্বের সমস্যার সমাধান করে দিবে—এই বিশ্বাস নিয়ে কখনো তাদের দ্বারস্থ হবেন না। রাসূল ﷺ স্পষ্টভাবে তাদের দ্বারস্থ হতে নিষেধ করেছেন:

"مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ". مسند أحمد (১০/৩৩১)

অর্থ: 'যে ব্যক্তি কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হলো, তার কথা বিশ্বাস করল, সে যেন মুহাম্মদের ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করল।' (মুসনাদে আহমদ: ১৫/৩৩১)

১৮. সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব ও সম্পর্কের টানাপোড়েন দূর করতে হবে। লোকদের মাঝে দলীয় বিরোধের জের ধরে যে সমালোচনা হয়ে থাকে, তা সাধারণত মৌলিক ও গঠনমূলক সমালোচনা নয়। সুতরাং এর কারণে কোনো সভ্য-ভদ্র ও ধার্মিক পাত্রের বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়।

১৯. পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত ও বংশীয় সুনাম-সুখ্যাতির বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যিক। কেননা তা আল্লাহ প্রদত্ত দান। যে ব্যক্তি সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করতে পেরেছে, সে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র, প্রীতিভাজন।

২০. প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর প্রতি আমার অনুরোধ, অলুক্ষুণে হবে না। সবসময় মঙ্গল ও কল্যাণের আশা কর। অতীতে এমন বহু সফল ব্যক্তি গত হয়েছেন, যারা সুন্দরভাবে সফলভাবে বৈবাহিক জীবন কাটিয়েছেন। পরম শান্তি-প্রশান্তি নিয়ে এ জীবন উপভোগ করেছেন। তুমি তাদের সুখানুভূতি ও অভিজ্ঞতার দিকে নজর দাও।

বৈবাহিক জীবনের ব্যর্থতার তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনিও শুনবে। কিন্তু তা নিতান্তই কম। এমন স্বল্পসংখ্যক তিক্ত অভিজ্ঞতা তোমার মন-মস্তিষ্কে স্থান দিও না।

২১. প্রত্যেক তরুণ-তরুণীর উদ্দেশ্যে বলছি, 'তোমার জীবনের সফলতা ও সৌভাগ্যের ট্রেন ছুটে যায়নি; বরং তা আরও সুন্দর ও উজ্জ্বলরূপে ফিরে আসছে এবং বৈবাহিক জীবনের মাধ্যমে তা আরও উত্তম ও বরকতপূর্ণরূপে ফিরে আসছে। মহান রাব্বুল আলামীন এমনই ওয়াদা করেছেন:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ৫, ৬]

অর্থ: 'সুতরাং কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ।' (ইনশিরাহ, ৯৪: ৫, ৬)

সুতরাং নিজেদের যাবতীয় বিষয় আপন রবের যিম্মায় ন্যস্ত করুন। তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না। আল্লাহ তা‘আলার এ বাণী স্মরণ করুন:

﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ৮৭]

অর্থ: ‘আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।’
(ইউসুফ, ১২: ৮৭)

পরিশিষ্ট:

- ❖ বিশিষ্ট আইরিশ সাংবাদিক ও সাহিত্যসমালোচক জর্জ বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘বিবাহের আগ পর্যন্ত নারী এক অজানা আশঙ্কায় ভোগে। বিবাহের পর তার সব ভয়-ভীতি কেটে যায়। কিন্তু পুরুষ, বিবাহের পরই তার যত ডর-ভয় দেখা দেয়।’
- ❖ আরব্য প্রবচন:
‘আইবুড়োর জীবন হতাশ স্বামী, গোমরা মুখ ও দুর্ভাগ্য থেকে সুন্দর।’
- ❖ ‘অনেক আইবুড়োত্বের জীবন অসুখী জীবন, অসুখী দম্পতি ও হতাশাগ্রস্ত জীবনাচার থেকে উত্তম। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ফায়সালাই চূড়ান্ত। তার ফায়সালায় পরম কল্যাণ নিহিত।’ -আয়েয কারনী

অবৈধ সম্পর্ক

নারী-পুরুষের মাঝে আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র সম্পর্কের বিধান দিয়েছেন, তা হলো বৈবাহিক সম্পর্ক। এর বাইরে যত ধরনের সম্পর্ক প্রচলিত আছে, তা সবই নিষিদ্ধ ও অবৈধ সম্পর্ক। প্রথম পরিচয় থেকে শুরু করে কথাবার্তা, আন্তরিকতা, সহাবস্থান করা পর্যায়ক্রমে যিনা ও ব্যভিচারের দিকে ধাবিত হওয়া—এর প্রত্যেকটিই অবৈধ সম্পর্কের দোষে দুষ্ট। আর যে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার উদগ্র বাসনা তরুণ সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তার কবলে প্রেমিক-প্রেমিকা হিস্ট্রিয়াগ্রস্ত ও মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে।

প্রকৃত মুসলিম নর-নারী কখনো অবৈধ সম্পর্কে জড়াতে পারে না। কেননা কুরআন-হাদীসে কঠোরভাবে অবৈধ সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জঘন্য কবিরাতা গুনাহ। তবে বৈবাহিক সম্পর্ক ও বিবাহের আগে পাত্রী দেখা—এ দু'টি বিষয় শরীয়তসম্মত। এর বাইরে নারী-পুরুষের যত সম্পর্ক বিদ্যমান, তার যত উপসর্গ রয়েছে—সবই অবৈধ ও নিষিদ্ধ।

নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক সমাজে চারিত্রিক নষ্টাচার, পাপাচার ও অশ্লীলতা ছড়ায়। পিতা-পুত্রের বংশীয় সম্পর্ক, বৈবাহিক প্রথা ও পারিবারিক অবকাঠামো ধ্বংস করে। এর কারণে নারীর ইজ্জত-আবরু চরম অনিশ্চয়তার শিকার হয়। সামাজিক ও মানবিক উন্নতি-উগ্রগতি ধ্বংসের মুখে পড়ে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয় শ্রেণির মাঝে আইবুড়োত্ত্বের সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। গোটা সমাজ আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়; আসমানি আযাবের হুমকির সম্মুখীন হয়।

তাহলে এ জটিল সমস্যার সমাধান কী? এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী?

সমাপান:

১. আল্লাহকে ভয় করুন, যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি জানেন চোখের অপব্যবহার এবং আপনার মনের যত গোপন বিষয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী স্মরণ রাখুন:

﴿إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا﴾ [المجادلة: ৭]

অর্থ: 'তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি তাদের সাথে আছেন।' (মুজাদালা, ৫৮: ৭)

মন যদি কোনো অবৈধ কাজে প্ররোচিত হয়, তবে মনে রাখবেন, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন। আপনি নাফরমানিতে লিপ্ত, এমতাবস্থায় আপনার রব আপনাকে দেখছেন। সুতরাং তাকেই ভয় করুন। তাকেই লজ্জা করুন। ভয় ও লজ্জা করার জন্য তিনিই অধিক উপযুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾

[النساء: ১০৮]

অর্থ: 'তারা মানুষ থেকে তো লজ্জা করে; কিন্তু আল্লাহ থেকে লজ্জা করে না, অথচ তারা রাতের বেলা যখন আল্লাহর অপছন্দনীয় কথা বলে, তখনো তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারা যা-কিছু করছে, তা সবই আল্লাহর আয়ত্তে।' (নিসা : ১০৮)

২. সোশ্যাল মিডিয়ার উপর নজরদারি বজায় রাখতে হবে। চরিত্র বিধ্বংসী ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। পারিবারিকভাবে সন্তানদেরকে সযত্ন তত্ত্বাবধান করতে হবে। সন্তানরা একান্ত সময়গুলো কীভাবে কাটাচ্ছে, অবসরে কী ধরনের বইপুস্তক পড়ছে, ইন্টারনেটে কোন ওয়েবসাইটগুলো তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু— প্রতিটি বিষয়ই অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। লেখাপড়া ও অধ্যবসায় তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তুলতে হবে।

৩. সন্তানদেরকে প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর গড়ে তুলতে হবে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে পাশাপাশি থাকতে হবে। এর মাধ্যমে প্রধানত দুটি উপকার হবে:

এক. সন্তানরা কী ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে, মন-মস্তিষ্কে কী ধরনের চিন্তা-চেতনা লালন করছে, তাদের আবেগ-উদ্দীপনা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে, অভিভাবকগণ তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন।

দুই. সন্তানরা জীবনের পদে পদে সমস্যা ও প্রতিকূলতার মুখে সাধারণত অনভিজ্ঞ বন্ধুদের অপরিণামদর্শী সমাধানের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্কের কারণে এখন নিঃসংকোচে নিজেদের সমস্যার কথা খুলে বলতে পারবে। অভিজ্ঞ পিতা-মাতার দূরদর্শী পরামর্শের সাহায্যে জীবনের সমস্যা ও প্রতিকূলতাগুলো সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে।

৪. মিডিয়ায় যে অনৈতিক ও অসুস্থ প্রেম-ভালোবাসার সংস্কৃতি প্রচার করা হয়, তরুণ-সমাজকে অবাধ মেলামেশায় প্রলুব্ধ করা হয়, তার অন্ধ অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অন্যদের অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সুখকর অনুভূতি; নাটক, সিরিয়াল ও ফিল্মে রচিত প্রেম কাহিনি দেখে দেখে ব্যক্তিজীবনে অবিকল কল্পনা করা চরম নির্বুদ্ধিতা। নাটক, সিরিয়াল ও ফিল্ম দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সুরসুরি জাগানিয়া লেখা ও রচনা, গল্প ও কবিতা পড়া বন্ধ করতে হবে।

৫. তরুণ সমাজে চারিত্রিক বিশুদ্ধতার শুদ্ধ চর্চা ও পরিচর্যার বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহকে ভয় করে দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। নারীদের পর্দার বিধান মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাশীলতা, গাম্ভীর্যতা বজায় রাখা কর্তব্য। কোমল সুরে কথা বলা, অবৈধ দেখা-সাক্ষাৎ থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়। মোটকথা, এমন যেকোনো আচার-উচ্চারণ, যা অবৈধ সম্পর্কের উপসর্গ, অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার উপকরণ, তা হারাম ও নিষিদ্ধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَلَيْسَتُغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ﴾ [النور: ৩৩]

অর্থ: ‘যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা সংযম অবলম্বন করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন।’ (নূর, ২৪: ৩৩)

৬. ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া ও যোগাযোগ রক্ষার এপ্লিকেশন ব্যবহারে সতর্ক ও সচেতন হতে হবে। কেননা এগুলোর মাধ্যমেই যত অসুস্থ ও বিকৃত চিন্তা-চেতনার বিষ ছড়ানো হয়। অনিশ্চিত, সংশয়পূর্ণ অবৈধ সম্পর্কের বীজ বপন করা হয়।
৭. চারপাশে যত অসৎ সঙ্গ ছেড়ে জ্ঞানী, গুণী, সৎ ও ধর্মভীরু ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকতে হবে।
৮. যে নারী-পুরুষ অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায়-জড়িয়ে পড়েছে, উভয়ের সম্মতি নিয়ে তাদেরকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিবাহের মোহর ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সহজসাধ্য করে যথাসম্ভব দ্রুত বিবাহকার্য সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়। যেন অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক খুব সহজেই বৈধ বৈবাহিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়।
৯. সবসময় মনে রাখতে হবে, যিনা ও ব্যভিচার মারাত্মক কবিরাত্ম গুনাহ ও চরম অশ্লীলতা। যে পাপের শাস্তি ইহকালে ও পরকালে অনিবার্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ৩২]

অর্থ: ‘আর তোমরা যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, নিশ্চয় তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অত্যন্ত জঘন্য পথ।’ (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৩২)

১০. প্রত্যেকেই নিজেকে এ জবাবদিহিতার সম্মুখীন করবে, সে কি চায় যে, তার স্ত্রী, মেয়ে, মা-বোন, খালা-ফুপি তারা প্রেম-ভালোবাসার অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ুক? এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে ন্যায়ানুগ ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে মানুষের

ইজ্জত-আবরুতে আঘাত করে, মানুষও তার মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। সুতরাং সে যেন অন্যের ইজ্জত-আবরু রক্ষায় আল্লাহকে ভয় করে।

১১. যে লোক অবৈধ সম্পর্কে মজেছে, প্রেম-ভালোবাসায় আকর্ষণ নিমজ্জিত, যেকোনো মূল্যেই তাকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নিকটাত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের করণীয় হবে, হিতোপদেশ ও নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা দিয়ে তাকে তার কার্যকলাপের জঘন্যতা ও গুরুতরতা বোঝানো। এর কারণে তাকে সামাজিকভাবে কত প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হতে হবে, পরকালে কত ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে—এ সম্পর্কে সতর্ক করা।

১২. আত্মকেন্দ্রিক হয়ে একাকী পড়ে থাকবেন না। গুয়ে-বসে অলস কর্মহীন সময় পার করবেন না। পরিবার ও বন্ধুজনদের সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন। নতুন জায়গায় নতুন অভিজ্ঞতার মুহূর্তগুলোকে প্রফুল্লচিত্তে উপভোগ করুন। সামাজ-কল্যাণমূলক ও জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করুন।

অবসর সময় না কাটিয়ে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করুন। অবসর হলো ইবলিস-শয়তানের চারণভূমি এবং যত অনর্থকতার কেন্দ্র। তাই অবসর-অকর্মণ্য মস্তিষ্কে দানা বাঁধে যত অন্যায়-অনাচার, কুমন্ত্রণা ও কুপ্রবৃত্তি।

১৩. বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করুন। হৃদয়াত্মা যখন আল্লাহর মহব্বতে সিক্ত হবে, তাঁর সান্নিধ্যে তৃপ্ত হবে, তখন তা নগণ্য সৃষ্টির ক্ষণিকের ভালোবাসাবিমুখ হয়ে মহান সত্তার চিরন্তন প্রেমে বিলীন হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ

الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ২৮]

অর্থ: 'জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।'

(রা'দ, ১৩: ২৮)

১৪. এই দু'আগুলো বারবার পাঠ করুন। বিশেষভাবে সিজদারত হয়ে:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! হারাম উপার্জন থেকে বিরত রেখে হালাল রিযিকের মাধ্যমে সচ্ছলতা দান করুন। আপনি ব্যতীত অন্য সমস্ত সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষী করুন।'

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَحَصِّنْ فَرْجِي.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার হৃদয়াত্মা পবিত্র পরিশুদ্ধ করুন। আমার লজ্জাস্থান অশ্লীলতামুক্ত রাখুন।'

১৫. অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার মারাত্মক ব্যাধির সফল চিকিৎসা এই যে, প্রেমাস্পদের রূপমাধুর্য ও বহিরাঙ্গের চাকচিক্য কল্পনা না করে তার যাবতীয় দোষ-ত্রুটি বারবার মনে করতে হবে। ফলে ব্যক্তির মনে তার প্রেমাস্পদের প্রতি অনীহা ও ঘৃণা সৃষ্টি হবে। এ থেকেই অবৈধ সম্পর্কের অবনতি ঘটবে।
১৬. নিজের জন্য একটি দৈনন্দিন রুটিন তৈরি করুন। যেমন: পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত মুখস্থ করা। এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জেনে নেওয়া। নির্দিষ্ট পরিমাণ হাদীস মুখস্থ করা। একটি ভালো বই নির্বাচন করে প্রতিদিন কিছু অংশ পাঠ করা। পরোপকারে স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা পালন করা। যেমন: রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা। এতিম-মিসকিনের দেখভাল করা। দৈনন্দিন এ রুটিন মেনে চলার ক্ষেত্রে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে।
১৭. অবৈধ প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে তওবা করুন। অপরপক্ষের সঙ্গে সার্বিক যোগাযোগ বন্ধ করে দিন। প্রয়োজনে মোবাইল নাম্বার পরিবর্তন করে ফেলুন। তার স্মৃতি বহন করে, তার কথা মনে করিয়ে দেয়-এমন যাবতীয় বস্তু ত্যাগ করুন। নিজের প্রতি আস্থাশীল হোন। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তির আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কিছু ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে তুলনামূলক উত্তম বিনিময় দান করেন। ইনশাআল্লাহ, ইহকাল ও পরকালে আপনিও উত্তম বিনিময় লাভ করবেন।

১৮. অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সঙ্গিন মুহূর্তে সাধ্যমতো রোযা রাখুন। কুপ্রবৃত্তি দমনের ক্ষেত্রে রোযা হলো মু'মিন বান্দর মজবুত ঢাল। পরকালের কঠিন শাস্তির হতে রক্ষাকবচ। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও পরিশুদ্ধি লাভ করার সহজ উপায়। রাসূল ﷺ তরুণ সমাজকে উপদেশ প্রদান করেছেন:

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ". صحيح البخاري (৩/৭)

অর্থ: 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কেননা রোযা তার প্রবৃত্তিকে দমন করে।' (বুখারী ৭/৩)

পরিশিষ্ট:

❖ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي بِالزَّيْنَةِ، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ: "إِذْنُهُ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا". قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِأُمَّكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ". قَالَ: "أَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِابْنَاتِهِمْ". قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ". قَالَ: "أَتُحِبُّهُ"

لِعَمَّتِكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ". قَالَ: "أَفْتُحِبُّهُ لِحَالَتِكَ؟" قَالَ: لَا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ. قَالَ: "وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِحَالَاتِهِمْ". قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ" قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ. مسند

أحمد ط الرسالة (٣٦ / ٥٤٥)

অর্থ: আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক যুবক রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যিনা (ব্যভিচার) করার অনুমতি দিন।' (এমন স্পর্ধার কথা শুনে) উপস্থিত সাহাবায়ে কেলাম তার দিকে ফিরে তাকালেন। ধমকের সুরে বললেন, 'থাম! কথা বন্ধ কর!' রাসূল ﷺ বললেন, 'তাকে কাছে আসতে দাও।' যুবকটি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বসল। রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি তোমার মায়ের ক্ষেত্রে যিনা-ব্যভিচার পছন্দ করবে?' যুবকটি বলল, 'নিশ্চয়ই না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন।' রাসূল ﷺ বললেন, 'লোকেরাও তাদের মায়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ করবে না।' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি তোমার মেয়ের ক্ষেত্রে যিনা-ব্যভিচার পছন্দ করবে?' যুবকটি বলল, 'নিশ্চয়ই না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন।' রাসূল ﷺ বললেন, 'লোকেরাও তাদের মেয়ের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ করবে না।' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি তোমার চাচির ক্ষেত্রে যিনা-ব্যভিচার পছন্দ করবে?' যুবকটি বলল, 'নিশ্চয়ই না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন।' রাসূল ﷺ বললেন, 'লোকেরাও তাদের চাচিদের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ করবে না।' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি তোমার খালার ক্ষেত্রে যিনা-ব্যভিচার পছন্দ করবে?' যুবকটি বলল, 'নিশ্চয়ই না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন।'।

রাসূল ﷺ বললেন, 'লোকেরাও তাদের খালাদের ব্যাপারে এমনটি পছন্দ করবে না।' এ সময় রাসূল ﷺ তার উপর হাত রেখে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি তার গুনাহ মাফ করুন। তার হৃদয় পাক-সাফ করুন। তার লজ্জাস্থান হেফাজত করুন।' এর পর থেকে সে যুবক এসব বিষয়ে আর কখনো আগ্রহী হয়নি।
(আহমাদ: ৩৬/৫৪৫)

❖ উরওয়া ইবনে হিয়াম। ইতিহাসের পাতায় তার অমর প্রেমকাহিনী আজও বিখ্যাত।

যখন মাতা-পিতার মৃত্যু হয়, তখন সে অবুঝ শিশু। এরপর থেকে আপন চাচা তাকে লালন-পালন করেন। চাচার বাড়িতে পিঠাপিঠি চাচাতো ভাই-বোন উরওয়া ও আফরার শৈশবের দিনগুলো বেশ আনন্দেই কেটেছে। শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে কখন তারুণ্যে এসে পৌঁছেছে, তা যেমন টের পায়নি। একজন আরেকজনের প্রেমে কীভাবে আকর্ষণ মজে গেছে, মনে কখনো সে কথা ভাববার ফুরসত হয়নি। প্রকৃতিই যেন তার উদারতায় চাচাতো ভাই-বোনের অমর প্রেমের মাহা আয়োজনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে।

উরওয়া এখন টগবগে যুবক। সমাজ-সংসার ও ব্যক্তি-জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপযুক্ত। জীবনের এতগুলো দিন যার সাথে কাটিয়েছে, যাকে সাধনা করে এসেছে, তাকে সাথে নিয়েই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটানোর ইচ্ছা তার।

কোনো দ্বিধা-সংকোচ না করে চাচার কাছে তার মেয়েকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু চাচা-চাচি একজনও তাতে অসম্মতি প্রকাশ করতে না পারলেও সম্মত হলো না। কারণ, তার অসচ্ছলতা ও আর্থিক অনটন। তাদের একান্ত ইচ্ছা, আদরের দুলালীকে তারা কোনো বিরাট ধনাঢ্য যুবকের কাছে বিবাহ দিবে। যে তাকে সোনা-গয়না, সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্য-ঐশ্বর্য দিয়ে সযত্নে আগলে রাখবে।

এদিকে পুত্রতুল্য যে ভাতিজাকে এতদিন আদর সোহাগে লালন-পালন করেছে, তাকেও নিরাশ করতে পারল না। তাই শর্ত জুড়ে দিল, মোটা

অঙ্কের মোহরের শর্ত । এ যেন মোহর নয়; মোহরের বোঝা । চাচা-চাচি প্রতিশ্রুতি দিল, নির্দিষ্ট অঙ্কের মোহর যদি সে আদায় করতে পারে, তবেই সে তার মনের মানুষটিকে চিরকালের জন্য আপন করে নিতে পারবে । সেই পর্যন্ত মেয়েটিকে অন্য কোথাও বিবাহ না দিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবে ।

উরওয়া তার হবু বধূর মোহর সংগ্রহে লেগে গেল । বহু দূর পথ পারি দিয়ে সে এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে এসে পৌঁছল । এতিম শিশুকে আজ তারুণ্যদীপ্তরূপে দেখে আত্মীয়রা যারপরনাই খুশি । উরওয়ার প্রতি তাদের কত সেবা-যত্ন, কত আদর-আপ্যায়ন । তার সম্পর্কে, তার চাচা-চাচির সম্পর্কে তাদের কত কৌতূহল, কত জিজ্ঞাসা! সব শেষে এল প্রয়োজনের কথা:

‘কীভাবে চলছে তার জীবন-যাপন? এত কষ্ট করে এত দূরের পথ পারি দিয়ে কী উদ্দেশ্যে তার আগমন?’

উরওয়া নিঃসকোচে তার বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বুলে বলল । তাকে পেয়েই আত্মীয়-স্বজন যারপরনাই খুশি, তার জন্য কিছু করতে মুখিয়ে আছে । এখন তার প্রয়োজনের কথা শুনে তারা যেন এর যথার্থতা খুঁজে পেল । বিবাহের মোহরস্বরূপ আত্মীয়রা তাকে একশ উট প্রস্তুত করে দিল । বিশাল উটের পাল নিয়ে উরওয়া চাচার বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলো ।

কিন্তু যে বিপত্তির অজানা আশঙ্কা এত দিন গুমোট বেঁধে ছিল, উরওয়ার অনুপস্থিতিতে তা-ই বাস্তব হয়ে দেখা দিল । ইয়েমেনের বনু উমাইয়া গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য যুবকের সাথে আফরার বিয়ে হয়ে গেল ।

আফরা এখন সুদূর শাম দেশে স্বামীর বাড়িতে । এ বিয়েতে উরওয়ার চাচা-চাচি প্রথমে সম্মত ছিলেন না । কিন্তু পাত্র পক্ষের পীড়াপীড়ি ও তাদের ধন-দৌলতের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য দেখে “না” বলতে পারলেন না । এ ক্ষেত্রে আফরার তীব্র অসম্মতিও কোনো মূল্য পেল না । মা-বাবার সম্মতি ও আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়ির সামনে আফরা ছিল একা অসহায় ।

এ জীবনে যাকে পাওয়ার কামনা করেছিল, অধির আশ্রয়ে যার আগমনের পথ পানে চেয়েছিল, যার সাথে সুখের ঘর বাঁধার স্বপ্ন বুনেছিল, তার সমস্ত স্মৃতি বুকে ধারণ করে অচেনা-অজানা এক যুবকের হাত ধরে চলতে হলো।

এদিকে উরওয়া তার চাচাতো বোন আফরার মোহর বাবদ একশ উটের বিশাল পাল নিয়ে হাযির হলো।

চাচা ইতঃপূর্বেই এলাকাবাসীদের রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিল— উরওয়ার আগমনে তারা দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে আফরার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করবে। এমনকি আফরার নামে একটি নতুন কবর বানিয়ে রাখলো। দেখে বোঝার উপায় নেই, এ যে কৃত্রিম কবর।

যে স্বপ্নের ঘর বাঁধবে বলে উরওয়া বিশাল আয়োজনে এসেছিল, এক নিমিষেই তা ধ্বসে পড়ল। পায়ের তলা থেকে বালি ঝুর-ঝুর করে সরে গেল। মুখ খুবড়ে পড়ল একটি সাজানো স্বপ্নের সংসার।

প্রিয়তমা আফরার আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকে বেদনায় মুষড়ে পড়ল। আফরার কবরের সামনে এসে সে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল। সব কিছুই গ্রামবাসীর পূর্বপরিকল্পনামাফিক হচ্ছিল; কিন্তু সবই ছিল বানোয়াট মিথ্যা। যেটুকু সত্য, তা ছিল উরওয়ার শোক-বেদনা ও অঝোর কান্না। তার শোকের মূল্য ছিল। কান্নার যথার্থ কারণ ছিল। জনপদের এক নারীর মুখে বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেল।

উরওয়া তৎক্ষণাৎ শামের উদ্দেশে যাত্রা করল। আফরাকে একটি বারের জন্য দেখার উদ্দেশ্যে।

একদিন সে সুদূর শাম দেশে আফরার ঠিকানায় পৌঁছল। তাদের ইতিবৃত্তি শুনে আফরার স্বামী আবেগাপ্ত হলেন। উরওয়া ও আফরাকে পরস্পর দেখা করার সুযোগ করে দিলেন। প্রিয়তমার সুখের সাজানো সংসারের কথা ভেবে উরওয়া সৌজন্য সাক্ষাৎ করে দেশে ফিরে এল। কিন্তু আফরার অতীত স্মৃতি তাকে তাড়া করে ফিরল। কিছুতেই প্রিয়তমা আফরার কথা ভুলতে পারল না। মা-বাবা তুল্য চাচা-চাচির এমন অবিশ্বাস্য প্রতারণার জ্বালা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে গ্রাস করতে লাগল।

সীমাহীন মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ল।

গ্রামবাসী কত চিকিৎসক-কবিরাজের শরণাপন্ন হলো। কিছুতেই কোনো কাজ হলো না।

দিন-দিন তার শরীর-স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটতে লাগল। প্রেম-ভালোবাসার দহনে দক্ষ হয়েই একদিন সে চির বিদায় নিল।

মৃত্যুর আগে সে সারাক্ষণ কয়েকটি লাইন আওরাতো। যা ছিল প্রিয়তমা আফরার ভালোবাসা ও চাচার প্রতারণার বিষয় সংবলিত।

উরওয়ার মৃত্যুর সংবাদে সুদূর শাম দেশ থেকে আফরা ছুটে এল। একটি বারের জন্য উরওয়ার কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে।

কবরের সামনে দাঁড়িয়ে সে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ল। কান্নার ধকল সইতে না পেরে আফরারও মৃত্যু হলো। এ জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট পেছনে ফেলে প্রিয়তমের সান্নিধ্য গ্রহণ করল। উরওয়ার কবরের পাশেই আফরার সমাধি রচিত হলো।

মৃত্যুর আগ মুহূর্তগুলোতে উরওয়ার মুখে আবৃত কবিতার লাইনগুলো:

جَعَلْتُ لِعَرَافِ الْيَمَامَةِ حِكْمَةً

وَعَرَافٍ نَجْدٍ إِنَّهُمَا شَفِيَانِي

فَمَا تَرَكَا مِنْ حِيلَةٍ يَعْلَمَانِيهَا

وَلَا سَلْوَةٍ إِلَّا بِهَا سَقِيَانِي

فَقَالَا: شَفَاكَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا لَنَا

بِمَا حَمَلَتْ مِنْكَ الضُّلُوعُ يَدَانِ

فَيَا لَيْتَ كُلِّ اثْنَيْنِ بَيْنَهُمَا هَوًى

مِنْ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ يَلْتَقِيَانِ

অর্থ: 'ইয়ামামা ও নাজদের চিকিৎসকের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছি, তারা যদি আমার আরোগ্য ফিরিয়ে আনতে পারে।

তাদের অভিজ্ঞতার সমস্ত ওষুধ আমাকে সেবন করিয়েছে; সমস্ত ধরনের ঝাড়ফুক দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা বলতে বাধ্য হয়েছে:

'এখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই পরম ভরসা। যে রোগে তুমি আক্রান্ত হয়েছ, তাতে আমাদের সাধ্য নেই কিছু করার।

হায়! যদি এ পৃথিবীতে যত প্রেমিক যুগল আছে, শেষ পরিণামে যদি তাদের মধুর মিলন হতো!'

খেয়ানত ও প্রতারণা

প্রতারণা হলো, কথার বরখেলাপ করা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। যেমন: স্বামী-স্ত্রীর একজন অপরজনের সঙ্গে প্রতারণা করা, এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে ধোঁকা দেওয়া, দায়িত্ববান ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে অবহেলা করা ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে ইবনে আশুর^{১৭} বলেন:

‘ব্যক্তির নিকট কোনো বিষয় ও বস্তু যে উদ্দেশ্যে আমানত রাখা হয়, আমানত প্রদানকারীর অজ্ঞাতসারেই সে যদি কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের বিপরীত করে, তবেই তা খেয়ানত। এমন ব্যক্তিকে “খায়েন” খেয়ানতকারী ও প্রতারক বলা হয়।’

ধোঁকা ও প্রতারণা সম্পর্ক নষ্ট করে। মানুষের আস্থা-বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা-ঐকান্তিকতার মতো মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয়। এর কারণে ব্যক্তির সাথে “ধোঁকাবাজ” ও “প্রতারক”-এর মতো চরম অপমানজনক ও লাঞ্ছনাকর তকমা সেঁটে যায়।

কারো প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করে আপনি যখন তার কাছে কোনো কিছু গচ্ছিত রাখবেন, আর বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার পরিচয় পাবেন, মনে হবে হৃদয়ে একটি বিষাক্ত তীর বিদ্ধ হয়েছে। বিশ্বাসভঙ্গের অমানসিক জ্বালা-যন্ত্রণা, অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা আপনাকে সংশয়গ্রস্ত করে ফেলবে। এভাবে যখন কয়েকবার প্রতারণার শিকার হবেন, তখন চারপাশের সমাজে কোথাও এক বিন্দু আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গা খুঁজে পাবেন না।

তাহলে এ মানসিক সংকট উত্তরণের পথ কী? এর পথ বন্ধ করার উপায় কী?

১৫. মুহাম্মদ তাহের ইবনে আশুর। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিউনিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। একই সঙ্গে তিনি লেখক, সাহিত্যিক, বিচারক ও মুফতী ছিলেন। প্রতিটি শাখায় তিনি অত্যন্ত সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সমাপান:

১. সন্তানদেরকে আমানতদারিতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা, আল্লাহভীতি, কথা-কাজে, আচরণ-উচ্চারণে সততা, ন্যায়নিষ্ঠতার ওপর গড়ে তুলতে হবে। শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ধোঁকা ও প্রতারণার মতো নিকৃষ্ট দোষগুলো তাদের কাছে ঘৃণিত করে তুলতে হবে।
২. মনে রাখতে হবে, খেয়ানত ও ধোঁকা হলো মুনাফেকি আচরণ। রাসূল ﷺ বলেছেন:

”أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أَوْثِمَنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.”

অর্থ: ‘চারটি দোষ যে ব্যক্তির মধ্যে থাকবে, সে নির্ঘাত মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোনো একটি থাকবে, সে তা থেকে মুক্ত হওয়া পর্যন্ত একটি মুনাফেকি দোষে দুষ্ট থাকবে। (চারটি দোষ হলো:) আমানত রাখা হলে খেয়ানত করবে, কথা বললে মিথ্যে বলবে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে এবং ঝগড়ায় লিপ্ত হলে পাপাচার করে বসবে।’ (বুখারী: ১/১৬)

৩. প্রত্যেককেই নিজ-নিজ সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব ও আমানত গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে ব্যক্তি আমানতের দায়িত্ব অনায়াসে পালন করতে পারবে। আমানত রক্ষার ক্ষেত্রেও তাকে কপটতার আশ্রয় নিতে হবে না। কোনো জটিল পথ মাড়াতে হবে না।
৪. সমাজে এমন বহু লোক আছে, যারা ধোঁকা, প্রতারণাকে অনায়াস মনে করে। মানুষের বিশ্বাস রক্ষা করা, আমানতদারিতা বজায় রাখার মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে কঠিন ও জটিল করে দেখে। এমন অসৎ লোকদের অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। সততা ও বিশ্বস্ততা, প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার রক্ষায় যারা প্রতিশ্রুতিশীল, এমন চরিত্রবান ও নীতিবান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. বর্তমান প্রজন্মের মন-মানসিকতায় বিশ্বস্ততা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার মূল্যবোধ বদ্ধমূল করে দিতে হবে। তাদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁকা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মতো চারিত্রিক দোষগুলোকে জঘন্য ও ঘৃণিতরূপে তুলে ধরতে হবে। এর অশুভ পরিণতি ও এর কারণে সামাজিক অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন করা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রধান ভূমিকা পালন করবে।
৬. খেয়ানতকারী ও ধোঁকাবাজ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত-বিষয়টি জোর তাকিদ দিয়ে প্রচার করতে হবে এবং বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: ১০৭]

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ভঙ্গকারী পাপিষ্ঠকে পছন্দ করেন না।' (নিসা, ৪: ১০৭)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম তাবারী (রহ.) 'জামেউল বায়ান ফি তা'উয়িলিল কুরআন' গ্রন্থে বলেন:

'যে লোক মানুষের অর্থ-সম্পদে খেয়ানত করে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে পছন্দ করেন না।'

৭. প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই ধোঁকা ও প্রতারণার প্রতি ঘৃণাবোধ থাকতে হবে। সর্বাত্মক চেষ্টা থাকবে, কোনোভাবেই যেন এ জঘন্য পাপে জড়িয়ে না পড়ে। পরহেযগারি ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে হবে। সবার আগে আপন রবের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে মা-বাবা, ভাইবোন, স্ত্রী, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও অংশীদার প্রত্যেকের সঙ্গে অঙ্গীকার রক্ষা করে চলতে হবে।
৮. মনে রাখতে হবে, "যেমন কর্ম, তেমন ফল।" কেউ যদি কারো সাথে ধোঁকা ও প্রতারণা করে, জীবনে কোনো পর্যায়ে সেও তার চেয়ে ভয়াবহ প্রতারণার শিকার হবে। ইবনুস সা'দী 'তাইসীরুল কারীমির রহমান' কিতাবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন :

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ [يوسف : ٥٢]

অর্থ: 'আর আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত লক্ষ্যে পৌছতে দেন না।' (ইউসুফ, ১২: ৫২)

ইবনুস সাদীর ব্যাখ্যা: 'যে কোনো প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীর অন্যায়ের পরিণতি তাকেও ভোগ করতে হয়। এর থেকে তার কোনো নিস্তার নাই।'

৯. সবসময় মনে রাখতে হবে, আপনার ওপর আল্লাহ তা'আলার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান রয়েছে। আপনি যেখানেই থাকুন-না-কেন, যা-ই করুন-না-কেন, তিনি আপনাকে দেখছেন। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, নির্জনে-বাহিরে, রাত-দিনে তিনি আমাদের সাথেই আছেন। আমাদের সমস্ত কথা শুনছেন, কৃতকর্ম দেখছেন। আমাদের কোনো আচার-আচরণ তাঁর থেকে গোপন নয়। এমনকি মনের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাও নয়। পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾

[النساء : ১০৮]

অর্থ: 'তারা মানুষ থেকে তো লজ্জা করে; কিন্তু আল্লাহ থেকে লজ্জা করে না, অথচ তারা রাতের বেলা যখন আল্লাহর অপছন্দনীয় কথা বলে, তখনো তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। তারা যা-কিছু করছে তা সবই আল্লাহর আয়ত্তে।' (নিসা, ৪: ১০৮)

১০. মানুষের নফস (মন) কুমন্ত্রণাপ্রবণ। নফসের বিরুদ্ধে বিবেকের তাড়নায় সক্রিয় হোন। কাল কেয়ামতে আপনাকেও আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। নিজ কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিতে হবে। অতি সামান্য থেকে গুরুতর প্রতিটি বিষয় আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে-এমন সজাগ মানসিকতা যদি আপনার মধ্যে জাগরুক থাকে, তাহলেই সততা, বিশ্বস্ততা ও অঙ্গীকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিশীল হয়ে বেঁচে থাকতে পারবেন।

১১. সুলাইমান (আ.)-এর রাজ্যে ছদছদ পাখি ছিল একটি নগণ্য প্রাণী। বিশ্বস্ততা ও আমানত রক্ষায় সে কী অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে! যথাযথ নিষ্ঠা ও দায়িত্বের সাথে সুলাইমান (আ.)-এর পত্র যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

আপনি তো মানুষ। আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ জীব। আপনার তুলনায় ছদছদ পাখি নিতান্তই নগণ্য। আপনি কেন পারবেন না সততা, বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে? প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পালন করতে?

১২. অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ ও সক্রিয় হতে হবে। মানুষ তার দুর্বল স্বভাব-প্রকৃতির কারণেই ভুল, অবহেলা ও শিথিলতাপ্রবণ। তাই রাসূল ﷺ প্রত্যেক দায়িত্ববানকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জবাবদিহিতা এবং আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের ভুল-বিচ্যুতিগুলো শুধরে নিতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

১৩. মানুষ মাত্রই সৃষ্টিগতভাবে ও স্বভাববৈশিষ্ট্যে দুর্বল প্রকৃতির। পদে পদে ভুল করা, অবহেলা করা তার স্বভাবজাত-বিষয়টি আপনাকে মনে রাখতে হবে এবং এর সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। সুতরাং ইহকালীন জীবনে আপনি একমাত্র ঐ সত্তার ওপরই ভরসা করতে পারেন, যার কোনো দুর্বলতা নেই, কোনো অসুস্থতা নেই। যিনি যুলুম করেন না এবং তার ওপর কেউ যুলুম করতে পারে না। তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি অবিনশ্বর। জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা। তিনি মহান আল্লাহ তা'আলা।

১৪. নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন কারো কাছ থেকে যদি ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হন, তাহলে মনঃকষ্টে ভেঙ্গে পড়বেন না। রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়বেন না। মনে রাখবেন, এ জীবন হলো বিপদসংকুল এক পরীক্ষাক্ষেত্র। স্বয়ং নবীগণই তাঁদের আপনজনদের থেকে অবিশ্বাস ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছেন।

নূত (আ.) ও নূহ (আ.)-এর স্ত্রী তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। নূহ (আ.)-এর স্বীয় পুত্র তাঁর ঈমানের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে। এ ধরনের আরও বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

১৫. ধোঁকা ও প্রতারণা পরবর্তী সময়ে প্রতারকের প্রতারণা মেনে নিয়েই তার সম্মুখীন হোন। তার অজান্তেই প্রকৃত অবস্থার তদন্ত করতে থাকুন, যেন ধারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে তার ওপর যুলুম না করে বসেন।

প্রতারণার শিকার হয়ে দুঃখ-বেদনার কথা চেপে না রেখে অকপটে প্রকাশ করতে পারেন। তবে ধোঁকা ও বিশ্বাসভঙ্গ করার বিষয়টি একেবারেই চেপে যান। একান্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত স্বল্প পরিসরে তা প্রকাশ করতে পারেন। কেননা প্রতারণার কথা প্রকাশ করার কারণে নতুন কোনো বিপদের সম্মুখীন হওয়ার এবং আরও কঠিন ভোগান্তির শিকার হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

১৬. জীবনের পতিটি অঙ্গনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি স্মরণ রাখুন:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ، وَلَا تَخْنُ مِنْ خَانَكَ.

অর্থ: যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত রক্ষা কর। যে তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে, তাকে তুমি ধোঁকা দিয়ো না।

(তিরমিজী: ২/৫৫৫)

কারো দ্বারা প্রতারণার শিকার হলে তার প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হবেন না। আল্লাহকে ভয় করে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। বিশ্বাস করুন, আল্লাহর নিকট আপনার জন্য যে প্রতিদান বরাদ্দ আছে, তা সর্বোত্তম ও স্থায়ী। তা ছাড়া কুকুর আপনাকে কামড়ে দিয়েছে, বিপরীতে আপনিও কুকুরকে ধরে সজোরে কামড়ে দিলেন—এটা তো সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় হতে পারে না।

১৭. যবান সংযত রাখুন। কাছের যে কাউকে বিশ্বাস করে লাগামহীনভাবে নিজের সমস্ত গোপন বিষয় ফাঁস করে দেওয়া ঠিক নয়। অপ্রকাশিত ও গোপন বিষয় হলো মানবজীবনের দুর্বল অংশ। জীবন পরিবর্তনশীল। ক্ষণে ক্ষণে তার রং বদলায়। কে কখন আপনার দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ধোঁকা দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হবে, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তাই পবিত্র কুরআনের আদেশ মেনে চলুন এবং সবসময় সতর্ক থাকুন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [سورة النساء: ৭১]

অর্থ: 'হে মু'মিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর।' (নিসা: ৭১)

১৮. না জেনে, না বুঝে যে কাউকে বিশ্বাস করে বসবেন না, বন্ধুরূপে গ্রহণ করবেন না এবং আর্থিক ক্ষেত্রে অংশীদার বানিয়ে নিবেন না। বিবাহ ক্ষেত্রে পাত্র নির্বাচনেও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার, বিচার-বুদ্ধি, সামাজিক সুনাম-সুখ্যাতি যাচাই করে নেওয়া আবশ্যিক। যেন পরে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার না হতে হয়।

১৯. আপনি যদি প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন, তাহলে আপনার প্রতি আমার উপদেশ হলো, শান্ত-স্থিরচিত্ত থাকার চেষ্টা করুন। রাগ ও ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে এমন কিছু করে বসবেন না, যাতে পরে পস্তাতে হয়। রাগ-ক্ষোভ, দুঃখ বেদনার মতো মানসিক প্রতিকূলতার মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়া, চারপাশের পরিচিত সমাজ ছেড়ে নীরব-নিভৃতে একাকীত্ব বরণ করা থেকে বিরত থাকুন।

আপনি নিশ্চিত থাকুন, ধোঁকাবাজ, প্রতারক সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত, আপনি নন। সুতরাং চিন্তা-ভাবনা থেকে ইতর শ্রেণির কথা ঝেড়ে ফেলুন। যা ঘটেছে, তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান। জীবনের ইতিবাচক দিক নির্বাচন করে সে পথে অগ্রসর হোন। নিতান্ত নগণ্য এক প্রতারকের ইতরতার কারণে আপনার বর্তমানের স্বচ্ছতা কর্দমাক্ত করবেন না, ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতা মলিন করবেন না।

পরিশিষ্ট:

❖ জাহেলী যুগের বিশিষ্ট কবি ও পরবর্তী যুগে রাসূল ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবী মাআন বিন আউস (রা.) বলেছেন:

فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رَمَانِي

فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةٌ هَجَانِي

أَعْلَمُهُ الرَّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ

وَكَمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الْقَوَافِي

অর্থ: 'প্রতিদিন কী নিবিড় তত্ত্বাবধানে তাকে তীরন্দাজি শিখাই। কিন্তু যখনই তার বাহু শক্ত হলো, তীরন্দাজি পাকাপোক্ত হলো, সবার আগে আমার দিকেই তীর তাক করে বসল। কবিতা রচনার শিল্প তাকে কতোভাবে শেখালাম। কিন্তু যখনই কবিতার প্রথম শ্লোকটি রচনা করলো, আমাকে ব্যঙ্গ ও উপহাস করে ছাড়লো।'

❖ জাতিসংঘের প্রস্তাবক ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি. রোজভেল্ট (১৮৮২-১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

'কেউ যদি আপনাকে একবার ধোঁকা দেয়, তাহলে এটা তার পাপ-অন্যায়। কিন্তু যদি সুযোগ পেয়ে দ্বিতীয়বার ধোঁকা দেয়, তাহলে এটার দায় আপনার।'

❖ জনৈক কবির কবিতা:

يَحْزُونُكَ ذُو الْقُرْبَىٰ مِرَارًا، وَرُبَّمَا
وَفِي لَكَ عِنْدَ الْعَهْدِ مَنْ لَا تُنَاسِبُهُ
وَلَا خَيْرٌ فِي قُرْبَىٰ لِغَيْرِكَ نَفْعُهَا
وَلَا فِي صَدِيقٍ لَا تَزَالُ تُعَايِبُهُ
وَحَسْبُ الْفَتَىٰ مِنْ نُصْحِهِ وَوَفَائِهِ
تَمَنِّيهِ أَنْ يُؤْذَىٰ وَيَسْلَمَ صَاحِبُهُ

অর্থ: 'নিকটজন আপনাকে বারবার ধোঁকা দেয়, অথচ আপনি যাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার যোগ্য মনে করেন না, সে-ও কদাচিত আস্থা ও বিশ্বাসের পরিচয় দেয়। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে। এমন আত্মীয়ের কি-ই বা মূল্য আছে, যে আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না। এমন বন্ধুরই বা কী প্রয়োজন, যার কাজে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে ভরসনা করতে থাকেন। ব্যক্তির পরার্থপরতা ও দায়িত্ববোধের পরিচায়ক হিসেবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, নিজে কষ্টের শিকার হয়েও সে বন্ধুর নিরাপত্তা কামনা করে।'

❖ কবি সুলতান সাঈদ আল বুসাইদী বলেন:

يَا مَنْ هَوَاهُ أَعَزَّهُ وَأَذَلَّنِي
 كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى وَصَالِكَ دُلَّنِي
 أَنْتَ الَّذِي حَلَفْتَنِي وَحَلَفْتَ لِي
 وَحَلَفْتَ أَنْكَ لَا تَخُونُ فَخُنْتَنِي
 وَحَلَفْتَ أَنْكَ لَا تَمِيلُ مَعَ الْهَوَى
 أَيْنَ الْيَمِينُ وَأَيْنَ مَا عَاهَدْتَنِي
 لِأَقْعَدَنَّ عَلَى الطَّرِيقِ وَأَشْتَكِي
 وَأَقُولُ مَظْلُومٌ وَأَنْتَ ظَلَمْتَنِي
 وَلَا دُعُونَ عَلَىكَ فِي غَسَقِ الدُّجَى
 يُبْلِيكَ رَبِّي مِثْلَمَا أَبْلَيْتَنِي

অর্থ: ঐ ব্যক্তি কোথায়, যার চাহিদা-বাসনা আমাকে অপমান করে হলেও তার মান-মর্যাদা সমুন্নত করেছে। বলে দাও! কীভাবে আমি তোমার কাছে পৌঁছতে পারি?

তুমিই তো আমাকে শপথ করিয়েছিলে, নিজেও শপথ করেছিলে যে, কখনো প্রতারণা করবে না; কিন্তু করলে তো প্রতারণা।

অঙ্গীকার করেছিলে, কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায় ছুটবে না। আজ কোথায় তোমার সে অঙ্গীকার, সে প্রতিশ্রুতি!?

আমি তো পথের ধারে বসে যাব। যত অভিযোগ-অনুযোগ বলে যাব, 'আমি নিরীহ মজলুম, আর তুমি পাষাণ্ড যালেম। আমি নিরীহ নিঃগৃহীত, আর তুমি কঠোর উৎপীড়ক।

রাতের শেষ প্রহরের পরম মুহূর্তে তোমার নামে নালিশ করব, 'তুমি যেমন আমাকে কপর্দকহীন রিক্তহস্ত করে ছেড়েছ, আমার রবও তোমাকে তোমার কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করাবেন।

নাস্তিকতা

নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতা একটি প্রাচীন সমস্যা। নাস্তিকতা হলো মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। একজন নাস্তিক বিশ্বাস করে, এ বিশাল পৃথিবীর কোনো স্রষ্টা নেই, তা এমনি-এমনি সৃষ্টি হয়েছে, কিংবা তা প্রকৃতির সৃষ্টি।

নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার নেপথ্য কারণ হলো অজ্ঞতা ও ভ্রষ্ট জ্ঞানচর্চা। আবার কখনো কখনো একধরনের মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও মানুষ নাস্তিকতার পথে ধাবিত হয়। তখন ব্যক্তির মনে এমন এমন দ্বিধা-সংশয় দেখা দেয়, যা থেকে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। কেননা এ ধরনের রোগীরা কখনো এমন কোনো বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হয় না, যিনি তার দ্বিধা-সংশয়ের যথার্থ উত্তর দিতে পারেন এবং এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারেন।

নাস্তিকতার আরেকটি কারণ হলো, নাস্তিকতার দোষে দুষ্ট কোনো বন্ধুর সাথে উঠাবসা ও চলাফেরা করা। এই সঙ্গদোষ ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে ধর্মহীনতার পথে ধাবিত করে।

তরুণ ও যুবসমাজের মধ্যে নাস্তিকতার প্রবণতা প্রবল। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব ও শূন্যতা হলো এর মূল কারণ। যেকোনো নতুনত্ব তাদের মাঝে দ্রুত সংক্রমিত হয়। আবার কখনো কখনো অর্থ-সম্পদের লিঙ্গা, যশ-খ্যাতি, সম্মান ও মর্যাদার মোহে পড়ে তারা নাস্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। নিজের ব্যক্তিত্ব ও ধর্মীয় স্বকীয়তা বিকিয়ে দিয়ে পরাশ্রিত হয়ে পড়ে।

সমাজে দিন-দিন নাস্তিকতা সংক্রমক ব্যাধি হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান কী? এ থেকে উত্তরণের পথ কী?

সমাধান:

১. নাস্তিক ব্যক্তিকে আলোচনার মাধ্যমে বোঝাতে হবে। তার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক ও কুরআন হাদীসের দলিলের ভিত্তিতে মৌলিক আলোচনা করতে হবে। কেননা জ্ঞানভিত্তিক মৌলিক আলোচনাই হলো সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ [سورة يونس: ১৬৮]

অর্থ: 'আপনি বলুন, আছে কি তোমাদের কাছে কোনো দলিল? তাহলে পেশ করুন আমার সামনে।' (আনআম, ৬: ১৪৮)

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ করেন-

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [سورة البقرة: ১১১]

অর্থ: 'তোমরা যদি আসলেই সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে প্রমাণ নিয়ে আস দেখি।' (বাকারা, ২: ১১১)

২. আমাদের চারপাশে উন্মুক্ত পৃথিবী, আমাদের হাতে পবিত্র কুরআন- এ দু'টি বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা আবশ্যিক। এ সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করা কর্তব্য। এ দু'টি বিষয় মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদের প্রমাণ বহন করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [سورة يونس: ১০১]

অর্থ: 'আপনি বলুন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার প্রতি লক্ষ্য কর।' (ইউনূস, ১০: ১০১)

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ *

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ﴾ [سورة الغاشية: ১৭ - ১৮ - ১৯]

অর্থ: 'তবে কি তারা লক্ষ্য করে না উটের প্রতি, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। আকাশের প্রতি, কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে।

পাহাড়সমূহের প্রতি, কীভাবে তা (ভূমিতে) প্রথিত করা হয়েছে।’
(গাশিয়া, ৮৮: ১৭, ১৮, ১৯)

৩. যে কোনো ধর্মীয় বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হলে তৎক্ষণাৎ এমন ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হবে, যিনি অগাধ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী, আমল-আখলাকে কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে:

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل, ৬৩]

অর্থ : তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা নাহল, ১৬: ৪৩)

জ্ঞানীদের কাছে জানতে চাওয়ার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [سورة النساء: ৮৩]

অর্থ: তারা যদি তা রাসূল বা যারা কর্তৃত্বের অধিকারী, তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তথ্য অনুসন্ধানী, তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত। (নিসা, ৪: ৮৩)

৪. কৌতূহল, চিন্তা-গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে নবীদের ঘটনা পাঠ করুন। আল্লাহ তা‘আলার কুদরতের বিস্ময় সম্পর্কে ভাবুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة هود: ১২০]

অর্থ: ‘(হে নবী!) আমি আপনাকে বিগত নবীগণের এমনসব ঘটনা শোনাচ্ছি, যার মাধ্যমে আমি আপনার অন্তরে শক্তি যোগাই। আর এসব ঘটনার ভেতর দিয়ে আপনার কাছে যে বাণী এসেছে, তা স্বয়ং সত্যও এবং উপদেশ ও স্মারক ঐ ব্যক্তিদের জন্য, যারা ঈমান গ্রহণ করেছে।’ (হুদ, ১১: ১২০)

৫. রাসূল ﷺ-এর মোজেজা^{১৮}, এবং তার জ্ঞানগরিমার মোজেজা সম্পর্কে জানুন এবং নিরপেক্ষভাবে আল্লাহ তা‘আলার কুদরতের নিদর্শন অবলোকন করুন। আব্বাসী খেলাফতকালের বিখ্যাত কবি আবুল আতাহিয়া (১৩০-২১১ হি.) বলেছেন:

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَذُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ
فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَٰهَ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَا حِدٌ

অর্থ: ‘প্রতিটি বস্তুতেই তাঁর নিদর্শন বিরাজমান। যা প্রমাণ করে যে, তিনি এক আল্লাহ মহান। তারপরও কী আশ্চর্য! মানুষ কীভাবে তাঁর নাফরমানি করে! অস্বীকারকারী কীভাবে তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে!’

৬. বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ঈমান, আকীদা ও ধর্মীয় মৌলিক বিষয়ের সঠিক শিক্ষার প্রচার করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বিষয়সংবলিত প্রচুর সভাসেমিনারের আয়োজন করতে হবে। কেননা আল্লাহভিত্তিকতা ও ধর্মপরায়ণতাই হলো মানুষের হৃদয়ে ঈমানের মূল চালিকাশক্তি। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [سورة آل عمران: ৭৯]

অর্থ: বরং সে বলবে, ‘তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে।’ (আলে ইমরান, ৩: ৭৯)

৭. সমাজের আনাচে-কানাচে আজ নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার ডাল-পালা বিস্তৃত। তাই বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে গড়ে তুলতে হবে। দ্বীনের প্রতিটি বিষয় দলিল-প্রমাণ ও আলোচনা-পর্যালোচনা ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিতে হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ،

أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» صحيح البخاري (৭০/২)

অর্থ: 'প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিত্রাতের (তাওহীদের) উপর। অতঃপর তার মা-বাবা তাকে ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারীরূপে গড়ে তোলে।' (বুখারী: ২/৯৫)

৮. যখনই মনে কোনো সন্দেহ-সংশয় উঁকি দিবে, নামায ও দু'আর মাধ্যমে ঈমান ও বিশ্বাসের পথে ফিরে আসা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, নির্দেশ করতেন:

«يَا بِلَالُ، أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ» مسند أحمد مخرجا (১৭৮/৩৮)

অর্থ: 'হে বেলাল! নামাযের মাধ্যমে আমাকে স্বস্তি দাও।' (মুসনাদে আহমাদ: ৩৮/১৭৮)

সামান্য আশঙ্কাতেই রাসূল ﷺ নামাযে মশগুল হতেন। সে তুলনায় ঈমান ও বিশ্বাস তো সবকিছুর উর্ধ্ব, সবকিছুর অগ্রে। সুতরাং ঈমানের ক্ষেত্রে সংশয় দেখা দিলে নামাযে মশগুল হওয়াই তো প্রথম করণীয়।

৯. যৌবনে যেমন দেহ-মন সতেজ ও প্রফুল্ল থাকে, তেমনি ঈমান ও বিশ্বাসের জায়গাটাও সুদৃঢ় হতে হবে, সুরক্ষিত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের বিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিতে হবে। মনীষী যথার্থ বলেছেন:

'দ্বিধা-সংশয়ের মুহূর্তে নিজের মনের ওপর মাত্রারিক্ত আস্থাশীল হয়ে পড়ো না। কেননা সন্দেহ-সংশয় দুর্বল প্রাণকে সহজেই কাবু করে ফেলে।'

১০. নাস্তিকদের সন্দেহ-সংশয়মিশ্রিত বক্তব্য খণ্ডন করে ঈমান ও বিশ্বাসের যথার্থতা তুলে ধরার জন্য আলোচনাসভা ও সেমিনার আয়োজন করা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। মহাকাশ ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনের অলৌকিকতা, তাঁর অলৌকিক সৃজনশীলতার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা এবং মহাবিশ্বে আল্লাহ তা'আলার শক্তিমত্তা ও মহত্ত্ব প্রমাণ করে দেখানো আবশ্যিক।

১১. ধর্মীয় বোধ ও বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয়ের শিকার হলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে একাত্তিবে বেশি বেশি ইস্তেকগফার করতে হবে। মহান রবের সামনে সিজদাবনত হয়ে কায়মনোবাক্যে এই দু'আ করতে হবে:

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبَّ اَنْ
يَحْضُرُوْنِ-

অর্থ: 'হে রব! আপনার দরবারে পানাহ চাই শয়তানের প্ররোচনা থেকে। পানাহ চাই শয়তানের উপস্থিতি থেকে।'

১২. নাস্তিক ও সন্দেহবাদীদের সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে। মু'মিন বান্দার জন্য এটাই কুরআনী দিকনির্দেশনা:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْإِتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾. (سورة الأنعام : ৬৮)

অর্থ: 'আপনি যখন দেখেন, তারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন আপনি তাদের থেকে সরে পড়েন, যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে ব্যস্ত হয়। আর শয়তান যদি আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে মনে হওয়ার পর যালিম লোকদের সঙ্গে বসবেন না।' (আনআম : ৬৮)

১৩. যে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া ও ওয়েবসাইটগুলো ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের বীজ বপন করে, যে সমস্ত বই পাঠকদের মনে সুকৌশলে নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার বিষ ছড়ায়, তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ হলো একটি অন্যতম ঈমানী সুরক্ষা। ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন: 'সন্দেহ-সংশয়ের সামনে তোমার মনটাকে স্পঞ্জ করে রেখো না। তাহলে তা চারপাশের সমস্ত সন্দেহ-সংশয় তার অন্তর্ভুক্তসহ গুষে নিবে। তোমার হৃদয়টাকে মজবুত স্বচ্ছ কাঁচের মতো গড়ে তোলো। তার পিচ্ছিলতায় দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সংশয় কখনোই স্থির হতে পারবে না। কিন্তু কাঁচ তার স্বচ্ছতায় আবর্জনাগুলোকে ঠিকই ধরতে পারবে এবং মসৃণতার বলে অনায়াসে এড়িয়ে যাবে।'

১৪. নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে রচিত বই-পুস্তক পড়তে হবে। এ সম্পর্কে অনেক বই রচিত হয়েছে। কয়েকটি নাম বলে দিচ্ছি:

الطب محراب الإيمان، الله يتجلى في عصر العلم، أفي الله شك؟، العالم ليس عقلا، صراع مع الملاحدة حتى العظم.

১৫. নাস্তিকের কোনো ধর্ম নেই, সুদৃঢ় কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই। তার অবস্থা হলো প্রাণীর মতো, যা যেখানে-সেখানে চড়ে বেড়ায়। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে অপরাধ ও কুপ্রবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে। তার কাছে বিবেক-বোধের কোনো মূল্য নেই। চিন্তা-চেতনার কোনো দাম নেই।

ধর্মহীনের ব্যক্তির এমন কোনো সঠিক নীতিমালা নেই, যা তাকে নীতি-নৈতিকতার বার্তা দিবে, সুষ্ঠু-স্বাভাবিক জীবনাচারের সুসংহত পয়গাম দিবে এবং অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত রাখবে। তার একমাত্র পুঁজি হলো, মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত এমন কিছু নীতিমালা, অন্য ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশি মতো যুক্তি দাঁড় করিয়ে অনায়াসেই সে নীতিমালা খণ্ডাতে পারে, তা থেকে সরে আসার যথার্থ কারণ দর্শাতে পারে।

১৬. সন্দেহ-সংশয়ের সময় কুরআনের এ আয়াতটি বারবার পাঠ করুন:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾. (سورة آل عمران : ৮)

অর্থ: ‘হে আমাদের রব! আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের রহমত দান করুন। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা।’ (আলে ইমরান, ৩: ৮)

সিজদাবনত হয়ে রাসূল ﷺ এ দু’আটি পড়তেন:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ.

অর্থ: ‘হে অন্তরের নিয়ন্ত্রণকর্তা, তোমার দ্বীনের ওপর আমার অন্তরকে অবিচল রাখো!’

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করে আপনিও এ দু’আটি বারবার পাঠ করুন।

১৭. সন্তানদের সঙ্গে গাভীর্যতা বজায় রেখে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলা কর্তব্য। তাদের কাছাকাছি থেকে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনে কী ধরনের চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে, তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। ঈমান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ-সংশয় আঁচ করতে পারলে সঠিক বিষয়ের দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সর্বোপরি দু'আ করতে হবে, তারা যেন মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের পথে অবিচল থাকে।
১৮. ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার পথ থেকে সতর্ক থেকে লোকদেরকে ঈমান ও বিশ্বাসের বন্ধন অটুট রাখতে হবে। কেননা নাস্তিকতা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনে ফাটল সৃষ্টি করে, ক্রমান্বয়ে তা ছিন্ন হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। গোটা সমাজে এক ভয়ংকর বন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যেখানে সবল দুর্বলকে গ্রাস করার প্রবণতায় মেতে উঠে। শক্তি ও দাপট দেখিয়ে স্বীয় মতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদগ্র মানসিকতায় মদমত্ত হয়ে পড়ে। কেননা স্রষ্টা, পরকাল ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ইত্যাদির কোনোটিতেই তারা বিশ্বাসী নয়।
১৯. মনে রাখতে হবে, নাস্তিকতা ও ধর্মীয় অবিশ্বাস জীবনে দুশ্চিন্তা-বিষণ্ণতা, মানসিক অস্থিরতা ডেকে আনে। ব্যক্তির মনে অহংকার, লোভ-লালসা, অপরাধ-প্রবণতা সৃষ্টি করে। কারণ, নাস্তিক বিশ্বাস করে না, এ বিশ্বজগতের কোনো স্রষ্টা আছেন, কিংবা আছেন কোনো মহাপ্রজ্ঞাবান তত্ত্বাবধায়ক, যার অধীনে যাবতীয় কিছু পরিচালিত হচ্ছে, যিনি পরকালে ন্যায়-অন্যায়ের ফায়সালা করবেন এবং প্রতিদান দান করবেন কিংবা শাস্তি দিবেন। সুতরাং একজন নাস্তিক-চোখ থাকতেও কানা। কান থাকতেও কালা। দিল থাকতেও মূর্দা।
২০. মনের সমস্ত অহংকার-দাস্তিকতা ঝেড়ে ফেলে বিনয়াবনত হয়ে সত্য গ্রহণ করতে হবে। যে কেউ নাস্তিকতার পথে ধাবিত হয়, তার মতাদর্শের বাইরে অন্যদেরকে তুচ্ছ-নগণ্য ভাবতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ. (صحيح مسلم ১/৭৩)

অর্থ: 'প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।' (মুসলিম : ১/৯৩)

২১. ধর্মীয় অজ্ঞতা দূর করার লক্ষ্যে সমাজে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপ্লব ঘটাতে হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বীনের দায়ীগণ, আলেম সমাজ ও চিন্তাবিদগণকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। তাঁরা জাতির সামনে ঈমান ও আকীদার মৌলিক বিষয়গুলো সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরবেন। এর অকাট্যতা ও অব্যর্থতা প্রমাণ করে দেখাবেন। ইসলাম ও ইবাদতের মূল শিক্ষা, আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝাবেন।

ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে আলেম সমাজের এ আলোচনাগুলো আধুনিক প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্যে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

২২. যেকোনো ধরনের বাড়াবাড়ি, প্রান্তিকতা ও সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ সমস্ত কারণে ব্যক্তি ন্যায়ানুগতা ও নীতি-নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হয় এবং স্বভাবধর্ম ইসলামের সরল পথ ছেড়ে নাস্তিকতার মতো স্বভাববিরুদ্ধ প্রান্তিকতায় ফেঁসে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا صَحِيحٌ مُسْلِمٌ (২০০০/৬)

অর্থ: ‘অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে।’ তিনি এ কথাটি তিনবার বলেছেন। (মুসলিম: ৪/২০৫৫)

২৩. যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে পরম সান্নিধ্য দান করবেন। যে আল্লাহ বিধি-বিধান অটুট রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা তার পরম রক্ষাকর্তা হয়ে যাবেন। সুতরাং ফরয ইবাদতগুলোতে যত্নবান হোন এবং নফল ইবাদতে সচেষ্টি হোন। দু‘আকে আপনার রক্ষাকবচ বানিয়ে নিন। প্রতিদানে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সুরক্ষা ও মুক্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। রাসূল ﷺ বলেছেন:

أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ

فَأَسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. سنن الترمذي ت

শাকর (৬৬৭/৬)

অর্থ: 'আপনি আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান সংরক্ষণ করুন, আল্লাহ আপনার 'হেফাজতকারী' (রক্ষাকর্তা) হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলুন। সর্বদা তাঁকে পাশে পাবেন। যদি প্রার্থনা করেন, আল্লাহ তা'আলার কাছেই প্রার্থনা করুন। যদি সাহায্য চান, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সাহায্য চান।' (তিরমিজী: ৪/৬৬৭)

২৪. মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা ও ধর্মীয় বিষয়ে যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে, ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে অন্যায় আচরণ-উচ্চারণ করবে, তার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি আরোপ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সত্তা। বিশ্বজগতে তিনিই একমাত্র সর্বোচ্চ সম্মানের হকদার। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত আসমানি ধর্ম ও সম্মান ও মর্যাদার হকদার। অন্যায়ভাবে প্রাণী-হত্যার কারণে, মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কারণে বিচার ও শাস্তি হওয়া উচিত। তাহলে বিশ্বজগৎ ও মানবজাতির স্রষ্টা মহান আল্লাহ, তাঁর প্রেরিত শ্রেষ্ঠ মানব রাসূল ﷺ ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে বিরোধিতা করা হলে তার শাস্তি কতটা কঠোর হওয়া উচিত?

মানবজীবনে সবচেয়ে বড় ও জঘন্য পাপ হলো নিজ স্রষ্টাকে অস্বীকার করা, তাঁর সাথে শরিক করা এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত জীবন-বিধান নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও উপহাস করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ (سورة التوبة : ٦٥)

অর্থ: 'আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে?' (তাওবা, ৯: ৬৫)

পরিশিষ্ট:

- ❖ মিশরীয় কবি, ঈমানী জাগরণের কবি ইবরাহীম বাদাওয়ী (১৯০৩-১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

لِلَّهِ فِي الْأَفَاقِ آيَاتٌ لَّعَلَّ
 أَقْلَهَا هُوَ مَا إِلَيْهِ هَذَاكَ
 وَلَعَلَّ مَا فِي النَّفْسِ مِنْ آيَاتِهِ
 عَجَبٌ عَجَابٌ لَوْ تَرَى عَيْنَاكَ
 وَالْكَوْنُ مَشْحُونٌ بِأَسْرَارٍ إِذَا
 حَاوَلْتَ تَفْسِيرًا لَهَا أَغْيَاكَ
 قُلْ لِلْجَنِينِ يَعْيشُ مَغْرُولا بِلَا
 رَاعٍ وَمَرْعَى، مَا الَّذِي يَرْعَاكَ؟
 وَاسْأَلْ بُطُونَ النَّحْلِ كَيْفَ تَقَاطَرَتْ
 شَهْدًا وَقُلْ لِلشَّهْدِ مَنْ حَلَّاكَ
 يَا مُذْرِكَ الْأَبْصَارِ وَالْأَبْصَارِ لَا
 تَذَرِي لَهُ وَلِكُنْهِهِ إِذْ رَاكَ
 إِنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنِي تَرَاكَ فَإِنِّي
 فِي كُلِّ شَيْءٍ أُسْتَبِينُ غُلَاكَ.

অর্থ: পৃথিবীর দিগ-দিগন্তে আল্লাহ তা'আলার কত অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে আপনি যেগুলোর সন্ধান পেয়েছেন, তা নিতান্তই কম।

আপনার সত্তার মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার মহাবিস্ময়কর নিদর্শন লুকিয়ে আছে। আপনার দৃষ্টি যদি তা দেখতে পেত।

কত নিগূঢ় রহস্যে ঠাসা এ বিশ্বজগৎ। আপনি যদি তা উদ্ঘাটন করতে যান, জীবন ফুরিয়ে যাবে, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

যে নবজাতক বেঁচে আছে, যার কোনো আশ্রয় নেই, যাকে দেখাশোনার কোনো অভিভাবক নেই, তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন—কে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখছে? কে তার দেখাশোনা করছে?

মৌমাছিকে জিজ্ঞেস করুন, কে তার উদর মধুতে ভরে দিয়েছে? মধুকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, কে তার মধ্যে এত মিষ্টতা ঢেলে দিয়েছে?

হে দৃষ্টিশক্তির স্রষ্টা, দৃষ্টিশক্তি যার নাগাল পায় না! আমার সাধ্য কি তোমাকে দেখার? কিন্তু আমি যে সবকিছুতেই তোমার অস্তিত্ব, তোমার মহত্ত্ব অনুভব করি।

- ❖ মিশরীয় লেখক, চিকিৎসক ও দার্শনিক মোস্তফা মাহমুদ (১৯২১-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘প্রকৃত ঈমান ও বিশ্বাসের বলেই মন প্রশান্ত হয়। মু‘মিন বান্দার জীবনে কঠিন সংকট ও প্রতিকূলতা প্রশান্ত সমুদ্রে একটি উত্তাল তরঙ্গমাত্র। যা মুহূর্তেই নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং সমুদ্র আগের মতো প্রশান্ত হয়ে যায়।’

- ❖ বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৪৯-১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন :

‘বিশ্বজগতের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর শক্তিমত্তা নিয়ে যখনই কোনো সন্দেহ-সংশয় জাগে, চারপাশের উন্মুক্ত সৃষ্টিজীব দেখতে থাকি। উপলব্ধি করতে পারি, এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা নিছক সাধারণ কেউ নন, যে বসে-বসে পাশা খেলায় মত্ত থাকে। তিনি মহান, মহাপ্রজ্ঞাবান।’

- ❖ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মিশরীয় কবি সাহিত্যিক আব্বাস মাহমুদ আক্বাদ (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘নাস্তিক ও ধর্মহীন চরম নির্বোধ ও মানসিক প্রতিবন্ধী।’

শিরক

পূর্ব চীনের ল্যান্স থেকে পশ্চিম ফ্রান্স পর্যন্ত সফর করে বেড়িয়েছি। কতো বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নতুনত্ব চোখে পড়েছে। তবে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রকটরূপে চোখে বেঁধেছে, তা হলো ‘শিরক’।^{১৯}

শিরক হলো প্রভুত্বের ও উপাস্যত্বের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তা‘আলার কোনো সমকক্ষ ও অংশীদার নির্ধারণ করা, তাঁর সঙ্গে অন্যকে ইলাহ সাব্যস্ত করা।

প্রকৃত সত্য হলো, মহান আল্লাহ তা‘আলা এক ও একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি ছাড়া নেই কোনো রব ও ইলাহ। নেই কোনো স্রষ্টা ও উপাস্য।

পৃথিবীতে শিরকই হলো সবচেয়ে গুরুতর জঘন্য পাপ। এমন মহা পাপ থেকে মানবজাতিকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা‘আলা যুগেযুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং আসমানি কিতাব নাযিল^{২০} করেছেন। কত দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন, যেন মানবজাতি বুঝতে পারে, তাদের একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একমাত্র উপাস্য। তিনি এক ও একক।

আল্লাহ তা‘আলা বান্দার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু শিরক ক্ষমা করেন না। যুগে-যুগে প্রেরিত নবী-রাসূলগণের ওপর প্রথম গুরুদায়িত্বটি ছিল আল্লাহ তা‘আলার তাওহিদ ও একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান করা। তাই তো প্রত্যেক নবী-রাসূল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক অনাচার ও রাজনৈতিক কদাচারগুলো এড়িয়ে প্রথমেই তাওহিদ ও একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন।

১৯ অংশীদারিত্ব নির্ধারণ করা।

২০ অবতারণা।

তাওহিদ ও একত্ববাদ হলো শিরক ও বহুশ্বরবাদের পরিপন্থি। এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। তাওহিদ হলো সবচেয়ে মহৎ ইবাদত, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। আর শিরক হলো সবচেয়ে জঘন্য, অমার্জনীয় পাপ, যে পাপের শাস্তি অনিবার্য। তাওহীদে বিশ্বাসী হওয়া ছাড়া তা থেকে নিস্তারের দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় হলো, আমরা কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ে মতবিরোধের জের ধরে রেখেছি। তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকছি। এদিকে তাওহিদ ও একত্ববাদের প্রচার-প্রসার, মুসলমানদের আকীদা ও ধর্মীয়বিশ্বাস সংশোধনের দায়িত্ব বেমানুম ভুলে বসেছি।

এ সমস্যার সমাধান কীসে? এ অচলাবস্থার উন্নতি কীসে?

সমাধান:

১. হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি দৃঢ় ঈমান ও অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হবেন, পবিত্র কুরআন ও বিশ্বজগতের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় নিমগ্ন হবেন, হৃদয়ের গভীর থেকে ধ্বনিত হবে:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.

অর্থ: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

তার সমকক্ষ কোনো অংশীদার নেই।'

২. নবী-রাসূলগণের পক্ষ থেকে উম্মতের ওপর তাওহিদ ও একত্ববাদের আহ্বান প্রচারের যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সে বিষয়ে সবসময় সচেতন থাকতে হবে। মানুষকে জোর দিয়ে বোঝাতে হবে, শিরকমুক্ত হয়ে তাওহিদ ও একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া ছাড়া নামায, রোযা, যাকাত ও অন্যান্য সমস্ত ইবাদতই বৃথা, এর কোনো মূল্য নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَآءً مَّنْثُورًا﴾

অর্থ: 'তারা (দুনিয়ায়) যে আমাল করেছিল আমি সেদিকে অগ্রসর হব, এরপর তাকে বানিয়ে দেব ছড়ানো ছিটানো ধূলিকণা (সদৃশ)।' (ফুরকান, ২৫: ২৩)

৩. মনে রাখতে হবে, নবী-রাসূলগণের প্রত্যেকেই মূলত তাওহিদ ও একত্ববাদের দাওয়াত প্রচার করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ২১]

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমি প্রত্যেক উম্মতের ভেতর কোনো না কোনো রাসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত^{২১}কে পরিহার কর।' (সূরা নাহল, ১৬: ৩৬)

তাওহিদ ও একত্ববাদের প্রচারে নবী-রাসূলগণের একটিই আহ্বান ছিল। পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
ط أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [المؤمنون: ২২]

অর্থ: 'আর তাদের মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম এই বলে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই, তবুও কি তোমরা (তাকে) ভয় করবে না?' (মু'মিনুন, ২৩: ৩২)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে সর্বপ্রথম যে নির্দেশ প্রদান করেছেন, তা হলো একত্ববাদের নির্দেশ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [محمد: ১৭]

অর্থ: 'সুতরাং জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। ক্ষমা প্রার্থন করুন আপনার ও মু'মিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য।' (মুহাম্মদ, ৪৭: ১৯)

২১ 'তাগুত' শয়তানকেও বলা হয় আবার প্রতিমাদেরকেও বলা হয়। সে হিসেবে বাক্যটির দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে। (ক) তোমরা শয়তানকে পরি করুন, তার অনুগামী হয়ো না। (খ) তোমরা মূর্তিপূজা হতে বেঁচে থাকো। (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন)

৪. রাসূল ﷺ ও তাঁর সাচা অনুসারীগণ প্রজ্ঞা, হিতোপদেশ ও আসমানি কিতাবের বাণীর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছেন। একই পথ অনুসরণ করে আমাদেরও তাওহিদ ও একত্ববাদের দাওয়াত প্রচার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে রাসূলগণ ও আসমানি কিতাবপ্রাপ্ত জাতিবর্গের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [العمران: ১৮৬]

অর্থ: 'আর (সেই সময়ের কথা তাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়) যখন আল্লাহ 'আহলে কিতাব' থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা এ কিতাবকে অবশ্যই মানুষের সামনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে।' (আলে ইমরান, ৩: ১৮৬)

৫. ধর্মের আলেম ও দায়ীগণকে পৃথিবীর দূর-দূরান্তে একত্ববাদের বাণী পৌঁছে দিতে হবে। ব্যক্তিগত পরিসরে, পারিবারিক জীবনে ও সামাজিক অঙ্গনে শিরকের ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরতে হবে। শিরকের যত ধরন-প্রকৃতি প্রচলিত আছে, যেমন: মূর্তি পূজা, প্রতিমা পূজা, কবর পূজা, মাজার পূজা, যাদুটোনা ও জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদি কার্যকলাপ থেকে সতর্ক করতে হবে।
৬. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস সুরক্ষিত ও অটুট রাখার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্রে পর্যন্ত 'ইমান ও একত্ববাদের বিশ্বাস'-বিষয়টি সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। কেননা একজন মুসলমান যত উচ্চ শিক্ষিতই হোক-না-কেন, উন্নতি-অগ্রগতির যত শীর্ষস্থান অধিকার করুক-না-কেন, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে একনিষ্ঠ খাঁটি বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না।

৭. কুরআন-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় ও গবেষণায় উৎসাহিত করতে হবে। সমাজ ও জাতির ঝোঁক-প্রবণতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে তা সঠিক পথে পরিচালিত করা আবশ্যিক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ১৫২]

অর্থ: 'এবং এ-ই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ কর না। অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। হে মানুষ! এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।' (আনআম, ৬: ১৫৩)

৮. পবিত্র কুরআনের ঘটনাসমূহে, দৃষ্টান্ত-উপমায়, দলিল-প্রমাণে, তথ্য ও তত্ত্বে আল্লাহ তা'আলার একত্ব ও অদ্বিতীয়তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন: সুলাইমান (আ.)-এর যামানায় পিঁপীলিকা ও হুদহুদ পাখির ঘটনা, মৌমাছির আলোচনা, সালেহ্ (আ.)-এর উটনীর ঘটনা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি বিষয়ের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। তা হলো, আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও অদ্বিতীয়তা।

৯. সন্তানদেরকে শিরকের জঘন্যতা ও গুরুতরতা সম্পর্কে সতর্ক করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা কর্তব্য। লুকমান (আ.) যেমনটি করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ১৩]

অর্থ: 'এবং (সেই সময়ের কথা) স্মরণ করুন, যখন সে তার পুত্রকে উপদেশাচ্ছলে বলেছিল, ওহে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক কর না। নিশ্চিত মনে রেখ, শিরক চরম অন্যায়।' (সূরা লুকমান, ৩১: ১৩)

(সূরা লুকমান, ৩১: ১৩)

সমাজের বিশেষ-সাধারণ নির্বিশেষে প্রতিটি শ্রেণির হৃদয়ে, প্রতিটি প্রজন্মের অন্তরে এ আয়াতের দাবি ও মর্ম বদ্ধমূল করে দিতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ২৮]

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শিরক করার বিষয়টি ক্ষমা করেন না। এর চেয়ে নিচের যেকোনো বিষয়ে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে, সে এমন এক অপবাদ আরোপ করে, যা গুরুতর পাপ।' (নিসা, ৪: ৪৮)

১০. দ্বীনের দাওয়াতের পন্থা সহজ-সাবলীল হতে হবে। তাতে বিতর্কিত বিষয়ের আঁচ থাকবে না। দর্শনের জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের ঝাঁঝ থাকবে না। ইসলাম হলো সাবলীল ও স্বভাবজাত ধর্ম। সুতরাং তার দাওয়াতের পন্থাও হবে সহজাত সাবলীল। পবিত্র কুরআনে দ্বীনের দাওয়াতসংবলিত দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ১২৫]

অর্থ: 'আপনি নিজ প্রতিপালকের প্রতি মানুষকে ডাকবেন হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আর (যদি কখনো বিতর্কের দরকার পড়ে, তবে) তাদের সাথে বিতর্ক করবেন উৎকৃষ্ট পন্থায়।' (নাহল, ১২৫)

১১. দ্বীনের দায়ী ও আহ্বায়ককে প্রথমেই মানুষের আকীদা ও বিশ্বাস সংশোধনে কাজ করতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক শিষ্টাচার, আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনা ইত্যাদি বিষয়ে অগ্রসর হতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র মক্কা নগরীতে তের বছর অবস্থান করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি শুধু আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দাওয়াত প্রচার করেছেন। لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ-এর অর্থ ও মর্ম মানুষের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছেন।

১২. একটি হাদীসে কুদসী,^{২০} যা সবসময় মনে রাখা কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ".

صحيح مسلم (২২৮৭/৬)

অর্থ: আবু হুরাইরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি শারীকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি কোন লোক কোন কাজ করে এবং এতে আমি ছাড়া অপর কাউকে শারীক করে, তবে আমি তাকে ও তার শিরকি কাজকে প্রত্যাখ্যান করি।' (মুসলিম: ৪/২২৮৯)

যত দিন বেঁচে আছেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কালিমাটি বারবার পাঠ করুন। لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (কোনো ইলাহ নেই) অংশটি সমস্ত প্রভু ও উপাস্যের অস্তিত্বকে নাকচ করে। لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ছাড়া) অংশটি প্রভু ও উপাসনার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে।

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় এ দু'আ পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! জেনে-বুঝে তোমার সঙ্গে শিরক করা থেকে পানাহ চাই। না জেনে, না বুঝে যে গুনাহ ও পাপাচার করেছি, তার জন্য ক্ষমা চাই।'

^{২০} যে হাদীসের মূল কথা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ভাষায় উম্মতকে তা জানিয়ে দিয়েছেন, সে হাদীসকে "হাদীসে কুদসী" বলা হয়।

পরিশিষ্ট:

- ❖ রূপদি আরবি কবিতার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম কবি আবু নুয়াস (৭৫৬-৮১৪ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘পৃথিবীর যত গাছপালা, তরুলতা আছে, তা পরখ করে দেখো, মহান স্রষ্টা যা সৃষ্টি করেছেন, তা পর্যবেক্ষণ করে দেখ, তাতে কত অসংখ্য প্রমাণ ও নিদর্শন জাজ্বল্যমান, যা প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ এক ও একক। তাঁর নেই কোনো শরিক, সমকক্ষ।’
- ❖ শাইখুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়া (রহ.) (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেছেন:
‘তাওহিদ ও একত্ববাদের মূল দাবি হলো, আমরা এক আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করব। তাকেই ডাকব। তাকেই ভয় করব। একমাত্র তাঁর ওপর ভরসা করব। এ শাস্ত দ্বীন তাঁরই পক্ষ থেকে প্রদত্ত।’
- ❖ ‘তাওহিদ ও একত্ববাদ হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মঙ্গলজনক হিতোপদেশ। পরকালের জন্য বান্দার শ্রেষ্ঠ পাথের।’
-আয়েয আল-কারনী

বিদ'আত

কুরআন-সুন্নাহর কোনো ভিত্তি নেই—এমন উদ্ভাবিত কোনো কথা, কাজ কিংবা ইবাদতই হলো বিদ'আত। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রর.) বিদ'আতের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন, 'যে বিষয়টি শরীয়ত পরিপন্থি, কিংবা যা বিশুদ্ধ ইবাদতে সংযোজন-বিসংযোজন ঘটায়, তা-ই বিদ'আত।'

যে বিদ'আতী, শরীয়তে ভিত্তিহীন কাজের উদ্ভাবক, তার কাজটিকে শয়তান তারই কাছে সুন্দর শ্রেষ্ঠরূপে তুলে ধরে। ফলে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়—এ নতুন পদ্ধতিই তো আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। অথচ তা আল্লাহ তা'আলার চরম নাফরমানি এবং রাসূল ﷺ-এর আদর্শ-পরিপন্থি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٍ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

অর্থ: 'নতুন উদ্ভাবিত প্রতিটি বিষয়ই বিদ'আত এবং যে কোনো বিদ'আত ভ্রষ্টতার উপলক্ষ।' (আবু দাউদ, ৭/১৭)

বিদ'আদী, সে তো অজ্ঞতার ঘোরে ডুবে থাকে। কেননা শয়তান তার কারসাজিতে ব্যক্তির সামনে উদ্ভাবিত কাজটাকে সুন্দর ও চাকচিক্যমণ্ডিতরূপে উপস্থাপন করে। ফলে তার দৃঢ় বিশ্বাস—তার কাজটিই সঠিক ও যথার্থ। তাতে একচুল ভুল-বিচ্যুতির অবকাশ নেই।

মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অজ্ঞতা ও অসচেতনতার সুযোগে সমাজে বিদ'আত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার-প্রসারে আলেম সমাজের নীরব নির্জীব ভূমিকার কারণে সমাজের রক্তে-রক্তে বিদ'আত ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই তা মানুষের মধ্যে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ও আদর্শের বিচ্যুতি ঘটায়। দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য ধ্বংস করে দেয়। মুসলমানদের পারস্পরিক কলহ-বিবাদ, ঝগড়া-ফাসাদের মুখে ঠেলে দেয়।

বর্তমান সমাজে বিদ'আত একটি ভয়ানক জটিল সমস্যার রূপ ধারণ করেছে। এ থেকে উত্তরণের পথ কী? এ জটিল সংকট কাটিয়ে উঠার উপায় কী?

সমাপ্তি:

১. মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমগুলো, যেমন: মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, সেমিনার, আলোচনা সভা ও শিক্ষা সিলেবাস-সর্বত্র রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ও আদর্শ তুলে ধরে বিদ'আত ও তার ভয়াবহ পরিণতি থেকে সতর্ক করতে হবে। সমাজের সাধারণ মুসলমান যেন সুন্নাহ ও বিদ'আত একসাথে গুলিয়ে না ফেলে এবং বিদ'আতের বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রভাবিত না হয়, সে বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
২. ধর্ম সম্পর্কে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা দূর করতে হবে। অজ্ঞতা ও মূর্খতা যে কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে ভুল পথে ঠেলে দেয়। বিশেষ করে ধর্মীয় অজ্ঞতা ব্যক্তিকে বিদ'আতের পথে ধাবিত করে। তাই সমাজের সর্বত্র দ্বিনি শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার-প্রসার ঘটতে হবে। ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার জাগরণ সৃষ্টি করতে হবে।
শাতেবী (রহ.) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করেছে, অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, তার পক্ষ থেকে বিদ'আতের কোনো আশঙ্কা নেই। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে, ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে যে ব্যক্তির সঠিক জ্ঞান নেই, তার দ্বারা বিদ'আত ও কুসংস্কারের সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।'
৩. সহীহ হাদীস ও জাল হাদীস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বিদ'আতীরা যে হাদীস 'ব্যবহার' করে, কিংবা হাদীসের অপব্যাখ্যা করে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
৪. ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি পথ বর্জন করা কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে বলেছেন:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (النساء: ১৭১)

অর্থ: 'হে কিতাবিগণ! নিজেদের ধীনে সীমালঙ্ঘন কর না।'

(নিসা, ৪: ১৭১)

৫. কুরআন সুন্নাহ সম্পর্কে বিজ্ঞ এবং শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে ফতোয়া গ্রহণ করতে হবে।

যারা না-জেনে, না-বুঝে ফতোয়া প্রদানকারীর বেশ ধারণ করেছে তাদের ফতোয়া বর্জন করতে হবে।

৬. কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অনুসরণে অন্ধবিশ্বাস ও অন্যায় গোঁড়ামি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নিজ নিজ পছন্দের পীর মাশায়েখের প্রতি অন্ধভক্তি, তাদের অন্ধ-অনুকরণ, পীর-মাশায়েখের মতাদর্শ গ্রহণে অন্যায় গোঁড়ামি, এমনকি কুরআন-সুন্নাহর ওপর তা প্রাধান্য দেওয়া-এ সমস্তই হলো বিদ'আতীদের চরিত্র।
৭. কথা-কাজে, আচরণে-উচ্চারণে রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত আদর্শের অনুসারী হতে হবে। কাফের, মুশরিক ও বিদ'আতীদের রীতিনীতি ও কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকতে হবে।
৮. বিদ'আত ও কুসংস্কারের পরিণতি ভয়াবহ। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এর ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তাই ভার্স্যাল মিডিয়া, সোস্যাল মিডিয়া, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কতা ও সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন।
৯. বিদ'আতীদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী উত্তম পন্থায় আলোচনাই বাঞ্ছনীয়।
১০. পুস্তক ও গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে মানুষের সামনে বিদ'আত ও কুসংস্কারের স্বরূপ উন্মোচন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে স্যাটেলাইট চ্যানেল, ইন্টারনেট ওয়েবসাইট ও দাওয়াতি কার্যক্রম-যেখানে শুধু কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ প্রচারিত হবে- বাস্তবায়িত করা কর্তব্য।
১১. সঠিক সুন্নাহ ও ইসলামি আদর্শ ধারণ ও লালন করার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিবে, তাদের পুরস্কৃত করে সমাজের মধ্যে সম্মান ও গৌরবের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে হবে।
১২. যে সমস্ত জাতি ও সমাজের রক্তে-রক্তে বিদ'আত ছড়িয়ে পড়েছে, মহামারি আকার ধারণ করেছে সেখানে ইসলামি ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামি আদর্শ, সংস্কার ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচলন ঘটাতে হবে।

১৩. রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ও আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, তা বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ফান্ড গড়ে তুলতে হবে। যার সাহায্যে পুস্তক প্রকাশ করা হবে। স্যাটেলাইট চ্যানেল ও ইন্টারনেট ওয়েবসাইট খোলা হবে। এ ফান্ড থেকে দ্বীনের দায়ী ও ইসলামি শিক্ষায় নিয়োজিত শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

১৪. রাসূল ﷺ-এর এ হাদীসটি সবসময় মনে রাখতে হবে:

"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ"

অর্থ: 'আমাদের আদর্শ সমর্থন করে না এমন কোনো কাজ যে করবে তা প্রত্যাখ্যাত বলে বিবেচিত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ, ৪২/২৯৯)

১৫. কুরআন-সুন্নাহ হলো বিদ'আত, কুসংস্কার, আদর্শিক বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্তির সোপান। তাই জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে কুরআন-সুন্নাহর বিধান আঁকড়ে থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

অর্থ: 'আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যাতে তোমরা তাঁকে ভয় করে যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে চলতে পার।' (আনআম, ৬: ১৫৩)

১৬. যখন কারো কথা ও হিতোপদেশ শুনে, কারো আচার-বিচরণ দেখে বোধোদয় হয়-আমি তো ভুল-বিচ্যুতির পথে আছি, আমি তো বিদ'আত-কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি তখন অহংকার ও গোড়ামির মানসিকতা পরিহার করে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসতে হবে। সহীহ সুন্নাহ ও আদর্শ ধারণ করতে হবে।

১৭. যারা ইসলামি জ্ঞান-গবেষণার প্রকৃত ধারক-বাহক তাঁদের সংস্পর্শে জ্ঞানার্জন করা কর্তব্য। শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহের দলিল-প্রমাণ যথাযথভাবে বুঝতে হবে। কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মতের অমিল হয়েছে বলে কিংবা আমার ভুল শুধরে দেওয়ার কারণে কাউকে অমূলকভাবে দোষারোপ করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে।
১৮. বিদ'আতীদের তোষামোদ ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিদ'আতীদের সম্মান করা, বিদ'আত ও কুসংস্কারসংবলিত বই-পুস্তকের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা, তাদের সমর্থনে মিথ্যা রটনা করা, বানোয়াট ও জোর-আপত্তি দাঁড় করানো-এ সমস্তই বিদ'আতীদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতার নামান্তর।
১৯. সবসময় সজাগ সচেতন থাকুন। আত্মমুগ্ধ হয়ে, নিজের প্রতি অতি আস্থাশীল হয়ে, নিজের কাজগুলোকে সুন্দর সুশোভিত করে দেখে আত্মপ্রত্যারণার শিকার হবেন না। কখনো কখনো নিজের কাজটিকে সঠিক ও যথার্থ বলে দৃঢ় বিশ্বাস হবে; কিন্তু আপনি হয়ত বাস্তবে ভুলের মধ্যে ডুবে আছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বাণী স্মরণ রাখুন:

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ (فاطر: ৮)

অর্থ: তবে কি যার দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজগুলো সুদৃশ্য করে দেখানো হয়েছে ফলে সে তার মন্দ কাজকে ভালো মনে করে (সে কি সংকর্মশীল ব্যক্তির সমান হতে পারে?) (ফাতির, ৩৫: ৮)

২০. জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে রিয়া ও লৌকিকতা থেকে বিরত থেকে ইখলাস ও একনিষ্ঠতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা রিয়া ও লৌকিকতা ব্যক্তিকে প্রচলিত পরিবেশ-পরিস্থিতির মর্জিমাফিক কাজ করতে প্ররোচিত করে। ফলে সে চারপাশের মানুষের মন জয় করতে গিয়ে সে শরীয়তের বিধি-নিষেধের ও বাধ্য-বাধকতার তোয়াক্কা করে না।
২১. একটি বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে-বিশ্বে প্রচলিত সমস্ত আদর্শ, সভ্যতা ও সামাজিকতা একটি নিরিখে যাচাই করা হবে। তা হলো পবিত্র কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর সুন্যাহ।

পরিশিষ্ট:

- ❖ আল্লামা ইবনুল কাইয়্যাম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন :
 'যে বিষয়েই মনের বৌক-প্রবণতা ও চাহিদা-বাসনা প্রাধান্য পাবে, বিষয়টির আগা-গোড়া বরবাদ করে ছাড়বে। তা এমনই মারাত্মক, জ্ঞান বিদ্যার সাথে মিশে তাকে বিদ'আত ও ভ্রষ্টতার পথে ধাবিত করে; জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিকে প্রবৃত্তিপূজারিতে পরিণত করে। যদি তা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যে প্রভাববিস্তার করতে পারে, তাহলে বান্দাকে লৌকিকতা ও প্রদর্শনবাদিতায় প্ররোচিত করে। আর যদি রাজ্যশাসনে মিশে যেতে পারে, গোটা শাসকশ্রেণিকে অন্যায় ও যুলুমের পথে ঠেলে দেয়।'
- ❖ বিশিষ্ট সাহাবী আবু দারদা (রা.) বলেছেন:
 'বিদ'আত পালনে বহু চেষ্টা মোজাহাদা করার চেয়ে যথার্থভাবে একটি সুন্নাহর অনুসরণই শ্রেয়। বিদ'আতের অনুগামী হওয়ার চেয়ে সুন্নাহর অনুসারী হওয়া উত্তম। যতদিন রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ ও আদর্শ আঁকড়ে থাকবে আপনার দ্বারা কোনো ভুল-বিচ্যুতি হবে না।'
- ❖ হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) (৯৭-১৬১ হি.) বলেছেন:
 'ইবলিস শয়তানের কাছে নাফরমানির তুলনায় বিদ'আত অধিক পছন্দনীয়। কেননা নাফরমান বান্দা এক পর্যায়ে নিজের ভুল বুঝতে পারে। তওবা করে সৎপথে ফিরে আসে। কিন্তু একজন বিদ'আতী, সে তো নিজেকে সঠিক পথের অনুসারী বলে দাবি করে। তার তওবা নসীব হবে কীভাবে?!'

ওয়াসওয়াসা ও শুচিবায়ু

ওয়াসওয়াসা হলো, অতৃপ্ত ও অস্থির মনে অযৌক্তিক ও অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তার আচ্ছন্নতা। ওয়াসওয়াসার শিকার হয়ে মানুষ দোদুল্যমান ও অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ে। যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ-সংশয় তাকে ঘিরে ধরে। প্রশান্তি ও যত্নের কোনো পথ সে খুঁজে পায় না।

ওয়াসওয়াসা ব্যাধির সবচেয়ে ভয়ানক ও আশঙ্কাজনক রূপটি হলো **obsessive-compulsive disorder** (অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসর্ডার)। সহজ বাংলায় যাকে বলা হয় “শুচিবায়ু”। চিকিৎসাশাস্ত্রে এটি একটি মানসিক ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত। ব্যক্তি যখন এ রোগে আক্রান্ত হয় সময়ে সময়ে তার মনে নানা অযৌক্তিক অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা-ভাবনা দানা বাঁধতে থাকে, যা তাকে প্রায়ই অস্থিরচিত্ত ও সংশয়গ্রস্ত করে রাখে। এমন পরিস্থিতিতে নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। দ্বিধা-সংশয় তাকে সম্পূর্ণরূপে কারু করে ফেলে।

শুচিবায়ুগ্রস্ত রোগী ঘুরে ঘিরে একই কাজ বারবার করতে থাকে। দীর্ঘ সময় ধরে একই চিন্তায় ঘুরপাক খেতে থাকে। এসময় অন্য কোনো যৌক্তিক ও যত্নসিদ্ধ চিন্তা-ভাবনা তার দেমাগ মস্তিষ্কে কাজ করে না।

সাধারণত অযু, গোসল, পবিত্রতা অর্জন, নামায ও এজাতীয় ইবাদতের ক্ষেত্রে শুচিবায়ু রোগ দেখা দেয়। এমনকি ব্যক্তিগত গতির বাইরে সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষেত্রেও শুচিবায়ু প্রবল হতে পারে। ব্যক্তি তখন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। চারপাশের মানুষ তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

শুচিবায়ুগ্রস্ত রোগী কোনো ইবাদত সম্পন্ন করতে পারে না। কোনো কাজেই তৃপ্তিবোধ করে না। তার মানসিক অবস্থা প্রথমে হ্যালোসিনেশন, পর্যাৱক্রমে পাগলামিতে পরিণত হয়। কখনো কখনো পরিস্থিতি এতই গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়, ভুক্তভোগী আত্মহত্যার পথে পা বাড়ায়।

তাই এ মানসিক সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে শুরুতেই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর সঠিক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

সমাধান:

১. যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আপনার মনে সংশয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে তা সমস্তই শয়তানের কারসাজি। শয়তান মানুষের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহে বেঘাত ঘটাতে চায়। মানসিক প্রশান্তি ব্যাহত করতে চায়। তাই আপনি সবসময় প্রশান্ত ও স্থিরচিত্ত থাকুন। কোথাও হুবির না হয়ে, পিছিয়ে না পড়ে সামনে অগ্রসর হোন। আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। বিশ্বাস করুন, ওয়াসওয়াসা ও গুচিবায়ু রোগ খুব দ্রুত কেটে যাবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ط وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (المجادلة: ১০)

অর্থ: 'গোপন পরামর্শ তো হল মুমিনরা যাতে দুঃখ পায় সে উদ্দেশ্যে কৃত শয়তানের কুমন্ত্রণা মাত্র। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব আল্লাহরই ওপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।' (মুজাদালা, ৫৮: ১০)

২. মনে যদি কোনো সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয় তাহলে **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ** পাঠ করে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করুন। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ:

﴿وَمَا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ط إِنَّهُ سَيَنُجِّئُكَ عَلَيْهِمُ﴾ (الأعراف: ২০০)

অর্থ: 'আর যদি শয়তানের দিক থেকে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (আরাফ, ৭: ২০০)

জেনে রাখুন, মনের এই দ্বিধা-সংশয়, অস্বস্তি ও অতৃপ্তি-সমস্তই শয়তানের মিথ্যা প্ররোচনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ শয়তানের ব্যাপারে বলেছেন, **كَذُوبٌ** (চরম মিথ্যাবাদী)।

৩. মনে রাখবেন, মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তাড়নায় কাজ করতে গিয়ে প্রকারান্তরে গুনাহের ভাগিদার হচ্ছেন। কেননা এতে আপনি শয়তানের কথায় কান দিচ্ছেন। তার কুমন্ত্রণার ফাঁদে পা দিচ্ছেন।

পক্ষান্তরে আপনি যদি মনের সন্দেহ-সংশয় আমলে না নিয়ে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন, তাহলে একটি গুনাহ থেকে বেঁচে গেলেন। নিশ্চিত থাকুন, মনের খুঁতখুঁতে মানসিকতা আমলে না নেওয়ার কারণে আপনার ওয়ু, নামায ও ইবাদত-বন্দেগিতে কোনো ক্ষতি হবে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ».

অর্থ: আবু হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কথা বা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের জন্য তাদের মনে কল্পনাগুলোকে মাকুফ করে দিয়েছেন।' (মুসলিম: ১/১১৬)

৪. সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য দলিল-প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করুন। বিদ্যা-বুদ্ধি কাজে লাগান। বিদ্যা ও জ্ঞান হলো চলার পথে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তা সমস্ত সন্দেহ-সংশয় দূর করে দেয়। আপনার বিদ্যা-বুদ্ধির ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ হবে, বিবেক-বুদ্ধি যত প্রয়োগ করবেন, আপনার দেমাগ ও মস্তিষ্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ সংশয়ের ছিদ্র-পথগুলো বন্ধ হতে থাকবে। গুচিবায়ু রোগ থেকে আপনার আরোগ্য ত্বরান্বিত হবে।

৫. সবসময় কোনো একটি ভালো কাজে ব্যস্ত থাকুন। কখনো অবসর সময় কাটাবেন না। অবসর হলো শয়তানের চারণভূমি। শয়তানের প্ররোচনার সুবর্ণ সুযোগ জ্ঞানী, গুণী ও সজ্জনদের সংস্পর্শে থাকুন; কিংবা পরিবার ও বন্ধুজনদের সঙ্গে সময় কাটান। জীবনের কোলাহল ব্যস্ততা ছেড়ে কখনো একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতায় পড়ে থাকবেন না। কেননা শয়তান হলো নিঃসঙ্গতার পরম বন্ধু। এ সময় দেমাগ মস্তিষ্কে যত অযৌক্তিক অনাঙ্কিত চিন্তা-চেতনা বাসা বাঁধে।

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস বলেন, ‘অবসর ও দ্বিধা-সংশয়ের ওপর কর্মব্যস্ততার ছুরি চালাও। চিকিৎসকগণ মানসিক রোগ থেকে সত্তর ভাগ আরোগ্য লাভের নিশ্চয়তা দিবে।’

৬. আপনার জীবনের সফল ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে ভাবুন। জীবনের সুখস্মৃতি ও সফল মুহূর্তগুলোর কথা চিন্তা করুন। এভাবে আপনার মন-মানসিকতাকে ইতিবাচক ও স্বস্তিদায়ক চিন্তা-ভাবনায় গড়ে তুলুন। দেমাগ ও মস্তিষ্ক হলো পাত্রতুল্য। উপকারী ও কার্যকর চিন্তা-চেতনায় আপনি তা পরিপূর্ণ করতে পারেন, আবার অনর্থক অযাচিত জল্পনা-কল্পনায় আকীর্ণ করে ফেলতে পারেন।

৭. কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ আয়োজনে নিয়োজিত থাকুন। মন-মস্তিষ্ককে কর্মব্যস্ত রাখুন। যেন অযাচিত জল্পনা-কল্পনা ও দ্বিধা-সংশয় তাতে বাসা বাঁধতে না পারে।

পূর্বের দৈনন্দিন রুটিন পরিবর্তন করে ফেলুন। নতুন একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করুন। মসজিদে ওয়ু ও নামাযের স্থান পরিবর্তন করে ফেলুন। নির্দিষ্ট মসজিদে একই জায়গায় না থেকে বিভিন্ন মসজিদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নামায আদায় করুন।

৮. গুচিবায়ু ও সংশয়প্রবণতার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এর কারণে ভুক্তভোগী চরম মানসিক অস্থিরতা, দূশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার শিকার হয়। জীবনের মূল্যবান সময় ও সম্পদ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দীন-ধর্মও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে গুচিবায়ুমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। জীবনের মূল্যবান সময় ও সম্পদ রক্ষায় যত্নবান হোন। দ্বিধা-সংশয়মুক্ত হয়ে দীন-ধর্ম ও ইবাদতগুজারে সচেষ্টি হোন।

৯. সুসংবাদ গ্রহণ করুন, শয়তানের প্ররোচনা ও সংশয়প্রবণতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে আপনার চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও প্রতিশ্রুতিশীল মানসিকতা “মোজাহাদা” হিসেবে গণ্য হবে। আপনি বিরাট প্রতিদানের হকদার হবেন। এর স্বপক্ষে ওলামায়ে কেরামের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি বিদ্যমান। তাছাড়া যারা প্রকৃত মুমিন বান্দা তাদের বিরুদ্ধেই শয়তানের যত প্ররোচনা। কিন্তু যারা পাপাচারী, কাফের তাদের বিষয়ে শয়তান নিশ্চিন্ত

ও দায়িত্বমুক্ত। জনৈক মনীষী যথার্থ বলেছেন, ‘বিরান বাড়ি, চোর তো সেদিকে ফিরেও তাকায় না।’

১০. যেকোনো কাজ কিংবা ইবাদত শুরু করুন-না-কেন, তা শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনার বিরুদ্ধে জিহাদের শামিল। তা শেষ করে তবেই ক্ষান্ত হোন। অনবরত কাজ করার প্রচেষ্টাই আপনার মনের খুঁতখুঁতে প্রবণতা দূর করে দিবে। আত্মবিশ্বাসী হোন। আল্লাহর ওপর ভরসা করুন।
১১. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে নরম কাদামাটি থেকে দুর্বল করে। আর শয়তানের সৃষ্টি হয়েছে প্রবল আগুন থেকে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিজ্ঞাবলের সামনে শয়তানের প্ররোচনা নিতান্তই ঠুনকো দুর্বল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ (النساء: ৭৬)

অর্থ: ‘শয়তানের ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই দুর্বল।’ (নিসা, ৪: ৭৬)

১১. একনিষ্ঠ আনুগত্য ও ইবাদত আপনার মনের সমস্ত অযৌক্তিক অনাকাঙ্ক্ষিত সন্দেহ-সংশয় দূর করে দিবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ﴾ (يوسف: ২৬)

অর্থ: ‘আমি তা দেখিয়েছিলাম তাকে অসৎ কর্ম ও নির্লজ্জতা থেকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, সে ছিল বিশুদ্ধ-হৃদয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।’

সুতরাং মসজিদে জামাতের সঙ্গে পাঁচওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করুন। আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দু‘আ করুন। যিকির তিলাওয়াতে যবান সতেজ রাখুন। আপনার মন অনাকাঙ্ক্ষিত চিন্তা-ভাবনা ও মানসিক অস্থিরতামুক্ত থাকবে।

সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন যিকির ও দু‘আ নিয়মিত পাঠ করুন। তা আপনার জন্য মজবুত রক্ষাকবচ। ‘সূরা ফালাক’ ও ‘সূরা নাস’ বেশি বেশি পাঠ করুন। সুন্নত হিসেবে প্রমাণিত যিকির ও দু‘আ পাঠ করুন। গুচিবায়ু-রোগমুক্ত হওয়ার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর আমল।

১২. দ্বিধা-সংশয় ও গুচিবায়ু রোগের ক্ষেত্রে আপনাকে সচেতন ও সাহসী হতে হবে। অন্যথায় প্রশয় পেয়ে শয়তান আপনার প্রতি প্রলুব্ধ হবে। তার ওয়াসওয়াসা ও প্ররোচনার ঝাঁপি খুলে আপনার ওপর জেঁকে বসবে। তাই ওয়াসওয়াসা এড়িয়ে কাজে মনোযোগী হোন। শয়তানকে আপনার মানসিক শক্তি ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি দেখিয়ে দিন।
১৩. গভীর চিন্তাশীল দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআন পাঠ করুন। তাতে রয়েছে এমনসব দিকনির্দেশনা ও দলিল-প্রমাণ যা আপনাকে স্বস্তি ও প্রশান্তির স্বাদ দিবে।
১৪. দুঃখ-বেদনার মুহূর্তে মনের মধ্যে গুচিবায়ু ও সংশয়প্রবণতা দানা বাঁধে, আবার হাসি-আনন্দের সময় তা স্তিমিত হয়ে যায়। তাই যাবতীয় দুঃখ-বেদনার কার্যকারণগুলো এড়িয়ে হাসি আনন্দে উজ্জীবিত থাকুন। আপনার হাসি-আনন্দ ও উৎফুল্লতাই শয়তানকে নিরাশ করে দিবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ২০১]

অর্থ: 'নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।' (আরাফ, ৭: ২০১)

১৫. জনৈক সুফী-সাধক গুচিবায়ু রোগের একটি কার্যকর প্রতিষেধক বাতলে দিয়েছেন:

'নিদিষ্ট কোনো ইবাদতে মশগুল হওরা, কুরআন হিফজ করা, দ্বীনি ইল্ম চর্চা করা ইত্যাদিতে প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গড়ে তুলুন। প্রতিযোগিতা হতে পারে আপনার স্বজন-বন্ধুজন, সহকর্মী কিংবা সহপাঠীদের সঙ্গে। এভাবে আপনার প্রতিদিনের জীবন যখন ব্যস্ত ও কর্মমুখর হয়ে উঠবে, মনের মধ্যে সন্দেহ ও সংশয়প্রবণতা বাসা বাঁধার সুযোগ পাবে না।'

১৬. হাঁটা-চলা ও সাঁতার কাটার মতো প্রতিদিনের সহজাত শরীরচর্চায় অভ্যস্ত হোন। নিয়মিত ব্যায়াম করুন। ভালো হয় যদি প্রাণোচ্ছল, হাস্যবদন ও আশাবাদী বন্ধুজনদের সঙ্গে শরীর চর্চা করতে পারেন। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিচিত্র দর্শনীয় স্থানে বেড়াতে যান।
১৭. শুচিবায়ু রোধে রাসূল ﷺ-এর আদর্শই হলো শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। মনের দ্বিধা-সংশয়ের সাথে তাল না-মিলিয়ে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকুন। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বসংবলিত যিকির ও দু'আ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরুদ পাঠে মশগুল থাকুন।
১৮. চারপাশের অসৎসঙ্গ বর্জন করে সৎ, নীতিবান ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে থাকুন। সংশয়প্রবণতা ও শুচিবায়ুর দুর্দশায় তারাই হবেন আপনার সুপারামর্শক। সংশয়প্রবণ মানসিকতা দূর করে আপনার জীবনকে উচ্ছল প্রাণবন্ত করতে তারা হবেন আপনার সহযোগী বন্ধু।
১৯. অবসর যাপন থেকে বেঁচে থাকুন। অবসর হলো দ্বিধা-সংশয়ের উর্বরভূমি। অবসরে কোনো প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম কিংবা জনহিতকর উদ্যোগে অংশগ্রহণ করুন।
২০. যে সমস্ত পাঠ অধ্যয়ন ও দর্শনের বিচার-বিশ্লেষণ আপনার মনে সংশয় সৃষ্টি করে, তা থেকে বিরত থাকুন। এছাড়াও স্বভাবজাত কিছু কাজ আছে, যা আপনাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলবে। যেমন: চার পাশের সমাজ ও মানুষের প্রতি নেতিবাচক ধারণা, স্বামী স্ত্রীর কিংবা স্ত্রী স্বামীর মোবাইল চেক করা, মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ানো ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।
২১. শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে সন্দেহ-সংশয়ের নেতিবাচক প্রভাব ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। গুরুত্ব দিয়ে বোঝাতে হবে যে, সাইক্রিয়াটিস্ট ও মনোবিদ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া লজ্জাজনক কিছু নয়। সেবাদানকারীদের প্রতি নির্দেশ থাকবে, তারা যেন সংশয়গ্রস্ত রোগীদের সাথে সদয় ও কোমল আচরণ করে। ধারাবাহিক আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সংশয়-প্রবণ মানসিকতা দূর করে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।

২২. সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় ও সুনিশ্চয়তার সাথে 'না' শব্দটিকে ব্যবহার করুন। ওয়ু করেছেন, শয়তান আপনার মনে সন্দেহ জাগাবে-ওয়ু পুরোপুরি হয়নি, কিছু একটা বাকি রয়েছে। আপনি বলুন, 'না', আমার ওয়ু যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। অবচেতন মনে শয়তান যদি এমন সন্দেহ সৃষ্টি করে-আপনি তো জীকে তালুক দিয়েছেন। আপনি বলুন, 'কখনো না, হতেই পারে না।' শয়তান যদি মনের মধ্যে এ প্ররোচনা ঢুকিয়ে দেয়-আপনার সন্তান বিপদে পড়েছে। আপনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলুন, 'না, আল-হামদুলিল্লাহ, সে খুব ভালো আছে। আল্লাহ তার পরম রক্ষণা-বেক্ষণকারী।' যদি এমন সংশয় সৃষ্টি করে-আপনার নামায হয়নি। আপনি বলুন, 'না, আমার নামায ত্রুটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।' এভাবে দৃঢ়প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সাথে জীবনের প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করুন।

২৩. সর্বশেষ আপনার প্রতি আমার উপদেশ হলো, দ্বিধা-সংশয়ের পরওয়া না করে প্রশান্তচিত্ত হোন। নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করুন। মহান আল্লাহ তা'আলার তাওফিক কামনা করুন এবং তাঁরই ওপর ভরসা করুন। শয়তান আপনার পিছু লেগে থাকে, আপনার মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করার কাজে মত্ত থাকে। এতেই প্রমাণিত হয় আপনার ঈমান পরিপক্ব। আপনার ঈমানী বলে শয়তান শঙ্কিত। সুতরাং, নিজের ঈমানী বলপ্রয়োগ করুন, শয়তানের প্ররোচনা নিষ্ফল করে দিন।

পরিশিষ্ট:

- ❖ চাক্ষুষ দলিল-প্রমাণের আলোকে দ্বিধা-সংশয় দূর করে অগাধ বিশ্বাস লাভের ঘটনাটি ঘটেছে তাওহিদ ও একত্ববাদের দীক্ষার প্রাণপুরুষ ইবরাহিম (আ.)-এর ক্ষেত্রে। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আরজ করলেন:

﴿رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُخَيِّرُ الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ২৬০]

অর্থ: 'হে আমার রব! আমাকে দেখান, কীভাবে আপনি মৃতদের জীবিত করে তুলেন।' (বাকারা, ২: ২৬০)

তাঁর রব জিজ্ঞেস করলেন: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنُ﴾ [البقرة: ২৬০]

অর্থ: ‘তবে কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?’ (বাকারা, ২: ২৬০)

তিনি বললেন: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيُظْهِرَنَّ لِّي﴾ [البقرة: ২৬০]

অর্থ: ‘বিশ্বাস তো হয়েছে। কিন্তু মনের প্রশান্তির জন্য (বলছি)।’
(বাকারা, ২: ২৬০)

এরপর আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশে তিনি চারটি পাখি আনলেন। পাখিগুলোকে টুকরো টুকরো করে চারটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। বাতাসের তোড়ে পাখির টুকরোগুলো মুহূর্তেই চারপাশে মিলিয়ে গেল। ইবরাহিম (আ.) চার পাহাড়ের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ালেন। উঁচু আওয়াজে পাখিগুলোকে ডাকলেন। আল্লাহ তা‘আলার অপার কুদরতে প্রতিটি পাখি নিজ আকৃতিতে ফিরে এলো। হযরত ইবরাহিম (আ.) বিস্ময় ভরে দেখলেন, প্রতিটি পাখি অবিকল আগের মতোই পূর্ণাঙ্গ অবয়ব ধারণ করে ফিরে এসেছে। তিনিও হৃদয়াত্মা জুড়ে আশ্বস্তি ও প্রশান্তির শীতলতা অনুভব করলেন। আপন রবের প্রজ্ঞা, ক্ষমতা ও শক্তিমত্তার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হলেন।

- ❖ কবি বলেন: ‘জীবনের বিচিত্রময় বহু লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পিছনে ছুটে এখন নিজেই দিশেহারা। তার জীবনের নেই কোনো সফলতা, নেই ব্যর্থতা।’
- ❖ সহিহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে আরজ করলেন, ‘ঈমানের বিষয়ে তাঁদের মনে কখনো-কখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করে।’ রাসূল ﷺ বললেন:

ذَلِكَ مَخْضُ الْإِيمَانِ". (مسند إسحاق بن راهويه) ১০২২/ ৩

অর্থ: ‘এটাও ঈমানের অংশ।’^{২৪}

অর্থাৎ, মানুষের মনে স্বভাবিকভাবেই শয়তানের প্ররোচনা ও দ্বিধা-সংশয় সৃষ্টি হবে। এ জাতীয় সন্দেহ-সংশয়কে ঘৃণা করা, তা থেকে বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করাই হলো ঈমানের পরিচায়ক।

^{২৪} মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ: ৩/১০২২

রিয়্যা ও লৌকিকতা

রিয়্যা ও লৌকিকতা হলো আল্লাহ তা'আলার প্রতিদান ও শাস্তির পরোয়া না করে, লোকসমাজে প্রশংসা ও সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করা এবং নিজের যতো বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা জাহির করা ।

الرِّيَاء (রিয়্যা) শব্দটি الرُّؤْيَةُ থেকে এসেছে । রিয়্যা হলো লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে কাজ করা । আর ইখলাস হলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করা । সুতরাং রিয়্যা ও ইখলাস একটি অপরটির বিপরীত, একটি অপরটির সাথে সংঘর্ষিক ।

রিয়্যাকারী তার কাজকর্মে ও উদ্দেশ্যে দোদুল্যমান দ্বিধা-দ্বন্দ্বগ্রস্ত । তার চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা পরিশুদ্ধ নয়, অসুস্থ চিন্তা । জনসম্মুখে উদ্যমী কর্মতৎপর, আর লোকচক্ষুর অন্তরালে অলস অকর্মা । একটু প্রশংসাতেই খুশিতে ঢগমগ হয়ে উঠে । সামান্য নিন্দার মুখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে । কেননা তার পরম কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য হলো লোকমুখে প্রশংসিত হওয়া । সমাজের চোখে শ্রদ্ধা ও মর্যাদার পাত্র হওয়া । পরকাল ও আখেরাত সম্পর্কে তার কোনো চিন্তা-ফিকির নেই । আল্লাহ তা'আলার দরবারে হিসেব-নিকেশের কোনো পরোয়া নেই ।

কোনো ভালো কাজ করতে হলে জনসম্মুখে করে । কোনো নেক আমল করলে মানুষের কাছে তার কথা ছড়িয়ে বেড়ায় খ্যাতি ও সম্মান লাভের আশায় । তার যাবতীয় কাজকর্ম ও উদ্যোগ-আয়োজন সৃষ্টিকে দেখানোর জন্য; স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নয় ।

চারপাশের সমাজ ও মানুষের বাহ্যিক ক্ষমতা শক্তিমত্তা ও চাকচিক্যতেই সে মুগ্ধ । মহান রব ও স্রষ্টার সৃষ্টিশীলতা ও সর্বময় ক্ষমতা তার মনে দাগ কাটে

না। তাই সে স্রষ্টাকে ছেড়ে সৃষ্টির পিছনে ছোট্টে। মহান আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার ও তিরস্কারের পরেয়া না করে সৃষ্টির মুখে প্রসংশার পালিশে খুশি হয়।

রিয়াকারী যতো ভালো কাজই করুক-না-কেন, এর বিনিময়ে পরকালে সে কোনো পুরস্কার পাবে না। তার ভাগ্যে জুটবে শুধু তিরস্কার ও ভৎসনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা শুধু বান্দার এমন আমল কবুল করেন, যা রিয়া ও লৌকিকতামুক্ত। যাতে লোক দেখানো ও প্রদর্শনবাদিতার কোনো ছাপ থাকে না।

নিজেদের জীবনকে সুন্দর সাবলীল করে তোলার জন্য, আমলের প্রতিদান লাভের জন্য এবং পরকালের সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে অবশ্যই আমাদের লৌকিকতামুক্ত হতে হবে। কিন্তু তার উপায় কী? এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

সমাধান:

১. চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তা'আলা কতো মহান সত্তা, আর আপনি কতো নগণ্য বান্দা। একবার ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা'আলার সাথে আপনার সম্পর্কের ভিত্তি কী? এ সম্পর্কের মহত্ত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। সমাজ ও মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক কীসের? এ সম্পর্কের ক্ষুদ্রতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব মনে রাখুন। চূড়ান্তে গিয়ে আপনাকে একক অদ্বিতীয় মহান সত্তার সামনেই দাঁড়াতে হবে।
২. সবসময় মনে রাখুন, মুশরিক, রিয়াকারী ও প্রদর্শনবাদী লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنۢ عَمَلٍۭ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ [সূরা

الفرقان: ২৩]

অর্থ: তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু আমল করেছে, আমি তার ফায়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূণ্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (এর মত মূলহীন) করে দিব। (ফুরকান, ২৫: ২৩)

৩. রিয়া ও লৌকিকতার খোলসমুক্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও সাহায্য প্রার্থনা করুন। সাহায্য প্রার্থনার সর্বোৎকৃষ্ট পস্থা হলো ধৈর্য, অবিচলতা ও সালাত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ১৫৩]

অর্থ: হে মুমিনগণ! সবার ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবারকারীদের সাথে আছেন। (বাকারা, ২: ১৫৩)

৪. স্রষ্টার সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক, বাকি সৃষ্টির সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তাদের থেকে নির্মুখাপেক্ষী করে। এ পর্যায়ে উপনীত হয়ে ব্যক্তি সমাজ ও লোকমুখের প্রশংসাবিমুখ হয়ে মহান রবের সম্ভৃতি প্রত্যাশী হয়ে উঠে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (التوبة: ১২৯)

অর্থ: তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তারই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনি মহা আরশের মালিক। (তাওবা, ৯: ১২৯)

৫. যে সমস্ত নেক আমল প্রকাশ্যে কিংবা জামাতবদ্ধ হয়ে পালন করা আবশ্যিক নয় তা একান্তে নির্জনে সম্পন্ন করুন। আর প্রকাশ্যে জামাতবদ্ধ হয়ে অবশ্যপালনীয় কাজগুলো ইখলাস ও একনিষ্ঠতার সাথে পূরা করুন।

৬. মনে রাখুন, আপনি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার তত্ত্বাবধানে ও নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ১]

অর্থ: 'নিশ্চিত জেনো রেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর লক্ষ্য রাখছেন।' (নিসা, ৪: ১)

৭. হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলার বলেছেন:

"أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ، مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ" (مسند أحمد مخرجا ١٥/ ٣٨٢)

অর্থ: 'শরীকদের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, আমি তার আমল থেকে দায়মুক্ত। সে যে শরীক করেছে, আমলটি তার জন্য সাব্যস্ত হবে।' (মুসনাদে আহমাদ: ১৫/৩৮২)

রাসূল ﷺ-এর এ বাণীটিও স্মরণ রাখুন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ سَمَعَ سَمَعَ اللَّهِ بِهِ وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهَ بِهِ". (صحيح المسلم: برقم: ৭৩৬৬)

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জনসম্মুখে প্রচারের ইচ্ছায় নেক আমল করে আল্লাহ তা'আলাও তার কৃতকর্মের অভিপ্রায়ের কথা লোকদেরকে জানিয়ে ও গুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লৌকিকতার উদ্দেশে কোন নেক কাজ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রকৃত উদ্দেশের কথা লোকদের মাঝে ফাঁস করে দিবেন।' (মুসলিম, হাদীস নং: ৭৩৬৬)

৮. নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা করুন, যাদের আপনি নিজের কর্ম-কীর্তি দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন, যাদের সামনে নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের প্রদর্শনী করছেন, তারা কে? তারা না আপনাকে সৃষ্টি করেছে, না আছে তাদের এক মুঠো রিযিক দানের সামর্থ্য। তাদের না আছে ক্ষমা করার যোগ্যতা, না আছে আরোগ্য দানের ক্ষমতা। জীবন দান করা, মৃত্যু দেওয়া এবং পরকালে আমলনামার হিসাব গ্রহণ করা-এসব কিছুই তাদের মানবিক ক্ষমতার বহু উর্ধ্বে।

৯. আপনি একজন মানুষ। আপনাকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি মহা পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাবান। তিনিই আপনাকে

রিযিক দান করেন। যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করেন। সুস্থতা-অসুস্থতা, জীবন-মৃত্যু-এসবের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। এমন মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জন বাদ দিয়ে দুর্বল মরণশীল মানবজাতিকে খুশি করার জন্য জীবনভর কাজ করে যাবেন, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি কখনো তা সমর্থন করবে না।

১০. একটিবার ভেবে দেখুন, জীবনের মতো নামায-রোযা, দান-সদকা, ইলম চর্চা ও জ্ঞান সাধনা-সমস্তই বরবাদ হয়ে যাবে; গোটা জীবনের শ্রম-সাধনা পণ্ড শ্রমে পরিণত হবে, শুধু রিয়া ও লৌকিকতার কারণে।

১১. রিয়ামুক্ত থাকার জন্য সবসময় এ দু'আটি পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ সজ্ঞানে শিরক করা থেকে আপনার পানাহ চাই। যা না জেনে, না বুঝে করছি, তার জন্য ক্ষমা চাই।'

১১. মনে রাখুন, যে মানুষ নিজেই নিজের উপকার করতে পারে না, নিজেকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে না, সুস্থতা-অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, জীবন-মৃত্যুর কর্তৃত্ব রাখে না, সে কীভাবে আপনার উপকার ও কল্যাণ সাধন করতে পারে?! তাকে মানানোর জন্য, খুশি করার জন্য নিজেকে প্রদর্শন করার এবং কল্যাণমুখী উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত থাকার কী অর্থ হতে পারে?!

১২. কাল কেয়ামতের ময়দানে কতো জ্ঞানী-গুণী, কতো সাধক পুরুষ শুধু রিয়ার কারণে তাদের জ্ঞানচর্চা ও সাধনার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। কতো সংস্কারক ও সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব আমৃত্যু সংস্কারকার্য ও সংগ্রামের পুরস্কার-বঞ্চিত হয়ে তিরস্কার ও ভৎসনার শিকার হবে, শুধু লৌকিকতার কারণে।

তাই প্রতিটি কাজের আগে নতুনভাবে নিয়ত করুন। নিয়তকে শুদ্ধ-পরিপুষ্ট করুন। প্রতিটি কাজ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করুন। রিয়া ও লৌকিকতা থেকে সদা সতর্ক থাকুন।

পরিশিষ্ট:

- ❖ বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এরিস্টটল^{২৫} বলেছেন:

‘ইহকালীন জীবনে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে হলে আপনার জন্য সংক্ষিপ্ত পথটি হলো, আপনার ভেতর-বাহির এক হওয়া।’

- ❖ ইসলামী খেলাফতের চতুর্থ খলীফা, আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) বলেছেন:

‘লৌকিক ও প্রদর্শনবাদী লোকের আলামতগুলো হলো, নির্জনে একাকীত্বে সে অলস অকর্মা থাকবে। আর জনসম্মুখে সর্বকর্মা হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। আত্মপ্রশংসায় খুশিতে আটখানা হয়ে কাজের গতি বাড়িয়ে দিবে। একটু নিন্দা ও বদনামে ভেঙ্গে পড়বে।’

^{২৫} তাঁকে প্রাণীবিজ্ঞানের জনক বলা হয়। এছাড়া প্লেটোর সাথে যৌথভাবে তাঁকে “পশ্চিমা দর্শনের জনক” বলে অভিহিত করা হয়। এরিস্টটল সফ্রেটিস ও প্লেটোর দর্শনসহ তাঁর পূর্বের সময়ের বিদ্যমান বিভিন্ন দর্শনের জটিল ও সদৃশ সমন্বয় দেখান। জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৫। মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩।

মিথ্যা

মিথ্যা হলো, একটি সত্য ও বাস্তবতার আংশিক কিংবা আগাগোড়া পরিবর্তন করে ফেলা। যা আদৌ ঘটেনি তা বানিয়ে বলাও মিথ্যা।

মিথ্যার মূল উদ্দেশ্য হলো ধোকা দেওয়া ও প্রতারণা করা। মানবিক স্বভাব-চরিত্রের মধ্যে মিথ্যাই হলো সবচেয়ে ঘৃণ্য নিকৃষ্ট।

এর কারণে ব্যক্তি চারপাশের মানুষের আস্থা ও বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে। পরিবার ও সমাজে চরম উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে অসত্য ও মিথ্যা হলো মুনাফেকির আলামত।

সমাজের অধিকাংশ গুনাহ, নাফরমানি, অন্যায়-অনাচারের অন্যতম কারণ হলো অসত্য ও মিথ্যা, যা মানুষের মনুষ্যত্ব, নীতি-নৈতিকতাকে সমূলে ধ্বসিয়ে দেয়।

ব্যক্তি যদি সমাজে একবার মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় চারপাশের মানুষ তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। তার সাথে উঠা-বসা ও চলা-ফেরায় সদা সতর্ক থাকে-না জানি কখন তার মিথ্যার ফাঁদে পা ফসকায়।

মিথ্যা চোরাবালির মতো ভয়ানক। একটা মিথ্যার ফাঁদে জড়িয়ে গেলে আরও দশটি মিথ্যা তাকে ঘিরে ধরে। ক্রমশ আরও একশটি মিথ্যা তাকে গ্রাস করে ফেলে। একপর্যায়ে অবস্থা এতই গুরুতর হয় যে, তার সত্য কথাও মানুষ বিশ্বাস করতে চায় না।

সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে অসত্য ও মিথ্যার স্বভাব পরিহার করে ন্যায় ও সত্য অবলম্বনের বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে আমাদের করণীয় কী?

সমাধান:

১. মিথ্যার নিন্দা করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾

[النساء: ৫০]

অর্থ: দেখ, তারা আল্লাহর প্রতি কি রকমের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। প্রকাশ্য গুনাহের জন্য এটাই যথেষ্ট। (নিসা, ৪: ৫০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا

أَوْثُمَنَ خَانَ.” (صحيح البخاري) ১/ ১৬

অর্থ: ‘মুনাফিকের আলামত তিনটি: কথা বললে মিথ্যা বলে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করে। আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।’ (বুখারী: ১/১৬)

২. মিথ্যার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে। কেননা তা কখনো কখনো নেফাক ও কপটতা থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে কুফুরির দিকে ঠেলে দেয়। পবিত্র কুরআনের বানী:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: ১০৫]

অর্থ: আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ তো তারাই করে, যারা আল্লাহর আয়াতের উপর ঈমান রাখে না। প্রকৃতপক্ষে তারাই মিথ্যাবাদী। (নহল, ১৬: ১০৫)

৩. সন্তানদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। সততা ও সত্যবাদিতার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বরোপ করা কর্তব্য। ইহকালে ও পরকালে মিথ্যার অশুভ পরিণতি থেকে সতর্ক করতে হবে।

৪. আজ থেকে নিজেই নিজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন, কখনো মিথ্যা বলবেন না, গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর বিষয়ে তো নয়-ই; এমনকি হাসি-তামাশাতেও না। সদা সত্য বলুন। রাসূলুল ﷺ-এর বানী মনে রাখুন:

«وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا» (صحيح مسلم) ১/ ২০১৩

অর্থ: 'ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে; সততায় সচেষ্টি থাকে, একপর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সত্যবাদী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়।' (মুসলিম: ৪/২০১৩)

৫. মিথ্যার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকুন। কখনো যেন আল্লাহ তায়ালার দরবারে মিথ্যাবাদীদের খাতায় আপনার নাম না উঠে। সবসময় রাসূল ﷺ-এর বানী মনে রাখুন:

«وَيَاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»

অর্থ: 'মিথ্যা ও অসত্য থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মিথ্যা শুধু পাপাচারের পথ খুলে দেয়। পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। ব্যক্তি অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে। মিথ্যায় লিপ্ত থাকে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে মিথ্যাবাদী হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।' (মুসলিম: ৪/২০১৩)

৬. মিথ্যা কখনো কোনো সমস্যার সমাধান হতে পারে না, মুক্তির উপায় হতে পারে না। মিথ্যার কারণে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে ও জটিল আকার ধারণ করে। তাই মনে রাখতে হবে-সত্যেই মুক্তি; মিথ্যায় ধ্বংস।

সং ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকুন। তাঁদের সান্নিধ্য আপনাকে সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠতায় অনুপ্রাণিত করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

অর্থ: 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।' (তাওবা, ৯: ১১৯)

৭. চরম সংকট ও প্রতিকূলতার মুহূর্তেও যারা সততার পথ বেছে নিয়েছেন, সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছেন, আল্লাহর উপর ভরসা করে বিপদ ও সংকট থেকে রক্ষা পেয়েছেন, তাদের ঘটনা পড়ে শিক্ষার্জন করুন।

কিন্তু যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে, কপটতার কুটকৌশল খাটিয়ে সমস্যা ও সংকটের বেড়াজালে আরও ভালোভাবে ফেঁসে গেছে তাদের ঘটনা পরিণতি জেনে সতর্ক হোন।

৮. সতর্ক হোন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন-হাসি-তামাসায় ভুলেও ছোট-ছোট মিথ্যায় প্রবৃত্ত হবেন না। মিথ্যা যতো নগণ্য হোক, অসত্যের দোষে দুষ্টতা বর্জনীয়। হাদীসে রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ." (سنن أبي داود) ৫/ ২৫৩

অর্থ: আবু উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের জিম্মাদার; আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের জিম্মাদার।' (আবু দাউদ: ৪/২৫৩)

৯. শোনা কথায় কান দিবেন না। কেননা এর কারণে একপর্যায়ে মিথ্যার বদভ্যাস হয়ে যায়। যে কোনো তথ্য ও সংবাদ আগে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানুন এবং সুনিশ্চিত হোন, তারপরই তা গ্রহণ করুন এবং প্রচার করুন।

“তারা বলেছে, তারা বলে”—এ ধরনের পরিভাষা পরিহার করুন। এ পরিভাষাগুলো ধারণা ও অনুমান মাত্র। মানুষের কিছু ধারণা ও অনুমান শুনাহ সমান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ [الحجرات: ১২]

অর্থ: নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। (হুজুরাত, ৪৯: ১২)

১০. জীবনের প্রতিটি সর্বাস্থানে ন্যায় ও সততাকে প্রাধান নীতি হিসেবে অবলম্বন করুন এবং মিথ্যার জঘন্যতা ও অশুভ পরিণতির কথা ভেবে মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকুন। দেশ, রাষ্ট্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্ম-কর্ম-নির্বিশেষে অতীত-বর্তমানের সকল জ্ঞানীজন একমত—মিথ্যা ও কপটতা চরম নিকৃষ্ট স্বভাব। একজন সভ্য-ভদ্র মানুষ কখনো এ দোষে দুষ্ট হতে পারে না।

১১. মনে রাখুন, যে মিথ্যা বলে, ধোকা দেয়, মানুষ ও সমাজ তার ব্যাপারে কতো খারাপ ধারণা পোষণ করে! কী কদর্যভাবে তার সমালোচনা করে! শুধু মানুষের খারাপ ধারণা ও সমালোচনাই নয়, মিথ্যাবাদী ও তার সম্মান-সম্মতি সামাজিকভাবে নানা প্রতিকূলতার শিকার হয়। তাই সর্বদা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি মনে রাখুন:

﴿ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ৬১]

অর্থ: ‘তারপর আমরা সকলে মিলে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী, তাদের প্রতি আল্লাহর লানত পাঠাই।’

(সূরা আলে-ইমরান, ৩: ৬১)

কে-ই-বা চাবে আল্লাহ তা‘আলার অভিশাপের পাত্র হতে।

১২. একটি বিষয়ে সতর্ক হোন, মিথ্যা আপনাকে নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন করবে, ক্ষতি ও বরবাদির দিকে ঠেলে দিবে এবং জাহান্নামে যাওয়ার পথ তরান্বিত করবে। কেননা তা ঈমানের পরিপন্থি, নীতি-নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের বিরোধী। তা সমস্ত মহৎ গুণাবলি নিঃশেষ করে দেয়। সুতরাং অসত্য ও মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকুন। নিরাপদ সুখী জীবনযাপন করুন।

১৩. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সততার প্রতিদান লাভে নিয়ত প্রয়াসী হোন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: ১১৭]

অর্থ: 'আল্লাহ বলবেন, 'এটা হল সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জান্নাতসমূহ যার নীচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা মহাসাফল্য।' (মায়িদা, ৫: ১১৯)

১৪. সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

"إِنْ تَصَدَّقِ اللَّهَ يَصْدُقْكَ". (سنن النسائي) ৬/ ৭০

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলার বিধিবিধান পালনে তুমি যদি একনিষ্ঠ হও, সততার পরিচয় দাও, আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে তার পুরস্কারের ওয়াদা সত্য করে দেখাবেন।' (সুনানুন নাসায়ী: ৪/৬০)

পারিশিষ্ট:

❖ প্রখ্যাত গবেষক ও সাহিত্যিক আমীন রায়হানী বলেন:

'প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদীরা যদি কাউকে বিশ্বাসও করে তবুও কেউ তাদের বিশ্বাস করে না।'

❖ আল্লামা ইবনুল কায়্যিম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন:

'লক্ষ্য করুন-আল্লাহ তা'আলা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সততার কী শ্রেষ্ঠ পোশাকটিই পরিধান করিয়েছেন। সততার গুণে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ সত্যবাদীকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এর স্বীকৃতিও দিয়েছেন:

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

অর্থ: 'আর যে ব্যক্তি সত্য কথা নিয়ে আসে এবং নিজেও তা বিশ্বাস করে, এরূপ লোকই মুতাকী।' (সযুমার, ৩৯: ৩৩)

এর বিপরীতে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা 'মুসাইলামাতুল কাযযাব'-এর দেহে অসত্য ও মিথ্যার কী কালিমা লেপে দিয়েছেন। আজও তার নামের সাথে মিথ্যার দুর্গন্ধ লেগে আছে। মানুষ আজও তাকে **كَذَّابٌ** (চরম মিথ্যাবাদী) হিসেবে স্মরণ করে।

পরনিন্দা ও চোগলখুরি

গীবত ও পরনিন্দা হলো অনুপস্থিত ব্যক্তির সমালোচনা করা। যা প্রমাণ করে, গীবতকারীর ধার্মিকতায় খাঁদ আছে। পরনিন্দা ও দোষচর্চার মূল কারণ হলো হিংসুটে মন ও অসুস্থ মানসিকতা। পরনিন্দা নিন্দুকের ভীৰুতা ও কাপুরুষতার কথা বলে দেয়। কেননা নিন্দুক কখনো তার সমালোচিত ব্যক্তিটির মুখোমুখি হওয়ার সাহস করে না, কখনো স্পষ্টবাদী হয়ে মনের খেদ প্রকাশ করতে পারে না।

গীবত ও পরনিন্দা হলো অনুপস্থিত সমালোচিত ব্যক্তির মানহানি করার কদর্য পন্থা। আর চোগলখুরি হলো মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কথা রটিয়ে বেড়ানো। যেমন কোনো ব্যক্তি দু' বন্ধুর সম্পর্ক নষ্ট করার উদ্দেশ্যে একজনের কথা অপরজনের কানে দেওয়া, অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা লাগিয়ে গোল বাঁধানো। চোগলখুরির ক্ষেত্রে ব্যক্তির রটানো কথা সত্য হোক বা মিথ্যা, হোক না তার উদ্দেশ্য সৎ কিংবা অসৎ, এর চূড়ান্ত পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

পরনিন্দা ও চোগলখুরি ভালবাসা ও সম্প্রীতির ভিত নাড়িয়ে দেয়। ভ্রাতৃত্বের মতো পবিত্র সম্পর্ক কলুষিত করে। পরস্পর আস্থা ও বিশ্বাস ধ্বংস করে দেয়।

বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞজন যথার্থ বলেছেন:

‘পরনিন্দা ও চোগলখুরি হলো গলিত পুঁজ ও দুর্গন্ধ বমি। যা কলুষিত মন থেকে বেরিয়ে মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।’

পরনিন্দা ও চোগলখুরি-কাজ দুটি অত্যন্ত জঘন্য ও নিরব বিধ্বংসী। এর কারণে বহু দেশ, সমাজ ও সভ্যতায় হিংসা-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ক্রমশ তা বনের লেলিহান আগুনের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বাতাস যতো

জোড়ালো কাপড়ের বনের আগুন প্রতিহত করার চেষ্টা করে, আগুন মুহূর্তে বনের গভীর হতে গহীনে ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণে অনেক বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। বহু রক্তপাত হয়েছে। বহু ধ্বংস-বিনাশ ঘটেছে।

সমাজে যদি মান-সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে হয়, গৌরব ও মর্যাদা অটুট রাখতে হয়, অবশ্যই পরনিন্দা ও চোগলখুরির মতো ঘৃণ্য স্বভাবদোষ পরিহার করতে হবে। এ লক্ষ্যে কার্যকর উপায় ও করণীয় পদক্ষেপ কী?

সম্মান:

১. তাকওয়া ও খোদাতীতি অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, অন্যের দোষচর্চা করা ও পরনিন্দা করা কুরআন সূন্যাহর বিধানের হারাম এবং মানবীয় দৃষ্টান্তের অসম্মত। পবিত্র কুরআনে গীবত ও পরনিন্দার বিষয়টিকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো অসম্মত কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে:

﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ

مَيْتًا فَكِرْهُتُمْ ۖ﴾ [الحجرات: ১২]

অর্থ: 'এককে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক।' (হুজুরাত, ৪৯: ১২)

২. শয়তান আপনাকে মিষ্টি কথায় এভাবে তোলানোর চেষ্টা করবে:

‘মানুষ বেপরোয়াভাবে অন্যায়-অপরাধ করবে, আর আপনি বলতেও পারবেন না? ২৬ আপনি তো মিথ্যা বলছেন না, সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে ভুলভাল বকছেন না, যা বলছেন নিরোট সত্য, তাতে গীবত ও পরনিন্দা হলো কীভাবে?’

শয়তানের এমন সাধুচরিত্রের মিষ্টি কথায় প্ররোচিত হবেন না। এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর বানীই চূড়ান্ত। তিনি বলেছেন:

২৬ অন্যায়-অন্যায়্য হলো গোপনে তার চর্চা করা, আর প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করা-স্পষ্টতই দুটি ভিন্ন বিষয়।

«أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ» (صحيح مسلم) ২০০১/ ৬

অর্থ: ‘তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে?’ সাহাবায়ে কেরাম বললেন: ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।’ রাসূল ﷺ বললেন: ‘(গীবত হলো) তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে।’ জিজ্ঞাসা করা হলো: ‘ভাই সম্পর্কে আমার মন্তব্য যদি (সত্য ও বাস্তব) হয় তাহলেও?’

রাসূল ﷺ বললেন: ‘তার সম্পর্কে তোমার কথা যদি বাস্তব হয় তবেই তো গীবত। আর যদি অবাস্তব ও অসত্য হয় তাহলে তো তুমি তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে।’ (মুসলিম: ৪/২০০১)

৩. কিয়ামতের দিন চোগলখুরি, বান্দা ও তার জান্নাতের মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ» (صحيح مسلم ১০১/ ১)

অর্থ: ‘কোনো চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ (মুসলিম, ১/১০১)

৪. কুরআন-সুন্নাহর অনেক স্পষ্ট ভাষ্য এটা প্রমাণ করে যে, চোগলখুরি হারাম ও নিকৃষ্টতম কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّهِنَّ * هَٰذَا مَثَلٌ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [القلم: ১০, ১১]

অর্থ: ‘এবং এমন কোনও ব্যক্তির কথায়ও চলো না, যে অত্যাধিক কসম করে, যে হীন, যে নিন্দা করতে অভ্যস্ত, চোগলখুরি করে বেড়ায়।’ (কলাম, ৬৮: ১০-১১)

গীবত চোগলখুরি ব্যক্তির নেক আমল বরবাদ করে দেয়। সুতরাং পরনিন্দা ও চোগলখুরি করে ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যদা ও নেকআমলগুলোকে তুচ্ছ মূল্যে বিকে দিবেন না। কষ্ট করে যে নামায, রোযা ও দান সদকা করেছেন তা পণ্ড্রমে পরিণত করবেন না।

৫. লোকদের কাজকর্ম ও খুটিনাটি বিষয়ের পিছু পড়বেন না। কারো সম্পর্কে যদি কথা বলতেই হয় ভেবে-চিন্তে বলুন। কথাটি যদি মঙ্গলজনক হয় তবেই বলুন। অন্যথায় চুপ থাকাই শ্রেয়। রাসলুল্লাহ  বলেছেন:

"وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ."

(صحيح البخاري ৮/ ১১)

অর্থ: 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস করে সে যেন ভালো কথা বলে, নয় তো চুপ থাকে।' (বুখারী, ৮/১১)

৬. জ্ঞানী-গুণী, ধার্মিক ও পরহেযগার ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকুন। সময়ের সদ্ব্যবহার, কথাবার্তায় পরিমিত রক্ষা এবং আল্লাহর যিকিরের ক্ষেত্রে তাদের সংস্পর্শ আপনার জন্য সহায়ক হবে, গুনাহমুক্ত জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পরনিন্দুক ও চোগলখোর, তাদের সঙ্গে ত্যাগ করুন। কেননা এসব চারিত্রিক ভ্রষ্টতা হলো মহা সংক্রামক ব্যাধি। ক্ষণিকের সংস্পর্শেই এর বীজ ছড়াতে থাকে।

খবরের মূল উৎস ও প্রধান সূত্রের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার আগে কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না এবং মানুষের কাছে প্রচার করে বেড়াবেন না।

৭. সবসময় সচেতন থাকুন। নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন-কখনো পরনিন্দা করবেন না। প্রয়োজনে নিজের উপর ক্ষতিপূরণ আরোপ করুন। যেমন: ভুলে অনিচ্ছায় গীবত কিংবা চোগলখুরি করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করুন এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তা বাস্তবায়ন করুন। অথবা কোনো নেক আমল করুন। এভাবে ভালো কাজে নিয়োজিত হয়ে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা সহজ হবে।

৮. ঝিকির ও এন্তেগফারে যবান তরতাজা রাখুন। হৃদয়-মনের নিষ্কলুষতা ও পরিজ্ঞান নাভে সচেষ্ট হোন। কেননা পরনিন্দা ও চোগলখুরি অন্তরে গুহে-রাখা হিংসা বিবেকের জের ধরেই হয়ে থাকে।
৯. সদসময় কোনো-না-কোনো ভলোকাঙ্গে ব্যস্ত থাকুন। যেন পরনিন্দা ও কুটনামি করার সুযোগ না হয়।
১০. অন্যের দোষ না ঘেটে আত্মসমালোচনায় মনোযোগী হোন। পরিশ্রম ও নিয়তির কল্যাণে যতোটুকু অর্জিত হয় তাতেই তুষ্ট থাকুন। অন্যের সুখ-সৌভাগ্য দেখে হিংসা করা সমীচীন নয়। হিংসুক নিজেই তার হিংসার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরে।
১১. আপনার মনে যখন গীবত চোগলখুরি উসখুস করবে তখন স্মরণ করবেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে কী বলেছেন:

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا بِسِوَا خَلَوُا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ ۚ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۚ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ১৬]

অর্থ: 'যারা ঈমান এনেছে, তাদের সাথে যখন এরা মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি আর যখন নিজেদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদেরই সঙ্গে আছি। আমরা তো কেবল তামাশা করছিলাম।' (বাকারা, ২: ১৪)

নিজেকে, নিজের বিবেককে একবার জিজ্ঞাসা করুন, আপনার পক্ষে কি সম্ভব স্বভাব-চরিত্রে, দেহ-রক্তে মুনাফিকের স্বভাব ধারণ করা?

১২. সন্তানদের গঠনমূলক শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। পরনিন্দা ও চোগলখুরির কারণে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ যে অসুস্থ পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে, সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে।
১৩. একটি বিষয় সুনিশ্চিত, যারা অন্যের সমালোচনায় লিপ্ত থাকে, পরনিন্দা ও চোগলখুরিতে মজে থাকে সমালোচিত ব্যক্তির কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ ও বিবাদি হয়ে দাঁড়াবে।

চোগলখুরি ও পরনিন্দার কারণে যে আন্তরিক বন্ধুত্বে চিড় ধরবে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিন্ন হবে এবং পারিবারিক সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিবে তার দায়ভার নিন্দুক ও চোগলখোর ব্যক্তিকেই বহন করতে হবে। এ পাপের বোঝা তার ঘারেই চাপিয়ে দেওয়া হবে। মনে রাখুন, কথাবার্তায় পরিমিতি রক্ষা করা ও ন্যায়ানুগতা অবলম্বন করা হলো জান্নাতে প্রবেশে অন্যতম উপায়।

১৪. আপনি কি চান, গীবত ও চোগলখুরি করে মু'মিন বান্দাদের অভিশাপের পাত্র হতে? পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল ধরাতে? মানুষের মনে-মনে হিংসা বিদ্বেষের বিষ ছড়াতে? সমাজে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে? মুনাফেকি স্বভাবদোষে কলুষিত হয়ে মানবজাতির নিকৃষ্ট ইনসানে পরিণত হতে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শুনুন:

"إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءَ بِوَجْهِهِ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ". (صحيح البخاري ٧١/٩)

অর্থ: 'দু'মুখো মানুষ হলো সবচে' নিকৃষ্ট। যে এক দলের সাথে এক চেহারা জাহির করে, পরক্ষণেই অপর দলের সাথে ভিন্ন চেহায়ায় হাজির হয়।' (বুখারী, ৯/৭১)

হাদীসের অখ্যায়িত নিকৃষ্টতম ব্যক্তিটি হলে পরনিন্দুক ও চোগলখোর।

১৫. যে ব্যক্তি অন্যের মান-মর্যাদা রক্ষা করে চলবে আল্লাহ তা'আলাও তার মান মর্যাদা বজায় রাখবেন। আর যে অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে, ছিদ্রান্বেষণে মেতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালাও তার গোপন বিষয় জাহির করে দিবেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) (১৫০-২০২ হি.) বলেছেন:

'অন্যের দোষচর্চা করবেন না। অন্যের মতো দোষ-গুণে মিলিয়ে আপনিও তো একজন মানুষ। আপনার চোখ যেমন অন্যের ভুল-বিচ্যুতি খুঁজে বেড়াচ্ছে চারপাশের চোখগুলোও আপনার ভুলগুলো শনাক্ত করছে। সুতরাং অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখাই শ্রেয়।'

পরিশিষ্ট:

- ❖ বিখ্যাত জার্মান-আমেরিকান কবি সাহিত্যিক ও উপন্যাসিক চার্লস বুকোসকি (১৯২০-১৯৯৪ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:
'লোকদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। এতো ঘনিষ্ঠ হবেন না যে, পরে পস্তাতে হয়। এতো বেশি দূরে থাকবেন না যে, মানুষ পর ভাবে। আপনাকে থাকতে হবে সবার মধ্যে, সবার সাথে মিশে, অভিজাত ঈশ্বর দূরত্ব বজায় রেখে।'
- ❖ 'চোগলখুরি হলো একটি কদর্য স্বাভাব। যা আপনাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে ছাড়বে। তাই পরনিন্দা না করে মানুষের ইতিবাচক দিকগুলোর প্রশংসা করুন।' -আয়েয আল-কারনী
- ❖ বহু শাস্ত্রজ্ঞানী ইবনে হাযাম আন্দালুসী (রহ.) (৩৮৪-৪৫৬ হি.) বলেছেন :
'যুগে-যুগে যতো রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে, যতো অন্যায় রক্তপাত হয়েছে, ইজ্জত-আবরু লুপ্তিত হয়েছে তার অন্যতম কারণ ছিল ধোকা-প্রতারণা ও চোগলখুরি।'
- ❖ বিখ্যাত তাবেয়ী ও নাহশাস্ত্র প্রণেতা আবুল আসওয়াদ দু'আলী (রহ.) (৬৯ হি.) বলেছেন:
'যে চোগলখুরিই আপনার কানে আসুক তার কোনোটাই মেনে নিবেন না। চোগলখোরকে এক বিন্দু প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। আজ যে আপনার কাছে অন্যের কুৎসা রটনা করছে, অন্যের নামে কানপড়া দিচ্ছে কাল সে আপনাকে নিয়ে একই কাজ করে বেড়াবে।'
- ❖ বিখ্যাত মিশরীয় লেখক নাগীব মাহফুজ (১৯১১-২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
'আজ যে আপনার কাছে লোকদের নিন্দা সমালোচনা করছে, কোনো সন্দেহ নেই, কাল সে আপনার নামেই লোকদের কাছে কুৎসা রটিয়ে বেড়াবে।'

নামাযে অবহেলা

নামায হলো ইসলামের দ্বিতীয় রোকন। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসেব গ্রহণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ،
فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ."
(سنن الترمذي ت شاكر) ২৭০/২

অর্থ: 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসেব গ্রহণ করা হবে। যদি তা যথাযথ ঠিক হয় তাহলে বান্দা সফল কৃতকার্য। আর যদি নামাযে গরবর হয় তাহলে বান্দার ক্ষতি ও ধ্বংস অনিবার্য।' (তিরমিজী, ২/২৭০)

নামায ত্যাগ করা গুরুতর কবীরা গুনাহ। কোনো কোনো ইমাম ও ফকীহ-এর মতে কুফুরি, যা বান্দাকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ."
(سنن الترمذي ت شاكر) ১৬/৫

অর্থ: 'আমাদের মাঝে ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে পার্থক্য রেখা হলো নামায। সুতরাং যে নামায ছেড়ে দিলো, সে যেন কুফুরি করলো।' (তিরমিজী, ৫/১৪)

কুরআন সুন্নাহর বহু জায়গায় নামাযের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কখনো নামায কায়েমের আদেশ এবং নামাযে অবহেলার ব্যাপারে নিষেধ করার মাধ্যমে, আবার কখনো পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়ে এবং কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বহুবার বিভিন্নভাবে নামাযের গুরুত্ব ও মহত্ব বোঝানো হয়েছে।

নামায হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে বান্দার সম্পর্কের সেতুবন্ধন। সুতরাং, যে নামায ত্যাগ করলো সে যেন আপন রবের সাথে তার বাঁধন ছিন্ন করলো, রিযিকের পথ সংকুচিত করলো এবং ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্য সফলতার পথ রুদ্ধ করলো।

যুগের আধুনিকায়ন, বাহ্যিক চাকচিক্য, চারপাশের যান্ত্রিক ব্যস্ততার ভিড়ে নামাযের মতো মৌলিক ইবাদত নিতান্ত গৌণ হয়ে পড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গে ইসলাম ও মুসলমানের অধঃপতন ত্বরান্বিত হচ্ছে। মুসলিম জাতির চলমান এ সংকট কাটিয়ে উঠার পথ কী? এ ব্যাপক সমস্যার সমাধানই বা কী?

সমাধান:

১. সন্তানদের মধ্যে নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নামায কায়েমে পুরস্কার এবং নামাযে অবহেলায় তিরস্কার-উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পন্থা। পুরস্কার ও প্রশংসায় ব্যক্তির উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। তিরস্কার ও ভৎসনায় সতর্কতা ও সচেতনতা তৈরি হয়।

২. অভিভাবকগণ, সন্তানদের নামায কায়েমের লক্ষ্যে আপনাদের করণীয় কী হবে? জেনে রাখুন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের ভাষ্য থেকে:

"عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ الصَّلَاةَ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا

بَلَغُوا عَشْرًا". (مسند البزار = البحر الزخار) ১৮৭/ ১৭

অর্থ: 'সাত বছর বয়সে তোমাদের সন্তানদের নামায শিক্ষা দাও। দশ বছর বয়সে নামায ত্যাগ করার কারণে শাসন কর।

(মুসনাদুল বায়হার, ১৭/১৮৯)

৩. সন্তানদের নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলতসংলিত পরিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস পাঠ করে শোনাতে হবে। পরিত্র কুআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: ১৩২]

অর্থ: 'এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক।' (সূরা তাহা, ২০: ১৩২)

৪. ইহকাল ও পরকালে নামাযের সুফল সুনিশ্চিত । পরকালের আগে অন্তত ইহকালের সুফলগুলো মনে রাখুন-হৃদয়ের প্রশান্ততা, মানসিক প্রশান্তি, সফলতা সৌভাগ্য ও নেক আমলের তাওফীক-এর চেয়ে বড় সুফলতা ও প্রাপ্তি আর কী হতে পারে?!
৫. দু'আ হিসেবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি বারবার পাঠ করুন:
 ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾
 অর্থ: 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্যে হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে) । হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করুন ।' (ইবরাহীম, ১৪: ৪০)
৬. নামায ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতির কথা একবার ভাবুন-পরকালে কবরের আযাব ও জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি তো অবশ্যম্ভাবী । তার আগে ইহকালে সক্রিয় পরিণতির শিকার হতে হবে । নামায ত্যাগ করার কারণে অভাব-অনটন, বঞ্ছনা-গঞ্ছনা, দুঃখ-দুর্দশা, কাজেকর্মে ব্যর্থতাসহ ব্যক্তি-জীবনে নানা সংকট ও প্রতিকূলতা থেকে নিস্তার নেই ।
৭. মাতা-পিতাকে নামাযের প্রতি যত্নবান হতে হবে, নিজের ও পরিবারের মঙ্গলের স্বার্থে । সন্তানদের জীবনে তারাই হলেন প্রথম ও প্রধান অনুসৃত ব্যক্তিত্ব । পিতা তার ছেলেকে মসজিদে নিয়ে যাবেন । মা তার মেয়েকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করবেন । পিতা-মাতার সততা ও কল্যাণমুখিতা সন্তানদের জীবনে গভীর উৎসাহ উদ্দীপনা জোগাবে ।
৮. একটি মহৎ অভ্যাসে নিজেকে অভ্যস্ত করুন, আযান শোনামাত্রই সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিন । লেখাপড়া, আলোচনা-পর্যালোচনা, সভা-অনুষ্ঠান, যাবতীয় সবকিছু বন্ধ করে একমাত্র নামাযের জন্য পশ্চত হন । নামাযই হলো যাবতীয় কল্যাণ, সফলতা ও সৌভাগ্যের সোপান ।
৯. মসজিদে পাঁচওয়াক্ত নামাযের নির্ধারিত সময় মনে রাখতে হবে । আযান শোনা মাত্রই নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে । এক মুহূর্তও বিলম্ব করা যাবে না । কেননা তা অলসতা থেকে শুরু করে একপর্যায়ে অবহেলা ও নামায ত্যাগের অভ্যাসে পরিণত হয় ।

১০. যে সময়টুকু নামাযে ব্যয় করছেন, জীবনের অন্যান্য ব্যতিব্যস্ততার তুলনায় তা নিতান্তই কম। তাই কখনো এমনটা ভাবা সমীচীন নয়, নামাযের কারণে আমার পেশা ও কাজকর্মের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।
১১. মনে রাখুন, যে নামায ছুটে যাবে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনার উপর তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। অন্যথায় মৃত্যুর পর প্রথমে কবরে, তারপর কেয়ামত দিবসে কঠিন হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।
১২. কর্মক্ষেত্রে ও শিক্ষাঙ্গণে, সর্বত্র নামাযের পরিবেশ গড়ে তুলুন। সহকর্মী ও সহপাঠীদের নামাযে উদ্বুদ্ধ করুন। যে কাজ করতে গিয়ে নামাযে অবহেলা হয় আল্লাহ তা'আলা তাতে বরকত দান করেন না। শুধু কর্মী ও কর্ম দ্বারা কান্ডিত সুফল অর্জিত হয় না।
১৩. নামাযের প্রতি যত্নবান-এমন ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকুন। তাদের সংস্পর্শ আপনার জন্য সহায়ক হবে। নামাযে শৈথিল্যকারী অবহেলাকারী লোকদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। তাদের অসৎ সঙ্গ আপনার ক্ষতির কারণ হবে। মানুষ হলো অনুকরণপ্রিয় জাতি। সঙ্গ দোষে কিংবা সঙ্গুণে সে খুব দ্রুত প্রভাবিত হয়।
১৪. আপনি যদি ফরজ নামাযে রীতিমতো অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে নফল নামাযে যত্নবান হোন। কেননা তা ফরজ নামাযের জন্য নিরাপত্তা-প্রাচীর স্বরূপ। দু'টি কারণে সুন্নত ও নফল নামাযে যত্নবান হতে হবে।
প্রথমত: মানুষ মাত্র অবসাদ ও অলসতাপ্রবণ। দীর্ঘ জীবনে কৃত অভ্যস্ত কাজে সে কখনো-সখনো উদাসীন হয়ে পড়ে। সুতরাং, ব্যক্তি যদি ফরজ নামাযের পাশাপাশি সুন্নত ও নফল নামাযেও যত্নবান হয়, তাহলে কখনো ব্যস্ততা কিংবা উদাসীনতার কারণে সুন্নত ও নফল নামায ছুটে যেতে পারে। প্রথমেই ফরজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। আর যে ব্যক্তির মূল পুঁজিই হলো ফরজ নামায, অলসতা শৈথিল্যের কারণে প্রথম ধাপেই তার ফরজ নামায কাযা হয়ে যাবে।
দ্বিতীয়ত: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। তখন ফরজ নামাযে ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া গেলে সুন্নত নফলের মাধ্যমে সে ঘাটতি পূরণ করা হবে। সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন:

"إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ."

অর্থ: 'নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন বান্দার (হুকুকুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয় তাহলে সে পারিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয় তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরজ (নামাযের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'দেখ তো! আমার বান্দা কিছু নফল (নামায) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেওয়া হবে?' তারপর এ ভিত্তিতে বান্দার অবশিষ্ট আমলের হিসাব গ্রহণ করা হবে। (তিরমিজী, ২/২৭০)

১৫. দু'আর মাধ্যমে আল্লাহমুখী হোন। সাচ্চা নামাযী হওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার তাওফীক প্রার্থনা করুন। মনোযোগের সাথে আযান শুনুন এবং আযানের জবাব প্রদানে সচেষ্টি হোন। বিশেষভাবে মুআজ্জিনের **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ وَ عَلَى الصَّلَاةِ** বাণীর মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ** বলে এর উত্তর প্রদান করুন।

১৬. যাবতীয় গুনাহ ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা পাপাচার মানুষকে সদাচার থেকে বিরত রাখে। তাকে অন্যায়-অকল্যাণের পথে ঠেলে দেয়।

এক ব্যক্তি হাসান বসরী (রহ.)-এর নিকট অনুযোগ করলো:

'ফজর নামাযের জন্য ভোরে উঠতে চাই, কিন্তু পারি না।'

তিনি বললেন:

'গুনাহ ও নাফরমানি তোমাকে বিরত রাখে।'

১৭. ইন্টানেট, সোশ্যাল মিডিয়া ও টেলিভিশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সতর্ক হোন। আনন্দ-ফুর্তি ও খেল-তামাশা পরিহার করুন। কেননা তা বান্দকে নামায থেকে বিরত রাখে। বিষয়টি সম্পর্কে পবিত্র করআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [মরیم: ৫৭]

অর্থ: 'তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামায নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সম্মুখীন হবে।' (সূরা মারইয়াম, ১৯: ৫৯)

১৮. সিজদায় পড়ে, নামাযের শেষে কায়মনো বাক্যে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করুন। তিনি যেন আপনাকে নামায কায়মের তাওফিক দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয বিন জাবাল (রা.)-কে অসীয়াত করেছিলেন:

لَا تَدْعُ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ ... (المعجم الكبير للطبراني ২০ /

(১২০)

অর্থ: প্রত্যেক নামাযের পর অবশ্যই এ দু'আ পাঠ করবে:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমাকে আপনার যিকির শোকর ও ইবাদতের তাওফীক দান করুন।' (মুজামুল কাবীর লিত্তাবারানী: ২/১২৫)

১৯. নামাযে যত্নবান হোন। কেননা তা আপনার গুনাহ মাফের অন্যতম উপায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ

الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ» (صحيح مسلم) ১/ ২০৮

অর্থ: 'নামাযের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ওয়ূ করবে এবং যথযথভাবে ওয়ূ করবে, এরপর নামাযের উদ্দেশ্যে হেঁটে রওয়ানা হবে এবং লোকদের সাথে কিংবা জামাতবদ্ধ হয়ে, অথবা মসজিদে নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দিবেন।' (মুসলিম, ১/২০৮)

২০. বিশ্বাস করুন, নামায কায়েম করা ব্যতীত জীবনের পরম সুখ ও সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। নামায হলো আপন রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ উপায়। পবিত্র কুআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ১৫]

অর্থ: 'এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।'।

২১. মনে রাখুন, প্রচণ্ড গরমে মসজিদে যাতায়াত আপনাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। জাহান্নামের "যামহারীর"^{২৭}-এর শীতের তীব্রতা থেকে উদ্ধার করবে।
২২. আপনি যদি আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদাবনত না হন, তবে আপনাকে কামপ্রবৃত্তি ও শয়তানের প্ররোচনার সামনে নতজানু হতে হবে। আর যদি নামাযে যত্নবান হন, আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হন তাহলে অবশ্যই প্রবৃত্তির তাড়না ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারবেন।

^{২৭} কোন বান্দা যদি শীতকালে জাহান্নামের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে পানাহ চায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামের শীতলতা থেকে মুক্তি দান করেন। এ ব্যাপারে হাদীস শরিফে এসেছে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, 'যদি কোন বান্দা তীব্র ঠাণ্ডার সময় বলে, লা ইলাহা ইল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই)। আজকে দিনটি কতই না শীতল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জাহান্নামের জামহারীর থেকে মুক্তি দান করুন। তখন আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে লক্ষ্য করে বলেন, আমার এক বান্দা তোমার জামহারীর থেকে আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। আমি তোমাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি তাকে মুক্তি দিলাম।' সাহাবীগণ বললেন, জামহারীর কী? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন:

'জামহারীর হলো এমন একটি ঘর, যেখানে কাফেরদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে এর ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতায় তারা বিবর্ণ হয়ে যাবে।' (অনুবাদক)

২৩. মনে রাখতে হবে, মানসিক সংকট ও অস্থিরতা থেকে মুক্তির অন্যতম উপায় হলো নামায। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ [الحجر: ৯৭]

অর্থ: 'আমি অবশ্যই জানি, ওরা যা বলে তাতে আপনার মনটা ছোট হয়ে যায়।' (আল হিজর, ১৫: ৯৭)

সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা মুক্তির উপায় বাতলে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ৯৮]

অর্থ: 'অতএব আপনি নিরঙ্কুশ প্রশংসা সহকারে আপনার প্রভুর পরিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন।' (আল হিজর, ১৫: ৯৮)

পবিত্র কুরআনের সমাধানই শ্রেষ্ঠ সমাধান।

২৪. নামায ছাড়া বান্দার জীবন ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত। নামাযবিহীন জীবনে না আছে প্রাণ, না আছে প্রেরণা। এমন জীবনের কোনো সৌন্দর্য ও অর্থময়তা নেই। সালাতবিমুখ জীবনে চূড়ান্ত অধোগতি ও ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং নামাযের প্রতি যত্নবান হয়ে নিজেকে বাঁচান; নিজের জীবনটাকে বাঁচান।

২৫. যদি পাঁচওয়াক্ত ফরয নামাযে যত্নবান না হন তাহলে এ জীবনে অর্জিত মান-মর্যদা, যশ-খ্যাতি, অর্থবিত্ত, সম্মান-সম্মতি ও বিলাসবহুল অট্টালিকা-এসবের কোনোটাই আপনার কাজে আসবে না। কিয়ামতের দিন সব নিমিষেই ধুলোয় মিশে যাবে।

২৬. কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কোনো ছায়ার অস্তিত্ব থাকবে না। মাথার কাছে সূর্য এসে দাঁড়াবে। প্রচণ্ড তাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন।

আপনি যদি নামাযের যত্নশীল হন তাহলে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কাল কিয়ামতের দিন আপনিও আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ

করবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সাত ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করবে। তাদের মধ্যে একজন হলো (হাদীসের ভাষায়):

«وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ» (صحيح البخاري ১/১৩৩)

অর্থ: 'এমন ব্যক্তি যার মন মসজিদের সাথে জুড়ে থাকে।' (বুখারী, ১/১৩৩)

২৭. বেশি রাত না করে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ুন। তাতে দু'টি উপকারিতা রয়েছে। এক, ফজর নামাযের জন্য সময়মতো জেগে ওঠা সহজ হয়। দুই, শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যও তা উপকারী।

পরিশিষ্ট:

- ❖ আপনি যদি পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে যত্নবান হতে না পারেন তাহলে নীতি-নৈতিকতা, শালীনতা, শিষ্টাচার, মানবিক মূল্যবোধ, মহৎ উদ্দেশ্য ও হিতবাদী দর্শনের প্রচার-প্রসারে মুখর হওয়ার কোনো অর্থ নেই। এসবই তখন অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা বুলি। তা শ্রোতাদের কানে পৌছাবে মাত্র; তাদের হৃদয়াত্মা স্পর্শ করতে পারবে না।
- ❖ যে নামায ত্যাগ করে সে তো সর্বহারা মিসকিন। নিজেকে সে শেষ করে দিয়েছে। আক্ষরিক অর্থে সে বেঁচে আছে। কিন্তু পৃথিবীর বুকে তার অস্তিত্বের কোনো প্রভাব নেই, কার্যকারিতা নেই।

অনেক লোককে দেখা যায়, বিয়ে ওলীমা, আকীকা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালনে বেশ সজাগ-সচেতন। প্রতিটি উপলক্ষেই ঠিক সময়ে সমহিমায় উপস্থিত। কিন্তু নামাযের প্রতি তার কোনো গুরুত্ব নেই, কোনো ক্রম্বেপ নেই। ধর্মীয় এ অধঃপতন অধোগতির শেষ কোথায়?!

- ❖ আযানের শুরুতেই 'আল্লাহ্ আকবার' বলে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মহিমার ঘোষণা করা হয়। প্রতিটি মানুষের মর্মে এ বাণী পৌঁছে দেওয়া উদ্দেশ্য-আপনার চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সমস্ত কিছু থেকে আল্লাহ বড়। তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ। -আয়েয করনী

❖ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ [ص: ১৬২] يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ» (مسند أحمد مخرجا) ১১/ ১৬১

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি নামাযে যত্নবান হবে কিয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর হবে। তার স্বপক্ষে দলিল হবে। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির উপায় হবে। আর যে নামাযে যত্নবান হবে না নামায তার জন্য নূর হবে না। তার স্বপক্ষে দলিলও হবে না। তার মুক্তির উপায়ও হবে না। কিয়ামতের দিন ফেরাউন, হামান, কারুন ও উবাই ইবনে খলফের সাথে তার হাশর হবে।’ (মুসনাদে আহমাদ, ১১/১৪১)

কঠোরতা ও রুঢ়তা

কঠোরতা ও রুঢ়তা একটি জঘন্য মানসিক ব্যাধি। ব্যক্তি যখন রাগে তেতে উঠে, ক্রোধে ফুঁসে উঠে, কারো কথাই কানে তুলে না। কোনো নীতি-নৈতিকতার ধার ধারে না। পরোয়া করে না ধর্মীয় বিধি-নিষেধের। জঘন্য অন্যায়-অন্যাচার করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

রাগ ও কঠোরতার বিপরীত পিঠ হলো উদারতা, সদয়তা ও বিনম্রতা। যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিরাট নেয়ামত। রাসূল ﷺ-কে তিনি এ চারিত্রিক গুণটি বিশেষভাবে দান করেছেন। এমনকি পবিত্র কুরআনে রাসূল ﷺ-কে তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং এর বিপরীত পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছেন:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ؕ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ১৫৭]

অর্থ: 'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে যেত।' (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৯)

চারিত্রিক সদয়তা ও বিনম্রতার গুণ থেকে যে বঞ্চিত হবে, সে হবে আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র ও শাস্তিযোগ্য। আর যে হবে সদয় ও বিনম্র, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, সে হবে কল্যাণ ও আনুগত্যের পথে অগ্রগামী; গুনাহ ও নাফরমানির পথ বর্জনকারী। কঠোর

স্বভাব, রুক্ষ মেজাজ-এমন লোকের মনে শয়তান ভর করে। তাকে রহমানের রহম^{২৮} থেকে বঞ্চিত করে ছাড়ে।

স্বভাবে রুক্ষ ও রুঢ় ব্যক্তি দুর্বলের প্রতি সদয় হতে জানে না। পারে না বন্ধুত্ব রক্ষা করতে। আচরণে-বিচরণে সে কঠোর স্বেচ্ছাচারী। তাকে দেখা যায় চিংকার চোঁচামেচি করতে, লোকদের গালমন্দ করতে কিংবা অন্যায় অধিকার ফলাবার চেষ্টা করতে। সমাজের কেউ তার কাছে ঘেঁষতে চায় না। তার সাথে মিশতে চায় না। তার সংস্পর্শে প্রফুল্লতা বোধ করে না। স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়স্বজন-সবাই তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। পরিবার ও সমাজে সে নিতান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত অসহনীয়।

আমাদের যদি সহজ সরল জীবনযাপন করতে হয়, সমাজে আদর্শবান হয়ে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে অবশ্যই ক্রোধ দমন করতে হবে। স্বভাব-রুক্ষতা দূর করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কী? এ স্বভাব দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার পথ কী?

সমাধান:

১. আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনে সচেষ্টি হোন। এর সর্বোত্তম পন্থা হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে যত্নবান হওয়া। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য নেক আমলে সচেষ্টি হওয়া। দান সদকা করা। এতিম, মিসকিন, অভাবী ও নিঃস্বদের দেখভাল করা। পাপাচার, অনাচার ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা। কেননা তা ব্যক্তিকে চারিত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে। তার স্বভাব চরিত্রে কঠোরতা ও রুঢ়তার বীজ বপন করে।
২. আল্লাহ তা'আলার যিকির, তাসবীহ, তাহলীল ও ইস্তেগফারে যবান সতেজ রাখুন। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার মাসনূন দু'আগুলো নিয়মিত পাঠ করুন। মানব হৃদয় মাত্রই রুঢ়তা ও রুক্ষতার ছাঁচে গড়া। আল্লাহর যিকির ও ইস্তেগফারই তাতে নম্রতা ও দয়াদ্রুতা-সৃষ্টি করতে পারে।

হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন, 'উদাসীনতা ও গুনাহের কারণে আত্মা কলুষিত হয়। যিকির ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ হয়।'

^{২৮} দয়ালু প্রভুর দয়া।

৩. চিন্তা-ভাবনা ও গভীর নিমগ্নতার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করুন। প্রতিটি আয়াতের মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। বিশেষ করে বিনয়, নম্রতা ও সদয়তার দীক্ষাসংবলিত আয়াতগুলো মনে রাখতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [حم السجدة: ৩৬]

অর্থ: 'জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট।' (হা-মীম সেজদাহ, ৪১: ৩৪)

অন্যত্র বলা হয়েছে:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَآتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ১০৭]

অর্থ: 'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি, রাগ ও কঠিনপ্রাণ হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে হয়ে যেত।' (সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ, পুরস্কারের সুসংবাদ ও শাস্তির সতর্কবাণী সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ফিকির করতে হবে। যে ব্যক্তি নিমগ্ন চিন্তে কুরআন তিলাওয়াত করবে তার হৃদয় বিগলিত হবে, চোখ অশ্রুসিক্ত হবে, শিহরিত হবে দেহের প্রতিটি কোষ একমাত্র আল্লাহর ভয়ে?

৪. জানাযার নামাযে শরিক হোন। বেশি বেশি কবর যিয়ারত করুন। একটিবার ভেবে দেখুন, অন্ধকার কবরে আজ তাদের দেহগুলোর কী অবস্থা! মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে! অথচ কিছু কাল পূর্বেও তাদের দেহে কত দামি পোশাক-পরিচ্ছদ শোভা পেত! কত উপাদেয় বাহারি খাবার তাদের দেহে পুষ্টি যোগাত।

স্মরণ করুন, যেকোনো মুহূর্তে আপনিও তাদের একজনে পরিণত হবেন। তাদের মতোই হবে আপনার পরিণতি। ক্ষণিকের এ পৃথিবী শুধু ধৌকা প্রবঞ্চনার আখড়া।

৫. একটিবার কি ভেবে দেখেছেন, কাল কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থার কথা? ভেবেছেন কি জাহান্নামের শাস্তির কথা? এসব বিষয়ে সচেতন চিন্তা-ভাবনা আপনার অহমিকা-দাঙ্গিকতা খর্ব করবে। রাগ-ক্রোধ ও রূঢ়তার স্থলে নম্রতা, সদয়তা ও উদারতা স্থান পাবে।
৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহৎ জীবন-চরিত অধ্যয়ন করুন। তাঁর জীবনাদর্শের পাঠ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা নিজ তত্ত্বাবধানে রাসূল ﷺ-এর হৃদয়াত্মা পরিশুদ্ধ করিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর মহান আদর্শের স্বীকৃতি দিয়েছেন:

﴿وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ৬]

অর্থ: 'আর নিশ্চয়ই আপনি নৈতিক চরিত্রের সর্বোচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত।' (কালাম, ৬৮: ৪)

সুতরাং তার যথার্থ অনুসরণেই আপনার স্বভাবগুণ ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধি নিহিত।

৭. শ্রেষ্ঠ কল্যাণযুগের মহা মনীষী সাহাবায়ে কেরাম, তাবায়ীন, তাবৈ-তাবায়ীন ও অন্যান্য মুসলিম মনীষীগণের জীবনী অধ্যয়ন করুন, গভীর পর্যবেক্ষণমূলক অধ্যয়ন। তাঁদের মহান আদর্শের পাঠ গ্রহণ করুন।
৮. যথাসম্ভব ক্ষমা করুন। অন্যের মতামত মূল্যায়ন করতে শিখুন। রাগে-ক্ষোভে যখন অন্যের ওপর চড়াও হতে যাবেন, মনে রাখবেন, আপনার উপরও আছেন একজন মহান কর্তৃত্ববান, যিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী, সকল শক্তিমত্তার অধিকারী।
৯. যমীনবাসীর ওপর রহম করুন। আসমানবাসী আপনার ওপর রহম করবেন। এটাই হাদীসের শিক্ষা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ

فِي السَّمَاءِ» (سنن الترمذي ت شاكر) ৩২৬/ ৬

অর্থ: 'যারা সদয় দয়াদ্র, আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। (সুতরাং) তোমরা যমীনবাসীর ওপর রহম কর, আসমানবাসী তোমাদের উপর রহম করবেন।' (তিরমিজী, ৪/৩২৪)

১০. সমাজের জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে চলাফেরা করুন। নাফরমান, পাপাচারী লোকদের সঙ্গে ত্যাগ করুন। আচরণে-উচ্চারণে বিনয় হোন। আল্লাহকে ভয় করুন। হাস্য-রসিকতা ও খেলতামাশা পরিহার করুন। কেননা তা আপনাকে আল্লাহর ভয় ও জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন করে রাখবে।
১১. হতদরিদ্র, নিঃস্ব, বিধবা ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদাচারী হোন। দান-অনুদানের মাধ্যমে তাদের পাশে দাঁড়ান। হাসপাতাল পরিদর্শন করুন। রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করুন। এতে আপনার আত্মশুদ্ধি হবে এবং স্বভাবজাত কঠোরতা ও রূঢ়তা দূর হবে।
১২. ফরয ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে 'তাহাজ্জুদ নামায' ও কুরআন তিলাওয়াতে যত্নবান হোন। রাতের শেষভাগের ইবাদতে বিশেষ মহিমা ও তাৎপর্য রয়েছে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন। রাসূল ﷺ-এর পবিত্র যবানেই শুনুন:

إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، أَوْ ثُلُثَاهُ، يَنْزِلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ"

(صحيح مسلم) ১/ ৫২২

অর্থ: 'যখন অর্ধরাত অতিবাহিত হয়, কিংবা রাতের দুই ভাগ শেষ হয়ে শেষ তৃতীয়াংশ শুরু হয় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন। ঘোষণা করেন:

'কে আছে, যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছে, আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তার প্রার্থনা কবুল করব? আছে কোনো বান্দা, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব?'

এভাবে সুবহে সাদেক উদিত হওয়া পর্যন্ত (আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা অব্যাহত থাকে)। (মুসলিম, ১/৫২২)

রাতের এই শেষ প্রহরে অঘোর নিদ্রায় বিভোর না থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন, নিজের যাবতীয় স্বভাবদোষ ও চারিত্রিক বিচ্যুতি থেকে শুদ্ধ-পরিশুদ্ধ লাভের জন্য।

১৩. লোকদের সাথে হাসিমুখে আন্তরিকভাবে সাক্ষাৎ করুন। আপনার আন্তরিক হাসি ও প্রফুল্লতা মানুষের মনে প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়া-মায়ার বার্তা পৌঁছে দিবে। আপনি পাবেন সদকার প্রতিদান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ»

অর্থ: 'তোমার ভাইকে দেখে হাস্যবদন হওয়াও একটি সদকা।' (তিরমিজী, ৪/৩৪০)

১৪. মতবিনিময় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পক্ষাবলম্বন ও গোড়ামিপ্রবণতা অবাঞ্ছনীয়, নম্রতা ও সদয়তাই একান্ত কাম্য। উপস্থিত সকলের মতামতের যথার্থ মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন। ধীরস্থির চিন্তে, আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তিতে এবং শরীয়তের দলিল-প্রমাণের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ»

অর্থ: 'যে ব্যক্তিকে নমনীয়তার অংশ দেয়া হয়েছে তাকে কল্যাণের অংশ দেয়া হয়েছে। নমনীয়তার অংশ হতে যে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাকে কল্যাণের অংশ হতে বঞ্চিত করা হয়েছে।' (তিরমিজী, ৪/৩৬৭)

১৫. নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করুন, অন্যের আচার-আচরণে আপনি কি কঠোরতা ও রুঢ়তা প্রত্যাশা করবেন, না কি সদাচার ও সদয়তাই কামনা করবেন? অন্যদের ব্যাপারে আপনার যেমন বিশ্বাস, আশা-প্রত্যাশা, আপনার থেকেও অন্যরা একই আচরণ প্রত্যাশা করে। তাই সবার আগে আপনাকেই ন্যায়ানুগ হতে হবে। মহৎ আদর্শের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।

১৬. মানুষের সাথে কঠোরতা ও দুর্ব্যবহারের কারণে আপনি যে সমালোচনা ও নিন্দার শিকার হবেন, তা কি ভেবে দেখেছেন? লোকসমাজে আপনি যে ভীতি ও শঙ্কার কারণ হবেন, তার পরিণতি চিন্তা করেছেন? এর কারণে চারপাশের মানুষ আপনার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। লোকসমাজে আপনি চক্ষুশূলে পরিণত হবেন।

১৭. মা-বাবার পারিবারিক বিবাদ এড়িয়ে যান। সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার পরিহার করুন। তাদের কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত আদর্শে ও শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তুলুন। রাগ-ক্ষোভ, কঠোরতা, রুঢ়তা ও গা-জোয়ারি মনোভাব বর্জনে এবং নম্রতা, কোমলতা ও প্রফুল্লতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করুন।

১৮. নিজে কুরআন তিলাওয়াত করুন। অথবা অন্যের সুমধুর তিলাওয়াত শুনুন। তাতে হৃদয় বিগলিত হয়। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি বৃদ্ধি পাবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

অর্থ: 'আল্লাহর সর্বোত্তম বাণী অর্থাৎ, কিতাব নাযিল করেছেন, যার সমস্তটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার বিষয়বস্তু বারবার আলোচিত হয়েছে। যারা নিজেদের প্রভুকে ভয় করে তাদের দেহের চামড়া তাতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়।' (যুমার, ৩৯: ২৩)

১৯. প্রতিদিনের শুরুতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন, আজ কারো ওপর রাগ করবো না, কারো সাথে দুর্ব্যবহার করবো না। বাক-সংযম ও ক্রোধ দমনের চর্চা করুন। তা যেন আপনার সহজাত স্বভাবে পরিণত হয়।

২০. এক ব্যভিচারিণী নারী সামান্য কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছে। আর এক সাধারণ নারী নগণ্য বিড়ালকে কষ্ট দিয়ে জাহান্নামের আয়ার ভোগ করেছে। তাই পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশই হোক আপনার আদর্শ:

[إِذْفَعُ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] [حم السجدة: ٣٤]

অর্থ: 'জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট।' (হামীম সেজদাহ, ৪১: ৩৪)

২১. কথাবার্তা ও আচার-আচরণে ভদ্র, মার্জিত ও সদয় হোন। অন্যের ওপর যে রহম করে, অন্যের ভুল-বিচ্যুতি গোপন রাখে আল্লাহ তা'আলাও তার ওপর রহম করেন, তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। আর যে অন্যের দোষ গেয়ে বেড়ায়, পরনিন্দায় মেতে উঠে আল্লাহ তা'আলাও তার গোপনীয়তা ফাঁস করে দেন। সমাজের চোখে তাকে অপমানিত করেন। মূলত প্রতিটি মানুষ নিজ-নিজ কর্মফলই ভোগ করে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ 'আপনাকে বাড়িতে আসতে দেখে, ঘরে প্রবেশ করতে দেখে আপনার শিশুসন্তানটি যদি আনন্দে নেচে না উঠে, লাফ দিয়ে কোলে না চড়ে তাহলে বুঝে নিবেন, আপনার স্বভাব-মাধুর্যতায় অপূর্ণতা আছে। যত দ্রুত সম্ভব, এ চারিত্রিক অপূর্ণতা দূর করা কর্তব্য। -ড. আয়েয আল-কারনী
- ❖ লোকমান হাকিম (রহ.) বলেছেন:
'সহাস্যবদনে সাক্ষাৎ করুন। মাধুর্যপূর্ণ কথা বলুন। সর্বজনের প্রিয় পাত্র হতে পারবেন। শত্রুও আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে।'
- ❖ বিখ্যাত তাবেরী মালেক বিন দিনার (রহ.) (৭৪৮ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:
'মানুষের জীবনে স্বভাবজাত কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতার মতো কঠিন সংকট দ্বিতীয়টি নেই। কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয় আল্লাহ তা'আলা তাদের দয়া-মায়া হতে বঞ্চিত করেন।'
- ❖ ইমামা শাফেয়ী (রহ.) (১৫০-২০২ হি.) বলেছেন:
'হৃদয় যখন নির্দয় পাষণ, চলার পথ যখন দুস্তর সংকীর্ণ, আপনার ক্ষমা লাভের আশাই পরম ভরসা হয়ে থাকল। আমার গুনাহ পাহাড়সম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার রবের ক্ষমা, সে তো আকাশসম।'

অহমিকা-আত্মগরিমা

অহমিকা হলো, ব্যক্তি অতিমাত্রায় আত্মতুষ্টি ও আত্মতৃপ্ত হয়ে শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থবিস্ত, সুনাম-সুখ্যাতি, বংশ-মর্যাদা, দৈহিক গঠন, রূপ-লাবণ্য ও রুচিপ্ৰকৃতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। কোনো ক্ষেত্রে নিজেকে পিছিয়ে থাকতে দেখে ভীষণ হীনম্যনতায় ভোগে এবং অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব দেশে হিংসার আগুনে জলে।

এমন লোককে দেখবেন অহংকারী চালে চলাফেরা করে। কোনো সদুপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। নিন্দা ও সমালোচনার মুখে ক্ষিপ্ত হয়। প্রশংসা-স্তুতি শুনে তুষ্ট হয়। কথাবার্তা, আচার-আচরণে শুধু অহমিকা ও দান্তিকতার উৎকট বহিঃপ্রকাশ। অন্যদের সে খোড়াই কেয়ার করে। নিজেকে নিয়েই সদা ব্যতিব্যস্ত। নিজস্ব যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যে মহাতুষ্টি। অকপটে স্বীকার করে, দোষ-গুণ-এ দু'য়ে মিলেই মানুষ। কিন্তু কখনো নিজের দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ে না।

তার একটাই চাওয়া, সর্ব ক্ষেত্রে তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোক। সর্বক্ষেত্রে তাকে মাননীয়-বরণীয় হিসেবে নির্বাচিত করা হোক।

এমন লোক সমাজে অসহ্য, অসহনীয়। সমাজের কেউ তাকে সাদরে গ্রহণ করে না। সবাই তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

অহমিকা ও আত্মগরিমা হলো একটি স্বভাবজাত বিচ্যুতির পরিণতি। এ বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় কী?

সমাধান:

১. ভুল স্বীকার করার মানসিকতা লালন করুন। নিয়ম করে প্রতিদিন আত্মসমালোচনা করুন। নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো শনাক্ত করে তা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করুন।
২. একবার ভেবে দেখুন, আমাদের আসল পরিচয় কী? কীসের থেকে আমাদের উৎপত্তি, আর কোথায় গিয়ে আমাদের সমাপ্তি? প্রথমে মাটি থেকে, তারপর শুক্রাণু থেকে মানুষের উৎপত্তি। পর্যায়ক্রমে গর্ভাশয়ের দুর্গন্ধ পানিতে তার বসবাস। এরপর বাহ্যিক পৃথিবীর জীবনে পদার্পণ। মৃত্যুর পর আবার মাটিতে সমর্পণ।
৩. অতীতের পরাক্রমশালী রাজা-বাদশা, প্রতাপশালী ও অর্থ-প্রাচুর্যের অধিকারী, এক সময় যারা ক্ষমতার দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়েছে, আজ তাদের কী পরিণতি? আজ তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি কোথায়? সবাই তো মাটিতে মিশে একাকার।
৪. আল্লাহ তা'আলার দরবারে সবসময় একটি বিষয় প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আপনাকে সুস্থ বিচারবুদ্ধি ও সরল পথের দিশা দান করেন। সত্যকে সত্যরূপে দেখার এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করার তাওফিক দান করেন।
৫. জেনে রাখুন, অহংকারী ও দাস্তিক লোকের প্রতি মানুষের মনে চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ কাজ করে। তার নিন্দা, সমালোচনা ও দুর্নাম সবার মুখে-মুখে। এসব অসন্তোষ ও নিন্দা মৃত্যুর পরও তার পিছু ছাড়ে না।
৬. আপনার চেয়েও মহৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানুন। নবী-রাসূল ও মহান পূর্বসূরিদের জীবন চরিত পাঠ করুন। তাহলে আপনার মনে হবে, ব্যক্তি এক জীবনে যতই উন্নতি সাধন করুক, যতই সফলতা অর্জন করুক তার চেয়েও সফল সার্থক ব্যক্তির তুলনায় সে নিতান্ত সাধারণ।
৭. নিজের দোষত্রুটি, ভুল-বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও সংকীর্ণতার ক্ষেত্রগুলোর কথা মনে রাখুন। তাহলে নিজেকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হবে। অন্যকে বড় ভাবার ও সম্মান করার মানসিকতা গড়ে উঠবে।

৮. আল্লাহকে ভয় করুন। মনে রাখুন, মানুষের গুরুতর ও খুঁটিনাটি-যাবতীয় বিষয় তিনি দেখছেন। সে যে অহমিকা-দাঙ্কিতা, অহংকার-আত্মগরিমা প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে, এর জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। কাল কিয়ামতের দিন বান্দা কখনো হিসাব দিয়ে পার পাবে না।
৯. অন্যের মতামত ও সিদ্ধান্তের যথার্থ মূল্যায়ন করুন। মনে রাখুন, কোনো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। আপনিও নন। সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, শিষ্টাচার ও আদর্শে আপনার চেয়ে উন্নত, আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
১০. নিজেকে তুলনামূলক দৃষ্টিতে বিচার করুন। শক্তিমত্তার বিচারে নিজেকে তুলনা করেন, তাহলে একটি সাধারণ ষাঁড় আপনার চেয়ে কয়েকগুণ শক্তিশালী। দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতায় যদি নিজেকে তুলনা করেন, তাহলে ঘোড়া বহু গুণ এগিয়ে। বাহ্যিক অবয়ব ও দৈহিক বিশালতায় হাতির সামনে আপনি নিতান্ত ক্ষুদ্র মানব।
১১. মনে রাখুন, যোগ্যতা ও প্রতিভা আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং যে জিনিস ধরে রাখার সাধ্য মানুষের নেই, তা নিয়ে সে কীভাবে গর্ব করে, বড়াই করে!
১২. জেনে রাখুন, বহু নৈতিক ও চারিত্রিক বিচ্যুতির প্রধান কারণ হলো অহমিকা ও দাঙ্কিতা। ন্যায় ও সত্যবিমুখতা, অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, নিজের ইতিবাচক দিকগুলো রং চড়িয়ে প্রচার করা, ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মোহ, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর মতো বহু জঘন্য স্বভাবের নেপথ্য কারণ হলো অহংকার ও আত্মগরিমা।
১৩. মানুষ কীভাবে ভুলে যায় যে, সে অতি সামান্য দুর্বল প্রাণী! যেকোনো মুহূর্তেই সে অসুস্থ হতে পারে। মুহূর্তের ব্যবধানে তার মৃত্যু হতে পারে।
১৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ،

وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» (صحيح مسلم ১/ ২১৭৮)

অর্থ: ‘আল্লাহ তা‘আলা আমার কাছে এ প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় নম্রতা বজায় রাখ। কেউ যেন কারো ওপর বড়াই না করে। কেউ যেন কারো ওপর অবিচার না করে।’
(মুসলিম, ৪/২১৯৮)

১৫. আপনার উন্নতি অগ্রগতির পথে অন্যদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ভুলে যাবেন না। নিজেই নিজেকে সর্বেসর্বা ভেবে বসবেন না। জীবনের এ পর্যায়ে এসে আপনি যে উন্নতি ও সফলতা অর্জন করেছেন, তার পেছনে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুজনদের আন্তরিক অবদান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। তা ছাড়া আপনার একার পক্ষে কখনো এ পর্যায়ে পৌছনো সম্ভব ছিল না।
১৬. কোনো মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। সুতরাং নিজের ভুল স্বীকারে কুষ্ঠাবোধ করবেন না। যা সঠিক ও যথার্থ, আপনার বিপক্ষে হলেও আন্তরিকভাবে তা মেনে নিন। মনে রাখুন, ভুল স্বীকার করা নিজের দুর্বলতা ও অপমানের কারণ নয়। তা তো আপনার সদীচ্ছা ও নৈতিক সাহসিকতার পরিচায়ক।
১৭. সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। মানুষের আন্তরিকতা ও ভালোবাসার কদর করুন। অহংকার ও নিজের বড়ত্ব জাহির করে সম্পর্কের অবমূল্যায়ন করা সমীচীন নয়।
১৮. মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলুন। চারপাশের মানুষজন ও সমাজ-তাদেরও রয়েছে এমন কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্বের অবদান, যা হয়ত আপনার অজানা। কিন্তু তার বদৌলতেই তারা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে শ্রেষ্ঠ মহান।
১৯. নিত্যদিনের সাংসারিক কাজকর্মগুলো নিজেই করার চেষ্টা করুন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম আদর্শ। নিজ হাতে বকরির দুধ দোহন করতেন। বাপড়ে তালি যুক্ত করতেন। জুতা সেলাই করতেন। হাট-বাজার থেকে সদাই কিনে আনতেন। গরিব মিসকিনদের সাথে চলাফেরা করতেন। স্বভাবতই এসব কাজের দ্বারা মনের অহংবোধ ও আত্মগরিমা দূর হয়।

পরিশিষ্ট:

- ❖ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ»

অর্থ: ‘যার মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।’ (মুসলিম, ১/৯৩)

- ❖ আব্বাসী খেলাফতকালের বিখ্যাত আরব কবি আবু নাওয়াস (৭৬২-৮১৩ খ্রিষ্টাব্দ) বলেন:

فَقُلْ لِمَنْ يَدَّعِي فِي الْعِلْمِ فَلَسَفَةٌ

حَفِظْتَ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ

অর্থ: ‘নিজেকে যে জ্ঞানী বলে জাহির করে তাকে বলে দাও, “তুমি যা অর্জন করেছ তা এক বিন্দুসম। এখনও যা বাকি আছে তা তো সমুদ্রসম।”

- ❖ প্রখ্যাত লেবানিজ কবি ও লেখক জিবরান খলীল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১) বলেন:

‘আপাদ-মস্তকে বহিরাঙ্গের চাকচিক্যটাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ো না। তাহলে একটা পর্যায়ে দেখবে, শুধু বহিরাঙ্গটাই চকমক করছে। আর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের জায়গাটুকু শূন্য পড়ে আছে।’

- ❖ মিশরীয় লেখক ও সাহিত্যিক তাওফীক হাকীম (১৮৯৮-১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘অহমিকা, আত্মগরিমা হলো অজ্ঞতা ও মূর্থতার উৎকট রূপ।’

- ❖ বিখ্যাত তাবেরী ইমাম হাসান বসরী (রহ.) (৬৪২-৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘অহংকারীর অবস্থা হলো পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় অবস্থানকারীর মতো। সে অন্যদের ছোট আকারে দেখে। অন্যরাও তাকে ছোটরূপে দেখে।’

স্বার্থপরতা

স্বার্থপরতা হলো অন্যের ভালোমন্দ-বিবেচনা না করে কিংবা জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের প্রয়োজনটাকে মুখ্য করে দেখা, মতলবটা হাসিল করে নেওয়া। স্বার্থপরতা হলো নিজেকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণের একমাত্র হকদার মনে করা। স্বার্থপর লোক সীমাহীন আত্মতৃপ্তিতে ভোগে। নিজের প্রতি তার মুগ্ধতা চূড়ান্ত পর্যায়ের। সর্বদা নিজেকে নিয়েই মেতে থাকে। নিজের প্রশংসা-স্তুতির গালগল্প মুখে লেগে থাকে।

অন্যদের ব্যাপারে তার কোনো উদ্যোগ-উদ্দীপনা যে নেই, তা নয়; কিন্তু তা শুধু অন্যদের দমিয়ে রেখে নিজের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে। অন্যদের ভাগ্যে ভালোমন্দ কী জুটল, কি গোটা দুনিয়া ভেসে গেল, তাতে তার কিছুই যায়-আসে না। নিজের ঝুলিতে কতটুকুন পুড়লো-তার কাছে এটাই মুখ্য। দিন শেষে তার ঝুলি কতোটুকু ভরেছে, এটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

স্বার্থপর লোকের অভিধানে শব্দ মাত্র তিনটি: আমি, আমি এবং আমি। এর বাইরে সে একটা অক্ষরও বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না। এ কারণেই মানুষ তার সঙ্গে মিশতে চায় না, তার সংস্পর্শে স্বস্তি পায় না।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে স্বার্থপরতা এক জটিল সমস্যা। কেননা মানুষ হলো সমাজবদ্ধ প্রাণী, সমাজ ছাড়া সে একাকী বাঁচতে পারে না। আর স্বার্থপরতা হলো সমাজবিরুদ্ধ স্বভাব। তাছাড়া বিষয়টা শারীরিক নয়, মানসিক। এতে কোনো সন্দেহ নেই, শারীরিক সমস্যার চেয়ে মানসিক সমস্যাই বেশি গুরুতর।

সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য এমন গুরুতর মানসিক সমস্যা থেকে মুক্তির বিকল্প নেই। কিন্তু উপায় কী? এ সমস্যার সমাধান কী?

সমাধান:

১. অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। স্বার্থপরতা নয়, পরার্থপরতাই ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

অর্থ: 'তোমাদের কেউ সাচ্চা মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ না করতে পারবে।' (বুখারী, ১/১২)

২. অন্যদের স্বার্থ মূল্যায়ন করতে হবে। আলোচনা-পর্যালোচনায় সুস্থিরতাই বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেকের মতামত যথাযোগ্য বিবেচনা করতে হবে। অন্যদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। কেননা তা অন্যের জন্য যতটুকু ক্ষতিকর, ব্যক্তি নিজের জন্য তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকর।

৩. সমস্ত বিষয়ে অন্যদের দৃষ্টিতে চিন্তা করুন। নিজেকে অন্যের স্থানে দাঁড় করান। অন্যরা কী ভাবছে-তা বোঝার চেষ্টা করুন। কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা কার বেশি, আপনার না কি অন্যদের-বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করুন। একরোখা হয়ে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা সমীচীন নয়। কাজেকর্মে অন্যদের সাথে शामिल হোন। তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়ান।

৪. যে বস্তুটার প্রয়োজন নেই, তা পাওয়ার জন্য মাত্রাতিরিক্ত অগ্রহ মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতার জন্য দেয়। তাই যে কোনো বিষয় মৌলিক প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করুন। মনের চাহিদা ও চোখের ক্ষুধা মেটাতে উদগ্রীব হবেন না।

৫. বোঝার চেষ্টা করুন, সর্বক্ষেত্রে আবশ্যিক নয় যে, আপনাকেই সবার আগে থাকতে হবে। এর প্রয়োজনও নেই। যেমন: সড়কের পাশে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদে মুসল্লিগণ কাতারবদ্ধ হয়ে বসে আছে। কোনো প্রয়োজন নেই সবাইকে ডিঙিয়ে সামনে যাওয়ার।

৬. পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি মনে রাখুন। তাতে সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্যদের স্বার্থ রক্ষার আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে:

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ৭]

অর্থ: 'এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।' (হাশর, ৫৯: ৯)

৭. আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, যে অর্থবিশ্বের মালিক বানিয়েছেন তা থেকে অভাবী ও অভাবগ্রস্তকে দান করুন। এতে দু'টি কল্যাণ নিহিত: এক. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিরাট প্রতিদান লাভ। দুই. স্বার্থপরতার মতো ঘৃণ্য স্বভাব থেকে নিস্তার।

৮. সমাজ-সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হোন। যেমন: এতিমের দেখভাল করা, অসুস্থদের সেবা-শুশ্রূষা করা, গরিব-মিসকীনদের দান-সদকা করা। এছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করুন। এর ফলে আপনার স্বভাব-প্রকৃতি স্বার্থপরতামুক্ত হবে। পরার্থপরতার মহত্ত্বে মহীয়ান হবে।

একটি বিষয় সুনিশ্চিত, আপনি যা ভোগ করছেন তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর যা দান করছেন তা-ই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। তাহলে কেন ক্ষণস্থায়ী বিষয় রেখে চিরস্থায়ী বিষয়ের পেছনে ছুটছেন?

৯. যারা আপনার উপকার করে, হোক না তাদের উপকার ক্ষুদ্র সামান্য, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হোন। আপনার প্রতি অন্যদের ভালোবাসার কদর করুন। এর ফলে আপনার প্রতি তাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা অটুট থাকবে এবং স্বভাব-চরিত্র স্বার্থপরতার দোষমুক্ত হবে।

১০. আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুমহল ও পাড়াপ্রতিবেশীর সাথে নানা উদ্যোগ-আয়োজনে অংশগ্রহণ করুন। সমাজের দশজনের সাথে এক হয়ে চলুন। সার্বিক ও সামাজিক উদ্যোগে পরস্পর বহু জিনিস আদান-প্রদান হয়। অন্যের স্বার্থে কাজ করার সুযোগ হয়। এর মাধ্যমে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা দূর হতে থাকে।

১১. সন্তানদের কুরআন-সুন্নাহর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। হিংসা-বিদ্বেষ ছেড়ে পরস্পর সহযোগিতা ও পরার্থপরতায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।
১২. অন্যদের সামনে সন্তানের অপমান করা, তাদের ব্যক্তিত্ব খাটো করা ঠিক নয়। কেননা কখনো-কখনো এমন আচরণের কারণে সন্তানদের মনে স্বার্থপরতা দানা বাঁধতে শুরু করে। সমবয়সিদের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে থাকে।
১৩. মনে রাখুন, স্বার্থপরতা নিছক স্বার্থপরতা-ই নয়; পর্যায়ক্রমে তা আপনার মনে অহংকার, হিংসা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে। সুতরাং নিজেকে এসব স্বভাবদোষে কলুষিত করা থেকে বিরত থাকুন।
১৪. স্বার্থপর লোক সবার কাছেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘৃণিত। কেউ তাকে পছন্দ করে না। তার সংস্পর্শে স্বস্তিবোধ করে না। কেননা সর্বক্ষেত্রেই সে নিজেকে প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট। নিজেরটা বাগিয়ে নিতে সিদ্ধহস্ত।
১৫. মা-বাবাকে সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে। আচার-আচরণে ও আদর-স্নেহে যেন পক্ষপাতিত্ব ও প্রান্তিকতার ছাপ না থাকে। কেননা তা সন্তানদের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করে। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। তারা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে।
১৬. সামান্য বিষয়ে বাচ্চাদেরকে শাস্তি দেওয়ার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কখনো কখনো এ কারণে বড় হওয়ার পর তাদের মনে স্বার্থপরতা কাজ করে। নিজের মতো অন্যদেরকে শাস্তি পেতে দেখে তৃপ্তি বোধ করে।
১৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণ যুগের মহান পূর্বসূরি-সাহাবায়ে কেরাম, তাবায়ীন ও তাবে তাবায়ীন ও পরবর্তী যুগের মহামনীষীগণের জীবনচরিত পাঠ করুন। তাঁদের মহান আদর্শ ও মতাদর্শ থেকে পাঠ গ্রহণ করুন। নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে অন্যের স্বার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরাই হলেন আমাদের অনুপম আদর্শ।

পারিশিষ্ট:

- ❖ বিশিষ্ট স্কটিশ দার্শনিক ও ঐতিহাসিক টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) বলেছেন:
‘স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা হলো যাবতীয় স্বভাব-বিচ্যুতির মূল কারণ।’
- ❖ বিশ্ববিখ্যাত গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অ্যারিস্টটল^{২৯} বলেছেন:
‘মহান আদর্শবান ব্যক্তি অন্যের প্রয়োজন অনুভব করে এবং পরোপকারে সচেষ্টি থাকে।’
- ❖ প্রখ্যাত লেবানিজ কবি ও লেখক জিবরান খলীল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১) বলেন:
‘যে তোমার চেয়ে অধিক প্রয়োজনগ্রস্ত, তাকে দান করাই উদারতা নয়, নিজের প্রয়োজনটাকে উপেক্ষা করে প্রয়োজনীয় বস্তু দান করাই হলো প্রকৃত উদারতা।’
- ❖ বিখ্যাত আরব দানবীর হাতেম তাঈ কবিতার ভাষায় বলেছেন:

أَمَّا وَالَّذِي لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ غَيْرُهُ

وَيُحْيِي الْعِظَامَ الْبَيْضَ وَهِيَ رَمِيمٌ

لَقَدْ كُنْتُ أَطْوِي الْبَطْنَ وَالزَّادُ يُشْتَهَى

مَخَافَةَ يَوْمًا أَنْ يُقَالَ لَسِيمٌ

অর্থ: ‘অদৃশ্যের দ্রষ্টা ও পুনরুত্থানের স্রষ্টার শপথ করে বলছি, উপাদেয় খাবার খাওয়ার সাধ্য থাকার পরও সবার সাথে অভুক্ত থেকেছি; পাছে লোকে না আবার আমাকে নীচ-ইতর বলে।’

^{২৯} জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৫। মৃত্যু খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩।

অজ্ঞতা ও মূর্খতা

অজ্ঞতা ও মূর্খতা, জ্ঞানবিদ্যার পরিপন্থি, বর্তমান বিশ্বে যা মহা সংকট হিসেবে পরিগণিত। মূর্খতা হলো কোনো বিষয় তার আসলরূপে ও বাস্তবিক অর্থে না জানা। মূর্খতার কারণে মানুষ ভুল পথে পরিচালিত হয়। যত অন্যায়-অনাচার, যুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হয়। পর্যায়ক্রমে ধর্মহীনতা ও কুফুরির দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহর নবী মুসা (আ.) অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧]

অর্থ: ‘সে বলেছিল, আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেন আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হই।’ (বাকারা, ২: ৬৭)

বনী ইসরাইল মুসা (আ.)-কে বলেছিল:

﴿قَالُوا اتَّخَذْنَا هُزُؤًا﴾ [البقرة: ৬৭]

অর্থ: ‘তুমি কি আমাদের উপহাস করছ?’ (বাকারা, ২: ৬৭)

লূত সম্প্রদায়ের ওপর যখন আল্লাহ তা‘আলার আযাব-সর্বগ্রাসী প্লাবন-নেমে এল, নূহ (আ.) তাঁর কাফের পুত্রের মুক্তি কামনা করলেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন:

﴿إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ৬৬]

অর্থ: ‘আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অজ্ঞদের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।’ (সূরা হুদ, ১১: ৪৬)

পবিত্র কুরআনের যে শব্দটি সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র যবানে উচ্চারিত হয়েছে তা হলো, اِقْرَأْ অর্থাৎ, পড়। এতে প্রমাণিত হয়, ইসলাম জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করে, মূর্খতা নিরক্ষরতা দূরীকরণে অনুপ্রাণিত করে।

বর্তমান বিশ্বে যত বিভেদ-সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থ-সম্পদ ও প্রাণের বিনাশ ঘটে চলছে তার অন্যতম কারণ হলো সুশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার অভাব।

মূর্খতা যখন কোনো জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিকড় গেড়ে বসে সে জাতির অধঃপতন ও ধ্বংস অনিবার্য। মূর্খতার অশুভ পরিণতি থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ-কোনোটাই মুক্ত নয়। মূর্খতা হলো সর্বব্যাপী সংকট। তা থেকে বাঁচার উপায় নিম্নরূপ:

সমাধান:

১. অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে বাঁচার প্রথম পদক্ষেপ হলো নিজের অজ্ঞতা দিকগুলো শনাক্ত করা। দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত হওয়া। জ্ঞানার্জনের পথে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-কে এ দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ১১৬]

অর্থ: 'এবং আপনি বলুন, হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।' (তোয়াহা, ২০: ১১৪)

২. শিক্ষা-দীক্ষামূলক ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এসব কার্যক্রমের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করতে হবে। যেন সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষাকেন্দ্রিক সচেতনতা গড়ে উঠে। অজ্ঞতা ও মূর্খতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার আলো ছাড়া পৃথিবীর বুকে কোনো জাতি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির পথে এককদম অগ্রসর হতে পারেনি। আর যে জাতিই চূড়ান্ত অধঃপতন ও ধ্বংসের শিকার হয়েছে তার অন্যতম কারণ হলো মূর্খতা ও শিক্ষাবিমুখতা।

৩. শিক্ষার যাবতীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে দেশের উন্নত শহর থেকে শুরু করে অনুন্নত প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে দিতে হবে। শিক্ষার মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ যতো সহজলভ্য হবে, এর অবকাঠামো যতো মজবুত ও টেকশই হবে, দেশ ও জাতির শিক্ষার মান ততোই উন্নত হবে।

“কবিগুরু” আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২) বলেন:

بِالْعِلْمِ وَالْمَالِ يَبْنِي النَّاسُ مُلْكَهُمْ

لَمْ يُبْنَ مُلْكٌ عَلَى جَهْلٍ وَاقْلَالٍ

অর্থ: ‘জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অর্থ-সম্পদের ভিত্তিতে একটি জাতি তার রাজ্য গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু অশিক্ষা ও মূর্খতার ওপর কোনো সমাজ ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়নি, হতে পারে না।’

৪. মনে রাখতে হবে, মূর্খতা সমাজের সবচেয়ে জটিল সংকট। এর অশুভ পরিণতি সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী। মূর্খ জাতি কখনো মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করতে পারে না। বিশ্বজাতির কল্যাণে কোনো সুস্থ সভ্যতার বার্তা বহন করতে পারে না। এমনকি চলমান কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে না।
৫. সন্তানদের সুশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিমুখতা এবং বর্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে এর অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে।
৬. পারিবারিক আয় উপার্জনের একটি উপযুক্ত অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা কর্তব্য। অন্য-বস্ত্রের মতো শিক্ষা হতে হবে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। আন্দালুসী কবি আবু ইসহাক আলবেরি (রহ.) (৪৫৯ হি.) বলেন:

وَمَا يُغْنِيكَ تَشْيِيدُ الْمَبَانِي

إِذَا بِالْجَهْلِ نَفْسَكَ قَدْ هَدَمْتَ

جَعَلْتَ الْمَالَ فَوْقَ الْعِلْمِ جَهْلًا

لَعَمْرُكَ فِي الْقَضِيَّةِ مَا عَدَلْنَا

অর্থ: ‘এসব দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ তোমার কী কাজে আসবে, যদি মূর্খতার বশে নিজ হাতেই তা ধ্বংস করে দাও।’

অজ্ঞতাবশ বিদ্যা-বুদ্ধির উপর অর্থ-সম্পদকে প্রধান্য দিয়েছ, কসম করে বলছি, তোমার এ সিদ্ধান্ত ন্যায়ানুগতা বঞ্চিত।’

৭. সাধারণ মানুষকে শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝাতে হবে। এ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহর আলোচনা ও মুসলিম মনিষীগণের বাণী তুলে ধরতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখি ও পিপীলিকার ঘটনা বলেছেন। কেননা তারা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল।

৮. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে-সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার মান সমুন্নত করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতাকে মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা আবশ্যিক।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গড়ে তোলার পাশাপাশি সফল কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾

[المجادلة: ১১]

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।' (মুজাদালা, ৫৮: ১১)

৯. প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা আবশ্যিক। শিক্ষাঙ্গনে দেশের সফল কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। যেন তারা দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আগামীর তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত আলোকিতরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথার্থ অবদান রাখতে পারে।

১০. “শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড”-শিক্ষার ক্ষেত্রে এ মূলনীতির চূড়ান্ত। শিক্ষার আলো ও অশিক্ষার অন্ধকার কখনো এক হতে পারে না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কখনো সমান হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ৯]

অর্থ: 'বল; যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?' (সূরা যুমা, ৩৯: ৯)

১১. মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয়ভিত্তিক ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার জন্য দেশের ব্যবসায়ী ও বিদ্বান শ্রেণিকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এটা তাদের জাতীয় ও মানবিক দায়িত্বও বটে। কোনো অবস্থাতেই তা এড়ানোর সুযোগ নেই।

১২. জ্ঞানার্জনের পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিরন্তন বাণীই হলো মূল আদর্শ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ». (صحيح مسلم) ২০৭৬/ ৬

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ তা'আলা তার জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন।' (মুসলিম, ৪/২০৭৪)

১৩. জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা হলেন নবীগণের প্রকৃত ওয়ারিশ। আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ». (سنن الترمذي ت شاكر) ৬৭/ ৫

অর্থ: 'আলেমগণই হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। কেননা নবীগণ ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসেবে 'দিনার-দিরহাম' রেখে যাননি। রেখে গিয়েছেন শুধু ইলম ও জ্ঞান। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে পারবে, সে বিরাট কিছু লাভ করবে।' (ইবনে মাযাহ, ৫/৪৯)

পারিশিষ্ট:

- ❖ আমিরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) (৪০ হি.) বলেছেন:
‘ইলম ও জ্ঞানের মর্যাদা এমনই যে, যার জ্ঞান নেই সে-ও নিজেকে জ্ঞানী বলে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করে। আর অজ্ঞতা-মূর্খতা এতটাই ঘৃণ্য যে, মূর্খ লোকও নিজেকে মূর্খতার দায়মুক্ত করতে পেরে স্বস্তি বোধ করে।’
- ❖ আন্দালুসী কবি আবু ইসহাক আলবেরি (৯৮৫-১০৬৭ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:

وَكُنْزًا لَا تَخَافُ عَلَيْهِ لِيَصَّا

خَفِيفَ الْحَمْلِ يَوْجَدُ حَيْثُ كُنَّا

يَزِيدُ بِكَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ

وَيَنْقُصُ أَنْ بِهِ كَفًّا شَدَدًا

অর্থ: ‘জ্ঞান-বিজ্ঞান হলো এমন ভাণ্ডার, যা চুরি হওয়ার ভয় নেই। নিতান্তই হালকা। সর্বত্র বহনযোগ্য। জ্ঞানের আলো যত ছড়াবে ততই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যখনই জ্ঞানের প্রচার-প্রসার বন্ধ হবে ধীরে-ধীরে তা সংকুচিত হতে থাকবে।’

- ❖ বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৪৯-১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান খোঁড়া অচল। আর জ্ঞানের আলো ছাড়া ধর্মকর্ম অন্ধ-আলোহীন।’

- ❖ মিশরীয় সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘যখন কোনো বই পড়ি বইয়ের কালো হরফগুলোই শুধু পড়ি না, বইয়ের হৃদয়াত্মার সাথে মিশে যাই।’

- ❖ ফরাসি দার্শনিক র্যনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘জ্ঞান-বিজ্ঞানই হলো বিশ্বে সর্ববৃহৎ শক্তি।’

হিংসা

জ্ঞান-গরিমা, অর্থ-সম্পদ, সুনাম-সুখ্যাতি, বংশ-মর্যাদা, পদমর্যাদা ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে কারো উৎকর্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখে গা জ্বালা করা, তার সবটুকু ছিনিয়ে নিয়ে এককভাবে নিজেই ভোগ-দখল করার উদগ্র বাসনার নামই হিংসা। হিংসা হলো 'দোধারি' তলোয়ার, যেভাবেই চালানো হোক, ক্ষতি অনিবার্য।

হিংসুক নিজেই হিংসার আগুনে জ্বলে, অন্যের ক্ষতি সাধন করে একক দখলদারিত্ব কায়েম করার উদগ্র বাসনায় অস্থির হয়ে উঠে। হিংসার গুনাহ ও পাপের বোঝা বহন করার সঙ্গে সঙ্গে নেক আমলসমূহ বরবাদ করে অপর দিকে ভুক্তভোগী শ্রেণি হিংসুক-কর্তৃক নানা প্রতিকূলতা ও বিপত্তির শিকার হয়। হিংসার কবলে তাদের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা ক্রমশ অসহনীয় ও দুর্বিধহ হয়ে উঠে।

হিংসা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাধি। এর কারণে সমাজে বাদবিবাদ, বিদ্বেষ, শত্রুতা, অন্যায়-অনাচার, যুলুম-অত্যাচারের মতো জঘন্য অপকর্মের সূত্রপাত হয়। তাই হিংসা বর্জনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার উপায় কী? এ জটিল সমস্যার সমাধান কী?

সমাধান:

১. মানুষমাত্রই তার মনে হিংসার উদ্রেক হবে এবং এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আক্রোশ ভরে মনের মধ্যে হিংসা পুষে রাখা দূষণীয়। যে কোনোভাবে তা দমন করাই বাঞ্ছনীয়। তাই অন্যের যোগ্যতা, দক্ষতা, সুযোগ-সুবিধা ও অর্থপ্রাচুর্যের দিকে না তাকিয়ে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন, তার কথা স্মরণ করুন। তাহলে দেখবেন, এমন বহু নিয়ামত আপনার ভাগ্যে জুটেছে, যা পাওয়ার জন্য অন্যরা উদগ্রীব হয়ে আছে।

২. একবার ভেবে দেখুন, হিংসার কারণে আপনার নেক আমল বরবাদ হবে। মানসিক প্রশান্তি ব্যাহত হবে। নিত্যদিনের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হবে। কেননা হিংসা হলো এমন আগুন যা সর্বপ্রথম হিংসুককেই জ্বালিয়ে মারে।
৩. মনে রাখুন, ইবলিসই হলো হিংসা-বিদ্বেষের মূল হোতা। তার দুষ্ট মনেই হিংসার প্রথম উৎপত্তি। জান্নাতে সে আদম (আ.)-কে হিংসা করেছিল। সুতরাং, কেউ যদি হিংসার বশবর্তী হয় সে হবে ইবলিসের অনুসারী। তার পরিণতি ভয়াবহ।
৪. ভুলে যাবেন না, সময় আবর্তনশীল। নিয়তি পরিবর্তনশীল। কালের দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আপনি নিজেও আক্রান্ত হতে পারেন। তাই সর্বদা অন্যের মঙ্গল কামনা করা কর্তব্য। পরার্থপরতা ও পরোপকারে সচেष्ट থাকা বাঞ্ছনীয়।
৫. ইবাদত ও সদাচারে সদা যত্নবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুনাহ ও নাফরমানি পরিহারে সচেष्ट হোন। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করুন, তাহলে যাবতীয় অকল্যাণ অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা পাবেন। পবিত্র কুরআনের আশ্বাসবাণী শুনুন:

﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران: ১২০]

অর্থ: ‘আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তার পরিবেশষ্টনকারী।’
(আলে-ইমরান, ৩: ১২০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«حَفِظَ اللَّهُ يَحْفَظَكَ». (سنن الترمذي ت شاكر) ১৬৭/ ৬

অর্থ: ‘আল্লাহ তা‘আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চল। তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন।’ (তিরমিজী, ৪/৬৬৭)

৬. হিংসুকের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন। তার কাছেও যাবেন না। বন্ধু হিসেবে তো কখনই না। কেননা আপনার মঙ্গল ও ইতিবাচক ক্ষেত্রে সে কখনো স্বস্তিবোধ করবে না। তার একমাত্র অপচেষ্টা হলো আপনার শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি ছিনিয়ে নিয়ে আপনাকে কল্যাণ-বঞ্চিত করা।
৭. দু'আ ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করুন। সকাল-সন্ধ্যায় সুন্নত অযীফাগুলো নিয়মিত আদায় করুন। শরীয়তে এমন অনেক আমলের দিকনির্দেশনা রয়েছে, যাবতীয় বিপদ-আপদ, সংকট ও প্রতিকূলতার মুখে যা আপনার রক্ষাকবচ-সে সমস্ত আমলে যত্নবান হোন। বিশেষভাবে 'মুআওয়াযাতাইন' দু'টি রক্ষাকবচ: সূরা ফালাক ও সূরা নাস নিয়মিত পাঠ করুন।
৮. হিংসুকের হিংসা মোকাবেলা করার জন্য, কিংবা তা থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হলো-যদিও এর বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য; কেননা তা মানুষের স্বভাবজাত ও প্রচলিত মানসিকতা বিরোধী- হিংসুকের হিংসা-বিদ্বেষের মাত্রা যত তীব্র হোক, আপনি আন্তরিকতা, সদাচার ও ভালোবাসার পরিচয় দিন। সৌহার্দ্য ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ তাকে হাদিয়া ও উপঢৌকন দিন। প্রফুল্লচিত্তে সহাস্য বদনে তার সাথে সাক্ষাৎ করুন। এটাই পবিত্র কুরআনের নির্দেশ ও দিকনির্দেশনা:

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَجْسَنُ فَإِذَا

الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [حم السجدة : ٣٤]

অর্থ: 'ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।' (হা-মীম সাজদা, ৪১: ৩৪)

৯. আপনার যোগ্যতা-দক্ষতা ও সুযোগ-সুবিধার কথা দশজনের কাছে প্রচার করবেন না। বিশেষভাবে হিংসুকের কাছে এসব বিষয় জাহির করা থেকে বিরত থাকুন। হিংসুকের হিংসা থেকে বাঁচার জন্য এটি একটি কার্যকর পন্থা। ইয়াকুব (আ.) তাঁর সন্তানদের এ পদ্ধতি বাতলে দিয়েছিলেন। সন্তানদের জনশক্তি ও একতাবদ্ধতার বিষয়টির উপর যেন দুষ্ট লোকের নজর না লাগে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿يَبْنَى لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾

অর্থ: 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরযা দিয়ে প্রবেশ কর না, ভিন্ন ভিন্ন দরযা দিয়ে প্রবেশ করবে।' (ইউসুফ, ১২: ৬৭)

তাফসির বিষারদগণের অভিমত, রাজার দরবারে প্রবেশের সময় এ বিশেষ পত্না অবলম্বনের উদ্দেশ্য ছিল, হিংসুক ও দুষ্ট লোকের 'বদনজর' থেকে বোঁচে থাকা।

১০. একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। কখনো যেন মনের মধ্যে 'গায়রুল্লাহ'র ভয় স্থান না পায়। সুনিশ্চিত থাকুন, আপনি যদি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয়ে থাকেন, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত যিকিরের রক্ষাকবচ ধারণ করেন তাহলে হিংসুকের হিংসা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যালিমের যুলুম প্রতিফলিত হবে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ৫১]

অর্থ: 'বলুন, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আপতিত হবে না।' (তাওবা, ৯: ৫১)

সুন্নাহর ভাষায়:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ»۔ (سنن الترمذي ت شاكر ৬/ ৭৭৭)

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জেনে রাখুন, গোটা জাতি যদি

আপনার কল্যাণে একতাবদ্ধ হয় তবুও আল্লাহ তা'আলা আপনার ভাগ্যে যতটুকু কল্যাণের ফায়সালা করেছেন, এর অতিরিক্ত তারা একবিন্দু কল্যাণ সাধন করতে পারবে না। আর গোটা জাতি যদি আপনার ক্ষতি সাধনে সংঘবদ্ধ হয় তবুও আল্লাহর ফায়সালার বাইরে তারা আপনার একচুল পরিমাণও ক্ষতি করতে পারবে না।' (সুনানে তিরমিজী, ৪/৬৬৭)

১১. হিংস্রের হিংসার উচিত জবাব হলো কোনো প্রত্যুত্তর না করে নীরব নিশ্চুপ থাকা। সুতরাং মানুষের হিংসাত্মক ও ব্যাসাত্মক কটুক্তির প্রতি জ্বাক্কেপ না করে আপন মনে কাজ করে যান। কাজের উদ্যোগ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিন। কথিত আছে, প্রকৃত জবাব হলো বাস্তবে পরিণত করে দেখানো, মুখের ওপর দু'টা কথা শুনিয়া দেওয়া তাতো নিতান্ত সামান্য।
১২. সুনিশ্চিত থাকুন, রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি যার জন্য যতটুকু রিযিকের ফায়সালা করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভোগ করার আগে কেউ মৃত্যুবরণ করবে না। আপনার জীবিকা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না, ভোগদখল করতে পারবে না।
১৩. অন্যের আয়ত্তে আপনার পছন্দের ভালো লাগার কিছু দেখলে তার বরকতের দু'আ করুন। তার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এমনই আদেশ করেছেন:

«إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ، فَلْيَذْغُ لَهُ بِالْبَرَكَاتِ».

(سنن ابن ماجه) ১১৬০/২

অর্থ: 'তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের কাছে নিজের পছন্দের ও ভালো লাগার কিছু দেখবে, তখন সে যেন তার বরকতের দু'আ করে।^{১০০}' (সুনানে ইবনে মাযাহ, ২/১১৬০)

১৪. মনটাকে নিষ্কলুষ ও হিংসা-বিদ্বেষমুক্ত রাখুন। ইহকালে জান্নাতের পরম সুখানুভূতি লাভ করবেন। আত্মার শুদ্ধতা ও মনের নিষ্কলুষতা আপনার জন্য জান্নাতের ফায়সালা ত্বরান্বিত করবে।

^{১০০} অর্থাৎ, তার ক্রমশ বৃদ্ধি কামনা করে।

১৫. আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস, দুঃস্থ ও প্রয়োজনগ্রস্তদের সাহায্য-সহযোগিতা ও দান-সদকা হলো আপনার অন্যতম পুঁজি। যাবতীয় বিপদ-আপদ, হিংসা ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর ও কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত পন্থা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন:

‘বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য দান-সদকার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার জন্য তা সমান প্রযোজ্য।’

১৬. আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা করুন। একনিষ্ঠ মনে তাওবা করে গুনাহমুক্ত হোন এবং সামনের দিনগুলোতে গুনাহমুক্ত জীবন-যাপনে সচেষ্ট হোন। কেননা গুনাহ ও পাপাচারই হলো বিপদগ্রস্ত হওয়ার মূল কারণ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ

كَثِيرٍ﴾ [سورة الشورى: ৩০]

অর্থ: ‘তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল।’ (আশ-শূরা, ৪২: ৩০)

১৭. অর্থবিস্ত, সুনাম-সুখ্যাতি, সন্তান-সন্ততি ও ঘর-বাড়ি মোটকথা, আপনার পছন্দের ও ভালো লাগার যা-কিছুই লাভ করবেন, বলুন, مَا شَاءَ اللَّهُ لَا (মাশাআল্লাহ, লা- কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা গোটা মানবজাতিকে এমনই দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেছেন:

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

[الكهف: ৩৭]

অর্থ: ‘তোমার উদ্যানে প্রবেশ করে তুমি কেন বললে না, আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই।’ (কাহ্ফ, ১৮: ৩৯)

পরিশিষ্ট:

- ❖ হিংসা-বিদ্বেষের সূত্র ধরে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য ঘটনাটা ঘটেছে। তার মূল হোতা ইবলিস শয়তান। মাটির তৈরি আদমকে হিংসা করে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। তার মন-মানসিকতা হিংসা-বিদ্বেষে এতটাই কলুষিত হলো যে, স্রষ্টার আদেশ লঙ্ঘন করে হলেও আদমকে সিজদা করা থেকে বিরত থাকল। স্রষ্টার আনুগত্য ছেড়ে অবাধ্যতার পথ বেছে নিল। রহমতের শীতল ছায়া ছেড়ে অভিশাপের আগুনে দগ্ধ হলো। জান্নাতের বাগান ছেড়ে জাহান্নামের গর্ভে নিমজ্জিত হলো। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে হিংসা-বিদ্বেষে কলুষিত করবে ইবলিস হলো তার সর্বস্বীকৃত প্রধান 'গুরু'। তাই সতর্ক হোন। ইবলিসের শিষ্য হয়ে নিজেকে কলুষিত করবেন না। রহমতের শীতল ছায়া ছেড়ে অভিশাপের আগুনে ঝাঁপ দিবেন না।
- ❖ আইরিশ লেখক জর্জ বার্নার্ড শো (১৮৫৬-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
'যে দাঁতব্যথায় ভুগছে, তার মনে হয়, দাঁত-ব্যথামুক্ত বাকি সবাই খুব সুখী।'
- ❖ লোকমান হাকিম (রহ.) বলেছেন:
'হিংসুকের তিনটি আলামত: ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে নিন্দা করে, উপস্থিতিতে তোষামোদ করে, তার বিপদে উল্লসিত হয়।'

ভয়

ভয় হলো একটি মানসিক অবস্থা। মৃত্যু, রোগ, শোক, হিংসা-বিদ্বেষ, ভয়ংকর শত্রু, প্রাণীর আক্রমণ, ঘুটঘুটে অন্ধকার ও নির্জন নিস্তব্ধ পরিবেশে আবদ্ধ হওয়া ইত্যাদির মতো অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কাই হলো ভয়-ভীতির প্রধান অনুঘটক। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেন:

‘কোনো অকল্যাণ-অনিষ্টের অজানা আশঙ্কা থেকে সৃষ্ট মানসিক অস্থিরতার নামই হলো ভয়।’

দার্শনিক অ্যারিস্টটল-এর বক্তব্য হলো, ‘ভয় হলো অনাকাঙ্ক্ষিত ও ভীতিকর কিছু ঘটার আশঙ্কার কারণে মানসিক অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য।’

ভয় পাওয়া এবং শংকিত হওয়া দুষণীয় কিছু নয়, দুষণীয় হলো ব্যক্তির এ ধরনের দাবি করা যে, সে কখনো কোনো কিছুর ভয় করে না। এ ধরনের দাবির কোনো ভিত্তি নেই। কেননা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে ভয়-ভীতি সংগঠিত করা হয়েছে, যা সহজাত ও স্বভাবজাত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: ১৭]

অর্থ: ‘মানুষতো সৃষ্টি হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিহ্নরূপে।’^{৩১}

তবে সবকিছুরই একটি মাত্রা ও পরিমিতি রয়েছে। যা বজায় রাখা কাম্য, লঙ্ঘন করা অবাঞ্ছনীয়। সুতরাং ভয়-ভীতি যদি মাত্রাতিরিক্ত করে তবে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। তা ব্যক্তিকে ভীকৃত, মানসিক দুর্বলতা ও ভীতিপ্রবণ মানসিকতার পথে ঠেলে দেয়। পর্যায়ক্রমে তা মারাত্মক ব্যাধিতে

^{৩১} মা‘আরিজ, ৭০: ১৯

পরিণত হয়। এ রোগ মানুষকে দুর্বলপ্রাণ করে ফেলে। ফলে ভুক্তভোগী নিজের প্রতি চরম অনাস্থা ও সংশয়ের শিকার হয়। আত্মবিশ্বাস খুইয়ে বসে। বাস্তব জীবনের কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে সে পশ্চাৎপদ ও পলায়নপর ভূমিকায় স্বস্তি বোধ করে। চরম নিরাশা ও নেতিবাচক মানসিকতায় ভুগতে থাকে।

ভয়-ভীতি তার মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনায় এমন প্রবলভাবে ভর করে যে, তার মানসিক প্রশান্তি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। মন-মানসিকতা অস্থির বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। পর্যায়ক্রমে স্বাভাবিক জীবনযাপন চরম অসহনীয় হয়ে উঠে। জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তির মৃত্যু ঘটে।

সুস্থ-স্বাভাবিক ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অনর্থক ভয়-ভীতিমুক্ত হয়ে থাকতে হবে। অযথা আশঙ্কা ও উৎকর্ষা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু উপায় কী? এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

সমাধান:

১. তাকদির ও নিয়তির ফায়সালায় পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখুন। আপনার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে, সবকিছু মহান আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও আদেশে বাস্তবায়িত হয় এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যা ফায়সালা করেছেন আপনার ভাগ্যে তা-ই ঘটবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ৫১]

অর্থ: 'আপনি বলুন, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ-আপদ আমাদের উপর আপতিত হবে না।'^{৩২}

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ

يَكُنْ لِيُصِيبَكَ» (سنن أبي داود) ২২০/ ৬

অর্থ: 'জেনে রাখ, তোমার ভাগ্যে যা ঘটবে তা কোনোভাবেই খণ্ডাবে না। আর যা তোমার ভাগ্যে নেই তা কিছুতেই তোমাকে আক্রান্ত করতে পারবে না।' (আবু দাউদ, ৪/২২৫)

তাহলে আর ভয় কীসের? দুশ্চিন্তা কীসের?

২. ভয় ও আশঙ্কার জায়গাগুলোতে আপনার বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিষয়গুলোর যৌক্তিক বিশ্লেষণ করুন। তাহলে নিশ্চিত হতে পারবেন, আপনার অজানা আশঙ্কা ও সংশয়প্রবণতা ভিত্তিহীন। যার অধিকাংশই বাস্তবে পরিণত হয় না। যেমন : বিমানে চড়তে আপনার ভয় হয়। বিমানে করে শূন্যের পথে ভ্রমণ করার সাহস পান না। তাহলে বিমান সম্পর্কে আপনার জানা-শোনার পরিধি বাড়ান। এর বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত হোন। এভাবে আপনার ভয়-ডর কেটে যাবে। এটা পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞতালব্ধ পন্থা।
৩. বিশ্বাস করুন, মানুষ যা কিছু আশঙ্কা করে তার অধিকাংশই বাস্তবে ঘটে না। এটা একটা বাস্তব মূলনীতি। ভয়-ডর দূর করার জন্য এটি একটি কার্যকর পন্থা।
৪. কোনো ক্ষেত্রে যদি শঙ্কিত হন এবং সময়ের সাথে সাথে শঙ্কার মাত্রা বাড়তে থাকে তাহলে বারবার পাঠ করুন:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

অর্থ: 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতোই না শ্রেষ্ঠ অভিভাবক।'

বিপদে-আপদে, বাধা ও প্রতিকূলতায় এ দু'আটি মু'মিনের পরম আশ্রয়। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۖ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فَأَتَىٰ خِثْيَاءَ الْأُتَىٰ ۚ﴾
 ﴿مَنْ أَلَّهِ فُضْلٌ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ۚ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَهُ ۖ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾

[আল عمران: ১৭৩, ১৭৬]

অর্থ: 'যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, নিশ্চয়ই তোমাদের বিরুদ্ধে সেইসব লোক সমবেত হয়েছে; অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এতে তাদের বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তারা বলেছিল; আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি মঙ্গলময়, কর্মবিধায়ক।

অনন্তর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদসহ প্রত্যাবর্তিত হয়েছিল, তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল; আর আল্লাহর অনুগ্রহ অতি ব্যাপক।' (আলে-ইমরান, ৩: ১৭৩-১৭৪)

৫. অতীত অনুসন্ধান করে দেখুন। পেছনে ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করুন। দেখবেন, আপনার অধিকাংশ শঙ্কা ও আশঙ্কার বিষয়গুলো আর বাস্তবে ঘটেনি। নিশ্চিত হতে পারবেন, বাস্তবতার চেয়ে মানুষের মনের অযাচিত জল্পনা-কল্পনা ও শঙ্কা-আশঙ্কার পরিমাণই বেশি।
৬. মহান বীরপুরুষদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করুন। কীভাবে তাঁরা জীবনের চরম বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছেন! কী সফলভাবে শত বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করেছেন। ভয় ও আশঙ্কা জয় করে দুর্বীর গতিতে আগামীর পথে অগ্রসর হয়েছেন। বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। তাঁদের জীবনদর্শন অবলম্বন করে জীবনাদর্শের অনুসরণ করুন। এ ক্ষেত্রে আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ হলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ।
৭. ভয় ও শঙ্কার মুহূর্তে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে একাকিত্ব বরণ করে নিবেন না। দীর্ঘ অবসর যাপনে প্রবৃত্ত হবেন না, তাহলে নানা শঙ্কা ও আশঙ্কা আপনার ওপর প্রবলভাবে জেঁকে বসবে।

তার চেয়ে আপনি বরং অন্যদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকুন। শিশু-বাচ্চাদের সাথে হাস্য-রসিকতায় মেতে উঠুন। একাকিত্বের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে জনহিতকর ও কল্যাণমূলক উদ্যোগ-আয়োজনে অংশগ্রহণ করুন। জীবনের চরম বাস্তবতা ও বাধাবিপত্তির মোকাবিলা করতে শিখুন।

৮. লোকদের সাথে সামাজিক সম্পর্কগুলোকে পরিমার্জিত করুন। নিরাশাবাদী ও নেতিবাচক মানসিকতার লোকদের সঙ্গে ত্যাগ করুন। তাদের সঙ্গে আপনাকে সংশয়প্রবণতার দিকে ঠেলে দিবে। সাহসী, আশাবাদী, ইতিবাচক ও নীতিবান লোকদের সাথে গুঠাবসা করুন। তাদের সংসঙ্গ আপনাকে সাহস যোগাবে এবং আশাবাদী করে তুলবে।
৯. নিজের জন্য উপযুক্ত কোনো ক্রীড়াদলে যোগদান করুন। খেলাধুলা ও আনন্দ-বিনোদনে নিজেকে উচ্ছল-প্রাণবন্ত রাখুন। এমন একটি খেলা ও প্রশিক্ষণ বেছে নিন যা আপনার মনে সাহস সঞ্চার করবে। আপনার মানসিকতাকে বলিষ্ঠ করে তুলবে। যেমন: বক্সিং, পর্বতারোহণ, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা, সাঁতার ইত্যাদি।
১০. শয়তানের প্ররোচনা ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। মনের যাবতীয় ভয়-শঙ্কা ও জল্পনা-কল্পনা দূর হয়ে যাবে। মনে রাখুন, মানসিক ভয়-ভীতির পেছনে শয়তানের কুমন্ত্রণা মূল ক্রীড়নক। আপনি যদি সফলভাবে এর মোকাবেলা করতে পারেন, তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন তাহলে আর কোনো ভয় নেই। ভয় করবেন একমাত্র আল্লাহকে। পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন :

﴿إِنَّمَا ذِكُّمُ الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيََاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ১৭০]

অর্থ: 'প্রকৃতপক্ষে সে তো শয়তান, যে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তবে তাদেরকে ভয় করো না। বরং কেবল আমাকেই ভয় করো।' (আলে-ইমরান, ৩: ১৭৫)

১১. ভয়মুক্ত থাকার জন্য আপনাকে দু'টি পন্থা বাতলে দিচ্ছি। প্রথমত, নিজের চেষ্টা ও সাধ্যানুযায়ী যাবতীয় বৈধ উপায় অবলম্বন করুন। সামর্থ্যের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে কাজিক্ত গন্তব্যে এগিয়ে যান। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলার ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে আপনার যাবতীয় বিষয় তাঁর যিম্মায় ন্যস্ত করুন। আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। মনে রাখবেন, গোটা জগতের যাবতীয় বিষয় তাঁর একক ইচ্ছা ও নির্দেশে পরিচালিত হয়। তাঁর হাতেই সবকিছুর চাবিকাঠি।

১২. বাল্যকাল থেকেই সন্তানদের সুস্থ মানবীয় মূল্যবোধের ওপর গড়ে তুলতে হবে। কঠোর ও রুঢ় শাস্তি প্রয়োগ করা, ভয় দেখানো, ভীতিকর ভিডিও বা চিত্র উপস্থাপন করা ইত্যাদির কোনোটিই শিশুদের ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়। ভীর্ণতা-কাপুরুষতা ও ভয়-সংশয় থেকে দূরে রেখে সন্তানদের উদ্যম সাহসিকতা ও গভীর আত্মবিশ্বাসের ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে।
১৩. যতক্ষণ না মনের ভয়-সংশয় দূর হয়ে প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা ফিরে আসে, আল্লাহ তা'আলার যিকির ও তাসবীহ-তাহলীল পাঠে মগ্ন থাকুন। প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতে যত্নবান হোন। মানসিক অস্থিরতা ও ভয় কাটিয়ে উঠার জন্য এবং আত্মিক স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করার জন্য আল্লাহর যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত হলো শ্রেষ্ঠ উপায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ২৮]

অর্থ: 'মনে রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।' (রা'দ, ১৩: ২৮)

১৪. নিয়মিতভাবে সকাল-সন্ধ্যায় মাসনূন দু'আ পাঠ করুন। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অবহেলা ও গাফলতি ঠিক নয়। কেননা এ দু'আগুলো আপনার অকল্যাণ প্রতিরোধে মজবুত রক্ষাকবচ। তাতে এমন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিহিত আছে যা আপনার মন-মানসিকতায় ভয়ের ছাপ পর্যন্ত ফেলতে দিবে না। সকাল-সন্ধ্যায় ফজর ও মাগরিব নামাযের পর বিশেষভাবে এ দু'আটি পাঠ করুন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ»। (مسند أحمد ط

الرسالة ২১/ ৭৩)

অর্থ: 'হে আল্লাহ, দুশ্চিন্তা-অস্থিরতা, দুঃখ-বেদনা, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আমি আপনার কাছে পানাহ চাচ্ছি। পানাহ চাচ্ছি ভীর্ণতা, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে। আরও পানাহ চাচ্ছি ঋণের বোঝা ও নির্যতন-নিপীড়ন থেকে।'।

১৫. মনের যাবতীয় ভয়-সংশয় ছাপিয়ে অপরের কল্যাণে দান-সদকা, সেবা-শুশ্রূষা ও সাহায্য-সহযোগিতায় নিয়োজিত হোন। তাতে যে আত্মিক তৃপ্তি ও মানসিক প্রশান্তি পাবেন তা অনন্য অসামান্য। গুনাহ নাফরমানি ও পাপাচার থেকে বিরত থাকুন। কেননা তা অনেক মানসিক দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার কারণ, মানসিক সংকীর্ণতা ও আত্মিক ব্যাধির উপকরণ।
১৬. সৃষ্টির প্রতি কোনো আশা-ভরসা না রেখে স্রষ্টার দান ও প্রতিদানের সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুতিতে আশাবাদী হোন। সমস্ত ক্ষতি ও অকল্যাণ প্রতিরোধে এবং সমূহ উপকার ও কল্যাণ লাভে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন। তিনিই তো তাকদির ও নিয়তির ফায়সালাকারী। তিনি যা দান করেন তা রদ করার সাধ্য কারো নেই। তিনি যা রদ করেন তা দান করার সাধ্য কারো নেই।
১৭. মনের যাতো জল্পনা-কল্পনা ও ভীতি-সংশয়ের কাছে নিজেকে সঁপে দিবেন না। তাহলে তা আপনার মন-মস্তিষ্কের ওপর প্রবলভাবে জেঁকে বসবে। মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তি নষ্ট করে আপনার জীবনকে অসহনীয় করে তুলবে।
১৮. মনে রাখুন, যে ভয় নৈতিক ও যৌক্তিক, তা আপনার জন্য আসন্ন বিপদের সতর্কবার্তা। ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করার চেষ্টা করুন। ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে আল-কুরআনের সুসংবাদ:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَّاتِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ১৫৫]

অর্থ: 'আর দেখ, আমি অতিঅবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব (কখনো) ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফসলহানির মাধ্যমে। যেসব লোক (এরূপ অবস্থায়) সবর ও ধৈর্যের পরিচয় দেয়, তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন। (বাকারা, ২: ১৫৫)

১৯. রাসূল যখন কোনো ভয় ও শঙ্কা আঁচ করতেন বেলাল (রা.)-কে বলতেন, 'হে বেলাল, নামায কায়েম করে আমাদের প্রশান্তি দাও।'

সুতরাং আপনিও ভয়-ভীতির মোকাবেলায় নামাযের আশ্রয় গ্রহণ করুন। কেননা নামায হলো আপনার চক্ষুশীতলতা, নিরাপত্তা ও শান্তির ঋণাধারা।

২০. শুধু আজকের দিনটির জন্য পরিকল্পনা করুন। বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে অজানা আশঙ্কা ও দূশ্চিন্তায় ভুগবেন না। মনে রাখুন, ভয়-ভীতি আপনার কোনো কাজে আসবে না। তা আপনার মৃত্যুকে একটুও বিলম্বিত করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَكِنَّ أُمَّةً أَجَلٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا

يَسْتَقْدِرُونَ﴾ [الأعراف: ৩৬]

অর্থ: 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে। যখন সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে, তখন তারা এক মুহূর্ত তার সামনে বা পেছনে যেতে পারে না।' (আ'রাফ, ৭: ৩৪)

২১. মানসিক ভয়-ভীতির পরিস্থিতিতে আপনার বন্ধুজন ও আত্মীয়স্বজনের সাহায্য নিন। বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করুন, যেন তারা আপনার সাহায্যে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিস্থিতি যতই জটিল হোক তাদের সাহায্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না। অন্যথায় অবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। তাঁর পরামর্শ মোতাবেক নিজেকে পরিচালিত করুন।

২২. যা করতে ভয় হয়, বারবার তা-ই করার চেষ্টা করুন। বিখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক রাফ ওয়াল্ডো এমারসন বলেছেন:

'যা করতে ভয় হয়, সর্বদা তা-ই করুন।'

আপনার যদি গাড়ি চালাতে ভয় হয় তাহলে গাড়ি চালানোর প্রাঙ্গিস করুন। অনবরত চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে অনেক দুঃসাধ্য সাধন হয়, অনেক ভয় ও শঙ্কার বিষয় অনায়াস হয়ে যায়। ভালোভাবে আয়ত্ত করার পর বারবার গাড়ি চালান। ধীরে ধীরে আপনার ভয় কেটে যাবে।

২৩. ভয় করবেন না। আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। সুন্দর আগামীর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনার পরম সহায়। আশা-ভরসা আপনার পাথেয়। সফলতা ও সৌভাগ্য আপনার নিত্যসঙ্গী।
২৪. অযাচিত ভয়-ভীতির পরিণামের কথা চিন্তা করুন। এর কারণে পরিবার ও সমাজে অনেক নেতিবাচক পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। অনর্থক শঙ্কা-আশঙ্কা দেখে মানুষ ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং ভীতিপ্রবণ মানসিকতা পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়।
২৫. নিজেকে বিশ্বাস করান যে, আপনি সাহসী। বাস্তবে সাহসী ভূমিকা পালন করুন। দ্বিধা-সংশয় ও হীনমন্যতা থেকে দূরে থাকুন। কেননা এ স্বভাব দু'টি আপনাকে ভীরা ও আত্মসমাহিত করে ছাড়বে। সাহসিকতার সাথে নিজের এক একটি অধিকার বুঝে নিন। যত বাধা-প্রতিবন্ধকতার শিকার হন-না-কেন, দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে যান। নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশ করুন।
২৬. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না। কেননা আল্লাহর ভয় ও একত্ববাদের বিশ্বাস আপনার মনে সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে। আপনার জীবনকে অনাবিল প্রশান্তিতে ভরে দিবে। পক্ষান্তরে গায়রুল্লাহর ভয়, তা তো মর্যাদাবানকে অপদস্থ, সৌভাগ্যবানকে হতভাগ্য এবং ধনীকে নিঃস্ব করে ছাড়ে। সুতরাং এক আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। তাঁর ফায়সালার বাইরে কেউ আপনাকে একচুল ক্ষতি করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المجادلة: ১০]

অর্থ: 'এরূপ কানাকাকি হয় শয়তানের প্ররোচনায়, যাতে সে মুমিনদেরকে দুঃখ দিতে পারে। কিন্তু সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে না। মুমিনদের উচিত কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা করা।' (মুজাদালা, ৫৮: ১০)

পারিশিষ্ট:

- ❖ 'যদি মর্যাদা ও গৌরব হৃত হয়, রুখে দাঁড়াও। সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সকলের আস্থা ও ভরসার প্রতীকরূপে নিজেকে গড়ে তোল। বকরির নম্রতা ও নমনীয়তা ইহকালে তার কোনো কাজে আসেনি। সিংহের সাহসিকতা সর্বজন ঘৃণিত; কিন্তু তাতেই বা তার কী ক্ষতি?' -আয়েয আল কারনী
- ❖ বিখ্যাত ইংরেজ কবি উইলিয়াম শেকসপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন:
'ভীক-কাপুরুষ ভয় কবলে এক জীবনেই হাজার বার মরে। আর সাহসী বীর মৃত্যুর স্বাদ একবারই গ্রহণ করে।'
- ❖ জনৈক দার্শনিক বলেছেন:
'বুলেটের বিকট আওয়াজে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। কেননা যে বুলেটের আঘাতে তোমার মৃত্যু হবে তার শব্দ তুমি শুনতেও পাবে না।'
- ❖ জনৈক দার্শনিক বলেছেন:
'পৃথিবীর সব ভয়েই ভীতির সঞ্চার হয়। একমাত্র আল্লাহর ভয়ে প্রশান্তি লাভ হয়।'
- ❖ বিখ্যাত মিশরীয় লেখক নাগীব মাহফুজ (১৯১১-২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
'ভয়-ভীতি আপনার মৃত্যুর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু জীবন চলার পথে শত্রু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।'
- ❖ 'আমাদের মাঝে কেউ কেউ অন্ধ মাছের মতো। বিশাল সমুদ্রে থেকেও মনে করে, ছোট্ট পাত্রে আটকে আছে। আর আমরা মানবজাতি, ঈমান ও বিশ্বাসের সুবিশাল জগতে আমাদের সৃষ্টি; কিন্তু আমরা নিজেদের ভয়-ভীতি, দুঃখ-বেদনা ও বিরোধিতা বৈরিতার ঘেরাটোপে আটকে রেখেছি। -আয়েয আল কারনী

কৃপণতা

আল্লামা আবুল ফারায় ইম্পাহানী (রহ.) বলেন:

‘কৃপণতা হলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া।’

বিশিষ্ট ভাষাবিদ আবুল আব্বাস ফুযূমী (রহ.) বলেন:

‘কৃপণতা হলো আর্থিক দায়-দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকা।’

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে এবং হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে কৃপণতা থেকে সতর্ক করেছেন।

কৃপণতা হলো একটি জঘন্য স্বভাবদোষ ও চারিত্রিক ভ্রষ্টতা। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা ঘৃণিত স্বভাব। কেননা তা ব্যক্তিকে পরোপকার ও পরার্থপরতা ছেড়ে আত্মপরায়ণতা ও স্বার্থপরতায় প্রলুব্ধ করে। অন্যদের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অর্থ-বিস্ত্র কুক্ষিগত করতে এবং সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে নিতে প্ররোচিত করে।

কৃপণতার কারণে ব্যক্তির কপালে শুধু দুর্নাম ও নিন্দাই জোটে। এমনকি মৃত্যুর পরও এ দুর্নাম বয়ে বেড়াতে হয়।

কৃপণতার মূল কারণ হলো সম্পদলিপ্সা ও জাগতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের উদগ্র বাসনা। ফলে কৃপণ মনে করে, সে যদি অন্যের কল্যাণে যতসামান্যও ব্যয় করতে থাকে তাহলে এতে সে একদিন নিঃস্ব হতদরিদ্রে পরিণত হবে।

সে মনে করে, টাকা ছাড়া কিছুই হয় না অর্থবিস্ত্রই হলো যাবতীয় বিষয়ের একমাত্র উৎস ও নিয়ন্ত্রক। ফলে সে অর্থোপার্জনে যতটা তৎপর, অর্থসঞ্চয়ে তারচেয়ে দ্বিগুণ তৎপর। পর্যায়ক্রমে সে হয়ে উঠে অর্থ-সম্পদের অনুগত দাসানুদাস। অর্থবিস্ত্র তার একমাত্র কর্তৃত্ববান মনিব।

সুখি সমাজে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, অনুগত সেবক হিসেবে সম্পদ যতোটা উৎকৃষ্ট কর্তৃত্ববান মনিব হিসেবে ততোটা নিষ্ঠুর নিকৃষ্ট। সুতরাং স্বয়ং ব্যক্তি যদি তার অর্থবিশ্বের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যথাযথ খাতে ব্যয় করতে পারে তাহলে সে মহান মনিব। কিন্তু যদি সে সম্পদের অনুগত দাসে পরিণত হয় তাহলে তার মতো হতভাগা আর কে আছে!

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে কৃপণতা ও ব্যয়কুষ্ঠতা একটি মারাত্মক ব্যাধি। বিশেষভাবে সামাজিক জীবনে তা এক জটিল সমস্যা। এর জের ধরে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এর থেকে বাঁচার উপায় কী? এর সঠিক সমাধান কী?

সমাধান:

১. কৃপণতা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহয় যে সতর্কবাণী ও নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সে সম্পর্কে জানুন। আপনার মধ্যে যে কৃপণতা দেখা দিবে, তার ক্ষতিকর দিকগুলোর কথা চিন্তা করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বাণী স্মরণ রাখুন:

﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّا نَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ

الْفُقَرَاءُ﴾ [محمد: ৩৮]

অর্থ: 'আর যে-কেউ কার্পণ্য করে, সে তো কার্পণ্য করে নিজে নিজেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত।'

(মুহাম্মাদ, ৪৭: ৩৮)

২. কখনো কি ভেবেছেন, যে সম্পদ আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইছেন তার শেষ পরিণতি কী? এখন যে দান-সদকা করছেন না, যাকাত আদায় করছেন না, কাল কিয়ামতের দিন যখন আপন রবের সামনে দাঁড়াবেন, কী জবাব দিবেন? যারা সম্পদলিপ্সা ও অর্থবিশ্ব সঞ্চয়ে আকর্ষণ ডুবে আছে, কিয়ামতের দিন তাদের আক্ষেপ-অনুতাপের কথা স্মরণ করুন। সীমাহীন অনুতাপের জ্বালায় তারা বলবে (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي * هَلَكْتُ عَنْ سُلْطَانِيَّةٍ﴾ [الحاقة: ৩৭, ৩৮]

অর্থ: 'আমার অর্থ-সম্পদ আমার কোনো কাজে আসল না। আমার থেকে আমার সব ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে গেল।' (আল-হাক্বা, ৬৯: ২৮-২৯)

৩. বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। যে অর্থ-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখতে চাইছেন মৃত্যুর পর তার কানাকড়িও কবরে নিয়ে যেতে পারবেন না। এগুলো সবই আপনাকে ত্যাগ করে অন্যের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। তাদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ» (سنن الترمذي ৫/ ৫৭০)

অর্থ: 'তিনটি বিষয় মৃতের ব্যক্তির সাথে চলবে। এরপর দু'টি ফিরে আসবে আর একটি থেকে যাবে (চিরকালের জন্য)। পরিবার-পরিজন, অর্থ-সম্পদ ও আমল তার সাথে চলবে। পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ ফিরে আসবে। থেকে যাবে শুধু তার আমল।' (তিরমিজী, ৪/৫৯০)

৪. মনে রাখুন, আপনার বর্তমান মালিকানাধীন সম্পদ কাল ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পরিণত হবে। যথারীতি কোনো উত্তরাধিকারী তার বৈধ মালিক বনে যাবে। সে যদি আপনার সুযোগ্য নেক সন্তান হয় তাহলে আপনার কথা স্মরণ করবে। আপনার কল্যাণের দু'আ করবে। কিন্তু সে যদি হয় অবাধ্য অকৃতজ্ঞ তাহলে আপনার কষ্টার্জিত সম্পদ পাপাচার-অনাচারে অপচয় করে বেড়াবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، مَالِي، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَيْسَ فَأَبْلَى، أَوْ أُعْطِيَ فَأَقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ» (صحيح مسلم ২২৭৩/ ৫)

অর্থ: 'বান্দা বলবে, 'হায় আমার সম্পদ! হায় আমার সম্পদ!' সম্পদের তিনটা অংশই শুধু তার কাজে আসবে। যা খেয়েছে, তা

শেষ হয়ে গেছে। যা পরিধান করেছে, তা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। আর যা দান করেছে, তা সঞ্চিত হয়ে আছে। এছাড়া বাকি সবই তার হাতছাড়া। এগুলো মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।’ (মুসলিম, ৪/২২৭৩)

৫. অতীতের কৃপণ লোকদের অবস্থা লক্ষ্য করুন, ইতিহাসের পাতায় তারা শুধু নিন্দা-সমালোচনা ও হাস্য-পরিহাসের পাত্র হয়ে আছে। কৃপণতার কারণে তাদের ভাগ্যে জুটেছে শুধু সমালোচনা ও নিন্দা। উদারতার প্রশান্তি ও প্রতিদান তারা কখনো অর্জন করতে পারেনি।

বিখ্যাত আরব কবি যুহাইর ইবনে আবু সালমা (৫২০-৬০৯ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন, ‘কে আছে, যে সম্পদশালী হয়েও স্বগোত্রের সঙ্গে কৃপণতা করে বেড়াবে, আর সমাজের লোকেরা তার থেকে নির্মুখাপেক্ষী হয়ে ঘৃণাভরে স্মরণ করবে।’

৬. উদার, মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকুন। তাঁদের সান্নিধ্যে মহত্ত্ব ও উদারতার পাঠ গ্রহণ করুন। বদান্যতা ও দানশীলতার চর্চা করুন, যেন তা অভ্যাসে, পর্যায়ক্রমে স্বভাবজাত ও সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ» (سنن الترمذي) ৩৬২/ ৬

অর্থ: ‘উদার-দানশীল আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত। জান্নাতের নিকটবর্তী। লোকসমাজের প্রিয়পাত্র এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী। আর কৃপণ, সে তো আল্লাহর রহমত-বঞ্চিত। জান্নাত থেকে দূরে। মানুষের ভালোবাসা বঞ্চিত এবং জাহান্নামের সন্নিহিতে। কৃপণ ইবাদতগুয়ার বান্দার তুলনায় নিরক্ষর দানশীলও আল্লাহ তা‘আলার নিকট অধিক প্রিয়।’ (তিরমিজী, ৪/৩৪২)

৭. মহান ব্যক্তিত্বের আদর্শ গ্রহণ করুন। উদারতা ও বদান্যতায় যিনি ছিলেন কল্যাণবাহী বায়ুর চেয়েও বেগবান। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর জীবনে কোনো দিন কাউকে “না” বলে ফিরিয়ে দেননি।

কবি ফারায় দাকের ভাষায়:

مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشْهِيدِهِ
لَوْلَا التَّشْهِيدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعَمٌ

অর্থ: ‘কখনো ‘না’ শব্দটি মুখে বলেননি। বলেছিলেন শুধু একবার-উম্মতকে একত্ববাদের কালিমা শিক্ষা দিতে গিয়ে। যদি একত্ববাদের এ কালিমা যদি না হতো তাহলে আজীবন তাঁর পবিত্র যবানে ‘না’ উচ্চারিত হতো না।’^{৩৩}

৮. কৃপণতার মতো স্বভাব দোষ থেকে মুক্ত থাকার জন্য হাদীসে বর্ণিত দু’আটি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করুন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ».

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কৃপণতা থেকে পানাহ চাই। পানাহ চাই ভীরতা ও কাপুরুষতা থেকে।’ (বুখারী, ৮/৭৯)

৯. মনে রাখুন, কৃপণ ও অপচয়কারী কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে নিন্দিত। আর উদার-দানশীল সম্মানের পাত্র। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

[الفرقان: ৬৭]

^{৩৩} অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে “না” বলে ফিরিয়ে দেননি। “না”-এর আরবী হলো لَا। ইসলামের কালিমার শুরুতেই এ لَا শব্দটিই বিদ্যমান। যেমন: اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ। لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ। কবি ফারায়দাক তার কবিতায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদারতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, ইসলামের কালিমার এ لَا যদি না হতো, তাহলে জীবদ্দশায় তিনি কখনো না বলতেন না। (অনুবাদক)

অর্থ: যারা ব্যয় করার সময়, না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য, বরং তাদের পছন্দ হল (বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার) মধ্যবর্তী ভারসাম্যমান পছন্দ।' (ফুরকান, ২৫: ৬৭)

সুতরাং কৃপণতা ও অপচয়-প্রবণতা বর্জন করে অর্থব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। অর্থব্যয়ে এটাই পবিত্র কুরআনের নির্দেশিত পথ।

১০. কৃপণতা বহু ধরনের, বহু কিসিমের। কেউ তার জ্ঞান-বিদ্যার কার্পণ্য করে। কেউ তার অর্থবিল্ডে ও স্বভাব-চরিত্রে কার্পণ্য করে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উদারতা ও মহানুভবতা বাহঞ্জনীয়।

চেষ্টা করুন স্বভাব-চরিত্র থেকে কৃপণতা ঝেড়ে ফেলার। তাহলে মহান সত্তার প্রতিবেশিত্ব লাভ করতে পারবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টির পর তাকে কিছু বলার আদেশ করলেন।

জান্নাত বলল:

‘মুমিন বান্দাগণ সুনিশ্চিত সফল হবে।’

আল্লাহ তা'আলা বললেন:

‘আমার সম্মান ও মর্যাদার কসম! জান্নাতে কৃপণ আমার কাছেও আসতে পারবে না।’

১১. মনে রাখুন, উদারতা ও বদান্যতা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». (صحيح البخاري) ১১/২

অর্থ: আদী ইবনে হাতেম (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ‘এক টুকরা খেজুর সদকা করে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করো।’ (বুখারী, ২/১১০)

১২. অল্প অল্প করে হলেও দানশীলতার চর্চা করুন। প্রতিদিন দরিদ্র-দুঃস্থদের দান করার জন্য মানিব্যাগে কিছু টাকা আলাদা করে রাখুন। এভাবে দান-সদকা আপনার অভ্যাসে পরিণত হবে। দানশীলতা আপনার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠবে।

পরিশিষ্ট:

❖ হাসতে মানা:

কৃপণ লোকটি সবেমাত্র দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য খুব যত্ন করে ভুনা করা আস্ত ছাগলছানাটি খাবার টেবিলে পরিবেশন করেছে। ঠিক তখনই তুফাইলি^{৩৪} এসে হাজির। এমন উপাদেয় খাবারের বন্দোবস্ত দেখে তার তর সইল না। এমন গোত্রাসে খেতে লাগল যে, কৃপণ লোকটি বলেই ফেলল:

‘এমন খাবলে-ছোবলে খাচ্ছ, মনে হচ্ছে ছাগলছানা থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ। এর মা বুঝি তোমাকে শিংয়ের গুঁতায় আহত করেছে?’

তুফাইলি বলল:

‘জবাইকৃত ভুনা করা ছাগলছানার জন্য তোমারই বা এত দরদ উথলে উঠছে কেন, এর মা বুঝি তোমার ধাত্রীত্ব পালন করেছে?’

* আব্বাসী খেলাফতকালের বিখ্যাত কবি দি'বাল খুযায়ী (৭৬৫-৭৩৫ খৃষ্টাব্দ) এক কৃপণ যুবক সম্পর্কে বলেছেন:

إِنَّ هَذَا الْفَتَى يَصُورُ رَغِيفاً

مَا إِلَيْهِ لِنَظَرٍ مِنْ سَبِيلٍ

هُوَ فِي سَفَرَتَيْنِ مِنْ أَدَمِ الطَّائِفِ

فِي سَلْتَيْنِ فِي مَنْدِيلٍ

خُتِمَتْ كُلُّ سَلَّةٍ بِحَدِيدٍ

وَسَيُورُ قَدَدَنْ مِنْ جِلْدِ فِيلٍ

فِي جَرَابٍ، فِي جَوْفِ تَابُوتِ مُوسَى

وَالْمِفَاتِيحُ عِنْدَ مِيكَائِيلٍ

^{৩৪} এক ব্যক্তির নাম।

অর্থ: 'এ যুবক একটা রুটি সংরক্ষণ করেছে এমনভাবে যে, কেউ সেটার দিকে নজর দেওয়ার কিংবা দেখে ফেলার উপায় নেই। রুটিটাকে তায়েফের শক্ত চামড়ার তৈরি দু'টি দস্তুরে পেঁচিয়ে দু'টি ছোট ঝড়িতে রেখেছ। ঝড়ি দু'টি হাতির চামড়ার ফিতা দিয়ে বেঁধে লোহা দিয়ে সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে। এরপর তা আরেকটি থলিতে পুরে মূসার সিন্দুকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে সিন্দুকের চাবি মিকাইলের কাছে।'

দুঃখ-বেদনা

অতীতের কষ্টদায়ক স্মৃতি মনে পড়, লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা কিংবা প্রিয়জনের অকাল বিচ্ছেদ ইত্যাদি কারণে যে বেদনাদায়ক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই দুঃখ-বেদনা, যা মানসিক অস্থিরতা ও দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পর্যায়ক্রমে তা ব্যক্তির জীবনকে অসহনীয় দুর্বিষহ করে তোলে।

দুঃখ-কষ্ট হলো একখণ্ড কালো মেঘ, ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। তা এমন কষ্টদায়ক পরিস্থিতি, যা জীবনের গতিময়তা স্থবির করে দেয়। দুঃখ-কষ্টের কবলে মানুষ নেগেটিভ চিন্তা-ভাবনার শিকার হয়। তার মনে নেতিবাচক মানসিকতা বাসা বাঁধতে শুরু করে। আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সফলতার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। জীবনের যত সৌন্দর্য, স্বাদ-আহ্লাদ ও হাসি-আনন্দ সবই বিস্মাদ লাগে। উচ্ছল প্রাণবন্ত জীবনের স্বপ্নিল পথ হারিয়ে ফেলে। এভাবে এক পর্যায়ে সে ডিপ্রেসন ও হতাশার মতো জটিল মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন জটিল ব্যাধি থেকে বাঁচার উপায় কী? দুঃখ-বেদনা কাটিয়ে উঠার পথ কী?

সমাপ্তি:

১. নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন, দুঃখ-কষ্ট কি আপনার হারানো বস্তু পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে? আপনার আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পেরেছে? পেরেছে কি সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতে? অকাল মৃত্যুর হাত থেকে আপনজনকে রক্ষা করতে? সুতরাং দুঃখ-কষ্টে জড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। অযথা মনের মধ্যে পুষে রাখার কোনো অর্থ নেই।
২. অতীতের যত দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-জ্বালা-সব কিছু ভুলে যান, বিস্মৃতির গহ্বরে ছুড়ে ফেলুন এবং জ্বলজ্বলে বর্তমানের কর্তব্যকে কাজে পরিণত করুন। তাতেই আপনার সুখ ও সফলতা নিহিত।

৩. ইবাদত ও যিকির-আযকার মানুষের জীবনে অসামান্য প্রশান্তি এনে দেয়। গভীর ধ্যানমগ্ন হয়ে আল্লাহর যিকির করা, নামায কায়েম করা, তাঁর প্রশংসা করা ও তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা মানুষকে সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে। তাই নিয়মিত সালাত কায়েম করুন। আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করুন। ধৈর্যের সাথে তাঁর প্রতিদানের অপেক্ষা করুন। দেখবেন, একটু একটু করে মনের দুঃখ বেদনাগুলো মুছে যাচ্ছে।

৪. নামায হলো যাবতীয় বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের নিরাময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো বিষয়ে শঙ্কিত হতেন, নামাযে মশগুল হতেন। বলতেন:

«يَا بَلَاءُ، أَرْحَنَّا بِالصَّلَاةِ»

অর্থ: ‘হে বেলাল! নামায কায়েম করে আমাদের প্রশান্তি দাও।’
(মুসনাদে আহমাদ, ৩৮/১৭৮)

তাই দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তে নামাযই হোক আপনার প্রথম আশ্রয়।
সিজদারত হয়ে এ দু‘আটি পাঠ করুন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ»

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বিষণ্ণতা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’

৫. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَظْمِنُ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ২৮]

অর্থ: ‘স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।’ (সূরা রাদ, ১৩: ২৮)

তাই বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করুন। আত্মিক প্রশান্তি অর্জিত হবে।
জীবন উচ্ছলতা ও প্রাণ ফিরে পাবে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হযরত ইউনুস (আ.)-এর বিপদমুক্তির দু‘আটি পাঠ করুন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ؕ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ: ‘(হে আল্লাহ!) তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তুমি সকল ক্রটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয়ই আমি অপরাধী।’ (আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য এ দু’আটি হলো ঐশী দিকনির্দেশনা।

৬. আল্লাহ তা’আলা আপনাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তাতেই তুষ্ট থাকুন। মানুষের দুঃখী হওয়ার প্রধান একটি কারণ হলো, সে যা পেয়েছে তাতে তৃপ্ত ও কৃতজ্ঞ না হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ»

(صحيح البخاري ৯/ ৭০)

অর্থ: ‘অটেল ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তিই প্রকৃত সচ্ছলতা নয়। মনের সচ্ছলতাই প্রকৃত সচ্ছলতা।’ (বুখারী, ৮/৯৫)

এ জীবনে যা পেয়েছেন, তাতেই তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হোন। এর মধ্যেই আপনার প্রকৃত সচ্ছলতা নিহিত আছে।

৭. যে নায-নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন, যে সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন তার একটা তালিকা করুন। আর জীবনে কদাচিত কিঞ্চিৎ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তারও একটা তালিকা করুন। দেখবেন, দুঃখ-কষ্টের তুলনায় সুখানন্দের পরিমাণ বহুগুণ বেশি।

চিন্তা করলে এমন অনেক বিষয় খুঁজে পাবেন যা আপনার আছে, অন্যদের নেই। এর জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞ হোন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার কারণে অনেক মানুষ বলার মতো কিছু না থাকার পরও পরম সুখী। আবার অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে একটা শ্রেণি সব রকম পার্থিব আরাম-আয়েশ ভোগ করেও অতৃপ্ত অসুখী।

৮. হতাশা ও নিরাশাবাদী লোকদের সঙ্গে ত্যাগ করুন। তারা শুধু আপনাকে দুঃখ-দুর্দশার কথাই শোনাবে। ব্যর্থতা ও হতাশার কথা বলে আপনার কান ভারি করে তুলবে। তাদের সঙ্গেদোষে আপনি নিজের অজান্তেই

নেতিবাচক মন-মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে পড়বেন। আশাবাদী ও স্বপ্নবান ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থাকুন। তাদের সংস্পর্শ আপনার সফলতা ও সৌভাগ্যের পথ সুগম করবে।

জীবনের সমস্ত হতাশা ও ব্যর্থতার কথা ভুলে যান। এমন সমস্ত কাজে নিয়োজিত থাকুন, যা বর্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে আপনার ও সমাজের সমষ্টির জন্য সুফল বয়ে আনবে। প্রকৃত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান তার ক্ষতিকে লাভে এবং নিরাশাকে আশায় রূপান্তরিত করে।

৯. ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে বিজ্ঞ ও বিদ্বজ্জনদের এড়িয়ে একক সিদ্ধান্তে পরিচালিত হবেন না। আপনার ব্যক্তিগত জানা-শোনা যত বেশিই হোক-না-কেন, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধই হোক-না-কেন, একক সিদ্ধান্ত কখনো কখনো আপনাকে ভুল পথেও ধাবিত করতে পারে।

তাই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলোতে পরিবার-পরিজন ও বিজ্ঞ-অভিজ্ঞজনদের সাথে আলোচনাসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। তাদের পক্ষ থেকে কখনো কখনো এমন সমাধান ও দিকনির্দেশনা পাবেন যা আপনাকে ব্যর্থতার কবল থেকে উদ্ধার করে সফলতার পথে পরিচালিত করবে।

১০. ঘড়ির কাঁটার দিকে লক্ষ করুন, কীভাবে অনবরত আবর্তিত হচ্ছে; চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র কীভাবে বিরামহীন প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবীর কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক এগুলোর গতিময়তায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। মানুষের জীবনও তাই-কোনো বিপদ-আপদ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তবে যে সাময়িক বিপত্তি ঘটে তার আড়ালে মূলত আসন্ন সুখ ও সৌভাগ্যের সম্ভাবনার হাতছানি থাকে।

তাই মেঘের তর্জন-গর্জনে বিচলিত না হয়ে তার আড়ালের সূর্যের হাসি দেখে আশাবাদী হোন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার সুসংবাদ:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ৫, ৬]

অর্থ: 'প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকে।' (ইনশিরাহ, ৯৪: ৫, ৬)

আপনার কি মনে হয়, জীবনের একটি বাধা, একটি ব্যর্থতা দু'টি সফলতা ও সৌভাগ্যের সমান হতে পারে? কখনই না। তাহলে দুঃখ যন্ত্রণার ঘেরাটোপে আটকে না থেকে অপার সম্ভাবনা ও উন্মুক্ত সফলতার পানে এগিয়ে চলুন।

১১. বিবেক-বুদ্ধির বিচারে ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও দুঃখক্লিষ্ট হওয়া কাম্য নয়। কেননা তা আপনাকে জীবনের কর্মমুখরতা ও ইবাদত-মগ্নতার ক্ষেত্রে দুর্বল করে ফেলবে। জীবনের ঈঙ্গিত সৌন্দর্য নষ্ট করে সহজাত জীবনযাপনের নির্মলতা ও স্বচ্ছতাকে কদমাক্ত করে ছাড়বে।
১২. জীবনে যা-কিছু হারিয়ে যাক, যা-কিছু হাত ছাড়া হয়ে যাক, মনে করবেন, এই না পাওয়ার মাঝেই আপনার সুখ-সৌভাগ্য নিহিত। বিশ্বাস রাখবেন, যা কিছু হয়েছে আল্লাহর ফায়সালায় হয়েছে। তাঁর ফায়সালাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক।
১৩. প্রশান্ত চিত্ত হোন। একান্ত নিবিষ্টচিত্তে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করুন। হৃদয়-মন অভাবিত আনন্দ ও অপার্থিব প্রশান্তিতে ভরে উঠবে। পবিত্র কুরআনে মহান রবের বাণী:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ২]

অর্থ: ‘মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাঁদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে এবং তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে।’ (আনফাল, ৮: ২)

১৪. যখন দুঃখ-কষ্টের ঘেরাটোপে আটকে পড়ে সুখ-শান্তি হাতড়ে ফিরবেন, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণায় আক্রান্ত হয়ে এক চিলতে হাসি আনন্দের জন্য অধীর পড়বেন, তখন ‘ইস্তেগফার’ হলো আপনার পরম আশ্রয়। ‘ইস্তেগফার’ হলো মুক্তির পথ। শান্তি ও নিরাপত্তার সোপান। যে ব্যক্তি এ পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা’আলা তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিবেন। জীবনে পরম সৌভাগ্য ও শান্তি দান করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে এ সুসংবাদই দান করেছেন:

«مَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْاسْتِغْفَارِ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ فَرْجٍ،
وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»

অর্থ: 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইস্তেগফার করবে, আল্লাহ তার জন্য সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির পথ খুলে দিবেন। সমস্ত সংকট কাটিয়ে উঠার পন্থা বাতলে দিবেন। এমন উপায়ে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।' (মুসনাদে আহমাদ: ৪/১০৪)

১৫. পবিত্র কুরআনে সরল পথের দিকনির্দেশনা:

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ৫]

অর্থ: 'আমাদের সরল পথে পরিচালিত কর।' (ফাতিহা, ১: ৪)

ইহকালীন জীবনে সুখ ও প্রশান্তি লাভের প্রধান উপায় হলো 'তাকওয়া' অবলম্বন করা, সরল পথে চলা। সুতরাং যেখানেই থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন, গুনাহ ও নাফরমানি বর্জন করে তাকওয়া (আল্লাহভীতি) অর্জন করে সরল পথে অবিচল থাকুন। দুঃখ-বেদনা ও যাবতীয় কষ্ট যাতনা থেকে এটাই পরম মুক্তির পথ। পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ [الطلاق: ২]

অর্থ: 'যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার) কোন না কোন পথ বের করে দিবেন।' (তালাক, ৬৫: ২)

১৬. আপনি শুধু আজকের কথা ভাবুন। আজকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করুন। অনাগত আগামীর কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। বর্তমানের দায়-দায়িত্বগুলো নিষ্ঠার সাথে সুষ্ঠুভাবে পালন করুন। ভবিষ্যতে আল্লাহ তা'আলা আপনার সহায় হবেন।

১৭. জীবন নিয়ে আপনার সুন্দর গোছালো পরিকল্পনা। তা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছেন। তাহলে জেনে রাখুন, বিপদ-আপদ আপনার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবে, পাপ মোচন করবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হবে।

বিদগ্ধ পণ্ডিত আবুল আলা আল মাদারির কথা স্মরণ করুন: তিনি ছিলেন অন্ধ। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একজন আরব দার্শনিক কবি ও লেখক। জীবনের সমস্ত অর্জিত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অন্যদের হাতে লিখিয়ে নিয়েছেন। আল্লামা ইবনুল আসীর (রহ.) পঙ্গু হয়েও 'জামেউল উসূল' ও 'আন-নিহায়া'-এর মতো বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৮. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার যিকিরকারীর মতো অন্যান্য আমলকারী ও ধর্মীয় জ্ঞানের চর্চাকারীগণও প্রধান মুখ্য ও প্রশংসিত। আর সমস্ত কিছুই নগণ্য ও নিন্দিত। সুতরাং নগণ্য বিষয়ে মন খারাপ করা অনুচিত। চিন্তা ও মননশীলতায় মহৎ উদার হোন। নচেৎ অতিসামান্য তুচ্ছ বিষয়ে ভেঙে পড়বেন। সাহসিকতা ও কর্মোদ্দীপনা হারিয়ে ফেলবেন। বিখ্যাত আরব কবি আবু তায়েব মুতানাব্বি (৩০৩-৩৫৪ হি.) বলেছেন:

وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا

وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَظَائِمُ

অর্থ: 'ছোটদের দৃষ্টিতে নিতান্ত ক্ষুদ্র বিষয়গুলোও গুরুতর জটিল আকার ধারণ করে। প্রকৃত অর্থেই যারা মহৎ উদার, অনেক জটিল গুরুতর বিষয়ও তাঁরা সহজেই সমাধান করে ফেলেন।'

১৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করুন। কেননা তা দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা দূর করে স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভের কার্যকর উপায়। দুরূদ পাঠের প্রতিদান সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ... قَالَ أَبِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَكْثَرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ "مَا شِئْتَ". قَالَ: قُلْتُ: الرَّبُّعَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ: النَّصْفَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قَالَ: قُلْتُ فَالثَّلَاثِينَ. قَالَ: "مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قُلْتُ أَجْعَلْ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: إِذَا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

অর্থ: উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, ... তিনি বলেন, আমি বললাম:

‘হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি তো খুব অধিক হারে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করি। আপনার প্রতি দরুদ পাঠের জন্য আমি আমার সময়ের কতটুকু খরচ করবো?’

তিনি বললেন:

‘তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর।’

আমি বললাম:

‘এক-চতুর্থাংশ সময়?’

তিনি বললেন:

‘তুমি যতটুকু ইচ্ছা কর, তবে এর চেয়ে অধিক পরিমাণে পাঠ করতে পারলে এতে তোমারই মঙ্গল হবে।’

আমি বললাম:

‘তাহলে আমি কি অর্ধেক সময় দরুদ পাঠ করবো?’

তিনি বললেন:

‘তুমি যতক্ষণ চাও, যদি এর চেয়েও বাড়াতে পারো সেটা তোমার জন্যই কল্যাণকর।’

আমি বললাম:

‘তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ সময় দরুদ পাঠ করবো?’

তিনি বললেন:

‘তুমি যতক্ষণ ইচ্ছা কর, তবে এর চেয়েও বাড়াতে পারলে তোমারই ভাল।’

আমি বললাম:

‘তাহলে আমার পুরো সময়টাই আপনার দরুদ পাঠে কাটিয়ে দিব?’

তিনি বললেন:

‘তোমার চিন্তা ও কষ্টের জন্য তা যথেষ্ট হবে এবং তোমার পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে।’ (তিরমিজী, ৪/৬৩৭)

২০. বিপদে ধৈর্য ধারণ করুন। উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশা করুন। আল্লাহ তা'আলা কিছুতেই আপনার ধৈর্য ও প্রতিদান নষ্ট করবেন না। তিনি নিজ উদারতা ও মহানুভবতার শান অনুযায়ী দান করবেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

«مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَسَبْتُ، إِلَّا الْجَنَّةُ» (صحيح البخاري) ৯০/ ৮

অর্থ: 'আমি যখন কোনো মুমিন বান্দার প্রাণপ্রিয়জনকে দুনিয়ার কোল থেকে উঠিয়ে নেই, আর সে উত্তম বিনিময়ের আশায় ধৈর্যধারণ করে, আমার নিকট তার জন্য একটি বিরাট প্রতিদান সুনির্দিষ্ট থাকে। তা হলো জান্নাত।' (বুখারী: ৮/৯০)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ২৬]

অর্থ: 'তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে, তার প্রতিদানে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা তোমাদের উৎকৃষ্ট পরিণাম।' (সূরা রাদ, ১৩: ২৪)

২১. আপনাকে জীবনের বাস্তবতা মেনে নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে। ইহকালীন জীবন অত্যন্ত বিপদসংকুল ও সংকটপূর্ণ। কিন্তু তা সাময়িক, একদিন তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সাময়িক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আপনাকে পরকালের সীমাহীন শান্তিময় জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। জান্নাত লাভের উপযুক্ত পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

২২. অন্যায়-অত্যাচারের শিকার হয়ে যদি ন্যায়বিচার না পান তাহলে ব্যথিত হবেন না। মনের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট পুষে রাখবেন না। বিচারের পালা এখানেই শেষ নয়। ন্যায়বিচারের পথ চূড়ান্ত রুদ্ধ নয়। রোজ হাশরে আরেকটি মহকুমা কায়েম হবে। বিচার করবেন 'আহকামুল হাকেমীন' মহান আল্লাহ তা'আলা। কারো ওপর একবিন্দু যুলুম করবেন না। তা

হবে ঐশী ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়ানুগতার বিচার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾
[الأنبياء: ৬৭]

অর্থ: 'কেয়ামতের দিন আমি এমন তুলাদণ্ড স্থাপন করব, যা পুরোপুরি ন্যায়ানুগ হবে। ফলে কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না। যদি কোন কর্ম তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।' (আম্বিয়া, ২১: ৪৭)

২৩. একবার ভেবে দেখুন, জান্নাতে আল্লাহ তা'আলা কত বিপুল সুখ-শান্তির উপকরণ প্রস্তুত করে রেখেছেন। দুঃখ-বেদনা, দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা কাটিয়ে ওঠার জন্য এটি একটি সফল পদ্ধতি।

যদি রোগ-বিরোগে আক্রান্ত হন, বিপদ-আপদের সম্মুখীন হন, ভয়-বিহ্বলতা, অভাব ও দারিদ্র্যের শিকার হন তাহলে জান্নাতের বিপুল সুখ-সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করুন।

জান্নাতের ব্যাপ্তি-পরিব্যাপ্তি হবে আকাশমণ্ডলী ও যমীন বরাবর। এর পাশেই নির্মল ঝর্ণাধারা বয়ে যাবে। আপন রবের দরবারে সে জান্নাতের প্রার্থনা করুন। তা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যান।

২৪. চারপাশে একটু লক্ষ করুন, বিপদগ্রস্ত লোকদের খোঁজ-খবর নিন, দেখবেন, শুধু আপনি একাই নন, কত মানুষ শত জ্বালা-যন্ত্রণায় ভুগছে। কত রকম দুর্যোগ ও সংকটে জর্জরিত হয়ে আছে। মনে হবে তাদের তুলনায় আপনি দিব্যি সুখী জীবনযাপন করছেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরিবার-পরিজন ও জীবিকা উপার্জন দিয়ে যেভাবে রেখেছেন তাতেই তুষ্ট থাকুন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» (صحيح البخاري ১/ ৭০)

অর্থ: 'মনের সচ্ছলতাই প্রকৃত সচ্ছলতা।' (বুখারী, ৮/৯৫)

২৫. দুঃখ-দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে সুখ-শান্তি লাভ করার জন্য সবচেয়ে মহৎ আমল হলো ফজরের নামায আদায় করা। সুতরাং জামাতের সাথে ফজর নামায আদায়ে যত্নবান হোন। অন্তত দু'রাকাত করে হলেও তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত আদায় করুন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ، ذَكَرَ وَلَا أَنْتَى، يَنَامُ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَرِيرٌ مَفْقُودٌ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَصْبَحَ نَشِيطًا قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَقَدْ انْحَلَّتْ عُقْدُهُ كُلُّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ أَصْبَحَ وَعُقْدُهُ عَلَيْهِ، وَأَصْبَحَ ثَقِيلًا كَسَلَانًا لَمْ يُصِبْ خَيْرًا»

(صحيح ابن حبان - محققا) ২৭৭/ ৬

অর্থ: 'যে কোনো মুসলিম নর-নারী ঘুমায়, তার ওপর (শয়তান কর্তৃক) একটি গিঁট লেগে যায়। সে যখন ঘুম থেকে উঠে, আল্লাহকে স্মরণ করে একটা গিঁট খুলে যায়। এরপর সে যদি ওয়ু করে নামাযে মশগুল হয় তাহলে উদ্যম প্রাণবন্ত হয়ে সকাল যাপন করে এবং কল্যাণের অধিকারী হয়। ইতোমধ্যে (তার ওপর শয়তানের) সমস্ত গিঁট খুলে যায়। আর যদি ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর যিকির না করে, (শয়তানের) গিঁটগুলো নিয়েই সে সকাল যাপন করে। এমতাবস্থায় তার সকাল নিরুদ্যম অলসভাবে কাটে। সে কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।' (সহীহ ইবনে হিব্বান, ৬/২৯৭)

২৬. পরিবার-পরিজনদের নিকট দুঃখ-কষ্টের অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়াবেন না। নিজের দূরাবস্থার কথা জাহির করে শত্রুর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটাবেন না। সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার ভার আল্লাহ তা'আলার গিম্মায় সপে দিয়ে উচ্ছল প্রাণবন্ত জীবন-যাপন করুন। ফলে নিকটজনেরা প্রশান্ত-নিশ্চিন্ত থাকবে, আর শত্রুরা আপনার সুখানন্দ দেখে ক্রোধ ও হিংসার আগুনে জ্বলে মরবে।

২৭. কল্যাণ ও সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হোন। সেবামূলক উদ্যোগ হলো আতরের মতো-আতরের সুবাসে ক্রেতা-বিক্রেতা ও বহনকারী প্রত্যেকেই সুবাসিত হয়। অনুরূপ সেবামূলক উদ্যোগে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সর্বশ্রেণি উপকৃত হয়।

যদি মানসিক অস্থিরতার শিকার হন তাহলে পরোপকারে সচেষ্টি হোন। স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য সংস্থার কাজে অংশগ্রহণ করুন। দরিদ্রকে দান করুন। দুর্বলকে সাহায্য করুন। এসব কাজের মাধ্যমে আপনি অপার্থিব আনন্দ লাভ করতে পারবেন। মানুষের মুখে প্রশংসা, দু'আ ও কল্যাণ কামনা হবে আপনার বাড়তি পাওনা।

২৮. অসন্তোষ ও বিরক্তি পরিহার করুন। কেননা এক পর্যায়ে তা দুঃখ-বেদনা ও মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিটা দিন নতুনভাবে শুরু করুন, নতুনভাবে উপভোগ করুন। দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ুন। মহাবিশ্বের তথ্যসমৃদ্ধ বই (ওপেন ইউনিভার্সবুক) ঘেঁটে দেখুন, মহাবিশ্বের বিপুল অনিন্দ সৌন্দর্য সম্পর্কে জানতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করতে পারবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ [النمل: ৬০]

অর্থ: 'অনন্তর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যানসমূহ উৎপন্ন করেছি।'

(নামল, ২৭: ৬০)

২৯. দুঃখ-বেদনার মুহূর্তে ভেঙে পড়বেন না। শত জ্বালা-যন্ত্রণার কবলে নিজেকে সঁপে দিবেন না। মানসিক দৃঢ়তা ও সংকল্পের অবিচলতা দিয়ে তা মোকাবেলা করুন। সুস্থির বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করুন। অন্যথায় সামান্য অসঙ্গতি চরম দুর্গতি ডেকে আনবে।

৩০. যেকোনো দুঃখ-বেদনার কথা দশ জনের কাছে না বলে নীরবে হজম করার চর্চা করুন। এভাবে ভীষণ মনঃকষ্ট এক সময় লাঘব হয়ে যাবে। বলছি না যে, দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। সুখের পরশ ও দুঃখের ছায়া-এ

দুঃখের সম্মেলনেই ইহকালীন জীবন। কষ্ট-যাতনাহীন অনাবিল সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবন হলো স্বর্গীয় জীবন। যা শুধু পরকালেই সম্ভব। তখন জান্নাতবাসীর সরল সদুক্তি হবে (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ
شَكُورٌ﴾

অর্থ: ‘তারা বলবে, সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর, যিনি আমাদের থেকে সমস্ত দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী।’ (ফাতির, ৩৫: ৩৪)

৩১. অসৎ ও ভ্রান্ত মতাদর্শীদের অমূলক নিন্দা-সমালোচনা ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে এড়িয়ে যান। মনটাকে হিংসা-বিদ্বেষের কলুষতামুক্ত রেখে কাঙ্ক্ষিত সফলতা ও সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে যান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ৬০]

অর্থ: ‘তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে, তার সাওয়াব আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে।’ (সূরা শূরা, ৪২: ৪০)

৩২. সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকুন। কেননা তা আপনার কষ্ট-যন্ত্রণার মলম, দুঃখ-বেদনার ‘মরহম’। অস্থিরতা ও বিষণ্ণতা কাটিয়ে মানসিক সুখ-শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে এটি একটি কার্যকর প্রক্রিয়া।

৩৩. গুচিবায়ু, বিষণ্ণতা-দুশ্চিন্তা ও সাম্প্রদায়িকতার মতো যে সমস্ত মানসিক ব্যাধির কারণে প্রতিনিয়ত দুঃখ-কষ্টের উদ্বেগ হয়, তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন।

বিখ্যাত আরব কবি আবু তায়েব মুতানাব্বি (৩০৩-৩৫৪ হি.) বলেছেন:

وَالْهَمْ يَخْتَرِمُ الْجَسِيمَ نَحَافَةً وَيُشِيبُ نَاصِيَةَ الصَّبِيِّ وَيُهْرِمُ

অর্থ: ‘দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা কত সুঠামদেহীকে শীর্ণকায় করে ফেলে। কত যুবকের যৌবনকে বার্ধক্যে পরিণত করে।’

৩৪. একবার ভেবে দেখুন, যে কারণে কষ্ট পেয়েছেন, তা কি চিরকাল স্থায়ী হবে? এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে কোনো কিছুই কি চিরস্থায়ী, শুধু মহান আল্লাহর সত্তা ব্যতীত? প্রতিটি বস্তুর ধ্বংস ও মৃত্যু অনিবার্য, বর্তমানে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

অর্থ: ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে। বাকি থাকবে কেবল আপনার প্রতিপালকের গৌরবময়, মহানুভব সত্তা। (সূরা আর-রাহমান, ৫৫: ২৬, ২৭)

৩৫. মানসিক দুঃখ-কষ্টের বিষয়টি যেমন গুরুতর, তেমনি ব্যাপক-বিস্তৃত। মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এ বিষয়ে তিনি আমাকে (লা-তাহযান) নামক একটি পুস্তক রচনার তাওফিক দান করেছেন। তা থেকেই কয়েকটি পরামর্শ উদ্ধৃত করছি:

- ❖ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার অপবাদ দিয়ে কেউ আপনাকে অপমানিত করেছে, তাতে দুঃখিত হবেন না।
- ❖ অনেকে বলবে, 'এসব অভদ্রতা অশালীনতার সামনে আপনার ভদ্রতা নম্রতার কী-ই বা মূল্য আছে?!' লোকদের এমন কথায় আপনি হতাশ হবেন না।
- ❖ কেউ আপনার সামনে অন্যদের প্রশংসা এমন ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করবে যেন আপনি কিছুই না। তাতেও দুঃখিত হবেন না।
- ❖ যাকে সর্বক্ষেত্রে বিশ্বাস করছিলেন, যার উপর আস্থা রেখে নিরাপদে পথ চলছিলেন, সে-ই সবার আগে আপনার সঙ্গে ধোঁকাবাজি করেছে, তাতে বিষণ্ণ-চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।
- ❖ যে আপনার দুর্বলতাগুলো খুটিয়ে বের করে, আপনাকে নানাভাবে ঠকাচ্ছে তার কারণে দুঃখ করবেন না।
- ❖ দুঃখিত ও ব্যথিত হবেন না। কেননা এসমস্ত ক্ষেত্রে আপনার এক বিন্দু ক্ষতি হয়নি। বরং লাভই হয়েছে; মানুষ আপনার উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে গেছে। -আয়েয আল কারনী

পরিশিষ্ট:

- ❖ ভেবে দেখুন, কী কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা.) হেরা গুহায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বিষমাখা তরবারি হাতে পক্ষাশজন কাফের তাঁদের ঘিরে রেখেছিল। তাদের চোখ-মুখ থেকে রাসূল ﷺ-এর প্রতি শত্রুতা ও প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। রাসূল ﷺ-এর খোঁজে তারা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, বাকি ছিল শুধু হেরা গুহায় প্রবেশ করা।

গুহার ভেতরে নিরস্ত্র দু'টি প্রাণ-রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা.)। তাঁরা গুহার মুখে কাফেরদের উপস্থিতি টের পেয়েছেন। এ-ও বুঝতে পেরেছেন, কাফেররা গুহার মুখে প্রবেশ করলেই তাদের দেখে ফেলবে। এখান থেকে বের হওয়ার কিংবা আত্মগোপন করার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। কাফেরদের হাত থেকে বাঁচার কোনো আশ্রয় নেই।

স্বভাবতই আবু বকর (রা.) বিচলিত হয়ে পড়লেন। উৎকণ্ঠার স্বরে বললেন:

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের একজনও যদি নিচের দিকে গুহার মুখের দিকে তাকায় আমাদের দেখে ফেলবে।’

রাসূল ﷺ একটুও বিচলিত হলেন না। প্রশান্তচিত্তে স্মিত হেসে যে কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, যুগযুগ ধরে বিপদগ্রস্ত ও সংকটাপন্ন মানুষের পরম আশ্রয় হয়ে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত তা আস্থা ও বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও অবিচলতার বিমূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ৬০]

অর্থ: ‘বিচলিত হয়ো না। আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।’
(সূরা তাওবা, ৯: ৪০)

পরক্ষণেই বিপদ কেটে গেল। মুক্তির পথ উন্মুক্ত হলো। ব্যর্থ-বিফল মনোরথে কাফেররা মক্কায় ফিরে গেল। আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির চাক্ষুষ বাস্তবায়ন দেখে, তাঁর সাহায্য লাভের আনন্দে উদ্দেল

হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবু বকর (রা.) হেরা গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের নতুন গন্তব্য মদিনার পথে অগ্রসর হলেন।

জীবনের কোনো প্রতিকূলতায় বিচলিত হবেন না। কোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতায় উৎকণ্ঠিত হবেন না। আল্লাহ তা‘আলার ওপর অগাধ বিশ্বাসী ও আস্থাশীল হোন। আপনার দুর্দিন কেটে যাবে। জীবনযাপন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

❖ দুঃখ জীবনেরই একটা অংশ। বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী কাল গুস্তাভ যুং বলেছেন:

‘পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষের জীবনেও দুঃখ আছে। মানুষের জীবনে তা ভারসাম্য রক্ষা করে। সবচেয়ে ভালো উপায় হলো তাকে আসতে দাও এবং মেধা ও ধৈর্যবলে তাকে সামলাও।’

❖ বিখ্যাত চীনা দার্শনিক লাও বু-এর উক্তি:

‘যদি পূর্ণতা লাভের জন্য অন্যের দিকে তাকাও, তাহলে কখনই পূর্ণ হতে পারবে না। তোমার সুখ-শান্তি যদি অর্থবিত্ত-নির্ভরশীল হয় তবে কখনো সুখী হতে পারবে না। তোমার অর্জনে যতটুকু আছে, তাতেই তুষ্ট থাক। সর্বোপরি যদি মনের সচ্ছলতা লাভ করতে পার, গোটা পৃথিবীটাই তোমার হয়ে যাবে।’

❖ কবি সালেহ আল-আমরী বলেন:

لا تفقدِ الأملَ الجميلَ وإن عفا
صدأ الحديد، وشاختِ الأقفالُ
البحرُ يفلقُ، والحجارةُ تنبُري
نَبْعًا، ويُشرقُ في القلوبِ الفألُ
ومن السحابِ الجُهمِ إزهارٌ، وفي
عُقَدِ المصيبةِ تنبتُ الأمالُ.

কাব্যানুবাদ:

মেঘ দেখে তুই করিসনে ভয়,
আড়ালে তার সূর্য হাসে ।
হারা শশীর হারা হাসি,
অন্ধকারেই ফিরে আসে ।
দখিন হাওয়ায় অমোঘ বরে
রিঙ শাখাই পুষ্প বরে ।
সিঁক্ত যে প্রাণ অশ্রুধারায়
প্রাণের প্রিয় তারি পাশে ।^{৩৫}

^{৩৫} কবিতাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত । আরবি কবিতার শাব্দিক অর্থের সঙ্গে এর খুব একটা মিল নেই । তবে ভাবার্থ অবিকল সামঞ্জস্যপূর্ণ । বরং আরবী কবিতার মর্মার্থ বাংলা কবিতাতেই পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে । তাই শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে বাংলা কবিতার মাধ্যমেই অনুবাদ করা হলো ।

তবে এমনটি ভাবার উপায় নেই, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আরবী কবিতার ভাব ও মর্ম গ্রহণ করেছেন । কারণ, তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন । আর আরবী কবিতার রচয়িতা সালেহ আল-আমরী ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেছেন । (অনুবাদক)

নিদ্রাহীনতা

বর্তমান বিশ্বে নিদ্রাহীনতা একটি স্বাভাবিক ব্যাধি। এর প্রধান কারণ, আগের তুলনায় মানুষের জীবনব্যবস্থার শাখা-প্রশাখা, জীবনের চাহিদা ও দায়দায়িত্ব যেমন বেড়েছে, তেমন জটিল আকার ধারণ করেছে। কালের দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও বিপদ-সংকটগুলো সূক্ষ্ম প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বণিক চিন্তাপ্রসূত সামাজিকতা ও লৌকিকতা রক্ষা করতে গলধর্ম অবস্থা। ক্ষুদ্র মানবদেহের বুকপিঠ জীবনযাপনের এতসব দায়-দায়িত্বের বোঝা বহন করে চলে। নিশ্চিত হয়ে একদণ্ড ঘুমানোর সুযোগ কোথায়?

নিদ্রাহীনতা ও ইনসোমনিয়া এমন জটিল ব্যাধি যা প্রথম পর্যায়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। সাথে সাথে যদি এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে পর্যায়ক্রমে তা জটিল থেকে জটিল আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগীর সুস্বাস্থ্য ও মন-মানসিকতায় বিকল্প প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তার সহজাত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অস্থির দুর্বিষহ করে তোলে।

ব্যক্তি যখন ভীষণ নিদ্রাহীনতার শিকার হয়, গভীর রাতে ঘুমের জন্য ছটফট করে, মাথায় নানা উদ্ভট জল্পনা-কল্পনা বাসা বাঁধতে শুরু করে। নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা এসে ভিড় করে।

নিদ্রাহীনতার কারণে জীবনের সহজাত গতিময়তা ব্যাহত হয়। কর্মজীবনের গতিময়তা বিঘ্নিত হয়। উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা, টাইপ-২, ডায়াবেটিস, হৃদযন্ত্রের মতো বিভিন্ন রোগ ও অকাল বার্ধক্যের মতো জটিল রোগ দেখা দেয়। সুস্থ-সবল প্রাণবন্ত জীবনের জন্য নিয়মিত সুখনিদ্রার বিকল্প নেই। কিন্তু তার উপায় কী? নিদ্রাহীনতার সঠিক সমাধানই বা কী?

সমাধান:

১. আল্লাহর যিকিরে যবান তরতাজা রাখুন। নিদ্রাপূর্ব দু'আগুলো নিয়মিত পাঠ করুন। ভালো-ঘুম হওয়ার জন্য এটি একটি পরীক্ষিত আমল। ঘুমানোর আগে অবশ্যই বেতের নামায আদায় করতে ভুলবেন না। আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন: 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো, ঘুমানোর আগে বেতের নামায আদায় করা।'
২. একটি দৈনন্দিন রুটিন করে নিন। সে মোতাবেক জীবনযাপন করুন। প্রতিটি কাজ সুনির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে সময়মতো ঘুমিয়ে পড়ুন। অন্যান্য কাজে যত অনিয়মই হোক ঘুমে যেন এতটুকু বিলম্ব না হয়। নিজের মধ্যে এভাবে সময়মতো ঘুমানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।
৩. ঘুম নষ্ট করে দেয়-এমন খাদ্যদ্রব্য যেমন : চা, কফি ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। অতিঅবশ্যই ধূমপান, মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্য বর্জন করতে হবে।
৪. খালি পেটে ঘুমাতে যাবেন না। প্রয়োজনে ফলমূল ও সালাদজাতীয় খাবার খেয়ে নিন। ভালো ঘুমের জন্য কার্যিক পরিশ্রম ও ব্যায়াম করে দেহটাকে যতো শ্রান্ত-পরিশ্রান্ত করবেন, ঘুমটাও তত গভীর ও আরামদায়ক হবে।
৫. যদি ঘুম না আসে তাহলে অযথা শুয়ে না থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ুন। নামায, যিকির, তিলাওয়াত কিংবা বই পড়ায় মনোযোগী হোন। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। এমন অলস মুহূর্তে নানা উদ্ভট জল্পনা-কল্পনা এসে ভিড় করে। মনটাকে অস্থির অশান্ত করে তোলে।
৬. ঘুমানোর জন্য একটি কোলাহলমুক্ত নীরব নিভৃত স্থান বাছাই করুন। অবশ্যই দুর্ঘটনার শঙ্কাবহুল ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রগুলো অফ করুন। তাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আকস্মিক দুর্ঘটনার কবল থেকে মুক্ত থাকা যাবে।
৭. বিছানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক হতে হবে। যারা ব্যাক পেইন কিংবা পিঠ ও কোমর ব্যথায় আক্রান্ত, তাদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উপযুক্ত বালিশ ও বিছানার বন্দোবস্ত করতে হবে।

৮. ঘুমানোর আগে বেডরুমটাকে হালকা সুবাসিত করুন। কিংবা বালিশের নিচে সুগন্ধযুক্ত রুমাল রেখে দিন। তাতে আপনার দেহমন প্রশান্ত সুবাসিত হয়ে উঠবে। চোখ দু'টো ঘুমের আবেশে জড়িয়ে যাবে।
৯. দ্রুত ঘুমানোর জন্য অত্যন্ত কার্যকর পন্থা হলো, উত্তমরূপে ওয়ু করা। ওয়ু ব্যক্তির হৃদয়-মনকে দুশ্চিন্তা ও টেনশনমুক্ত করে। সুস্থির প্রশান্ত করে তোলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বারা ইবনে আযেব (রা.)-কে এ পরামর্শ দিয়েছেন:

"إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ"

অর্থ: 'তুমি যখন ঘুমাতে যাবে, নামাযের জন্য যেভাবে ওয়ু করো, সেভাবে ওয়ু করে ঘুমাবে।' (বুখারী: ১/৫৮)

১০. দৈনন্দিন জীবনের ঝায়-ঝামেলা-ঘুমানোর আগ মুহূর্তে এসব নিয়ে কোনো চিন্তা-ফিকির করবেন না। কেননা তা মন-মস্তিষ্কে অস্থির বিচলিত করে তোলে। তার চেয়ে বরং জীবনের যত সুখ-সৌভাগ্য, সফলতা-উৎকর্ষতার কথা মনে করে আনন্দে উদ্বেল হোন। ভবিষ্যতের সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যাবেন।

পরিশিষ্ট:

- ❖ বিশিষ্ট সাহাবী বারা' ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ."

অর্থ: ঘুমানোর জন্য যখন বিছানায় যাবে তখন নামাযের ওয়ুর মতো করে ওয়ু করবে। এরপর ডান কাঁধে ভর করে শুয়ে পড়বে। ঘুমানোর আগে এই দু'আটি পাঠ করবে :

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. (صحيح البخاري) ৫৮/১

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে আপনার কাছে অর্পণ করলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার যিম্মায় সমর্পণ করলাম। নিজেকে আপনার আশ্রয়ে সঁপে দিলাম, দয়া ও করুনা লাভের আশায়, জাহান্নামের আযাব থেকে নাযাত লাভের প্রত্যাশায়। হে আল্লাহ! আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আপনার অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি। আপনার প্রেরিত রাসূলের প্রতি।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

'এভাবে ঘুমানোর পর তুমি যদি সে রাতে মৃত্যুবরণ করে তাহলে ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ করবে। উল্লিখিত দু'আগুলোই হবে (ঘুমানোর পূর্বে) তোমার সর্বশেষ কথা। (এরপর অন্য কোনো কথা বলবে না)।'

বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন:

দু'আটি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠ করে শুনালাম। যখন আমি اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ পর্যন্ত পৌঁছালাম, বললাম, وَبِنَبِيِّكَ (وَرَسُولِكَ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, الَّذِي أَرْسَلْتَ।

- ❖ 'যাদের দ্বারা আপনি কষ্ট পেয়েছেন, যুলুম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, ঘুমানোর আগে তাদের প্রত্যেককে মন থেকে মাফ করে দিন। অন্যদের

প্রতি যত অভিযোগ-অনুযোগ, মন থেকে সব মুছে ফেলুন। নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত মনে চোখ বন্ধ করুন।' -আয়েয আল-কারনী

- ❖ রোমান দার্শনিক ও লেখক এমিল সিওরান (১৯১১-১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘অনিদ্রা এমন জটিল সমস্যা, যা মানুষের সুখের স্বর্গকে কষ্টের নরকে পরিণত করতে পারে।’

- ❖ ইবনুন নাহবী (৪৩৩-৫১৩ হি.) বলেছেন:

‘বিপদ-আপদ যত কঠিনই হোক এক সময় তা কেটে যাবে। রাতের অন্ধকার যত গভীরই হোক এক সময় ভোরের আলো ফুটবেই। রাতের আকাশেও তো ঝলমলে তারকা বর্তমান। ভোরের আলোয় সমস্ত অঁধার মূয়মাণ।’

হতাশা

হতাশা ও নিরাশা হলো একটি নেতিবাচক মানসিক অনুভূতি। মানুষ যখন তার ইচ্ছা পূরণ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, সামাজিক বৈরিতা ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তার মনে হতে থাকে, এ থেকে রক্ষা নেই। এ পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার পথ নেই। তখনই তার মনে নিরাশা দানা বাঁধতে শুরু করে। তাকে হতাশা ঘিরে ধরে। মানুষ যখন ভীষণ রকম হতাশ হয়ে পড়ে তার ইচ্ছা ও মনোবল নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কর্মক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা দুর্বল হতে থাকে। নিজস্ব সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ক্ষয়িত হতে থাকে।

হতাশার কবলে ব্যক্তির মনে নেতিবাচক জল্পনা-কল্পনা বাসা বাঁধে। পর্যায়ক্রমে মনের অবাস্তব উদ্ভট জল্পনা-কল্পনাগুলো তার বোধ-বিশ্বাসে পরিণত হয়। চেষ্টা-শ্রমের মানসিকতা ও অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার কাছে অনর্থক মনে হতে থাকে, যেন শুরু করার আগেই নিঃশেষ হওয়ার দশা। জীবন-সংগ্রামে বাঁপ দেওয়ার আগেই পরাজয়-প্রবণতা।

নিরাশাবাদী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনেতে জানে না। আসন্ন সফলতার পথ সুগম করার কথা ভাবে না। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নেতিবাচক কিছু ঘটনা ঘটান অজানা আশঙ্কায় ভুগতে থাকে। জীবনের সফলতা ও কৃতকার্যতা তার কাছে সুদূরপর্যন্ত।

হতাশাগ্রস্ত লোক আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। সর্বদা নানা অভিযোগ-অনুযোগে মত্ত থাকে। দ্বিধা-সংশয়, অস্থিরতা-অনিশ্চয়তা, ভয়-শঙ্কা-এগুলো তার নিত্যসঙ্গী, যা কখনো কখনো দুর্বলপ্রাণ ব্যক্তিকে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার পথে ধাবিত করে। আবার কখনো আত্মহত্যা প্ররোচিত করে।

ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে হতাশা ও নিরাশা একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে আমাদের করণীয় কী? তা কাটিয়ে উঠার উপায় কী?

সমাধান:

১. আপন রবের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলুন। আল্লাহ তা'আলার ওপর গভীর আস্থা অটুট রাখুন। দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন, যত দুর্যোগ ও প্রতিকূলতা, একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন।
২. সবক্ষেত্রেই ভালো কিছু আশা করুন। ইচ্ছা পূরণে ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে নামায, যিকির, তাসবীহ, তিলাওয়াত, দান-সদকা ও প্রার্থনায় যত্নবান হোন। আল্লাহ তা'আলা কিছুতেই আপনাকে আশাহত করবেন না। আপনার চেষ্টা-প্রচেষ্টা নিষ্ফল করবেন না।
৩. হতাশা ও নিরাশার দু'টি পরিণতি: হয়ত হতাশা আপনাকে গ্রাস করবে; কিংবা স্বয়ং আপনি নিরাশাকে হজম করে ফেলবেন। হতাশা হয়ত আপনাকে পশ্চাদপদ মানসিকতার দিকে ঠেলে দিবে। কিংবা স্বয়ং আপনি নিরাশাটাকে ভেঙে চুরমার করে সামনের পথে অগ্রসর হবেন। সুতরাং যত পশ্চাদপদ নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলুন। ইতিবাচক ও সমুন্নত মানসিকতা ধারণ করুন। আপনার জীবন আপনারই মানসিকতা ও চেতনার আলোকে গড়ে উঠবে।
৪. সুন্দর মনোরম উদ্যানে বেরিয়ে পড়ুন। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে আসুন। যেখানে প্রকৃতি তার স্বর্গীয় সৌন্দর্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। শরীয়তের বিধিনিষেধ মেনে বৈধ আনন্দ-বিনোদন উপভোগ করুন। হতাশামুক্ত হওয়ার জন্য গতানুগতিক জীবনধারার বাইরে বিচিত্র মুহূর্ত ও ভিন্ন পরিবেশ আপনার দেহ-মনকে প্রফুল্ল প্রাণবন্ত করে তুলবে।
৫. নিশ্চিত থাকুন, আপনার সমস্যার সমাধান অবশ্যই আছে। আপনাকে শুধু আশা-ভরসা নিয়ে ধৈর্যধারণ করতে হবে। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তিনিই একমাত্র রক্ষাকারী, পরম মুক্তিদাতা।
৬. যেকোনো বাধা-প্রতিবন্ধকতার কবলে এতটা হতাশ হবেন না যে, তা আপনাকে ব্যর্থতার পথে ধাবিত করে। রাতের আঁধারের পর ভোরের আলো যেমন অপেক্ষমান তেমনই নিরাশার অন্তরালে আশা ও প্রত্যাশার হাতছানি বর্তমান।

৭. আশাবাদী হোন। স্বপ্নবান হোন। সফল মহা পুরুষদের জীবনী পাঠ করুন। জীবনের কঠিন প্রতিকূলতাগুলো তাঁরা কীভাবে মোকাবেলা করেছেন, দুর্লভ বাধা-প্রতিবন্ধকতা কীভাবে উতরে গেছেন, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। অতীতের বাধা-বিপত্তির কবলে বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলো বিশ্লেষণ করুন। উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিষয়ের আশ্চর্যরকম মিল পাওয়া যাবে। তা হলো আশা ও প্রত্যাশা।
যুগে যুগে মহামনীষিগণ প্রত্যেকেই ছিলেন এক-একজন আশাবাদী স্বপ্নবান পুরুষ। নিরাশা হতাশা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি।
৮. মনের মধ্যে যে দ্বিধা-সংশয় ও আশঙ্কা কাজ করছে প্রথমে তা শনাক্ত করুন। প্রয়োজনে লিখে ফেলুন। এরপর তার বাস্তবানুগ সমাধান উদ্ঘাটনে প্রয়াসী হোন।
কিংবা আপনার কষ্ট ও প্রতিকূলতার বিষয়টি কোনো প্রবীণ বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে তুলে ধরুন। অথবা কোনো মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। তাঁরা আপনার সমস্যা সমাধানে যথার্থ সহযোগিতা করবেন। আপনাকে মানসিক সংকীর্ণতা ও সংকট থেকে উদ্ধারে কার্যকর পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন।
৯. সফল ও স্বপ্নবান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকুন। ব্যর্থ নিরাশাবাদী লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করুন। কেননা নিরাশাবাদ হলো একটা সংক্রামক ব্যাধি। জটিল ব্যাক্টেরিয়ার মতো তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
১০. শিক্ষাক্ষেত্র কিংবা কর্মজীবনের কোনো একটি শাখায় বিফল হলে ভিন্ন খাতে মেধা-শ্রম যাচাই করুন। একটা বিষয়ে বিফলতার অর্থ এই নয় যে, সর্বক্ষেত্রেই ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসের অনেক সফল ব্যক্তিকেই নিজের সফলতার জায়গাটি নির্ণয় করতে গিয়ে কোনো না কোনো ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।
১১. নিজেকে নিরুৎসাহিত করার অজুহাত না খুঁজে স্থায়ী যোগ্যতা ও সাহসিকতার বলে বলিয়ান হয়ে উঠুন। শতো বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলুন। একই জায়গায় স্থবির হয়ে, শুধু চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থেকে সফলতার সর্বোচ্চ চূড়া দূরের কথা, সফলতার হাতছানি লাভ করাও সম্ভব নয়।

১২. হতাশা ও নিরাশা ব্যক্তিকে কর্মবিমুখ করার জন্য তার সামনে একের পর এক বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দাঁড় করিয়ে দেয় যতসব কাল্পনিক অবাস্তব কারণ-উপকরণ। তাই নিরাশাকে এতটুকু অবকাশ দেওয়া যাবে না যে, আপনার যোগ্যতা ও সম্ভাবনা অকার্যকর করে দেয়, সমস্যা সমাধানের পথে আরও জটিলতা সৃষ্টি করে।
১৩. অতীত জীবনের যে সমস্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, কীভাবে তা মোকাবেলা করেছেন—তা স্মরণ করে দেখুন। অতীতের সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ ও সাহসী ভূমিকাগুলো আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে, আসন্ন ভবিষ্যতের বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করার।
১৪. নিজের জন্য এমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন না, যা আপনার সাধ্য ও সামর্থ্যের বাইরে। সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী ছোট ছোট পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একাধিক পদক্ষেপের মাধ্যমে একটি মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব। মনে রাখবেন, এক হাজার মিটারের দৌড় প্রতিযোগিতা প্রথমে একটি পদক্ষেপের মাধ্যমেই সূচিত হয়। তারপর একের পর এক বহু পদক্ষেপের সাহায্যে এক হাজার মিটারের দৌড় সম্পন্ন হয়।
১৫. ভুল যতই হোক—না—কেন, চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। এক্ষেত্রে পিপীলিকার আদর্শ গ্রহণ করুন—সফলতা লাভের জন্য সে হাজারবারও চেষ্টা করতে প্রস্তুত। মনে রাখুন, বিদ্যুৎ আবিষ্কারক এডিসন সাতশতাবার ব্যর্থ চেষ্টার পরই সফলভাবে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।
কাজেকর্মে ও দায়দায়িত্বে যত অলসতা-অবহেলা ঝেড়ে ফেলুন। প্রতিটি কাজ সময়মতো সম্পন্ন করুন। দৈনিকের কাজ দৈনিক সেরে ফেলুন। কখনো আজকের কাজ আগামী দিনের জন্য বিলম্ব করবেন না।
১৬. আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করুন এজন্য যে, অদ্যাবধি সুস্থ-সবল থেকে সাধ্যমতো কাজেকর্মে নিয়োজিত আছেন। ব্যক্তিগত সফলতার একটি তালিকা সযত্নে সংরক্ষণ করুন। প্রতিদিন অন্তত একবার আপনার সফলতাগুলো স্মরণ করুন। এতে আশা ও প্রত্যাশার সাথে সাথে মনোবল বৃদ্ধি পাবে। কাক্ষিত কিছু যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মনে করবেন, এ হারানোর মধ্যেই আপনার কল্যাণ নিহিত।

১৭. নিজেকে অন্যের সাথে তুলনা করতে যাবেন না। প্রত্যেকের জীবনই নানা রকম বৈচিত্র্যময়। আপনার যা কাক্ষিত, সংকল্পিত তা অর্জনে নিজের মতো করে এগিয়ে যান। এর জন্য নিজের চেষ্টা ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু বিলিয়ে দিন। একদিন সফলতার এমন শীর্ষস্তরে পৌঁছে যাবেন যা হয়ত আপনার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হবে।
১৮. বিফলতা ও নেতিবাচক মানসিকতা পরিহার করে নিজেকে সফলতা ও সহজতার সুসংবাদ দান করুন। প্রত্যেক দিন-শেষে ভাবুন, আগামীর দিনটি আরও সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হবে।
- মনে রাখুন, সফলতা ও সৌভাগ্যের প্রতিক্ষায় ধৈর্যধারণ করাও একটি ইবাদত। সুতরাং অপেক্ষা করুন ধৈর্যের সাথে, সফলতা আসবে দু'হাত ভরে।
১৯. একটি বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন, কোনো বাধা-বিপত্তিই স্থায়ী নয়। চরম দুর্যোগ-দুর্ভোগের পরই পরম সুখ ও সৌভাগ্যের উত্থান ঘটে। এটাই জগতের অবধারিত নীতি।

পরিশিষ্ট:

- ❖ হযরত ইয়াকুব (আ.) প্রাণপ্রিয় পুত্র হারানোর শোকে কেঁদে কেঁদে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে মর্মান্তিক বেদনাবিধুর ঘটনা কি আর ঘটেছে?

“ইউসুফকে নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে”—এই কথিত কিছার অন্তরালে এক মহান পিতা প্রাণপ্রিয় পুত্রকে হারালেন। জগতের সমস্ত দুঃখ-যাতনা তাকে ঘিরে ধরল। তিনি পুত্র হারানোর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। নিদ্রাহীন চোখ দু'টি আলো হারাতে লাগল। সুস্বাদু যত খাদ্য বিশ্বাদে পরিণত হলো।

পুত্র ইউসুফের শোক না কাটতেই আরেক পুত্র বিনইয়ামিনও হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম। দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-যাতনা যেন ইয়াকুব (আ.)-এর চরম ধৈর্যপরীক্ষা নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে। এমন কঠিন দুর্যোগ-মুহূর্তেও তাঁর যবানে বারবার উচ্চারিত হতে লাগল। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]

অর্থ: 'নিশ্চিত জেনে রাখ, আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের।' (সূরা ইউসুফ, ১২: ৮৭)

অবশেষে তার আশাই সত্য প্রমাণিত হলো। চরম দুঃখ-বেদনার পর পরম সুখানন্দের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। পুত্র ইউসুফের জামার স্পর্শে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। দু'চোখ ভরে 'শিশুপুত্র' ইউসুফকে দেখতে লাগলেন। পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শিশুপুত্র যে আজ বাদশাহর মর্যাদায় ভূষিত, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত।

এ ঘটনা যেন পবিত্র কুরআনের এ আয়াতেরই প্রতিধ্বনি:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥، ٦]

অর্থ: 'প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকে।' (সূরা ইনশিরাহ, ৯৪: ৫, ৬)

- ❖ 'নিরাশা ও হতাশার কবলে আত্মসমর্পণ করবেন না। জীবনের বাহ্যিক রূপটা হয় যদি কালো মেঘের মতো তাহলে তার ভেতরটা আশা-ভরসার আলোয় উদ্ভাসিত। শক্ত কঠিন বিরাট পাথরের নিচেও এক চিলতে শীতল ছায়া প্রত্যাশিত। সফলতা ও সৌভাগ্যের পথ হোক না যতই দূস্তর পারাবার, আশা ও ভরসাই হলো তার সফল পারাপার।' -আয়েয আল-কারনী

নেতিবাচক মানসিকতা

নেতিবাচক মানসিকতা হলো, জীবনে যা কিছু অনভিপ্রেত অনাকাঙ্ক্ষিত, যত বাধা-বিপত্তি, ফিরে ফিরে সেগুলোকে বড় করে দেখা। আর সমস্ত সফলতা, সুখশান্তির ক্ষেত্রগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া, কিংবা খাটো করে দেখা।

নেতিবাচক প্রবণতা মূলত একটা মানসিক ব্যাধি। ব্যক্তির মন-মানসিকতায় যখন তা দানা বাঁধতে শুরু করে সাদা চোখে ধরা পড়ে না। পর্যায়ক্রমে এ ব্যাধি শিকড়-বাকড় ছড়াতে থাকে। ডালপালা গজাতে থাকে। একপর্যায়ে প্রবল হতে প্রবল আকার ধারণ করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে জটিল সংকট সৃষ্টি করে।

ভুক্তভোগী প্রথমে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতিবাচক মানসিকতায় ভাবতে শুরু করে। তারপর কোনো বিষয়ের সুদূরসম্ভাব্য ও কল্পিত অশুভ দিকগুলো খুঁটে খুঁটে দেখে। অশুভ দিকগুলোই তার কাছে মুখ্য হয়ে উঠে। ইতিবাচক দৃষ্টিতে ও কল্যাণপ্রত্যাশী মানসিকতায় সে কোনো কিছুই ভেবে উঠতে পারে না।

এভাবে নেতিবাচক মানসিকতা যখন তার মজ্জাগত হয়ে প্রকট আকার ধারণ করে, তার কাছে জীবনের কোনো সফলতার মূল্য থাকে না। মনে হতে থাকে, সুখ-শান্তি নিতান্তই সাময়িক, কিছু দিন পর তা হারিয়ে যাবে। দুঃখ-বেদনা ও কষ্ট-যাতনাই হলো জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সুখময় সফল জীবন-যাপনের জন্য নেতিবাচক মানসিকতা পরিহার করা অপরিহার্য। কিন্তু এর উপায় কী? এর সঠিক সমাধান কী?

সমাপান:

১. যে সত্তা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, রিযিক দান করেছেন তিনি আপনার অমঙ্গলের ফায়সালা করতে পারেন না। সুতরাং মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [يوسف: ৬৭]

অর্থ: 'আর যারা নির্ভর করতে চায় তাদের উচিত তাঁরই ওপর নির্ভর করা।' (ইউসুফ, ১২: ৬৭)

২. আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। তাঁর নিকট শুধু কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রত্যাশা করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বান্দার ধারণা অনুযায়ী তার ভালো-মন্দের ফায়সালা করেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي إِِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ».

(صحيح ابن حبان - محققا) ৬০০/২

অর্থ: আমার প্রতি বান্দার ধারণা অনুসারে আমি তার ব্যাপারে ফায়সালা করি। সে যদি সুধারণা রাখে এর সুফল লাভ করে। আর যদি অকল্যাণের ধারণা পোষণ করে এর পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হয়। (সহীহ ইবনে হিব্বান, ২/৪০৫)

৩. সর্বদা পজেটিভ ও ইতিবাচক মানসিকতায় ভাবতে শিখুন। যত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের কবলে ধৈর্যধারণ করুন। নায-নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা স্মরণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'মিন বান্দাকে সুসংবাদ প্রদান করে বলেছেন:

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

صحيح مسلم (১/২২৯০)

অর্থ: সুহায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'মু'মিনের অবস্থা কতোই না বিস্ময়কর, সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর! মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ এ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে না। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে সে আল্লাহর শোকর করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হলে ধৈর্যধারণ করে। সবার ও ধৈর্যের বিনিময়ে সে কল্যাণ লাভ করে।' (মুসলিম, ৪/২২৯৫)

৪. নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন, আপনি কি গায়েবের খবরাখবর জানেন? অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে তা বলতে পারেন? তাহলে কেন অনর্থক অজানা আশঙ্কায় সংকুচিত হচ্ছেন?

আপনার জীবনে কী এমন কোনো হাসি-আনন্দ ও সৌভাগ্য-সফলতা আসেনি, যা ছিল অভাবিত কল্পনাতিত? তাহলে ভবিষ্যতেও কেন সুন্দরের আশা করছেন না? সফলতার স্বপ্ন বুনেছেন না?

মনে রাখতে হবে, ইতিবাচক মানসিকতাই সফলতার মূল চাবিকাঠি। তাই গোলাপের কাঁটার ভয় না করে তার সুবাস সৌন্দর্য উপভোগ করুন। রাতের ঘন কালো আঁধার না দেখে আকাশের উজ্জ্বল চাঁদ ও ঝলমলে তারকারাজি লক্ষ্য করুন। চারপাশের সব আঁধার কেটে যাবে।

৫. পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ অনুসারণ করুন। তুমুল ঝড়-ঝাপটার কবলেও তিনি ছিলেন ভীষণ আশাবাদী ও কল্যাণপ্রত্যাশী। মুসলিম উম্মাহর কঠিন সংকটকালেও তিনি রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছিলেন।

৬. পৃথিবীর ইতিহাসে যত মহা আবিষ্কারক, জ্ঞানী-মহাজ্ঞানী ও রাজা-মহারাজা ছিলেন, তাঁদের জীবনযাপনও ছিল আপনার মতো সুখ-দুঃখ মিশ্রিত। কারো কারো পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল আরও অধিক বিপদসংকুল ও সংকটপূর্ণ। কিন্তু তাঁরা কখনও আশা ছাড়েননি, নিরাশ হননি। শত প্রতিকূলতার মাঝেও সৌভাগ্য ও সফলতার স্বপ্ন বুকে ধারণ করে কাজক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট থেকেছেন। ফলে এক জীবনেই তারা এমন অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন, যা আমরা কয়েক জীবনেও সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে পারি না।

৭. এমন বন্ধু-বান্ধব নির্বাচন করুন, যারা ভীষণ আশাবাদী ও কর্মোদ্যমী। যারা অলস অকর্মণ্য ও নিরাশাবাদী, তাদের সঙ্গে ত্যাগ করুন। নিকট আত্মীয় ও বন্ধু সমাজের দ্বারা মানসিক শক্তি অর্জন করুন। দৃঢ় মনোবল ও ধারাবাহিক কর্মপ্রচেষ্টায় বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করুন।
৮. নিশ্চিত থাকুন, বিশ্বে যা কিছু ঘটছে, পূর্বনির্ধারিত আসমানি ফায়সালার ভিত্তিতেই ঘটছে। প্রতিটি মানুষের জীবনে তাঁর নিয়তির ফায়সালা প্রতিফলিত হচ্ছে। এ বিষয়টিই রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জোর দিয়ে বলেছেন:

«وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ» (سنن الترمذي ت شاكر ٤/ ٦٦٧)

অর্থ: জেনে রেখো, গোটা জাতি যদি তোমার কোনো মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, আল্লাহ তা'আলা তোমার মঙ্গলের যে ফায়সালা করেছেন, তার বাইরে তারা তোমার একবিন্দু উপকারও করতে পারবে না। তারা যদি তোমার ক্ষতিসাধনে সংবদ্ধ হয়, তবুও আল্লাহর ফায়সালার বাইরে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মানুষের ভাগ্যলিপি চূড়ান্ত এবং নিয়তির ফায়সালা অবধারিত।' (তিরমিজী, ৪/৬৬৭)
৯. মনের যত জল্পনা-কল্পনা ও দ্বিধা-সংশয় ঝেড়ে ফেলে দৃঢ় সংকল্প ও অবিচল মানসিকতায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে প্রয়াসী হোন। অতীতের ব্যর্থতা প্রতিকূলতা মনে করিয়ে দেয়-এমন সমস্ত বিষয় এড়িয়ে চলুন, স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলুন। আল্লাহ তা'আলার বরকত ও তাওফিকের প্রত্যাশী হয়ে নতুনভাবে শুরু করুন। নব উদ্যমে সচেষ্ট হোন। ইনশাআল্লাহ, সফলতা অবশ্যম্ভাবী।
১০. দু'আ ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করুন। সকাল-সন্ধ্যায় নির্ধারিত যিকির-ওযীফা আদায় করার পাশাপাশি অত্যন্ত

মনোযোগের সঙ্গে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করুন। বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করুন। হৃদয় মন প্রশান্ত হবে, অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠামুক্ত হবে। পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿الْأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ২৮]

অর্থ: 'স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।' (সূরা রা'দ, ১৩: ২৮)

১১. নতুন কোনো উদ্যোগে ও কর্ম কল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্টি হোন। তাতে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা যাচাই করার সুযোগ হবে। ভিন্ন প্রেক্ষাপটে নিজেকে নতুনভাবে উপলব্ধি করা যাবে। মনোবল ও আত্মবিশ্বাস আরও সমৃদ্ধ হবে।
১২. সুদূর কল্যাণপ্রসারী উদ্যোগ বাস্তবায়নে সচেষ্টি হোন। উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যতি-ব্যস্ততা ও কর্মমুখরতা অতীতের ব্যর্থতা ও হতাশার কথা ভুলিয়ে দিবে। প্রকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বিফলতাকে সফলতায় ও হতাশাকে সাহসিকতায় রূপান্তরিত করে, বাধা-প্রতিবন্ধকতার কবলে ভেঙে পড়ে বিপদের ওপর বিপদ ডেকে আনে না।
১৩. যে পরিবেশ পরিস্থিতি, যাদের সংস্পর্শ ও কাজকর্ম আপনার নেতিবাচক মানসিকতার প্রধান কারণ বলে মনে করেন, তাদের থেকে সরে দাঁড়ান। আপনজন কিংবা বন্ধুজনদের সাথে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দর্শনীয় স্থানে ঘুরে আসুন। এতে মন-মানসিকতা প্রফুল্ল প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। নতুনভাবে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন। দায়দায়িত্বে পেশাদারিত্ব ও উদ্দীপনার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।
১৪. পত্র-পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়ার অজস্র নেতিবাচক সংবাদ ও ভীতিপ্রদ খবরাখবরের ছড়াছড়ি-এ সমস্তই এড়িয়ে চলুন। ইতিবাচক সংবাদ, সফল ব্যক্তিদের সফলতার ঘটনা পড়ুন।
১৫. নেতিবাচক মানসিকতার কবলে চারপাশের সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকিত্বে পড়ে থাকবেন না। আশাবাদী, কর্মোদ্যমী ও স্বপ্নবান ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শ থাকুন। তাদের সংস্পর্শ আপনার মনে সাহস সঞ্চার করবে। আপনাকে প্রাণবন্ত উজ্জীবিত করে তুলবে।

১৬. সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আগামী দিনগুলো আরও সুন্দর সফল হবে। কেননা আপনি মহান আল্লাহর তত্ত্বাবধানে ও তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে আছেন। তিনি কিছুতেই আপনাকে নিরাশ করবেন না। রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না। সুতরাং সফলতা ও সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করুন। আল্লাহ তা'আলা আশাবাদী ও স্বপ্নবান ব্যক্তিদের ভালোবাসেন। তাদেরকে তাদের আশানুরূপ দান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি:

﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

অর্থ: 'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় মাগফিরাত ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ অতি প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (বাকারা, ২: ২৬৮)

১৭. আপনার প্রতি আমার সর্বশেষ উপদেশ হলো, 'চোখ থেকে "কালো" চশমাটা খুলে ফেলুন। মন থেকে নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে ফেলুন। জীবনটাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে শিখুন। পজেটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনার জীবনটাকে রাঙিয়ে তুলুন। জীবনের পটভূমি তো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরই বাস্তব প্রতিফলন মাত্র।

পরিশিষ্ট:

- * লেবাননের বিখ্যাত আরব কবি ইলিয়া আবু মাযী (১৮৮৯-১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

قَالَ: السَّمَاءُ كَثِيْبَةٌ! وَتَجْهَمَا

قُلْتُ: ابْتَسِم! يَكْفِي التَّجْهَمُ فِي السَّمَاءِ!

قَالَ: الصَّبَا وَلِي! فَقُلْتُ لَهُ: ابْتَسِم!

لَنْ يَرْجِعَ الْأَسْفُ الصَّبَا الْمُتَصَرِّمًا.

অর্থ: সে বলল, 'আকাশ বিষণ্ণ গোমরা হয়ে আছে।'

বললাম, 'তুমি হাস্যবদন থাক। আকাশের বিষণ্ণতা গোমরাভাব মুহূর্তেই কেটে যাবে।'

সে বলল, 'শৈশব অতীত হলো! যৌবন ফুরিয়ে গেল!'

বললাম, 'হাসিমুখে পৌড়ত্বের ভার গ্রহণ কর। তোমার অক্ষেপ অতীত শৈশব ও হারানো যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারবে না।'

- ❖ আমেরিকান ফোর্ড মটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড (১৮৬৩-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

'একটি ক্ষেত্রে আপনার বিশ্বাস আপনি পারবেন, আর একটি ক্ষেত্রে আপনার ধারণা, আপনি পারবেন না। দু'টি ক্ষেত্রেই দেখবেন, আপনার বিশ্বাস ও ধারণাটাই সত্যে প্রমাণিত হয়েছে।'

- ❖ মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক সফটওয়্যার নির্মাতা বিল গেটস বলেছেন:

'ইউনিভার্সিটির কয়েকটি সাবজেক্টে ফেল করেছি; কিন্তু আমার বন্ধুটি বেশ সাফল্যের সাথেই পাশ করেছে। এখন সে মাইক্রোসফট কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। আর আমি কোম্পানির স্বত্বাধিকারী।'

- ❖ প্রখ্যাত আমেরিকান সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ থেন্টাইস মুলফোর্ড (১৮৩৪-১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

'যে ব্যক্তি শুধু জীবনের নেতিবাচক দিকগুলোকেই বড় করে দেখে, অতীতের দুঃখ-দুর্দশার ভাবনায় ডুবে থাকে, ভবিষ্যতেও সে অনুরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির অজানা আশঙ্কায় ভুগতে থাকে। একপর্যায়ে সে অন্ধকার ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তখন তার নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই বাস্তবে প্রতিফলিত হয়। পদে পদে সে নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার শিকার হয়।'

ক্রোধ

রাগ-ক্রোধ হলো দৈনন্দিন জীবনের এক জটিল সমস্যা ও মারাত্মক ব্যাধি। এ স্বভাবজাত রিপু মানুষের মাঝে আজ ব্যাপক ও প্রকট আকার ধারণ করেছে। ব্যক্তি যখন কোনো কিছুতে অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয় তার মধ্যে রাগের উদ্রেক ঘটে, ক্রোধ সঞ্চারিত হয়। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ গালমন্দ, অভিশাপ, ঘাত-প্রতিঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ডিভোর্স ও সম্পর্কচ্ছেদের মতো জঘন্য কাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

পৃথিবীতে বহু অন্যায়-অনাচার, যুলুম-নির্যাতন, ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের নেপথ্য কারণ ছিল ভীষণ রাগ ও প্রচণ্ড ক্ষোভ। ক্রোধের মতো সুদূর অকল্যাণপ্রসারী ও দ্রুত ক্রিয়াশীল মানবপ্রবৃত্তি দ্বিতীয়টি নেই। কেননা তা ব্যক্তির কাজকর্ম, দায়-দায়িত্ব পালন হতে গুরু করে আচার-ব্যবহার সর্বত্র ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এ যেন এক সর্বনাশা ক্যান্সার ব্যাধি। যার ধ্বংসাত্মক জীবাণুগুলো দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

অতিরিক্ত ক্রোধের কারণে হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ বাড়তে থাকে। হার্টঅ্যাটাক ও মস্তিষ্কের রক্তস্রাবের মতো প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি বাড়ে। মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধের কারণে পাকস্থলির কোষগুলো উজ্জীবিত হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এসিড নির্গমনের পরিমাণও বেড়ে যায়।

রাগ ও ক্ষোভের কারণে মানুষ শুভবুদ্ধি চর্চার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। পরিবার-পরিজন, সমাজ ও বন্ধুজনের কাছে অসহ্য হয়ে উঠে। কেউ তাকে সহ্য করতে পারে না। তার রগচটা স্বভাবের কারণে সবাই তটস্থ থাকে। সমাজের সঙ্গে সে যতই মিলেমিশে চলার চেষ্টা করুক, প্রত্যেকেই তার সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। একপর্যায়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ভীষণ অস্বস্তিকর লাগে।

সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করার জন্য রাগ ও ক্ষোভের মানসিকতা পরিহারের বিকল্প নেই। কিন্তু এর উপায় কী? এর সঠিক পথ ও পছা কী?

সমাধান:

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ মান্য করুন। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبُ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبُ» (صحيح البخاري) ২৮ ৮
 অর্থ: আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট বলল, 'আপনি আমাকে অসিয়ত করুন।' তিনি বললেন, 'তুমি রাগ করো না।' লোকটি কয়েকবার তা বললেন। নবী ﷺ প্রত্যেকবারই বললেন, 'রাগ করো না।' (বুখারী, ৮/২৮)
২. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অঙ্গনে এ দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলুন-আপনার সহপাঠী বা সহকর্মীদের বলে দিন, রাগের মুহূর্তে তারা যেন আপনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে তারাও প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে।
৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ক্রোধ দমন করার পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। তা হলো, ভীষণ রাগের মুহূর্তে ওয়ু করুন। পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয়, তেমনই মনের চাপা ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রশমিত করে। নিজের অবস্থান পরিবর্তন করুন। যদি দাঁড়িয়ে থাকেন বসে পড়ুন। যদি বসে থাকেন শুয়ে পড়ুন। অথবা স্থান ত্যাগ করুন এবং اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পাঠ করুন।
৪. রাগের সময় চুপ থাকুন। কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেন ও চুক্তি করা সমীচীন নয়। কেননা রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত ও মতামত-কোনোটাই ন্যায্যানুগ ও যথার্থ হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ»

অর্থ: 'তোমাদের কেউ যখন রাগ করে সে যেন চুপ থাকে।' (মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৯)

৫. রাগ করার আগে একবার ভাবুন, রাগ মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে। তার নেক আমল বরবাদ করে। ব্যক্তির সুনাম-সুখ্যাতি ও মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। পরিচিতজন ও বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। সর্বোপরি রাগান্বিত ব্যক্তিকে আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত করে।
৬. ক্রোধ দমন করা এবং ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণের বিরাট ফযিলত ও প্রতিদানের কথা চিন্তা করুন। মহান রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে প্রতিদান লাভের প্রত্যাশাই আপনাকে রাগ ও ক্ষোভের মানসিকতা বর্জনে উদ্বুদ্ধ করবে।
৭. অধস্তন ও নিম্নবর্গের ওপর আপনার যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা, আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর তার চেয়ে নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তাই শাস্তি ও প্রতিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমাসুন্দর আচরণ করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর রহম করবেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ

فِي السَّمَاءِ» (سنن الترمذي) ৩/ ৩৮৮

অর্থ: 'দয়ালু ব্যক্তিদের ওপর পরম দয়ালু সত্তা (আল্লাহ তা'আলা) রহম করেন। তোমরা যমীনবাসীর ওপর রহম কর। আসমানে বিরাজমান সত্তা তোমাদের ওপর রহম করবেন।' (তিরমিজী, ৩/৩৮৮)

৮. যদি রাগের উদ্রেক হয় তাহলে তাসবীহ পাঠ করুন। রাগ প্রশমিত হতে থাকবে। মন-মানসিকতা প্রশান্তি ও প্রফুল্লতায় ভরে উঠবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাসবীহের আমলের সঙ্গে মানসিক প্রশান্তি জুড়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿وَمِنْ آثَارِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ [طه: ১৩০]

অর্থ: 'সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং তাসবীহ পাঠ কর রাতের কিছু অংশে ও দিনের প্রান্তসমূহে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।' (ত্বহা, ২০: ১৩০)

৯. রাগ ও ক্ষোভের কারণে যে মানসিক ও শারীরিক ক্ষতির শিকার হবেন, তা কি কখনো ভেবে দেখেছেন? দুচিন্তা-বিষণ্ণতা, মানসিক সংকীর্ণতা, আক্ষেপ-অনুতাপ-এসবই রাগ করার অশুভ পরিণতি। এ ছাড়াও ব্লাডপ্রেসার, হার্টঅ্যাটক, ব্রেইন স্ট্রোক ও মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের মতো প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে।
১০. রাগ প্রশমিত করার চর্চা করুন। রাগের উদ্বেগ হওয়া মাত্র নাক দিয়ে টেনে লম্বা শ্বাস গ্রহণ করুন। কয়েক সেকেন্ড শ্বাস ধরে রেখে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ করুন। এভাবে কয়েকবার করুন, দেহ-মন উভয়ই প্রশান্ত হবে।
১১. অন্যদের সম্মান বজায় রাখুন। তাদের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। অধীন ও নিম্নবর্গের লোকদের কথা ধৈর্যের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তাদের ওজর-আপত্তি কবুল করুন। সময় নিয়ে ধৈর্যের সাথে কথা শোনার কারণে অনেক ভুল ধারণা ও অবিশ্বাসের আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ফলে অন্যায় রাগ ও ক্ষোভের সম্ভাবনা থাকে না।
১২. সন্তানদের ঈমানী শিক্ষা-দীক্ষা ও কুরআন-সুন্নাহর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। ক্রোধ দমন, সহনশীলতা ও ক্ষমার গুণের মতো মহৎ আত্মিক গুণাবলি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
১৩. দু'টি বিষয়ের জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন: প্রথমটি হলো, বিনয়-নম্রতা ও সহনশীলতা। অপরটি হলো, সন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ-উভয় অবস্থায় ন্যায়সংগত কথা বলার যোগ্যতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই প্রার্থনা করতেন:

«وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ».

অর্থ: (হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট প্রশান্ত ও ক্রোধান্বিত-উভয় অবস্থায়ই ন্যায়ানুগ কথা বলার তাওফিক প্রার্থনা করছি।' (নাসায়ী, ৩/৫৪)

১৪. বিশ্বাস করুন, রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ করা ও ক্রোধ দমন করতে পারা দুর্বলতা ও অক্ষমতার আলামত নয়; বরং নৈতিক শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র জবানেই শুনুন:

«لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» (صحيح البخاري) ২৮/ ৮

অর্থ: 'যে বেশিশক্তি জাহির করে সে আসল শক্তিশালী নয়। প্রকৃত শক্তিশালী ও বলবান হলো, যে রাগের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' (বুখারী, ৮/২৮)

১৫. আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভালোবাসা কে-ই বা পেতে না চায়? তাহলে রাগ ও ক্ষোভের মানসিকতা পরিহার করে ধৈর্য ও সহনশীলতার চর্চা করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল কায়েস (রা.)-কে সুসংবাদ প্রদান করে বলেছেন:

«إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاءَةُ» (صحيح مسلم ৬৮/ ১)

অর্থ: 'তোমার মধ্যে দু'টি স্বভাবগুণ বর্তমান, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। (স্বভাবগুণ দু'টি হলো,) ধৈর্য ও সহনশীলতা। (মুসলিম ১/৪৮)

১৬. যদি ক্রোধ দমন করা সম্ভব না হয়, অত্মনিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তাহলে রাগ ও ক্ষোভের সম্ভাব্য ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র যবানে এমনই নির্দেশবাণী উচ্চারিত হয়েছে:

«أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَعَكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ» (سنن الترمذي ت بشار) ১৮৩/ ৬

অর্থ: 'তোমার যবান সংযত রাখ। (ফেতনার যামানায়) নিজ ঘরে আবদ্ধ থাক। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হও।' (তিরমিযি, ৪/১৮৩)

১৭. যে সমস্ত কারণে রাগের উদ্বেগ হয়, যে ব্যক্তিদের কারণে মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয় তাদের থেকে দূরে থাকুন। তাহলে রাগের সম্ভাবনা কমে যাবে। অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে আফসোস-অনুতাপে ভুগতে হবে না।

১৮. বিনম্র ও মার্জিত আওয়াজে কথা বলুন। চিৎকার-চঁচামেচি আপনার কথার জোর বাড়াবে না, বক্তব্য জোরালোভাবে সাব্যস্ত করবে না। উল্টো আপনার অভদ্রতা ও অসভ্যতা ফাঁস করে দিবে। মানুষের কাছে আপনি সম্মান ও মর্যাদা হারাবেন।

১৮. রাগ ও ক্রোধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। কেননা তা বহু অন্যায়-অনিষ্ট এবং শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির মূল কারণ।

পরিশিষ্ট:

❖ একদিন ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর পুত্র ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছিল। বাচ্চারা বেশ হাসি-আনন্দের সাথেই খেলাধুলায় মত্ত ছিল। এর মধ্যেই এক দুষ্ট ছেলের আঘাতে ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর পুত্রের মাথা ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বের হতে লাগল। লোকেরা দুষ্ট ছেলেটিকে ধরে খলিফার দরবারে নিয়ে এল।

বাইরে চিৎকার-চঁচামেচি শুনে ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ইতোমধ্যে ছেলেটির মা এসে খলিফার দরবারে উপস্থিত। অনুনয়ের সুরে বলল:

‘ছেলেটি আমার এতিম। তার বাবা নেই।’

খলিফা বললেন:

‘আপনি ধৈর্যধারণ করুন। বিচলিত হবেন না।’

এরপর তিনি জানতে চাইলেন:

‘এতিমদের তালিকায় এই ছেলেটির নাম আছে কি না?’

ছেলেটির মা বলল:

‘না, এতিমদের তালিকায় তার নাম নেই। ‘বায়তুল মাল’ থেকে সে কোনো সুযোগ-সুবিধাও পাচ্ছে না।’

খলিফা বললেন:

‘এতিমদের তালিকায় এই ছেলেটির নাম রেজিস্ট্রি করে দাও।’

খলিফা-পত্নী ফাতেমা বললেন:

‘এই ছেলেটির প্রতি আপনি এত সদয় হচ্ছেন কেন? আজ আপনার পুত্রকে রক্তাক্ত করেছে। কাল আর একজনকে আহত করবে।’

খলিফা তাঁর পত্নীর উদ্দেশ্যে বললেন:

‘যা বলার বলেছ। আর বলো না। ছেলেটি এতিম। লোকেরা তাকে এমনভাবে ধরে এনেছে যে, তাকে অনেক ভয় পাইয়ে দিয়েছে। এখন তাকে একটু শান্ত-নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ দাও।’

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজীজ (রহ.)-এর কী অনুপম মহানুভবতা ও সহনশীলতা! সন্তানের মাথা রক্তাক্ত দেখে তিনি একটুও বিরক্ত হলেন না, রাগান্বিত হলেন না। ক্ষমা-সুন্দর ব্যবহার করে উদারতা ও মহানুভবতার কী অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন! চরিত্র-মাধুর্যে ও ক্ষমার গুণে তাঁরাই হলেন পবিত্র কুরআনের বাস্তব নমুনা। তাঁদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

[আল عمران: ১৩৬]

অর্থ: ‘যারা নিজের রাগ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালোবাসেন।’ (আলে-ইমরান, ৩: ১৩৪)

❖ বিখ্যাত ফরাসি উদ্ভাবক ও বহুবিদ্যাজ্ঞ পিয়ের বিউমার্কাইজ (১৭৩২-১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘রাগের গুরুটা হলো পাগলামি। তার শেষটা হলো আক্ষেপ অনুতাপ।’

❖ হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম জাওয়ী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন:

‘নিজের রাগটাকে ধৈর্য ও সহনশীলতার রশিতে বেঁধে ফেলুন। কেননা মনের ক্ষোভ ও ক্রোধ হলো পাগলা কুকুর। একবার যদি বাঁধনমুক্ত হয়ে যায় সবকিছু নাশ করে ফেলে।’

❖ বিখ্যাত আরব কবি ও দুঃসাহসী যোদ্ধা আনতারা হ ইবনে শাদ্দাদ (৫২৫-৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

لَا يَحْمِلُ الْحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّقَبُ

وَلَا يَنَالُ الْعُلَا مَن طَبَعَهُ الْغَضَبُ

অর্থ: 'অভিজাত সম্রাট ব্যক্তি হিংসা-বিদ্বেষ পুষে রাখতে পারে না। রাগী ও বদমেজাযি কখনো সফলতার শীর্ষস্থান অধিকার করতে পারে না।'

- ❖ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট-পদ গ্রহণ করার পর ড. মুহাম্মাদ সা'দ আসসা'দী তাঁর পুত্রকে বলেন:

'কখনো যদি মনে রাগ ও ক্ষোভের উদ্বেগ হয় তাহলে উপরে আসমান ও নিচে যমীনের দিকে তাকাও। আসমান-যমীনের বিশালত্ব এবং তার স্রষ্টার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করো।'

তাড়াহুড়া

তাড়াহুড়া হলো আগ-পিছ না ভেবে, কোনো চিন্তা-ফিকির না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যসম্পাদনে প্রবৃত্ত হওয়া। মানুষ স্বভাবগতভাবে তাড়াহুড়াপ্রবণ। আল্লাহ তা'আলা যদি তাকে বিবেক-বুদ্ধি ও ধৈর্য-সহ্য দান না করতেন, তাহলে পরিপক্ব হওয়ার আগেই সে ফল পেড়ে ফেলত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহিম (আ.)-এর আদর্শ বর্ণনা করে মানুষকে ধৈর্য ও সহনশীলতায় অনুপ্রাণিত করেছেন:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ [হুদ: ৭৫]

অর্থ: 'নিশ্চয় ইবরাহীম অত্যন্ত সহনশীল, অধিক অনুনয় বিনয়কারী, আলাহমুখী।' (সূরা হুদ, ১১: ৭৫)

ধৈর্য-স্থৈর্য, সুচিন্তা ও স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা ইত্যাদি স্বভাবগুণ মানুষের সফলতা ও সৌভাগ্যের পথ সুগম করে। তাকে ব্যর্থতা ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে।

আর তাড়াহুড়া ও অস্থিরতা হলো এমন স্বভাবদোষ, যা ব্যক্তিকে প্রতিকূলতা ও ব্যর্থতার পথে ধাবিত করে। তার অর্জিত যত সফলতা ও সুকীর্তি, গৌরব ও মর্যাদা, এক এক করে সমস্ত কিছু বরবাদ করে ছাড়ে। এমনটাই ঘটনা স্বাভাবিক। কেননা তাড়াহুড়ার মুহূর্তে যা করা হয় তাতে সুস্থ চিন্তা-ভাবনা ও বিবেক-বুদ্ধির কোনো ভূমিকা থাকে না।

কত তাড়াহুড়াপ্রবণ লোক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাড়াহুড়া ও অস্থিরতার বশবর্তী হয়ে স্বাস্থ্য-সুস্থতা, অর্থ-সম্পদ ও সুনাম-সুখ্যাতি-সব খুইয়ে বসেছে। স্বভাবগত ক্ষয় তার জীবনের ক্ষয়-ক্ষতির চূড়ান্ত করে ছেড়েছে। পরিশেষে যখন সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, তখন আক্ষেপ-অনুতাপ ছাড়া কিছু করার নেই।

জীবনে সুখ-শান্তি লাভ করার জন্য, সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য তাড়াহুড়াপ্রবণতা ও অস্থির মানসিকতা পরিহারের বিকল্প নেই। কিন্তু তার উপায় কী? এ সমস্যার সঠিক সমাধান কী?

সমাধান:

১. ধৈর্যধারণ করুন। কেননা তা সফলতা ও মুক্তির অন্যতম উপায়। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তার কাজটাকে সহজ করে দেন। তার মুক্তি ও সফলতার পথ উন্মুক্ত করে দেন।
২. কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে কোনো, উদ্যোগ বাস্তবায়নের পূর্বে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করুন। পর্যাপ্ত সময় নিয়ে এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত ও সুবিধা-অসুবিধা যাচাই করুন।
৩. পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশ হোক আপনার জীবনের নিত্য আদর্শ:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ১৫৭]

অর্থ: 'তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ কর।' (আলে-ইমরান, ৩: ১৫৯)

৪. পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এমন ব্যক্তিদের নির্বাচন করুন যারা জ্ঞানী, গুণী, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।
৫. কোনো বিষয়ে কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হতে পারলে 'সালাতুল ইস্তিখারা' আদায় করুন। আল্লাহ তা'আলার কাছে সঠিক দিকনির্দেশনা চেয়ে প্রার্থনা করুন। যে ব্যক্তি 'ইস্তিখারা' করে সে ব্যর্থ হয় না। 'ইস্তিখারা'র পরামর্শে তাকে অনুতপ্ত হতে হয় না।

কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে কিংবা অত্যাশঙ্ক কোনো বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে তাঁরই দরবারে কায়মনোবাক্যে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রার্থনা করার নামই ইস্তিখারা। অর্থাৎ, ইস্তিখারার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ তা'আলার কাছে এই প্রার্থনা করে যে, আমি যা করতে চাই তাতে যদি আমার কল্যাণ থাকে তাহলে তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং বরকত দান করুন। এটিই হলো ইস্তিখারার হাকীকত।

ইস্তিখারার জন্য দুটি কাজ করণীয় বলে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে। দু' রাকাত নামায আদায় করা এবং ইস্তিখারা প্রসিদ্ধ মাসনূন দু'আটি মনোযোগের সাথে পড়া। সময়ের স্বল্পতা বা অন্য কোনো কারণে এই দু'টি কাজ সম্ভব না হলে তিনবার বা সাতবার এই দু'আটি পড়েও ইস্তিখারা করা যায়, اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي (ইবনুস সুন্নী, হাদীস: ৫৯৭, ৫৯৮)

এরপর যে বিষয়ে হৃদয়াত্মা আশ্বাস পাবে আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে সেই কাজ আরম্ভ করা কর্তব্য। এভাবে আমল করলে ইস্তিখারা হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, এই আমল করার জন্য শরীয়তে নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। রাত বা দিনের যেকোনো সময় তা করা যায়। (অনুবাদক)

৬. অতীত জীবনের দিকে ফিরে তাকান, গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন, তাড়াহুড়ার কারণে যে ক্ষতি ও দুর্গতির শিকার হয়েছেন তা শনাক্ত করুন এবং সামনের দিনগুলোতে ধৈর্য ও সুচিন্তার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উদ্যোগ বাস্তবায়ন করুন।
৭. কোনো বিষয়ে তরিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে “একটু ভেবে দেখি, একটু চিন্তা করে দেখি”—এ নীতি অবলম্বন করুন। এভাবে তাড়াহুড়াপ্রবণ মানসিকতা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং ধৈর্য ও ধীরস্থিরতার গুণে প্রতিটি বিষয় সুষ্ঠু সফলভাবে সম্পন্ন হবে।
৮. ধীরতা ও স্থিরতার চর্চা করুন। যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে হলে একটু সময় নিন। কোনো দায়িত্ব পালন করতে বলা হলে ভেবে-চিন্তে ধীরস্থিরভাবে পালন করুন। এভাবে অনবরত প্রশান্ত মানসিকতার চর্চা করতে থাকুন। একপর্যায়ে তা আপনার স্বভাবগুণে পরিণত হবে।
৯. আরবি প্রবাদ বাক্যটি মনে রাখুন:

فِي الْعُجْلَةِ النَّدَامَةُ، وَفِي التَّأَنِّي السَّلَامَةُ.

অর্থ: ‘তাড়াহুড়ায় লোকসান, ধীরস্থিরতায় পরিত্রাণ।’

অতীতে মানুষ যে ক্ষতি ও দুর্গতির শিকার হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে, তার অধিকাংশেরই নেপথ্য কারণ হলো তাড়াহুড়াপ্রবণতা ও অশান্তচিন্তা।

১০. ইবাদত হলো বান্দার জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। অন্যান্য মঙ্গলজনক কাজও তার জীবনের শুভ অধ্যায়। তাই শুভ কাজে দেরি করতে নেই। দ্বিতীয় কোনো চিন্তা-ভাবনার অবকাশ নেই।
১১. ধৈর্য-স্থৈর্য হলো নবী-রাসূলগণের চারিত্রিক গুণ। জ্ঞানী-গুণী ও মহামনীষিগণের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। আর তাড়াহুড়া ও অস্থিরপ্রবণতা হলো বোকা, নির্বোধ ও পাগলাটে লোকের স্বভাবদোষ। এবার আপনিই ভাবুন, কোনটি অবলম্বন করবেন।
১২. সন্তান, পরিবার ও অধীনস্তদের, চিন্তা-ভাবনা ও ধীরস্থিরতার দীক্ষায় গড়ে তুলতে হবে। তাড়াহুড়া ও অস্থিরপ্রবণতার ক্ষতিকর দিকগুলোর ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক করতে হবে।

১৩. ধীরস্থিরতা ও প্রশান্তি লাভের অন্যতম উপায় অবলম্বন করুন। তা হলো আল্লাহর যিকির। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

﴿الْأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ২৮]

অর্থ: ‘স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়।’ (সূরা রা’দ, ১৩: ২৮)

১৪. সর্বশ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ গ্রহণ করুন। ধৈর্যে-স্থৈর্যে তিনি হলেন অতীত ও ভবিষ্যতের অনুপম শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

১৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«الْأَنَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»

অর্থ: ‘ধীরস্থিরতা হলো আল্লাহর তরফ থেকে। আর তাড়াহুড়া হলো শয়তানের পক্ষ থেকে।’ (তিরমিজী, ৪/৩৬৭)

একবার ভেবে দেখুন-শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হবেন, না কি মহান রবের তরফ থেকে নিয়ামতপ্রাপ্ত হবেন?

পরিশিষ্ট:

- ❖ ইরাক ও ইরানের অন্যতম বিখ্যাত শিয়া ধর্মীয় রেফারেন্স মুহাম্মদ আল-হুসাইনী আশ্ শীরাজী (১৯২৮-২০০১ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি সর্বদা প্রশান্তচিত্ততা ও সুস্থির চিন্তা-ভাবনার আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কেননা তুণীরের তীর একবার ছুটে গেলে আর ফেরানো যায় না।’
- ❖ চৈনিক কনফুসীয় দার্শনিক মেনসিয়াস (২৮৯-৩৭২ খ্রিষ্টপূর্ব) বলেছেন:
‘যারা সহসা অতি দ্রুত শিখরে পৌঁছায় তারা অপেক্ষাকৃত দ্রুত নিচে পতিত হয়।’
- ❖ বিশিষ্ট জার্মানি লেখক ও সাহিত্যিক জোহান গ্যাটে (১৭৪৯-১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘অস্থিরপ্রবণ লোক বের হওয়ার দরজার খোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অথচ সে দরজার সামনেই আনাগোনা করছে।’

মতভেদ

মতভেদ হলো একটি বিষয়ে দু'জন কিংবা ততধিক ব্যক্তি সহমত হতে না পারা, মতবিরোধে লিপ্ত হওয়া।

মতভেদের অন্যতম কারণগুলো হলো ব্যক্তিগত বিরোধ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ভিন্নতা, চিন্তা-চেতনা আকিদা ও বিশ্বাসের পার্থক্য ইত্যাদি।

মতবিরোধ ও মতভিন্নতার মাঝে একটা পার্থক্য বর্তমান। মতবিরোধ হলো, কাক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের পথ-পন্থা ও মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা দেওয়া। আর মতভিন্নতা হলো, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও পথ ও পন্থা ভিন্ন হওয়া।

আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে মতভেদ দু'ধরনের: একটির উৎস হলো চিন্তানৈতিক বৈচিত্র্য ও বোধ-উপলব্ধির ভিন্নতা। এটি প্রশংসনীয় ও ফলপ্রসূ। অপরটির নেপথ্য কারণ হলো ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থ, নিজস্ব মতামত বাস্তবায়নের মানসিকতা, জাতীয়বাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি। এটা নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর।

এ ধরনের মতবিরোধ ও মনোমালিন্য হতে শুরু করে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও গালমন্দ পর্যায়ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পর্কচ্ছেদ, পারিবারিক বিচ্ছেদ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা শেষ অবধি যুলুম-নির্যাতন ও যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত গড়ায়।

সবচেয়ে ভয়াবহ হলো দলীয় ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ। ধর্মীয় বিরোধ তো আরও ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক। এর জের ধরেই পৃথিবীতে ভয়াবহ দাঙ্গা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে। শত বছরের সাজানো জনপদ ও হাজার বছরের সভ্যতা-সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটেছে।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা অটুট রাখার জন্য বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প নেই। কিন্তু উপায় কী? মতভেদ ও বিরোধ নিরসনের সহজ সমাধান কী?

সমাধান:

১. মতবিরোধের বিষয়টিকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করুন। যে সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কুণ্ডলো সাদা চোখে ধরা পড়ে না, বিস্তার অনুসন্ধান ও জানা-শোনার ভিত্তিতে তা শনাক্ত করুন।
২. মতবিরোধের ক্ষেত্রে গালমন্দ করা, অপবাদ আরোপ করা, অপর পক্ষের নামে কুৎসা রটনার মতো অন্যায় পথ পরিহার করে আসল সত্য ও সঠিক সমাধান বের করার চেষ্টা করুন।
৩. কারো সঙ্গে মতবিরোধ হলে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলুন। অন্যের কথা বাস্তবতার আলোকে বিচার করুন। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ার পর স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তে তা গ্রহণ করুন।
৪. প্রতিপক্ষ যত কঠোর হোক, যত মূর্খতার পরিচয়ই দিক আপনি প্রশান্ত চিন্তে ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রেখে তার মোকাবেলা করুন। প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে তার প্রতিটি কথার উত্তর প্রদান করুন।
৫. একতরফা কথা না বলে, গলাবাজি প্রদর্শন না করে অপরপক্ষকে কথা বলার সুযোগ দিন। গুরুত্ব দিয়ে তার প্রতিটি কথা শুনুন এবং যথার্থভাবে যাচাই করুন।
৬. মতভেদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্তব্য হলো পরস্পর আলোচনা করা, মতবিনিময় করা এবং প্রত্যেকের কথা ও মতামত গুরুত্ব দিয়ে শোনা। সর্বোপরি সকলের ঐকমত্যের জায়গাটি শনাক্ত করা এবং সে ভিত্তিতে এমন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, যাতে সবার নৈতিক ও যৌক্তিক স্বার্থ রক্ষা হয়।
৭. পরস্পর বিরোধ নিরসন সম্ভব না হলে কোনো জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ও আমানতদার ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া কর্তব্য।
৮. অপরপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করুন। বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে তার পক্ষ থেকে যদি কোনো ইতিবাচক ও ন্যায্যানুগ মতামত আসে তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করুন।

৯. মতভেদ ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে মীমাংসাকারীর ভূমিকা পালন করুন। সদয় ও বিনয় কথায় বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করুন।
১০. যেকোনো বিজ্ঞানের চেয়ে মহাবিজ্ঞ, পণ্ডিতজনের ওপর মহাপণ্ডিত বর্তমান। বহুমাত্রিক অগাধ জ্ঞানার্জনের পরও এমন অনেক বহু বিষয় আছে যা আপনার জ্ঞানের পরিধির বাইরে। তাই কখনো নিজেকে সর্বেসর্বা ভাবা ঠিক নয়। যে অজ্ঞ, মূর্খ সে-ই নিজেকে মহাজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত ভেবে বসে থাকে।
১১. পক্ষপাতিত্ব ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মানসিকতা পরিহার করে বিবদমান ব্যক্তিদের পরস্পর সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির চেতনা ধারণ করে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।
১২. অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নিজেকে সর্বেসর্বা ভাবার মানসিকতা পরিহার করুন। মীমাংসামূলক আলোচনার টেবিলে একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করুন।
১৩. ভুল স্বীকার করার মানসিকতা লালন করা কর্তব্য। অপর পক্ষের দাবি যৌক্তিক ও নৈতিক প্রমাণিত হলে তা সাগ্রহে হাসিমুখে মেনে নেওয়া আবশ্যিক। তখন মতভিন্নতা, বাদবিসংবাদের কারণ হবে না; বরং প্রকৃত সত্য ও যৌক্তিক বিষয় উদ্ঘাটনের উপায় বলে সাব্যস্ত হবে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ হাফেজ্জ ইবনুল কাইয়্যিম জাওয়ী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন:
‘যে ব্যক্তি অন্যদের কাজকর্ম ও পদক্ষেপগুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে বিবেচনা করবে তার হৃদয় নিষ্কলুষ ও পরিশুদ্ধ থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা তাকে যাবতীয় অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।’
- ❖ সিরিয়ান ও লেবানিজ কবি অ্যাডোনিস^{৩৭} বলেছেন:
‘তুমি আমাকে ঘৃণা করছ না। তুমি ঘৃণা করছ আমার সম্পর্কে তোমার মনে কল্লিত রূপটাকে। সে কল্লিত রূপটি আমি নই, স্বয়ং তুমিই।’

^{৩৭} এটি তার ছদ্মনাম। তার আসল নাম হলো আলী আহমাদ সাঈদ।

- ❖ নিউজিল্যান্ডের বিখ্যাত লেখক পিটার টি ম্যাকিন্টায়ার বলেছেন:
‘সর্বদা নিছক সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকার মাধ্যমেই আত্মবিশ্বাস অর্জিত হয় না; বরং অকপটে ও নিঃসংকোচে নিজের ভুল স্বীকার করতে পারাই প্রকৃত আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার পরিচয়।’
- ❖ ভারতীয় অন্যতম রাজনীতিবিদ ও হিন্দু ধর্মালম্বীদের আধ্যাত্মিক গুরু, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী^{৩৮} (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
‘মতভিন্নতা হলেই যে তা চরম বিরোধিতা ও শত্রুতায় পর্যবসিত হতে হবে এমনটা সমীচীন নয়। নচেৎ আমি ও আমার স্ত্রীই হতাম একে অপরের চরম বিরোধী, ঘোরতর শত্রু।’

যুলুম-নির্যাতন

যুলুম হলো, কারোর মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ করা, অর্থ-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করা কিংবা শারীরিক নির্যাতন করা। আরেকটু বিস্তারিত বলতে গেলে কারো হক নষ্ট করা, সম্পদ আত্মসাৎ, অন্যায়-অবিচার, মিথ্যার আড়ালে প্রকৃত সত্যটাকে গোপন করা, জনসম্মুখে কাউকে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা, গাল-মন্দ করা এবং মিথ্যারোপ করা ইত্যাদি হলো গুরুতর ও জঘন্যতম যুলুম-অন্যায়।

যুলুমের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যালিম তার পদবলে ও পেশিশক্তিতে এতটাই দুর্বিনীত থাকে যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য পীড়িত ও ভুক্তভোগীর কিছুই করার থাকে না। সমস্ত অন্যায়-অবিচার চুপচাপ মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। অত্যাচারিত ব্যক্তি যখন দেখে, তার মতোই রক্ত-মাংসে গড়া এক আদম সন্তান তার ওপর অনবরত অন্যায়-অবিচার করে যাচ্ছে, অথচ তার আত্মরক্ষা করার সাধ্যটুকু নেই, প্রতিবাদের ভাষায় টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করার সুযোগ নেই তখন কিছু না করতে পারার অক্ষমতা ও আত্মগ্লানি তার জন্য আরও দুর্বিষহ ও অসহনীয় হয়ে উঠে।

আল্লাহ তা'আলা যে কোনো যুলুম-নির্যাতনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। স্বয়ং তাঁর পবিত্র সত্তার ওপরও যুলুমের নিষিদ্ধতা অবধারিত করে নিয়েছেন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যুলুম-নির্যাতন জঘন্যতম কবীরা গুনাহ। কেননা তা যাবতীয় অনিষ্টের মূল। পারিবারিক ও সামাজিক যত অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা, যত ফেতনা-ফাসাদ-এসবের নেপথ্যে মূল কারণ হলো অন্যায়-অনাচার ও যুলুম-অত্যাচার।

সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হলে সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলতে হবে। যুলুম-নির্যাতনের পথ বন্ধ করতে হবে। অন্যায়-অনাচারের মূলোৎপাটন করতে হবে। কিন্তু উপায় কী? এ জটিল সমস্যার সমাধান কী?

সমাপান:

১. বিচারবিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।
২. ব্যক্তি-জীবন থেকে শুরু করে পরিবার, শিক্ষালয় ও কর্মস্থল, মোটকথা সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে সাম্য ও ন্যায়ানুগতা বজায় রাখতে হবে। যেন দেশ ও জাতি ন্যায়-ন্যায্যতার শীতল ছায়ায় বেঁচে থাকতে পারে এবং তার সুফল ভোগ করতে পারে।
৩. পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের কথা মনে রাখতে হবে। তাতে যুলুম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যালিমের ওপর কঠোর শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন: পবিত্র কুরআনের সতর্কবাণী:

﴿الْأَنَ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ﴾ [الشورى: ৬৫]

অর্থ: ‘মনে রেখ, জালেমগণ স্থায়ী আযাবের ভেতর থাকবে।’ (সূরা শূরা, ৪২: ৪৫)

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

«يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا» (صحيح مسلم) ১৭৭৬/ ৬

অর্থ: ‘হে আমার বান্দারা! আমি নিজেই নিজের ওপর যুলুম নিষিদ্ধ হিসেবে অবধারিত করেছি। তোমাদের জন্যও তা নিষিদ্ধ করেছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের ওপর যুলুম করো না।’ (মুসলিম, ৪/১৯৯৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (صحيح البخاري) ১২৭/ ৩

অর্থ: ‘যুলুম-নির্যাতন কিয়ামতের দিন বহু আযাব ও শাস্তি হয়ে দেখা দিবে।’ (বুখারী, ৩/১২৯)

৪. এ বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকুন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা মাযলুমের পক্ষে জালিমের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। যালিমের নেক আমলসমূহ মাযলুমের আমলনামার অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। আর মাযলুমের গুনাহ ও নাফরমানি যালিমের আমলনামাভুক্ত করে দিবেন। এভাবে মাযলুমের পাল্লা অধিক আমলের ওজনে ভারি হবে, আর যালিমের গুনাহর পাল্লা যুলুম-অত্যাচারের বোঝায় ঝুঁকে পড়বে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«لَتَوْدَنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ

الْجَلْحَاءِ، مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ» (صحيح مسلم) ১৭৭৮/ ৬

অর্থ: 'কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হক ও ন্যায্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি শিংবিহীন বকরির ওপর শিংওয়ালা বকরির যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে।' (মুসলিম, ৪/১৯৯৭)

৫. ইতিহাসের পাতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। যুগে যুগে যালিম অত্যাচারী ও স্বৈচ্ছাচারীদের কী করুণ পরিণতি ঘটেছে! একসময়ের দোর্দণ্ড প্রতাপ-প্রতিপত্তির অধিকারী, নিঃশেষে তারা কী ভয়াবহ ধ্বংস ও বরবাদির শিকার হয়েছে। মৃত্যুর পরও তাদের নিস্তার নেই। ইতিহাস আজও তাদের নিন্দা ও ঘৃণা ভরে স্মরণ করে।
৬. যদি ক্ষমতা বলে ও পেশিশক্তির জোরে দুষ্ট মন আপনাকে কারো ওপর যুলুম করতে প্ররোচিত করে তাহলে স্মরণ করুন, আপনার ওপরও বিরাজমান অসীম ক্ষমতা ও শক্তিমত্তার অধিকারী মহান আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং যমীনবাসীর প্রতি রহম করুন। আসমানের মহান সত্তা আপনার প্রতি রহম করবেন।

জ্ঞানীগণ যথার্থ বলেছেন:

'কারো ওপর যুলুম করার সময় তোমার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়ানুগতার কথা স্মরণ করো। কারো ওপর ক্ষমতা ও শক্তি যাহির করতে গিয়ে তোমার ওপর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও শক্তিমত্তার কথা মনে রেখো।'

৭. কখনো যুলুম-অবিচারের শিকার হলে এই দু'আটি পাঠ করতে থাকুন:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

উচ্চারণ: হাসবুনাল্লা-হু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল ।

অর্থ: আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট । তিনি কতই না শ্রেষ্ঠ অভিভাবক ।

এ দু'আটি হলো নিরুপায় ময়লুমের সর্বোত্তম পাথের ও বিরাট অস্ত্র ।

৮. ধৈর্যধারণ করুন । আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন । যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তা'আলা তার ধৈর্যের প্রতিদান প্রদান করেন । তাকে সাহায্য করেন ।

মনে রাখতে হবে, যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ কাফের-মুশরিক কর্তৃক বহু যুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়ন-নিগ্রহের শিকার হয়েছেন ।

দ্বিতীয়ত, এ পৃথিবী হলো তিক্ত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষাস্থল । ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জায়গা নয় । কিয়ামত দিবসেই প্রকৃত ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে ।

৯. যুলুম-অত্যাচার বাহ্যিকভাবে ক্ষতিকর মনে হলেও কখনো কখনো তা আপনার জন্য কল্যাণকর হতে পারে । তা আপনারই কৃত অন্যায় ও পাপাচারের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ । পাপমোচনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করুন । সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত এ দু'আটি পাঠ করুন :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ: «يَا أُمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟»، قَالَ: هُمُومٌ لَزِمْتَنِي، وَذُيُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا أَعَلَّمْتُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ عَزٌّ وَجَلَّ هَمٌّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنُكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ:

অর্থ: আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মসজিদে প্রবেশ করে জনৈক আনসারী সাহাবিকে দেখতে পেলেন। তিনি হলেন আবু উমামা (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

‘হে উমামা! কী ব্যাপার? নামাযের সময়ের বাইরেও যে তুমি মসজিদে আছ?’

আবু উমামা (রা.) বললেন:

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতায় ভুগছি। ঋণের দায়ে দায়গ্রস্ত হয়ে পড়েছি।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

‘আমি কি তোমাকে এমন দু‘আ শিখিয়ে দিব না, তুমি যদি তা পাঠ করো আল্লাহ তা‘আলা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন?’

আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি বললাম:

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্যই (শিখিয়ে দিন)।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

‘সকাল-সন্ধ্যায় তুমি এ দু‘আটি পাঠ করবে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ
وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ
الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ" (سنن أبي داود) ৯৩/ ২

অর্থ: ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও দুর্দশা থেকে পানাহ চাই। পানাহ চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে। ভীর্ণতা ও কৃপণতা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আশ্রয় প্রার্থনা করি ঋণের বোঝা ও লোকদের ক্ষমতা ও পেশিশক্তির কবল থেকে।’

(আবু দাউদ, ২/৯৩)

১০. যালিমের ক্ষমতা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি দেখে শঙ্কিত হবেন না। সাময়িকভাবে সে অপ্রতিরোধ্য। আল্লাহ তা‘আলা তার যুলুম ও স্বৈচ্ছাচার সম্পর্কে বেখবর নন। নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই তাকে

জবাবদিহির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে এবং যুলুমের শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

সুতরাং ধৈর্যধারণ করুন এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করুন। যালিমের যুলুম নিতান্ত সাময়িক। আল্লাহ তা'আলা তাকে অবকাশ দিয়ে রাখেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ

تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ৬২]

অর্থ: 'তুমি কিছুতেই মনে করো না, জালিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ বেখবর। তিনি তো তাদের সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন চক্ষুসমূহ থাকবে বিস্তারিত। (ইবরাহীম, ১৪: ৪২)

১১. চারপাশে যদি যালিম ও যুলুমের অবাধ ছড়াছড়ি ও উদ্যাম প্রদর্শনী চলতে থাকে তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তার শহরে হিজরত করুন। অনেক মহামনীষীই নিপীড়ন-নিগ্রহের শিকার হয়ে, যালিমের জনপদ ছেড়ে নিরাপদ শহরে সফর করেছেন।

১২. বুখারী ও মুসলিম শরীফের এ হাদীসটি মনে রাখুন:

«دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمَهَا، وَلَمْ تَدْعُهَا

تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» (صحيح البخاري) ১৩০/ ৬

অর্থ: 'এক মহিলা শুধু এ কারণে জাহান্নামী হয়েছে যে, সে একটা বিড়ালকে আটকে রেখেছিল। নিজে বিড়ালটাকে খেতে দেয়নি। তাকে জমিনে চড়ে খাবার সংগ্রহ করে খাওয়ার সুযোগও দেয়নি।' (বুখারী, ৪/১৩০)

একটু চিন্তা করে দেখুন, অতি নগণ্য প্রাণী বিড়াল আটকে রাখার অপরাধে আল্লাহ তা'আলা মহিলাটিকে জাহান্নামের আযাব দিয়েছেন। আর যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের ওপর যুলুম করবে তার পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে!

১৩. সদাচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা করা হলো মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। এর সুফল সুদূরপ্রসারী। পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ [النحل: ৯০]

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইনসাফ ও দয়ার আদেশ করেন।' (সূরা নাহল, ১৬: ৯০)

১৪. আচার-উচ্চারণে, আচারণ-বিচরণে নীতিবান ও ন্যায়ানুগ হোন। তাতে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সমৃদ্ধি অর্জিত হবে। আল্লাহর লানতের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কেনানা যালিমদের ওপর তাঁর লানত অবধারিত। পবিত্র কুরআনের সতর্কবাণী:

﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ১৮]

অর্থ: 'সকলে শুনে নিক, ওই জালেমদের ওপর আল্লাহর লানত।' (সূরা হুদ, ১১: ১৮)

১৫. আপন সন্তান ও পরিবারের কল্যাণ বিবেচনা করে হলেও যুলুম থেকে বিরত থাকুন। মানুষের ওপর আপনি অন্যায়-অবিচারে প্রবৃত্ত হবেন; তার পরিণতিতে আপনার পরিবারের সদস্যগণ তাদের খারাপ নিশানায় পরিণত হবে, লোকদের দ্বারা যুলুম-নির্যাতনের শিকার হবে। এটাই প্রকৃতির অবধারিত নীতি—যেমন কর্ম তেমন ফল।

তাছাড়া মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা হলো, সে যখন কারো সাথে পেরে না উঠে তখন প্রতিপক্ষের আবেগ-অনভূতি ও দুর্বলতার জায়গায় আঘাত করে তাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে।

১৬. সন্তানদের কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ ও ঈমানী দীক্ষায় গড়ে তুলুন। তাদের সদাচার ও ন্যায়পরায়ণতায় অনুপ্রাণিত করুন। অন্যায় যুলুমের ব্যাপারে তাদের মনে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করুন।

১৭. যদি যুলুম প্রতিরোধের শক্তি না থাকে তাহলে অন্তরে তা ঘৃণা করুন। যালিমের সঙ্গে বেঁচে থাকুন। কখনো তার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করবেন না, তার পক্ষে একবিন্দুও ঝুঁকবেন না, নচেৎ জাহান্নামের কঠিন আযাবের আশঙ্কা রয়েছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ:

﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [হুদ: ১১৩]

অর্থ: ‘(হে মুসলিমগণ!) তোমরা ওই জালেমদের দিকে একটুও
ঝুঁকবে না, অন্যথায় কখনও জাহান্নামের আগুন তোমাদেরকেও
স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও বন্ধু থাকবে না।
আর তখন কেউ তোমাদের সাহায্যও করবে না।’ (সূরা হুদ, ১১: ১১৩)

১৮. প্রকৃত হকদারকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সব ধরনের যুলুম
অবিচার থেকে বিরত থাকতে হবে। সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ
তা‘আলার নিকট ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ-প্রতিটি প্রাণীর মর্যাদা হক্ক ও মর্যাদা
রয়েছে। মানুষের হক্ক ও মর্যাদা আরও বেশি। তার দেহ-শরীর, অর্থ-
সম্পদ ও ইজ্জত আবরু তার মতোই সমান মর্যাদাপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-
এর পবিত্র যবানে সুস্পষ্ট ঘোষণা শুনুন:

“أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟”
قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: “اللَّهُمَّ اشْهَدْ.” (صحيح البخاري) ১৭৭/ ৫

অর্থ: ‘(হে উপস্থিত জনমণ্ডলী, আজকের এই দিন (জুমার দিন), এ
মাস (জিলহজ মাস) ও এ শহর (মক্কা) যেমন পবিত্র; তোমাদের
জানমাল, ইজ্জত-আবরু, মান-সম্মান (কিয়ামত পর্যন্ত) এমনই
পবিত্র। আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহর দীন পৌছে দিয়েছি?’
সাহাবাগণ বললেন, ‘হ্যাঁ (ইয়া রাসূলুল্লাহ)।’ রাসূলুল্লাহ ﷺ
বললেন, ‘হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।’ (বুখারী, ৫/১৭৭)

১৯. অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন আপন
রবের সামনে দাঁড়াবেন তখন যেন আল্লাহর কোনো বান্দা, এমনকি
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো নগণ্য প্রাণীর ওপর যুলুমের বোঝা বহন করতে না
হয়, নচেৎ আক্ষেপ-অনুতাপ ও বরবাদি ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।
পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾

অর্থ: 'আল-হায্বল কায্যমের সামনে সকল চেহারা নত হয়ে থাকবে। আর যে-কেউ যুলুমের ভার বহন করবে, সে-ই ব্যর্থকাম হবে।' (ত্বাহা, ২০: ১১১)

২০. যুলুম-নির্যাতন এমন জঘন্য অপরাধ, ইহকালেই এর করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়। কেননা যালিম আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়। তাছাড়া মাযলুমের বদ দু'আ ও আল্লাহ তা'আলার আরশের মধ্যে কোনো আবরণ থাকে না। তার জন্য আসমানের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাযলুমের দু'আর ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন:

"ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ،
وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا [ص: ৬৭৩] فَوْقَ الْغَمَامِ، وَتُفْتَحُ لَهَا
أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ
بَعْدَ حِينٍ. (سنن الترمذي ت شاكر) ৬/ ৬৭৩

অর্থ: 'তিন ব্যক্তির দু'আ বৃথা যায় না: (এক.) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (দুই.) ইফতারের সময় রোযাদারের দু'আ। (তিন.) পীড়িত ও মাযলুমের দু'আ। আল্লাহ তা'আলা তা মেঘের ওপর উঠিয়ে নেন। তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা (মাযলুমের দু'আয়) সাড়া দিয়ে বলেন:

'হে আমার বান্দা, কিছুটা বিলম্বে হলেও অতি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব!'

২১. সর্বদা মনে রাখুন, কিয়ামতের দিন বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। অন্যায়-অবিচার করে ইহকালে কোনোভাবে পার পেয়ে গেলেও পরকালে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচার থেকে কোনো নিস্তার নেই। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা:

﴿ وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ * وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ [الزمر: ৬৭, ৭০]

অর্থ: ‘মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। তাদের ওপর কোন যুলুম করা হবে না। প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। আর তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ পরিপূর্ণ জ্ঞাত।’ (সূরা যুমার, ৩৯: ৬৯-৭০)

২২. দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষভাবে যবান ও হাত দুটিকে সবধরনের যুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত রাখুন। এটিই প্রকৃত মুসলমানের আদর্শ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

অর্থ: ‘প্রকৃত মুসলমান সেই, যার যবান ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।’ (বুখারী, ৮/১০২)

২৩. কারো ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করা থেকে বিরত থাকুন। সময় মতো প্রত্যেককে তার পাওনা বুঝিয়ে দিন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ". (صحيح البخاري، برقم: ২৬৬৭)

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মতহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ হতে মাফ করিয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না।’ (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২৪৪৯)

পরিশিষ্ট:

- * হিজরি চতুর্থ শতাব্দী। বাগদাদের শাসক ছিল ভীষণ অহংকারী, যালিম স্বৈচ্ছাচারী। জনগণকে লাঞ্ছিত অপদস্ত করা ছিল তার স্বভাবজাত। প্রজাসাধারণের ওপর যুলুম-নির্যাতন ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

তারই শহরে বাস করত দরিদ্র নিঃশ্ব ভগ্ন দেহের এক বৃদ্ধা। সহায়-সম্মল বলতে তার একখণ্ড কৃষি জমি। যালিম শাসকের সাজ-পাঙ্গরা একদিন রীতিমতো বৃদ্ধার শেষ সম্মল কৃষি জমিটাই জবরদখল করে নিল। নিরুপায় বৃদ্ধা শাসকের নিকট অনুযোগ করল। তার ওপর হওয়া অন্যায়-অবিচারের সুবিচার চেয়ে আরজি জানাল। শাসক তার স্বভাবজাত অহংপুষ্ট ভঙ্গিমায় ও তাচ্ছিল্যের সুরে বলল:

‘যাও, রাতের শেষ ভাগে দু‘আ করে দেখ, দেখি কী করতে পারো?’

বৃদ্ধার আর বোঝার বাকি রইল না। বিচার না পাওয়ার হতাশা ও চাপা ক্ষোভ নিয়েই তাকে ফিরে আসতে হলো। শুধু বলে এল:

‘সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’

সে রাতের শেষ প্রহরে বৃদ্ধা আল্লাহ তা‘আলার দরবারে যুলুমের বিচার চেয়ে শাসকের নামে বদ দু‘আ করল। কিছু কালের মধ্যেই আব্বাসী খলিফা কর্তৃক বাগদাদের শাসক পরাজিত হলো। পালাবারও সুযোগ পেল না। কারাবন্দি হলো।

প্রথম জুমার দিন আব্বাসী খলিফা জনসম্মুখে পরাজিত শাসকের হাত কেটে ফেলার হুকুম করলেন। তৎক্ষণাৎ পূর্ববর্তী যালিম শাসকের হাত কেটে ফেলা হলো।

দ্বিতীয় জুমায় আব্বাসী খলিফা তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডদেশ জারি করলেন। খবর পেয়ে বৃদ্ধা বেড়িয়ে এল। যালিম শাসককে মৃত্যুমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল:

‘আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, রাতের শেষ প্রহরে দু‘আ করার সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য।’

এরপর বৃদ্ধা এ কবিতা আওড়ালো :

إِذَا جَارَ الْوَزِيرُ وَكَاتِبَاهُ
وَقَاضِي الْأَرْضِ أَجَحَفَ فِي الْقَضَاءِ
فَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ
لِقَاضِي الْأَرْضِ مِنْ قَاضِي السَّمَاءِ

অর্থ: ‘শাসক ও উযির-নাযির যদি যালেম হয়, যমীনের বিচারক যদি অবিচারী হয়, তাহলে আসমানের ফায়সালাকারীর পক্ষ থেকে তার ধ্বংস ও বরবাদি অনিবার্য।’

- * ফ্রান্সের দার্শনিক ও বহুবিদ্যাবিশারদ গুস্তাভে লে বোন (১৮৪১-১৯৩০ খ্রি.) তাঁর রচিত ‘আরব-সভ্যতা’ নামক বইয়ে লিখেছেন:
‘আরবদের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালু বিজেতা ইতিহাস আর দেখেনি।’
- * যুলুম-অত্যাচার, বিদ্বেষ-শত্রুতা ও বিপদের মুহূর্তে বন্ধুকে একা ফেলে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গে কবি ইবনে রুমি (১২০৭-১২৭৩ হি.) বলেন:

وَزَهَّدَنِي فِي النَّاسِ مَعْرِفَتِي بِهِمْ
وَطُولُ اخْتِبَارِي صَاحِبًا بَعْدَ صَاحِبٍ
فَلَمْ تُرِنِي الْأَيَّامُ خِلَاءً يَسُرُّنِي
بَوَادِيهِ إِلَّا سَاءَنِي فِي الْعَوَاقِبِ
وَلَا صِرْتُ أَدْعُوهُ لَدَفْعِ مَلَمَةٍ

من الدهر إلا كان إحدى النوائبِ

অর্থ: ‘সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা ও মানুষের আসল পরিচয় আমাকে তাদের থেকে বিমুখ করেছে।’

জীবনে এ যাবৎ কাল এমন কোনো বন্ধুর দেখা পেলাম না, যার ওপর ভরসা করতে পারি, যাকে দেখে আশ্বস্ত হতে পারি।

যাকেই অন্তরঙ্গ ও পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মনে হয়েছে তার সাথে পরিণতি খুব একটা সুখকর হয়নি। চরম বিপদের মুহূর্তে আমি তার সাহায্য প্রত্যাশা করেছি। কিন্তু তার স্বার্থপরতা আমার সামনে নতুন বিপদ দাঁড় করিয়েছে।’

বার্ধক্য

বার্ধক্য একটি স্বাভাবিক জৈবিক ঘটনা। মস্তুর ও আনুক্রমিক হারে এগিয়ে আসা দৈহিক অবক্ষয়। একটা অবধারিত জৈবিক বাস্তবতা। যা প্রতিরোধ করার কিংবা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কারো নেই।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও পৌঢ়ত্বের পর বার্ধক্যও জীবনের একটি পটভূমি। সর্বশেষ চূড়ান্ত পটভূমি। জীবনের এই স্বতঃসিদ্ধ চিত্রটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ

الْقَدِيرُ﴾ [الروم: ৫৬]

অর্থ: 'আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি শুরু করেছেন দুর্বল অবস্থা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, আবার শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।' (রুম, ৩০: ৫৪)

বার্ধক্যের পরিণতিতে ব্যক্তি স্মৃতিশক্তি হারাতে থাকে। তার দৈহিক শক্তি ক্ষয়িত হতে তাকে। উচ্ছল প্রাণবন্ত জীবন হারাতে থাকে তার গতিময়তা। একপর্যায়ে এসে ব্যক্তি মানসিক বিকারগ্রস্ততা ও অপ্রকৃতিস্থতার শিকার হয়। পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-স্বজন তার সংস্পর্শে বিরক্তি বোধ করে। তার থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। সে দূরত্ব ঈষৎ উপেক্ষামূলক ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

দীর্ঘ জীবনের শক্তি ও সঞ্চয় ব্যয় করে ব্যক্তি যে সাজানো সংসার গড়ে তুলেছে, জীবনের চরম সংকটকালে এসে যখন সে সংসারের লোকদের একে

একে অনেককে দূরে সরে যেতে দেখে তখন তাকে চরম মানসিক দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা, সর্বাঙ্গীণ একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা ঘিরে ধরে। বৃদ্ধ লোকটি সুন্দর সাবলীল, শ্রদ্ধা ও সহায়তাপূর্ণ জীবনের অস্তিত্ব সংকটের তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার হয়। এ তিক্ততার দায় আমাদের; চারপাশের সমাজের।

জীবনের পটভূমিতে একজন বৃদ্ধের প্রতি আমাদের করণীয় কী? বার্ধক্যকালীন সমস্যাগুলোর প্রকৃত সমাধান কী?

সমাধান:

১. বৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতি পরিবার-পরিজনের পক্ষ থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তার সাথে সযত্ন ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-বিশ্রামের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। শরীয়তের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের মতো এটিও একটি মহৎ ইবাদত।
২. বৃদ্ধ ব্যক্তির মন-মানসিকতা ও সুযোগ-সুবিধানুযায়ী উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। কেননা বার্ধক্য একটি জৈবিক অবক্ষয়কাল। যখন ব্যক্তির বিশেষ সেবায়ত্ন ও পরিচর্যা আবশ্যিক।
৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, দাতব্য সংস্থা কর্তৃক কিংবা সামাজিক উদ্যোগে বৃদ্ধদের জন্য স্বাস্থ্যালয় ও পরিচর্যা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।
৪. বৃদ্ধ লোকদের স্বাস্থ্য-সক্ষমতা ও মন-মানসিকতার উপযোগী একটি দৈনন্দিন রুটিন প্রস্তুত করতে হবে। সে মোতাবেক তারা হাঁটাচলা করবেন। সাধ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী যিকির, তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হবেন।
৫. বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সবসময় ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক চলতে হবে। যেকোনো ধরনের সমস্যা অনুভব করামাত্র ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা কর্তব্য। রোগ শনাক্ত হওয়ার পর যথোপযুক্ত চিকিৎসা গ্রহণ করা আবশ্যিক।
৬. বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে কখনো বাকবিতণ্ডা রেষারষি করা যাবে না। কোনো অবস্থাতেই তাদের ত্যক্ত-বিরক্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا»

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তিরমিজী, ৪/৩২১)

৭. বৃদ্ধদের প্রতি সদয় সহানুভূতিশীল হতে হবে। যদূর সম্ভব, সহমত পোষণ করে তাদের ইচ্ছা ও অভিমতের মূল্যায়ন করতে হবে। তাদের মন জয় করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।
৮. স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও দেহের পরিচর্যার মাধ্যমে বার্ধক্য নিয়ন্ত্রণ করা ও বৃদ্ধ বয়সে সুস্থ থাকা সম্ভব। এর জন্য আবশ্যিক হলো স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা এবং রুটিন মাসিক জীবনযাপন করা।
৯. দেহমনে সুস্থ-সবল থাকার জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা ও ব্যায়াম করতে হবে। বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে-এমন সমস্ত কাজ যেমন: ধূমপান, তৈলাক্ত খাবার খাওয়া ও দুশ্চিন্তা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। সর্বোপরি সুস্থ মন-মানসিকতা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সবকিছু পরিহার করা আবশ্যিক।
১০. জ্ঞাতব্য যে, দীর্ঘ জীবন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিরাট নিয়ামত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর একনিষ্ঠ খাদেম আনাস (রা.)-এর জন্য দীর্ঘ জীবন কামনা করে দু'আ করেছেন। অন্যত্র রাসূল ﷺ বলেছেন:

«وَأَنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ»

অর্থ: 'মানুষ দীর্ঘজীবী হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওবা করার তাওফিক দান করা অন্যতম সৌভাগ্য।' (মুসনাদে আহমাদ, ২২/৪২৬)

১১. নামাযের জামাতে যদি বয়স্ক ও বৃদ্ধ লোক উপস্থিত থাকে তবে ইমাম সাহেবের কর্তব্য হলো, অতি দীর্ঘায়িত না করে সংক্ষিপ্তভাবে নামায শেষ করা। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এমনটিই আদেশ করেছেন।
১২. বার্ধক্য প্রলম্বিত করার জন্য এবং বার্ধক্যের ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত থাকার লক্ষ্যে প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে। অবশ্যই মসজিদে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে

হবে। এ আমলটিতে একই সাথে দু'টি কল্যাণ নিহিত। প্রথমত, জামাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার সওয়াব হাসিল হবে। দ্বিতীয়ত, ডাক্তার যে প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটা-চলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন তা সহজেই কার্যকর হবে।

১৩. পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের সংস্পর্শে থাকতে হবে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। অকাল বার্ধক্য প্রতিরোধের জন্য এটি একটি বাস্তবানুগ ও কার্যকর পন্থা। যা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সুপ্রমাণিত।

১৪. যেকোনো ধরনের মানসিক চাপমুক্ত থাকতে হবে। মানসিক চাপে ভোগার অন্যতম কারণ হলো আসন্ন ভবিষ্যৎ নিয়ে অজানা আশঙ্কায় ভোগা। হাতছাড়া হওয়া বিষয়ে আক্ষেপ-অনুতাপ করা এবং কোনো ক্ষেত্রে বিফল হয়ে দুঃখ-কষ্টে ভেঙ্গে পড়া।

১৫. স্বাস্থ্য-সবলতা অনুযায়ী নিয়মমাফিক রোযা রাখতে হবে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা ও জরিপে প্রতীয়মান হয়েছে, দৈনিক উদ্দীপনা ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধির জন্য রোযা অন্যতম কার্যকর উপায়। এর মাধ্যমে বার্ধক্য প্রলম্বিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

পরিশিষ্ট:

❖ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ»، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» (سنن الترمذي ت شاكر) ০৬৬/ ৬

অর্থ: জনৈক সাহাবি আরজ করলেন: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: 'যে ব্যক্তি (যুগপদ) দীর্ঘজীবী ও নেক আমলকারী।' সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন: 'সবচেয়ে খারাপ লোক কে?' রাসূল ﷺ বললেন: 'যে লোক (যুগপদ) দীর্ঘজীবী ও বদ আমলকারী।' (তিরমিজী, ৪/৫৬৬)

- ❖ বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের প্রবক্তা ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘দৈহিক বার্ধক্যের চেয়ে মানসিক বার্ধক্যই বেশি প্রকট।’

- ❖ বিশিষ্ট মিশরীয় চিন্তাবিদ ও লেখক মোস্তফা মাহমুদ (১৯২১-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ) বলেন:

‘মনে রাখুন, যৌবনই হলো জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান পুঁজি। তাই যৌবনে এমন পাথেয় সঞ্চয় করুন, বার্ধক্যে যা আপনার জন্য সহায়ক হবে।’

রিবা

‘রিবা’ অর্থাৎ, সুদ অন্যতম কবীরা গুনাহ। জঘন্যতম অর্থনৈতিক অনাচার ও সর্বব্যাপী ধ্বংসাত্মক।

‘রিবার’ পরিচয় ও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন:

‘পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হলো ‘রিবা’।’

রিবা দু’ প্রকার:

এক. ‘রিবার’ প্রথম প্রকারকে মেয়াদি সুদ বা জাহেলি যুগের সুদ বলা হয়। হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় ‘রিবান নাসিআ।’ ‘রিবা’র এ প্রথম প্রকারটা সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত। তাই এটাকে ‘রিবাল কুরআন’ও বলা হয়।

দুই. ‘রিবা’র দ্বিতীয় প্রকারকে বর্ধিত সুদ বলা হয়। আরবিতে এই প্রকারটাকে একাধিক নামে নামকরণ করা হয়। যথা : রিবাল ফজল, রিবান নাক্দ ও রিবাল বাই ইত্যাদি।

সুদের এ প্রকারটি কুরআনের ভাষ্য দ্বারা সাব্যস্ত নয়; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই এটাকে রিবাল হাদিসও বলা হয়।

‘রিবান নাসিআ’ বা মেয়াদি সুদ: সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক আলোচিত রিবা হলো মেয়াদি সুদ। পবিত্র কুরআনে এ প্রকার সুদকে সরাসরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই একে রিবাল কুরআন বলা হয়।

জাহেলি যুগের লোকেরাও এটাকে সুদ বলেই বিশ্বাস করত। সে-বিবেচনায় এটাকে রিবাল জাহেলিয়াও বলা হয়। আবু বকর জাসসাস (রহ.)-এর যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন :

‘মেয়াদের ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের শর্তে যে ঋণ দেওয়া হয় তাকে রিবান নাসিআ বা মেয়াদি সুদ বলা হয়।’

‘রিবাল ফজল’ বা বর্ধিত সুদ: কিছু পণদ্রব্য তার সমজাত দ্রব্যের বিনিময়ে লেনদেন করার সময় অতিরিক্ত হিসেবে যা গ্রহণ করা হয় তাকে ‘রিবাল ফজল’ বলে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা ‘রিবা’ বা সুদকে হারাম করেছেন এবং সুদিকারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদী লেনদেনের লেখক ও সাক্ষীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন। কেননা সুদ অর্থ-সম্পদের বরকত নষ্ট করে দেয়। বান্দার নেক আমল বরবাদ করে ছাড়ে। দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা ও সমবন্টনের ভিত্তি ধসিয়ে দেয়। এছাড়াও ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক অন্যায়-অনাচারের রাস্তা খুলে দেয়।

বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার জঘন্য ও নিকৃষ্ট দিক হলো ‘রিবা’ বা সুদ। যা বিত্তবানদের বিত্তবৈভব আরও বহুস্তরে বৃদ্ধি করে। আর দরিদ্রকে দারিদ্র্যের চরমে ঠেলে দেয়।

তাই সুদ বর্জন করা ও সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। কিন্তু তার উপায় কী? এ সংকট নিরসনের প্রকৃত পথ কী?

সমাধান:

১. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে হবে। সুদের নিষিদ্ধতা সংবলিত কুরআন-সুন্নাহর বিধান চর্চা করতে হবে। বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি মনে রাখতে হবে:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ১৩০]

অর্থ: ‘হে মুমিনগণ! তোমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে সুদ খেও না এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।’ (আলে-ইমরান, ৩: ১৩০)

২. সতর্ক ও সচেতন হোন, রাসূল ﷺ যাদের ওপর লা'নত করেছেন তাদের দলে না शामिल হয়ে যান। জাবের বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত:
 «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (صحيح مسلم) ১২১৭/ ৩
 অর্থ: রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদখোর, সুদি লেনদেন লিপিবদ্ধকারী ও এর সাক্ষরদের অভিসম্পাত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তারা সবাই সমান (অপরাধী)।' (মুসলিম, ৩/১২১৯)
৩. সুদমুক্ত হালাল লেনদেন করতে হবে। তাতেই প্রকৃত কল্যাণ ও বরকত নিহিত। সুদি ও হারাম লেনদেন পরিহার করুন। তাতে যত অকল্যাণ ও অনিষ্টের ছড়াছড়ি।
৪. বিশ্বাস করুন, আপনি আপনার সম্পদের স্থায়ী মালিক নন। এ অর্থবিশ্ত চিরকাল আপনার কাছে সঞ্চিত থাকবে না। অন্যের হাত ঘুরে তা যেমন আপনার মালিকানাধীন হয়েছে তেমনই আপনার হাত হয়ে অন্যের মালিকানায় চলে যাবে। এটাই অর্থ-সম্পদের অবধারিত নীতি। সুতরাং আপনি শুধু শুধু অর্থসম্পদকে সুদের দোষে দূষিত করতে যাবেন কেন?
৫. অতীতে যে সমস্ত জাতিবর্গের মধ্যে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যে সমাজে এখনও সুদি কারবার বর্তমান তাদের অবস্থা যাচাই করে দেখুন-রিবা ও সুদের কারণে তারা কী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও অধঃগতির শিকার হয়েছে! কী ভয়াবহ আর্থিক অবিচার-অনাচারে জর্জরিত হয়েছে!
৬. সমাজের জ্ঞানীজন ও সুধিমহলের পক্ষ থেকে মানুষকে সতর্ক করতে হবে। সুদের জঘন্যতা ও নিষিদ্ধতা সংবলিত কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান সম্পর্কে লোকদের অবহিত করতে হবে।
৭. মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তা'আলা কোনো সুদখোরের দু'আ কবুল করেন না। কেননা তার খাদ্য হারাম পথে উপার্জিত। তার পোশাক-পরিচ্ছদ অবৈধ টাকায় ক্রয়কৃত। তার দেহের রক্তের সাথে হারাম সম্পদ মিশ্রিত। এমন ব্যক্তির দু'আ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ،
وَعُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟" (صحيح مسلم) ১/ ৭০৩

অর্থ: (হারাম ভক্ষণকারী আল্লাহর দরবারে দু'আ করে বলে,) ইয়া রাব্বি! ইয়া রাব্বি! (হে আমার রব! হে আমার রব!) অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, তার পোশাক-পরিচ্ছেদ হারাম, এমনকি তাকে হারাম খাওয়ানো হয়েছে। এমতাবস্থায় তার দু'আ কীভাবে কবুল হতে পারে? (মুসলিম, ২/৭০৩)

৮. মুক্তবাজার-নীতি চালু করে একপেশে ও স্বার্থকেন্দ্রিক অর্থনীতি বন্ধ করতে হবে।
৯. 'রিবা' ও সুদভিত্তিক ঋণব্যবস্থাকে মুনাফাভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রবর্তন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ ও রূপার মূল্যহারে টাকার নোটের মান নির্ধারণ করতে হবে।
১০. লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও হালাল উপার্জনে অনুপ্রাণিত করতে হবে। কেননা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই বাজার চাঙা হয়ে উঠবে এবং সুদের ভিত্তি ছেড়ে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীর মাঝে আর্থিক লেনদেন করা সহজতর হবে।
১১. শরীয়তে অনুমোদিত 'করজে হাসানা'^{৩৩}র গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনুধাবন করে সে নিয়মে ঋণ প্রদান করতে হবে। 'করজে হাসানা'র নীতি হলো, যে পরিমাণ অর্থ ঋণ প্রদান করা হয়েছে, ঋণগ্রহীতাকে তার সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করলেই ঋণ শোধ হয়ে যাবে। এর সাথে একআনা মুনাফাও অতিরিক্ত যোগ করতে হবে না।
১২. ঋণগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিশীল হতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বাস রক্ষা করাই হলো তার প্রধান কর্তব্য। পাশাপাশি ঋণদাতাকে সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে এবং অভাব-

^{৩৩} আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, সওয়াবের প্রত্যাশায়, কোনো প্রকার শর্তরোপ না করে যে ঋণ প্রদান করা হয়, তাকে 'করজে হাসানা' বা উত্তম ঋণ বলা হয়।

অনাটনের ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধের সুযোগ দেওয়ার মানসিকতা ধারণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা:

﴿وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ২৮০]

অর্থ: ‘কোন (দেনাদার) ব্যক্তি যদি অসচ্ছল হয়, তবে সচ্ছলতা লাভ পর্যন্ত তাকে অবকাশ দিতে হবে। আর যদি সদাকাই করে দাও, তবে তোমাদের পক্ষে সেটা অধিকতর শ্রেয়- যদি তোমরা উপলব্ধি কর।’ (বাকারা, ২: ২৮০)

পরিশিষ্ট:

❖ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ২৭৫]

অর্থ: ‘যারা সুদ খায় (কিয়ামতের দিন) তারা সেই ব্যক্তির মত উঠবে, শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল বানিয়ে দিয়েছে। এটা এজন্য হবে যে, তারা বলেছিল, ‘বিক্রিও তো সুদেরই মত হয়ে থাকে।’ (বাকারা, ২: ২৭৫)

❖ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَجُلًا يَسْبَحُ فِي نَهْرٍ وَيُلْقِمُ الْحِجَارَةَ، فَسَأَلْتُ مَا هَذَا؟ فَقِيلَ لِي: آكَلُ الرَّبَا” (مسند أحمد) ২৭৩/ ৩৩

অর্থ: ‘মেরাজের রাতে এক লোককে দেখি রক্তের নদীতে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। তাকে পাথর গলাধঃকরণ করানো হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম: ‘কে এই লোক?’ বলা হলো: ‘সুদখোর।’ (মুসনাদে আহমাদ, ৩৩/২৯৩)

গুনাহ

গুনাহ হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ-নিষেধবহির্ভূত কোনো কাজ করা। গুনাহর দু'টি স্তর : সগীরা ও কবীরা।

কবীরা গুনাহ: যে সমস্ত পাপাচারের কারণে ইহকালেই শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তি 'হুদ' ওয়াজিব হয়। যেমন: চুরি, ডাকাতি, হত্যা, যিনা-ব্যভিচার। এছাড়াও যে সমস্ত অন্যায়-অনাচারের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কঠোর সতর্কবার্তা উচ্চারিত হয়েছে এবং কুরআন-সুন্নাহয় আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অভিশাপ এবং জাহান্নামের কঠিন আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

সগীরা গুনাহ: কবীরা গুনাহ ছাড়া বাকি সমস্তই সগীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ

وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ৩২]

অর্থ: 'যারা ছোট খাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার।' (সূরা নাজম, ৫৩: ৩২)

গুনাহ ও নাফরমানির কারণে পরকালীন শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়াগুণে যাকে ক্ষমা করেন, তার বিষয় ভিন্ন। এছাড়াও দৈহিক, মানসিক ও ইহজাগতিক প্রেক্ষাপটে গুনাহ ও পাপাচারের নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাব বর্তমান। বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, দুঃখ-দুর্দশা, রিযিকের সংকীর্ণতা, আর্থিক অভাব-অনাটন

থেকে শুরু করে দুর্ভিক্ষ, খরা, অনাবৃষ্টি যাবতীয় সংকট ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের নেপথ্যে মানুষের গুনাহ-নাফরমানি, পাপাচার-অনাচারই হলো অন্যতম কারণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ৬১]

অর্থ: 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন স্থলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে।' (রুম, ৩০: ৪১)

ইহকালে ও পরকালে শান্তি ও সৌভাগ্য অর্জনের জন্য গুনাহ ও নাফরমানিমুক্ত জীবনযাপনের বিকল্প নেই। কিন্তু উপায় কী? পাপাচারমুক্ত জীবনযাপনের সরল পথ কী?

সমাধান:

১. প্রথমেই আসল সমস্যা ও মূল ব্যাধিটা শনাক্ত করতে হবে। আর তা হলো, অন্যায় স্বীকার করা। কৃত পাপকর্মকে পাপাচার বলে মেনে নেওয়া। এক্ষেত্রে অহমিকা ও দাঙ্গিকতা প্রদর্শন করা, কৃত অন্যায়ের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করা কিংবা অন্যায়কে ন্যায় বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা সমীচীন নয়।
২. গুনাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনো নেক আমল করে খালেস দিলে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করতে হবে। এটাই পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَكَمَ
يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ * أُولَٰئِكَ جَزَاءُ ۚ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ مِنْ
رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ

الْعَمِلِينَ﴾ [آل عمران: ১৩৫, ১৩৬]

অর্থ: 'আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না।

এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!' (আলে-ইমরান, ৩: ১৩৫-১৩৬)

৩. তাওবা কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। এ শর্তগুলো হলো, কৃত নাফরমানির কারণে অনুতপ্ত হওয়া, ভবিষ্যতে এমন অন্যায় করবো না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া এবং যাবতীয় গুনাহ ও নাফরমানি থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকা।
৪. সবসময় কোনো নেক আমল ও উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকুন। কর্মমুখর জীবনযাপন করুন। কেননা অবসর হলো শয়তানের সুবর্ণ সুযোগ। অবসরের সময়গুলোতে শয়তান মানুষের মনে নানা ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণা ঢুকিয়ে দেয়। তাকে নানা অন্যায়-অনাচারে প্ররোচিত করে।
৫. দৈহিক পবিত্রতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য বেশি বেশি দু'আ করুন। কেননা দু'আ হলো মুমিনের ঢাল ও অস্ত্র। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে দু'আর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বলেছেন:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَانِ﴾ [البقرة: ১৮৬]

অর্থ: 'আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে।' (বাকারা, ২: ১৮৬)

৬. বেশি বেশি তাওবা করুন। সর্বদা দু'আ ও ইস্তিগফারে মশগুল থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন গুনাহমুক্ত মাসুম। জীবদ্দশায়ই তাঁর আগে-পরের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তারপরও প্রতিদিন তিনি

সন্তরবার ইস্তিগফার করতেন। অন্য একটি হাদীসের ভাষ্যমতে একশতোবার ইস্তিগফার করতেন।

৭. পরম দয়ালু, চিরদয়াময় আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমতের কথা স্মরণ করুন। তিনি সর্বদা সদাচারীদের পাশেই রয়েছেন। তাঁর অপার রহমতই বান্দার শেষ ভরসা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

অর্থ: 'বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সত্তার ওপর সীমালংঘন করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (যুমার, ৩৯: ৫৩)

৮. শয়তানের ওয়াসাওয়াসা ও প্ররোচনা থেকে মুক্ত থাকার লক্ষ্যে এবং গুনাহ ও নাফরমানি ছেড়ে আল্লাহর আনুগত্যে থাকার জন্য দান-সদকা করুন। কত নাফরমান অবাধ্য বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দান করেছেন শুধু এ কারণে যে, সে গরিব-মিসকিনদের দান করেছে, ক্ষুধার্ত-নিরন্নকে আহার দান করেছে। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেছে।

৯. অন্যায় ও নাফরমানির মন্দ পরিণতি সম্পর্কে একবার ভাবুন। এর কারণে কী কঠিন বিষণ্ণতা ও মানসিক অস্থিরতার শিকার হতে হয়! এছাড়াও কবর ও পরকালের ভয়ংকর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার সতর্কবাণী স্মরণ করুন:

﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النمل: ৯০]

অর্থ: 'আর যে-কেউ মন্দকর্ম নিয়ে আসবে, তাদেরকে উল্টো-মুখো করে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদেরকে তো কেবল তোমাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়া হবে।' (নামল, ২৭: ৯০)

১০. কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার দু'আগুলো নিয়মিত পাঠ করুন। শরীয়তের পরিভাষায় এ দু'আগুলোকে **أَذْعِيَّةٌ مَّأْتُورَةٌ** (আদইয়ায়ে মা'সূরা) বলা হয়। শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও নফসের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে এ দু'আগুলো হলো আপনার রক্ষাকবচ।

১১. 'আদইয়ায়ে মা'সূরা'র মধ্যে হতে এ দু'আটি বারবার পাঠ করুন:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ ۖ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ৮৭]

অর্থ: '(হে আল্লাহ) আপনি ছাড়া নেই কোনো ইলাহ। আপনি চিরমহান। আমি তো ভুল করে ফেলেছি।' (আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এ দু'আটি পাঠ করতেন খালেস দিলে।

১২. তাওবা করার উসিলায় আল্লাহ তা'আলা আপনার গুনাহগুলোকে সাওয়াবে রূপান্তরিত করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এ প্রতিদানের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হোন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ

حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ৭০]

অর্থ: 'তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (ফুরকান, ২৫: ৭০)

১৩. একটিবার ভেবে দেখুন তো, গুনাহ-নাফরমানি ও অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত অবস্থায় যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহলে কোন মুখে আপন রবের সামনে দাঁড়াবেন?

১৪. নজর হেফাজত করুন এবং সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ

أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: ৩০]

অর্থ: ‘মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পছন্দ। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।’ (নূর, ২৪: ৩০)

১৫. আত্মশুদ্ধিমূলক ওয়াজ-নসিহতসংবলিত বই পুস্তক পাঠ করুন। নেককার ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের ওয়াজ-নসিহত শুনুন। তা আপনাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করবে এবং আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের পথের পাথেয় হবে।

১৬. অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকুন। যারা আপনাকে গুনাহ ও নাফরমানির দিকে নিয়ে যায়, যাদের সঙ্গদোষ আপনাকে পাপাচারের পথে ধাবিত করে, তাদের এড়িয়ে চলুন।

সৎ সঙ্গ গ্রহণ করুন। সদাচারী নেক আমলকারী সাথি-সঙ্গী, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অবলম্বনের ক্ষেত্রে তারা হবে আপনার একান্ত সহযোগী। কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের পথে একনিষ্ঠ সফরসঙ্গী।

১৭. গুনাহ ও নাফরমানির যতো উপলক্ষ আছে, তা থেকে দূরে থাকুন। যে সমস্ত বিষয় ও কার্যকলাপ ব্যক্তিকে অন্যায়ের পথে ঠেলে দেয়, তা পরিহার করুন।

১৮. গুনাহ ও পাপের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বেশি বেশি নেক আমল করুন। কেননা ইবাদত ও সদাচার বান্দার পাপরাশি মোচন করে। রাসূল ﷺ বলেছেন:

وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. (سنن الترمذي) ৩০০/ ৬

অর্থ: ‘গুনাহ করার পর একটি নেক আমল করো। নেক আমলটি তোমার পাপমোচন করে দিবে।’ (তিরমিজী, ৪/৩৫৫)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ১১৬]

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়।’ (হুদ, ১১: ১১৪)

১৯. সময়মতো জামাতের সাথে নামায আদায়ে যত্নবান হোন। নামাযের ফরয ওয়াজিব হতে শুরু করে প্রতিটি সুন্নাত ও মুস্তাহাব যথাযথভাবে পালন করুন। যাবতীয় অন্যায় ও নাফরমানির বিরুদ্ধে নামাযই হলো শ্রেষ্ঠ প্রতিবন্ধক। আমীরুল মু‘মিনীন ওমর (রা.) বলেছেন:

‘যে ব্যক্তি নামাযে অবহেলা করবে, জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রেও সে ভুল-ত্রুটি করবে।’

প্রতিটি কাজে পবিত্র কুরআনে নামাযের প্রভাব ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ৬০]

অর্থ: ‘নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।’

(আনকাবুত, ২৯: ৪৫)

২০. মাতা-পিতার সদাচারী হোন। এর বদৌলতে আল্লাহ তা‘আলা গুনাহ মাফ করেন, বিপদ-আপদ দূর করেন এবং যাবতীয় অকল্যাণ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন।

২১. সবসময় মনে রাখুন, আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে দেখছেন। ঘরে-বাইরে, রাতের অন্ধকারে এবং দিনের আলোতে, গোপনে-প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় তিনি আপনাকে দেখছেন। আপনার কথা-কাজ এমনকি মনের গহীনের সুপ্ত ইচ্ছাটিও তাঁর কাছে গোপন নয়, তাঁর ইলমের বাইরে নয়। জীবনের যাবতীয় কুয়া-কলাপ আপনার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾

অর্থ: ‘তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তারা যা করে তা পরিবেষ্টন করে আছেন।’ (নিসা, ৪: ১০৮)

পরিশিষ্ট:

- ❖ ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন:

‘নিশ্চয় আপনার এমন কিছু গুনাহ আছে, যা শুধু আপনি জানেন, এবং আপনার রব জানেন। আপনি খুব করে চান, আল্লাহ তা‘আলা যদি আপনার সে গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিতেন! তাহলে আপনি নিজের সাথে হওয়া অন্যের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষমাগুণের প্রতিদানে আল্লাহ তা‘আলাও আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন।’

- ❖ ডেনমার্কের বিখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘ন্যায় ও কল্যাণ-বিচ্যুতিই হলো অন্যায়। হতাশা ও নিরাশা এ ভুলের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।’

- ❖ উনিশ শতকের ইংরেজ জীববিজ্ঞানী ও বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘যে ব্যক্তি নীতি-নৈতিকতা ও চারিত্রিক-শালীনতায় প্রতিশ্রুতিশীল, সে তার অতীতের কার্যকলাপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তার মধ্যে যা কিছু সংগত ও যথার্থ, তা অটুট রাখে। আর যা কিছু অসংগত অসমীচীন, তা পরিহার করে।’

বয়ঃসন্ধিকাল

বয়ঃসন্ধিকাল মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। জীবনের এ পর্যায়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন সংবেদনশীল।

বয়ঃসন্ধিকাল ১৪ কি ১৫ বছর বয়স হতে শুরু হয়ে ২১ থেকে ২২ বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়ে থাকে। এ সময়ে ছেলে-মেয়েরা দৈহিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে একটি নতুন জগতে প্রবেশ করে। মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনার জগতে তারা নিত্যনতুন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়।

এ সময়টাতে ছেলে-মেয়েদের স্বভাব-চরিত্রে উচ্ছলতা, দূরস্তুপনা ও অস্থিরচিন্তা প্রবল হয়ে উঠে। হেঁয়ালিপনা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বেপরোয়া মনোভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কারো অভিভাবকত্ব ও শাসন ভালো লাগে না। সর্বত্র কর্তৃত্ব ফলানোর মানসিকতা এবং যেকোনো ক্ষমতা ও শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহপ্রবণতা কাজ করে। মোটকথা, সবসময় একটা দুর্বিনীত মনোভাব তাদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে থাকে। ফলে মা-বাবা ও অন্যান্য অভিভাবকদের সাথে বনিবনা হতে চায় না। সময়-অসময়ে খিটমিট লেগে থাকে। অভিভাবকগণ তাদের আচার-আচরণে উৎকণ্ঠা বোধ করেন।

বয়ঃসন্ধি হলো মানুষের দৈহিক, মানসিক ও চিন্তানৈতিক পরিবর্তনের সন্ধিস্থল। এ সময়টাতে ছেলে-মেয়েরা হয়ে উঠে আবেগপ্রবণ। উদ্দাম চঞ্চল। তাদের আবেগ-উদ্যমতা যদি সঠিক পথে পরিচালিত না হয়, এর যথার্থ পরিচর্যা যদি না হয়, দৈহিক ক্ষয়ক্ষতি হতে শুরু করে মানসিক ও আদর্শিক বিচ্যুতি ও অবক্ষয় সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

উন্নত জীবন গড়ার লক্ষ্যে বয়ঃসন্ধিকালের নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে বেঁচে থেকে এর সযত্ন পরিচর্যা অত্যাবশ্যিক। এ লক্ষ্যে আমাদের করণীয় কী? বয়ঃসন্ধিকালের ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কী?

সমাধান:

১. সন্তানদের সাথে অভিভাবকদের বন্ধুসুলভ বোঝাপড়া থাকতে হবে। একজন মহান পিতা হওয়ার পাশাপাশি নিজেকে সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর রূপে দাঁড় করাতে হবে। তাদের সাথে একান্ত আলোচনা-পর্যালোচনায় তাদের মানসিক মানচিত্র পাঠ করতে হবে। তাদের চিন্তা-ভাবনা ও বৌদ্ধিক-প্রবণতা অনুধাবন করতে হবে।
২. একজন অভিভাবক তার পরিবারের শুধু অর্থের জোগানদাতাই নন; সন্তানের আদর্শিক শিক্ষা ও নৈতিক দীক্ষার ব্যাপারেও তাকে সজাগ-সচেতন হতে হবে। সে লক্ষ্যে সন্তানের ওপর প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধান বজায় রাখা কর্তব্য। বয়ঃসন্ধির আবেগ-উদ্দীপনায় সন্তান যেন কোনো অন্যায়ে জড়িয়ে না পড়ে, কোনো পাপচারে লিপ্ত না হয়ে পড়ে—সে দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।
৩. সন্তানদের সাথে অভিভাবকদের পর্যাপ্ত সময় কাটাতে হবে। সন্তানের জন্য মা-বাবার স্নেহ ও হিতাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সংস্পর্শের বিকল্প হতে পারে না। সৎ সঙ্গ ব্যক্তিকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। আর অসৎ সঙ্গ তাকে অন্যায়-অনাচারের পথে ধাবিত করে।
৪. সন্তানদের দ্বিনি শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। তাদের মনে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসা জাগরুক করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নামায, রোযা, যিকির, তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতে অনুপ্রাণিত করা আবশ্যিক।
৫. অবসরের সময়গুলোতে সন্তানদের কোনো উপকারী ও কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। কেননা অবসর হলো শয়তানের সুবর্ণ-সুযোগ। এ সুযোগে সে তার পাওনা আদায় করে নেয়।
৬. সন্তানদের ক্রীড়াচর্চায় উৎসাহিত করতে হবে। শরীরচর্চা ও ক্রীড়াচর্চামূলক উদ্যোগ-আয়োজনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যেন ভবিষ্যত বিনির্মাণের জন্য তারা নিজেদের সুস্থ-সবল, দৃঢ় প্রত্যয়ী ও উঁচু মনোবলের অধিকারীরূপে গড়ে তুলতে পারে। আল্লাহ তা'আলার নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অধিক প্রিয়।

৭. বয়ঃসন্ধিকালে কোনো অপরাধের জের ধরে সন্তানদের সাথে বাকবিতণ্ডায় জড়ানো, তাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়া কিংবা জনসম্মুখে শাসানো-এর কোনোটাই সমীচীন নয়। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই অভিভাবকদের এমন আচরণ সন্তানের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপূর্ণ শাসন ও উপদেশমূলক অনুশাসন অধিক বাঞ্ছনীয়। এর প্রভাব ও সুফল সুদূরপ্রসারী।
৮. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের বোঝাতে হবে, এখন সে আর আগের মতো ছোট শিশু-বালক নেই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করা কর্তব্য। তাকে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, দায়বদ্ধতা ও প্রতিশ্রুতিশীলতার ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে।
৯. প্রচলিত গদবাঁধা প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির বাইরেও সন্তানদের কিছু বৈধ শখ, ইচ্ছা ও আবেগ-অনুভূতি থাকতে পারে। সাধ্যমতো তাদের সে আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন করতে হবে।
১০. প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডির বাইরে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে সন্তানদের সুযোগ করে দিতে হবে-তারা যেন নিজ চেষ্টা-প্রচেষ্টায় আগামীর পথ সুগম করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু ভুলচুক হলেও পরবর্তী সময়ে সে তা কাটিয়ে উঠার সুযোগ পাবে। তা ছাড়া ক্রটি-বিচ্যুতি মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ করে তুলে।
১১. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের দীর্ঘ সময়ের জন্য একাকী অবস্থান করতে দেওয়া নিরাপদ নয়। অভিভাবকের তত্ত্বাবধানের বাইরে অনেক অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে তারা ভ্রষ্ট চিন্তা-চেতনা ও বিকৃত মানসিকতার শিকার হতে পারে। ধাবিত হতে পারে অন্যায় অপকর্ম ও অশালীনতার পথে।
১২. লেখাপড়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে খুঁজে খুঁজে সন্তানদের ভুল ধরার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কেননা অভিভাবকদের এমন আচরণ সন্তানদের মনে নেতিবাচক মানসিকতা জন্ম দেয়। একপর্যায়ে তার মনোবল ও আত্মবিশ্বাসে ফাটল সৃষ্টি করে। তারা ভালো কিছু করে সফল হওয়ার আগ্রহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলে।

১৩. লেখাপড়া, খেলাধুলা, সামাজিক কাজকর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে সন্তানদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকার প্রশংসা করতে হবে। এর ফলে তার আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। মনোবল ও আত্মবিশ্বাস পরিপুষ্ট হবে।
১৪. দশ বছর বয়সের পর সন্তানের বিছানা পৃথক করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (سنن أبي داود) ১/ ১৩৩

অর্থ: 'তাদের (সন্তানদের) বিছানা পৃথক-পৃথক করে দাও।' (আবু দাউদ, ১/১৩৩)

উত্তম হলো, প্রত্যেক সন্তান নিজ নিজ বিছানায় ঘুমানো।

১৫. একটি সুন্দর উপযুক্ত সময়ে পারিবারিক আলোচনা-পর্যালোচনায় বসতে হবে। সেখানে মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে ও পরিবারের সকল সদস্যকে অংশগ্রহণ করবে। প্রত্যেকে নিজের চিন্তা-ভাবনা ও আবেগ-অনুভূতির কথা ব্যক্ত করবে। পারিবারিক সমস্যা ও সংকট সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করবে। এভাবে পরিবারের মাঝে পরস্পর বোঝাপড়া সৃষ্টি হবে এবং একটি ইউনিট হিসেবে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ আরও গভীর ও প্রতিশ্রুতিশীল হবে।
১৬. সময় সময়ে সন্তানদের তিরস্কার ও ভর্ৎসনার মানসিকতা পরিহার করে তাদের কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। নির্ভয়ে নিঃসংকোচে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতি ব্যক্ত করার সুযোগ দিতে হবে।
১৭. বাবাকে অবশ্যই পুত্রসন্তানদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে হবে। তাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে হবে। কথাবার্তা ও আচার-আচরণে সন্তানের সঙ্গে এতটা সহজ-সাবলীল ও আন্তরিক হবেন, যেন তিনি সন্তানের সমবয়সী ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সন্তানকে সাথে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, সঙ্গে করে মসজিদে নিয়ে যাওয়া এবং তার মধ্যে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা—এ সমস্ত ক্ষেত্রে পিতাকে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৮. প্রত্যেক মা'কে তার মেয়ের সাথে আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ হতে হবে। মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালে তাকে বোঝাতে হবে, এখন সে আর আগের মতো ছোট্ট খুকিটি নেই। জীবনের অনিবার্য ধারায় সে এখন নতুন ধাপে পদার্পণ করেছে। বয়সের একটা স্বীকৃত পর্যায়ে এসে পৌঁছাচ্ছে।

এ পর্যায়ে তাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাকে সবচেয়ে দায়িত্ববানরূপে গড়ে তুলতে হবে।

১৯. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। পাক-পবিত্রতা, নামায, রোযা, সহীহ-আকিদা ও ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকালের আবেগ-উদ্দীপনার সূচনালগ্নে ছেলে-মেয়েদের যদি ধর্মীয় ভাবধারা ও অনুশাসনের ভিত্তিতে গড়ে তোলা না হয়, তাহলে আজীবন এই ভুলের মাশুল দিতে হবে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ কিয়ামত দিবস, যে দিন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়া দান করবেন। হাদীসের ভাষ্যমতে তাদের একজন হলো:

"وَشَابُّ نَشَأً فِي عِبَادَةِ اللَّهِ". (صحيح البخاري ১/ ১১১)

অর্থ: 'এমন যুবক, যার জীবন গড়ে উঠেছে আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে।' (বুখারী, ২/১১)

- ❖ বিখ্যাত আরব কবি আবুল আতাহিয়া (১৩০-২১১ হি.) বলেছেন:

بَكَيْتُ عَلَى الشَّبَابِ بِدَمْعٍ عَيْنِي

فَلَمْ يُغْنِ الْبُكَاءُ وَلَا النَّحِيبُ

فَيَا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا

فَأُخِيرُهُ بِمَا صَنَعَ الْمَشِيبُ

অর্থ: 'বিগত যৌবনের কথা স্মরণ করে এখন আমি কেঁদে মরি। অনুতাপ-অনুশোচনার জ্বালায় পুড়ি। কিন্তু এ অনুশোচনা ও ক্রন্দন কি আমার কোনো কাজে এসেছে?

হায়! একদিন যদি যৌবন ফিরে পেতাম, তাকে বার্ষিক্যের করুণ পরিণতির কথা বলে দুঃখ ঘুচাতাম।'

- ❖ তাফসিরশাস্ত্রের ইমাম আবু জাফর তাবারী (রহ.) (২২৪-৩১০ হি.) যখন বয়সে আশির কোটা পেরিয়েছেন, তখন এক সফরে তিনি জাহাজ নোঙর করার পর লাফিয়ে নামলেন। তা দেখে তো তাঁর সফরসঙ্গী ও শাগরেদরা বিস্ময় কৌতূহলে থ হয়ে গেল। কয়েকজন বিস্ময় প্রকাশ করে মুখ ফুটে বলেই ফেলল:

‘অশতিপর হয়েও জাহাজের উঁচু পাটাতন থেকে কী করে লাফিয়ে নামা সম্ভব?’

- ❖ ইমাম তাবারী (রহ.) বললেন:

‘যৌবনে দেহের সবল সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আল্লাহর নাফরমানি থেকে মুক্ত রেখেছি। তাই আল্লাহ তা‘আলা আমাকে বার্ষিক্যের জরাগ্রস্ততা থেকে মুক্ত রেখেছেন।’

চিন্তানৈতিক প্রান্তিকতা

চিন্তানৈতিক ভ্রষ্টতা হলো, কথাবার্তায়, কাজকর্মে, আচার-আচরণে, মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায় মধ্যপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রান্তিকতার শিকার হওয়া। প্রাচীনকাল থেকেই চিন্তা-চেতনাগত প্রান্তিকতা ও ভ্রষ্টতা মানবজাতির মধ্যে সক্রিয় হয়ে আছে। বর্তমান বিশ্বে তা আরও জঘন্য ও প্রকট আকার ধারণ করেছে।

এ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রান্তিকতা ও চিন্তানৈতিক ভ্রষ্টতা নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। মধ্যযুগে ইউরোপের বৃহৎ জনগোষ্ঠী ও খ্রিষ্ট-ধর্মীয়-সমাজ চিন্তা-চেতনাগত চরম বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িতে মেতে উঠেছিল। গির্জা ও পাদরিদের অনুশাসন ও সুনীতি এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীর বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে যে সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, তার কবলে ইউরোপের জনগণ গির্জার অনুশাসন ছুড়ে ফেলে সর্বান্তঃকরণে পুঁজিবাদী অর্থনীতি আঁকড়ে ধরেছিল।

মুসলিম সমাজও প্রান্তিক চিন্তা-চেতনার আক্রমণ থেকে নিস্তার পায়নি। আজও মুসলিম বিশ্বের বহু জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে মানসিক ভ্রষ্টতা ও চিন্তার প্রান্তিকতা ভীষণ আকার ধারণ করেছে। একদল মুসলিম যুবক ও বুদ্ধিজীবীর দিল-দেমাগ ও বিবেক-মস্তিষ্ক প্রান্তিকতা ও মধ্যপন্থা থেকে বিচ্যুতির কালো খাবায় বিষাক্ত হয়েছে ওঠেছে। এরই জের ধরে যতো হানাহানি, রক্তপাত ও যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে চলেছে।

চিন্তা-চেতনার প্রান্তিকতা এমন মারাত্মক বিষয়, যা দেশ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যে কাউকেই বিষিয়ে তুলতে পারে। এর নিরন্তর ক্ষয় ও ক্ষতির শিকার যে কেউ হতে পারে।

চিন্তার ভ্রষ্টতা ও মানসিক প্রান্তিকতার অনেক নেতিবাচক প্রভাব বর্তমান। তা সরল স্বাভাবিক ও মানবিক ব্যক্তিত্বকে সমাজের চোখে ঘৃণিত পরিত্যাজ্য করে ছাড়ে। ফলে পরিবার-পরিজন থেকে শুরু করে সমাজের লোকেরা তার সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে। মানসিক দুর্দশা-হতাশা-নিরাশা তাকে প্রবলভাবে ঘিরে ধরে।

এত শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে প্রান্তিকতার নেতিবাচক প্রতিফল। সামাজিক অঙ্গনে এর ক্ষয়ক্ষতি আরও বহুগুণ বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। সমাজের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা সত্যচ্যুত ও ভ্রষ্ট করা থেকে শুরু করে, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিনাশ, পর্যায়ক্রমে দেশ, জনপদ ও জনগোষ্ঠীর ধ্বংস ও বরবাদির চূড়ান্ত করে ছাড়ে।

এই সর্বব্যাপী ধ্বংস ও বরবাদি থেকে বাঁচার জন্য চিন্তানৈতিক ভ্রষ্টতা ও প্রান্তিকতা দূর করে সুস্থ বিচারবোধ ও পরিমিতিসম্পন্ন মানসিকতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এর সঠিক উপায় কী? এ জটিল সমস্যার সরল সমাধান কী?

সমাধান:

১. ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে সমাজের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর বিজ্ঞ আলেমগণের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি শ্রেণির মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, নৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিতরূপে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামের মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধ সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা দিতে হবে।

এর বাইরেও নিজ উদ্যোগে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা ও সঠিক জ্ঞানার্জনের পথে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে। সুবোধ শিক্ষিত ও পরিশীলিত মন-মস্তিষ্কই পারে ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে।

২. কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামের ন্যায়ানুগতা ও মধ্যপন্থা প্রচার করা আবশ্যিক। এ ক্ষেত্রে প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়া হলো কার্যকর উপায়। বর্তমান প্রজন্মকে চিন্তা-চেতনার প্রান্তিকতা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শিক্ষা ও সচেতনতামূলক

কার্যক্রম প্রবর্তন করা কর্তব্য। সর্বোপরি দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি-দর্শনের আলোকে ভ্রষ্ট বিচ্যুত মানসিকতার অপনোদন করা আবশ্যিক।

৩. শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুস্থ মন-মানসিকতা ও বিশুদ্ধ চিন্তা-চেতনার চর্চা ও পরিচর্যা করতে হবে। প্রান্তিক বুদ্ধি-বিদ্যার নেতিবাচক প্রভাব ও ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের উদারতা ও মধ্যপন্থার দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। তবে উদারতার নামে যেন শিথিলতার চর্চা না হয়-সে দিকটিও গুরুত্বের সঙ্গে তত্ত্ববধান করতে হবে। ইসলাম উদারতাকে যতটা সমর্থন করে, শিথিলতাকে ঠিক ততটা ঘৃণা করে।

৪. যেকোনো পর্যায়ে প্রান্তিকতা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুপম আদর্শ গ্রহণই হলো শ্রেষ্ঠ উপায়। জীবনের প্রতি অধ্যায়েই তাঁর কর্মধারা ছিল শিথিলতা-অবহেলা, বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের দোষমুক্ত; মধ্যপন্থা ও ন্যায়ানুগতার গুণে অনন্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মতকে একই গুণের স্বীকৃতি প্রদান করে বলেছেন:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ১৪৩]

অর্থ: ‘(হে মুসলিমগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি।’ (বাকারা, ২: ১৪৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ» (سنن ابن ماجه ১০০৮/২)

অর্থ: ‘হে লোকসকল! দ্বীনের বিষয়ে তোমরা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্বপুরুষরা দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংস হয়েছে।’ (ইবনে মাযাহ, ২/১০০৮)

৫. কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে বিজ্ঞ এবং শরীয়তের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আলেম-সমাজের বাইরে অন্যদের ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। শরীয়তের দলিল-প্রমাণ ব্যতীত

হালাল-হারামের বিধান বলে দেওয়া এবং যত্রতত্র ফতোয়া প্রদান করার রীতি বন্ধ করতে হবে। যথার্থরূপে না জেনে-বুঝে যারা অনুমাননির্ভর ফতোয়া প্রদান করবে, তাদের জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকদের অনুপ্রাণিত করতে হবে, ধর্মীয় বিষয়ে তারা যেন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীনের দ্বারস্থ হয়।

৬. বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। বেকারত্বের কবলে ও কর্মহীন জীবনে যুবসমাজ নানা বিচ্যুতি ও প্রান্তিকতার শিকার হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ ও কার্যক্রম সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে, যেকোনো পেশা ও শ্রেণির মানুষ যেন নিজের অবসরে এখানে शामिल হতে পারে।
৭. মানুষের মাঝে সকল ভেদাভেদ ও শ্রেণিবৈষম্য নির্মূল করে সাম্য সম্প্রীতি ও ন্যায়ানুগতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জুলুম-অত্যাচার ও বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার পথ বন্ধ করে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ কায়ম করতে হবে। জাতিগত বিভেদ ও শ্রেণিবৈষম্যের জেরধরেই শত্রুতা, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধম্পৃহা ইত্যাদির মতো জঘন্য মানসিক প্রান্তিকতা দানা বাঁধে।
৮. সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় ভাবধারায় গড়ে তোলা অভিভাবকগণের মৌলিক কর্তব্য। তাদেরকে প্রচলিত বিভিন্ন বাদ-বিসংবাদ ছেড়ে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শে অনুপ্রাণিত করা আবশ্যিক।
৯. দীর্ঘ সময়ের জন্য সন্তানদের একাকী ও অভিভাবকহীন না ছেড়ে তাদের জন্য সৎসঙ্গপূর্ণ পরিবেশ সুনিশ্চিত করা আবশ্যিক। অভিভাবকহীন লাগাম ছাড়া অসৎ সঙ্গদোষের কবলে তরুণ-যুবকরা ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তানৈতিক প্রান্তিকতার শিকার হয়।
১০. পরস্পর ভেদাভেদ, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা, নিজ আদর্শ ও মতাদর্শের প্রতি গৌড়ামি ও পক্ষপাতিত্বমূলক মানসিকতা পরিহার করা কর্তব্য। এ সমস্ত প্রবণতা মানুষের মাঝে বিদ্বেষ, বিরোধিতা ও চিন্তানৈতিক প্রান্তিকতার জন্ম দেয়, সদাচার ও মহৎ উদ্যোগ থেকে বিরত রাখে এবং ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হওয়ার পথে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১১. সম্ভাব্য সকল উপায়ে শুদ্ধ চিন্তা-চেতনা ও বিশুদ্ধ মননশীলতার প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে। মন-মস্তিষ্কের বিশুদ্ধতা ও বিবেক-বুদ্ধির নিষ্কলুষতাই হলো আমাদের আকিদা-বিশ্বাস ও জাতীয় ঐক্যের রক্ষাকবচ, মুসলমানদের ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আবরু ও প্রাণ রক্ষার কার্যকর উপায় এবং সমস্ত বিচ্যুতি ও প্রান্তিকতা থেকে বর্তমান প্রজন্মের মন-মস্তিষ্ক রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।
১২. চিন্তানৈতিক প্রান্তিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ঔপনিবেশিকতার সমস্ত ছিদ্রপথ বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়টিকে সতর্ক নজরদারিতে রেখে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবাবদিহির সম্মুখীন করতে হবে। যেন চিন্তানৈতিক দুরারোগ্য ক্যান্সার মুসলিম উম্মাহর মন-মস্তিষ্ক ও রগরেষায় বাসা বাঁধতে না পারে।
১৩. প্রান্তিক মতাদর্শীদের মোকাবিলা করতে হবে বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ ও গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে। ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও হিতোপদেশের আলোকে তাদের প্রতিটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ইসলামের উদারতা, ন্যায়ানুগতা ও মধ্যপন্থার বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে।
১৪. যারা মানসিক ভ্রষ্টতায় আক্রান্ত, প্রান্তিক চিন্তা-চেতনার শিকার, তাদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সেখানে গঠনমূলক আলোচনা, দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি দর্শনের আলোকে প্রান্তিক মানসিকতার অসাড়তা স্পষ্ট করা হবে এবং কুরআন সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ আলেমে দ্বীন ও মনো-বিজ্ঞদের সমন্বয়ে সুস্থ বোধ-বুদ্ধি ও নিষ্কলুষ মননশীলতার চর্চা হবে।
১৫. আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, অন্যের প্রতি সুধারণা পোষণ করা, বাঁকাচোখে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখা। আপনি যদি একরোখা দৃষ্টিতে লোকদের নেতিবাচক দিকগুলো বড় করে দেখেন, তাহলে তা আপনাকে মানুষের প্রতি প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের খাটো করে দেখার মতো হীন মানসিক সংকটে ফেলবে।
১৬. মনে রাখতে হবে, কাউকে কাফের বলে দেওয়া, ঈমানের গণ্ডি থেকে খারিজ বলে ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-

এর। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন বিজ্ঞ আলেম সমাজ। এক্ষেত্রে যে কারোর মন্তব্য করার অধিকার নেই, অবকাশ নেই।

১৭. এক শ্রেণির অজ্ঞ মূর্খ, বয়সে ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে অপরিপক্ব লোকদের মধ্যে এ প্রবণতা কাজ করে যে, পান থেকে চুন খসতেই তারা যে কাউকে সরাসরি কাফের বলে বসে। কাউকে কাফের আখ্যায়িত করাতেই যেন তাদের পরমানন্দ।

কারণে-অকারণে, শাস্ত্রীয় মূলনীতির পরোয়া না করে যে কাউকে কাফের বলে দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতির কথা কি তারা চিন্তা করেছে? তারা কি কখনো ভেবেছে, এর জের ধরে মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু চরম হুমকির মুখে পড়ে! কখনো কখনো তা ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাযজ্ঞের মতো ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করে! দেশ, জাতি ও জনপদের সার্বিক নিরাপত্তার ভিত ধসে পড়ে!

এ ক্ষেত্রে ঈমানের মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পেশ করতে হবে। কী কী কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং ব্যক্তি ঈমানের গণ্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে—এ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। যেন সাধারণ শ্রেণি ও অজ্ঞ লোকেরা এ বিষয়ে ফেতনা-ফাসাদে জড়িয়ে না পড়ে।

১৮. চিন্তানৈতিক প্রাপ্তিকতা দূর করার লক্ষ্যে ধর্মীয় সংস্কারক ও বিজ্ঞ আলেম সমাজের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার সমন্বয়ে কাজ করতে হবে। সাধারণ লোকদের নিকট অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ বিষয়গুলো সবিস্তারে সুস্পষ্টরূপে প্রচার করতে হবে।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় হলো, কাফের হওয়ার উপযুক্ত অপরাধ করার পরও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তির অজ্ঞতা ও না-জানার ওয়র কবুল করা হবে? কী কী অপরাধে সহযোগী ব্যক্তিকেও কাফের সাব্যস্ত করা হবে? ইসলামের গণ্ডি থেকে খারিজ হওয়ার কারণগুলো কী কী? জঘন্য পাচাচার ও নষ্টাচার হওয়া সত্ত্বেও তা ব্যক্তিকে ঈমান ও ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয় না—এমন কারণগুলো কী কী? এবং কোন কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফের প্রতিপন্ন করা যাবে না ইত্যাদি।

এ অধ্যায় সম্পর্কিত শরীয়তের পরিভাষাগুলো সুস্পষ্টরূপে বলে দিতে হবে। যেন বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণ মানুষও পড়াশোনা করে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারে।

১৯. বিচার-বিভাগ ও এর সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের দক্ষতা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিতে হবে; যেন তারা ন্যায়ানুগতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং কোনো প্রকার কালবিলম্ব ও শিথিলতা করা ব্যতীত দ্রুত হুকুম বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়।

ভ্রষ্ট ও প্রান্তিক চিন্তাচেতনার বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির বিধান করতে হবে। এ ধরনের অপরাধে যারা জড়িত থাকবে, তারা সাধারণ হোক কিংবা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি-অবশ্যই তাদের আইনানুগ বিচারের আওতায় আনতে হবে।

২০. চিন্তা-ভাবনায় প্রান্তিক ও অতিরঞ্জনকারীদের পথ ও পন্থা সম্পর্কে জানতে হবে। তাদের চিন্তাপ্রসূত সন্দেহ-সংশয় ও দাবি দাওয়ার বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। অনিষ্টকে অনিষ্ট বলে চেনার যোগ্যতা, ভালোমন্দের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিকে যত অকল্যাণ-অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে। যে ব্যক্তি ভুল চিনতে পারে না, সে-ই সাধারণত ভুলের শিকার হয়।

২১. প্রান্তিক চিন্তা-ভাবনার উৎসসমূহ শনাক্ত করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর দলিল-প্রমাণ ও যুক্তি-দর্শনের আলোকে তাদের উত্থাপিত আপত্তির সদুত্তর দিতে হবে।

২২. অতীতের যে সমস্ত জাতিবর্গ ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের আশ্ফালন দেখিয়েছে, আসমানি গ্রন্থের বিধি-বিধান বাস্তবায়নে ছাড়াছাড়ি ও শিথিলতার স্পর্ধা দেখিয়েছে, তাদের ইতিহাস পড়ে দেখুন, পরিণতিতে তারা কী ভয়ানক মানবিক অবক্ষয় ও জাগতিক অধঃপতনের শিকার হয়েছে!

ইহুদিরা তো ধর্মীয় অবমাননার চূড়ান্ত করে তাদের নবীদের হত্যাযজ্ঞে মেতে ছিল। আর খ্রিস্টসমাজ, তারা ভক্তি-শ্রদ্ধার চরমে পৌঁছে সৃষ্টির ইবাদত ছেড়ে সৃষ্ট নবীদের উপাসনায় আকর্ষণ নিমজ্জিত হয়ে ছিল।

কালের আবর্তে একসময় তারাই আবার ধর্ম ও গির্জার অনুশাসন ছুড়ে ফেলে সর্বান্তঃকরণে লুফে নিল পুঁজিবাদী দর্শন। পুঁজিবাদের খালার শেষ ঝোলটুকু চেটে খাবার প্রতিযোগিতায় ছুটতে লাগল।

আমাদের প্রত্যেকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো, সার্বিক নিরাপত্তার শতভাগ অটুট ও নিষ্কণ্টক রাখা। কেননা একটি দেশ ও জনপদে যখন শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত নড়ে উঠে, ঠিক তখন থেকেই সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়াতে থাকে।

দ্বীন ও শরীয়ত পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার আদেশ করেছে। তা হলো, জান, মাল, মান-মর্যাদা, দ্বীন-ধর্ম ও বিবেক-বুদ্ধি। জাতীয় শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হলে এর রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয়।

২৩. সাক্ষাতের শুরুতেই সালাম প্রদান করা কর্তব্য। পরস্পর সাক্ষাতের মুহূর্তে সালামই হলো ইসলামি আদর্শ, যা শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্প্রীতির বার্তা বহন করে।

পৃথিবীতে ইসলাম ও ইসলামের সর্বশেষ নবী আগমন করেছেন শান্তি ও নিরাপত্তার সুসংবাদ নিয়ে। মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত আবরূর রক্ষণাবেক্ষণের বার্তা নিয়ে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ১০৭]

অর্থ: '(হে নবী!) আমি তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি।' (আম্বিয়া, ২১: ১০৭)

মানুষের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মমত্ববোধ ও দয়াদ্রতা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিশেষ দান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: ১০৭]

অর্থ: 'আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন।' (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫৯)

পরিশিষ্ট:

- ❖ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনটি যুবক ইবাদত ও ধর্মকর্ম পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তাদের লক্ষ্য হলো, একটা মুহূর্তও যেন আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের বাইরে না কাটে।

এ লক্ষ্যে প্রথম জন শপথ করল:

‘রাতে ঘুমাবে না। সারা রাত নফল নামায়ে মশগুল থাকবে।’

দ্বিতীয়জন কসম করে বলল:

‘আমৃত্যু রোযা রেখে যাব।’

তৃতীয়জন শপথ করল:

‘বিবাহ না করে আজীবন আল্লাহর ইবাদতগুজারে নিয়োজিত থাকবো।’

এ ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদের ডেকে পাঠালেন। তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ،
وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ

مِنِّي" صحيح البخاري (২/৭)

অর্থ: ‘শুনে রাখ, আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের মধ্যে আমিই সর্বাধিক আল্লাহভীরু পরহেযগার। কিন্তু আমিও তো রোযা রাখি ও পানাহার করি। নামায আদায় করি, বিশ্রাম গ্রহণ করি এবং নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। (এটাই আমার আদর্শ) যে ব্যক্তি আমার আদর্শ-বিমুখ হবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’

(বুখারী, ৭/২)

সুতরাং ধর্মকর্মে শরীয়তের নামে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি সমীচীন নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿وَلَيْسَ لَكَ لِلْيُسْرَىٰ﴾ [الأعلى: ৮]

অর্থ: ‘আমি তোমার জন্য সহজ শরীয়ত (এর অনুসরণ) সহজ করে দেব।’ (সূরা আ‘লা, ৮৭: ৮)

- ❖ আব্দুর রহমান বিন মুলজিম খারেজী, সাহাবায়ে কেরামের যামানায় বিশৃঙ্খলা ও উগ্রবাদের অন্যতম হোতা। সে-ই আমিরুল মু'মিনীন আলী (রা.)-কে হত্যা করে। সে ছিল অত্যধিক নামাযী ও কুরআন ভিলাওয়াতকারী, আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর বীভৎস প্রতিমূর্তি। রাসূল ﷺ বলেছেন:

«يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ،
وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَأُونَ
الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ
السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، (صحيح البخاري) ১৭৭/৬

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের নামায, রোযা ও নেক আমলের তুলনায় তোমাদের নামায, রোযা ও নেক আমলসমূহকে নিতান্ত তুচ্ছ নগণ্য মনে হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে; কিন্তু কুরআনের মর্ম তাদের কণ্ঠনালিও অতিক্রম করবে না। তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে এমনভাবে ছিটকে পড়বে, যেমন তিরন্দাজের হাত থেকে তীর ছুটে বেরিয়ে যায়।' (বুখারী, ৬/১৯৭)

লক্ষ করে দেখুন, আব্দুর রহমান বিন মুলজিমের অবস্থা। কত বড় ইবাদতগুজার ও মুত্তাকী-পরহেযগার হওয়া সত্ত্বেও শুধু চিন্তানৈতিক ভ্রষ্টতা ও প্রান্তিকতার বশবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জামাতা, আমিরুল মু'মিনীন আলী (রা.)-কে হত্যার মতো জঘন্য হীন অকর্ম করতে একটুও কুণ্ঠিত হয়নি। এমন লোকদের ব্যাপারেই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ৮]

অর্থ: 'তবে কি যার দৃষ্টিতে তার মন্দ কাজগুলো সুদৃশ্য করে দেখানো হয়েছে, ফলে সে তার মন্দ কাজকে ভালো মনে করে, (সে কি সংকর্মশীল ব্যক্তির সমান হতে পারে?) । বস্তুত আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আর যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করে । সুতরাং (হে নবী!) এমন যেন না হয় যে, তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) জন্য আপসোস করতে করতে তোমার প্রাণটাই চলে যা । নিশ্চয়ই তারা যা-কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালোভাবেই জ্ঞাত ।' (ফাতির, ৩৫: ৮)

কারাগার ও কারাবাস

কারাগার, যেখানে ব্যক্তিকে আটক রেখে পূর্ণ নজরদারিতে রাখা হয় এবং নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমার বাইরে যাবতীয় কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখা হয়। কারাবদ্ধ ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতার ঘেরাটোপে আটকে পড়ে। চারপাশের চলমান বিশ্বের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও অগ্রযাত্রা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এভাবে একপর্যায়ে তার কর্মক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি ক্রমশ ক্ষয়েক্ষয়ে নিঃশেষের চূড়ান্তে পৌঁছে।

কারাগারে কোনো কোনো বন্দি চরম দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও মানসিক অস্থিরতার শিকার হয়। কখনো কখনো তো কারাবন্দিদের অবস্থা এতটাই সঙ্গিন হয়ে পড়ে যে, না জীবিত আখ্যায়িত করে তার কাছ থেকে কোনো কাজের আশা করা যায়; না মৃত সাব্যস্ত করে তাকে সমাধিস্থ করা যায়।

কপালে বন্দিদশা জোটে নির্দিষ্ট মতাদর্শের কারণে, অপরাধের শাস্তিতে কিংবা অন্যের ওপর যুলুম-নির্যাতনের কারণে। কারাবদ্ধ ব্যক্তি হয়ত যালিম কিংবা মাজলুম; নিপীড়ক কিংবা নিপীড়িত। যাই হোক-না-কেনো, বন্দিদশায় ব্যক্তির জীবন সার্বিকভাবে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। হতাশা, বঞ্চনা ও আসন্ন ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা তার মন-মানসিকতায় জেঁকে বসে।

সামাজিকভাবেও বন্দিজীবন ফিরে-আসা লোকটাকে নেতিবাচক ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়; যদি সে প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে। কোনো কোনো বন্দি তো এমন ভীষণ দুর্ভোগ-দুর্দশার শিকার হয়, বাঁচার জন্য সবশেষে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

বন্দিজীবনের দুর্ভোগ-দুর্দশা থেকে বাঁচার জন্য এবং জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির চাকা সচল রাখার জন্য আমাদের এর প্রকৃত সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ-পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

সমাপান:

১. কারাবন্দি ব্যক্তির কর্তব্য হলো আপন রবের আশ্রয় গ্রহণ করা। নিজের যত অভিযোগ-অনুযোগ ও মুক্তিকামনা, আল্লাহর দরবারে ব্যক্ত করা। বন্দিজীবনে এমনই ছিল নবী ইউসুফ (আ.)-এর আদর্শ। পাপাচার-অনাচারের বিপরীতে তিনি বন্দিজীবনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ৩৩]

অর্থ: 'ইউসুফ দু'আ করল, হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যে কাজের দিকে ডাকছে, তা অপেক্ষা কারাগারই আমার বেশি পছন্দ।' (ইউসুফ, ১২: ৩৩)

নবী ইউসুফ (আ.) কারাগারে তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে তাওহিদ ও একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

অর্থ: 'হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আলাহ?' (ইউসুফ, ১২: ৩৯)

২. কারাবন্দির জন্য সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি। সুতরাং অবশ্যই তাকে খুশু-খুযূর সাথে, একাগ্র ও বিনম্র চিত্তে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করতে হবে। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি যিকির ও ওযীফা আদায়ে যত্নবান হতে হবে।
৩. বন্দিজীবনে নিজেকে সর্বদা ভালো ও কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। যেন একটি মুহূর্তও অনর্থক অবসরে না কাটে। এ উদ্দেশ্যে লেখাপড়া থেকে শুরু করে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা ইত্যাদি, সম্ভব যেকোনো ভালো কাজ করা যেতে পারে।
৪. কারাগারে যদি কোনো জ্ঞানী, গুণী ও সৎজনের সন্ধান মিলে তার সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। এমন কত লোক আছে, যারা অপরাধী হয়ে, অন্ধকার

জীবন নিয়ে কারাবন্দি হয়েছে। সেখানে কোনো জ্ঞানী-গুণীজনের সংস্পর্শ থেকে আলোকিত জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে।

৫. সাথী-সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা, আচরণে-বিচরণে তাদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠা কারাবন্দির প্রধান কর্তব্য। এর ফলে সাথী-সঙ্গীরাও তার প্রতি সদাচারী, সদয় ও সহানুভূতিশীল হবে। তার বন্দিজীবন যথাসম্ভব হাসি-আনন্দে কাটবে। কষ্ট ও দুর্ভোগের ভার কিছুটা হলেও লাঘব হবে।
৬. জীবনের প্রেক্ষাপটে বন্দিদশা হলো এক তিক্ত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ধৈর্য, অবিচলতা ও আত্মিক শক্তিবলে যদি এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায়, তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তা মূল্যবান পুঁজি হয়ে থাকবে। ইতিহাসের কত জ্ঞানী-গুণী ও মহামনীষী কারাবন্দিত্বের শিকার হয়েছেন। কিন্তু এ প্রতিকূলতার কবলে তাঁরা নতিস্বীকার করেননি, অবদমিত হননি। বন্দিজীবনের বাস্তবতা মেনে নিয়েই তারা নিজের কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি জাতির কল্যাণে গৌরবময় কাজ করেছেন। অনেক মহামনীষী বন্দিশালার অবরুদ্ধ পরিবেশে থেকে জীবনের অমর কীর্তি গড়েছেন।
৭. কারাবন্দির কর্তব্য হলো নেগেটিভ ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে ফেলে পজেটিভ চিন্তা করা। বন্দিদশায় মুষড়ে না পড়ে মুক্তির আশায় বুক বাঁধা। দুঃখ-দুর্দশার পরই সুখ-শান্তির উদয় হয়। এটাই তো জীবনাবর্তনের চিরন্তন ধারা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ৫, ৬]

অর্থ: 'প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি থাকে।' (ইনশিরাহ, ৯৪: ৫, ৬)

৮. কারাগারের নির্জীব নিরানন্দ পরিবেশ কাটিয়ে উঠার জন্য সাথিসঙ্গীদের সাথে কবিতার আসর কিংবা গুল্ল-গুজবের আড্ডা দেওয়া যেতে পারে। গুমোটবদ্ধ পরিবেশে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাওয়ার জন্য এবং প্রফুল্লতা লাভের জন্য এটা অত্যন্ত কার্যকর পন্থা।

৯. কারা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো, কারাগারটাকে বিচার ও শাস্তির কেন্দ্রের চেয়ে অধিক, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা। বন্দিদের অলসতা কর্মহীনতার সুযোগ না দিয়ে বিভিন্ন পেশা ও প্রশিক্ষণে নিয়োজিত করা।
১০. আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুজন-যারা কারাবন্দির সাথে দেখা করতে যাবে-তাদের কর্তব্য হলো, কোনো নেগেটিভ খবর না বলে বন্দিকে আনন্দদায়ক ও আশাব্যঞ্জক কথা বলা। তার মামলা-মোকদমার অগ্রগতি ও অনতিবিলম্বে কারামুক্তির সুসংবাদ শোনানো।
১১. স্মরণ করুন নবী উইসুফ (আ.)-এর ঘটনা, বন্দিজীবনে তিনি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের মহান দায়ীর ভূমিকা পালন করেছেন। ইমাম সারাখসী (রহ.) বন্দি অবস্থাতেই তাঁর ৩০ খণ্ডের সুবিশাল 'মাবসূত' গ্রন্থ-রচনা করেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) তাঁর ৪০ খণ্ডের সুবিশাল 'ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া' গ্রন্থটি কারাগারে থাকাবস্থায় রচনা করেছেন।

পরিশিষ্ট:

- ❖ ইতিহাসের পাতায় কারাজীবনের সবচেয়ে মহৎ চাক্ষু্যকর ও চমকপ্রদ ঘটনাটি হলো নবী ইউসুফ (আ.)-এর। নবুওয়াত লাভ করার পূর্বেই তিনি ছিলেন মহৎ, সম্ভ্রান্ত ও চারিত্রিক কলুষতামুক্ত নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁকে পাপাচার ও অনাচারে প্রলুদ্ধ করা হলো; কিন্তু তিনি বললেন (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ৩৩]

অর্থ: 'সে (ইউসুফ) বলল, 'হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়।' (সূরা ইউসুফ, ১২: ৩৩)

তাঁকে ঐন মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারাবন্দি করা হলো তিনি আপন রবের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁর পরম সহায় হলেন। কারাগারে তিনি তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে তাওহিদ ও একত্ববাদের দাওয়াত প্রদান করলেন। একত্ববাদ ও বহুঈশ্বরবাদের মধ্যে তিনি সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনে দিলেন। (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

অর্থ: 'হে আমার কারা সঙ্গীদয়! বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আলাহ?' (ইউসুফ, ১২: ৩৯)

এভাবেই হিতোপদেশ প্রদান, তাওহিদ ও একত্ববাদের শিক্ষার প্রচারে তাঁর কারাজীবন কাটতে লাগল।

এদিকে মিশরের নীল নদের তীরে কত ঢেউ আছড়ে পড়ে, রাজদরবারে কত বিষয়ে শলাপরামর্শ হয়, কত মামলা-মোকদ্দমার সুষ্ঠু সুরাহা হয়; কিন্তু নবী ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তির পরোয়ানা আসে না। তিনিও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হন না। আল্লাহর রহমতই যে তাঁর পরম আশ্রয়।

অবশেষে একদিন বিশেষ প্রয়োজনে বাদশাহ, ইউসুফ (আ.)-কে কারামুক্ত করে দরবারে হাযির করার নির্দেশ করলেন। কিন্তু ইউসুফ (আ.) সুস্পষ্ট অপবাদমুক্ত না হয়ে কারাগার থেকে বের হতে সম্মত হলেন না। তিনি জানতে চাইলেন (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۖ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾

অর্থ: 'যে নারীগণ নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে বেশ অবগত।' (ইউসুফ, ১২: ৫০)

আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-এর দোষমুক্তি প্রকাশ করলেন। স্বয়ং অপবাদ আরোপকারী নারী নিজের দোষ স্বীকার করে নিল এবং নবী ইউসুফ (আ.)-কে নির্দোষ ঘোষণা করল।

আল্লাহ তাঁকে জেলখানা থেকে সরাসরি রাজ-প্রাসাদের মর্যাদা দান করলেন। একই সঙ্গে নবুওয়াত ও মিশরের রাজত্বের সম্মানে ভূষিত করলেন। জেলখানার বন্দিজীবনে নবী ইউসুফ (আ.) যে শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার করেছেন, যে মহৎ আদর্শের পথ দেখিয়েছেন, কারাবাসীদের জন্য তা অনুপম শিক্ষা হয়ে আছে।

শূলভা:

ক্ষতিকর প্রভাব ও করণীয়

দেহে যখন অতিরিক্ত 'স্নেহ' বা চর্বি জমে যায়, তখন দেহের এ বিশেষ অবস্থাকে শূলতা বলা হয়। শূলতা বিষয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে অনেক গবেষণা হয়েছে। একটি জরিপে দেখা গেছে, বিশ্বে ক্ষুধা ও অনাহারে মৃত্যুর তুলনায় অতিভোজন ও শূলতার কারণে মৃত্যুর হার বেশি।

শূলতার কারণে দেহ-স্বাস্থ্যে নানা রকম ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয়। জটিল ও মারাত্মক রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার, শ্বাসকষ্ট ও অস্টিওআর্থরাইটিস^{৪০} অন্যতম। এর কোনো কোনোটি একপর্যায়ে মারাত্মক ক্যান্সারের রূপ ধারণ করে।

শূলতার কারণে মানুষের কর্মশক্তি ও প্রজনন-ক্ষমতা হ্রাস পায়। ভুক্তভোগী তার জীবনের আনন্দ-বিনোদনগুলো সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করতে পারে না। ফলে শিকার হয় নানা রকম দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা ও অস্থিরতার। কর্মস্পৃহা ও কর্মতৎপরতার ক্ষেত্রে শূলতা বিরাট প্রতিবন্ধক।

শূলতা যখন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, ব্যক্তি একপ্রকার প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। নিজেই নিজের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিবার ও সমাজের ওপর বিরাট বোঝা হয়ে পড়ে।

সুস্থ, সবল, কর্মোদ্দীপনাপূর্ণ ও প্রশান্তিময় জীবন যাপন করার জন্য মেদহীন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। কিন্তু এর উপায় কী? শূলতা কাটিয়ে উঠার কার্যকর সমাধান কী?

^{৪০} আর্থ্রাইটিস বলতে সাধারণত অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টের প্রদাহকেই বোঝানো হয়। এটি নির্দিষ্ট একটি রোগ নয়। অস্থিসন্ধি, অস্থিসন্ধির আশপাশের মাংসপেশি, টেনডন ইত্যাদির অনেকগুলো অসুখ একসঙ্গে আর্থ্রাইটিস নামে পরিচিত। তবে সবচেয়ে বেশি হয় অস্টিওআর্থ্রাইটিস। (অনুবাদক)

সমাধান:

১. প্রথমেই মানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, স্থূলতা একটা মারাত্মক ব্যাধি। স্থূলকায় ব্যক্তি যখন এটা মেনে নিবে, নিজেকে অসুস্থ ভাবতে শুরু করবে, তখন থেকেই সে দেহের মেদ-চর্বি ঝরিয়ে সুস্থতা লাভের জন্য তৎপর হবে।
২. অনিয়মিত ও অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস পরিহার করা কর্তব্য। স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর-এমন যেকোনো ধরনের খাবার থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক।
৩. ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে।
৪. স্থূলতার ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের ওপর এর মারাত্মক পরিণতির কথা মনে রাখতে হবে।
৫. দৈনিক হাঁটাচলা ও নিয়মিত ব্যায়াম, স্থূলতা কাটিয়ে উঠার জন্য সবচেয়ে কার্যকর প্রাকৃতিক উপায়। তাই হাঁটাচলা ও ব্যায়াম হতে হবে প্রতিদিনের আবশ্যিক কর্তব্য। এক্ষেত্রে কোনো এক্সারসাইজ টিমের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যায়াম করা যেতে পারে। তাদের ব্যায়ামের দিক-নির্দেশনা সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই কার্যকর।
৬. অবসরে কায়িক পরিশ্রমহীন দীর্ঘ সময় বসে থাকা ও বিশ্রামে পড়ে থাকার মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে।
৭. ভালোভাবে না চিবিয়ে দ্রুত খাবার খাওয়ার অভ্যাস বর্জন করা কর্তব্য। মিষ্টান্নজাতীয় খাবার ও কোলড্রিংস যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। এর পরিবর্তে তরতাজা ফলাহার অধিক সাহ্য়সম্মত।
৮. স্বল্প দূরত্বের গন্তব্যস্থলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে যানবাহনের চেয়ে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হবে। মসজিদ, ক্ষেত-খামার কিংবা নিকটবর্তী কর্মস্থলে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করাই বাঞ্ছনীয়। বহুতল ভবনে লিফট বাদ দিয়ে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।
৯. স্বাস্থ্যকর যতো খাদ্যদ্রব্য পরিবর্তন করতে হবে। এক বসায় উদরপূর্তি করে না খেয়ে অল্প অল্প করে বারবার খাওয়া এবং রাতের খাবার ও

ঘুমানোর মধ্যে তিন থেকে চার ঘণ্টার বিরতি রাখা অধিক স্বাস্থ্যসম্মত ।
প্রতিদিন অন্তত আট গ্লাস পানি পান করতে হবে ।

১০. মেদমুক্ত সুস্বাস্থ্য ফিরে পেতে দৃঢ় প্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হতে হবে ।
আমাদের চারপাশের অনেকেই নিজস্ব চেষ্টা-পরিশ্রমের বদৌলতে মেদ-
চর্বি ঝরিয়ে স্থূলতামুক্ত সুস্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে ।

পরিশিষ্ট:

- ❖ অনেক খেটে খাওয়া শ্রমজীবী লোকদের দেখেছি, তারা লোহা, কাঠ, পাথর ইত্যাদির কাজ করে । তারা কত সুস্থ, সবল ও মজবুত গড়নের অধিকারী । কাজে-কর্মে কী সীমাহীন উদ্যমী ও প্রাণবন্ত । গলা ছেড়ে গেয়ে চলছে আর বিরামহীন কাজ করছে । চেহারা দুঃখ বিষাদের কোনো ছাপ নেই । মনে বিষণ্ণতা ও দুচ্চিন্তার স্থান নেই । দেহ-মনে তারা যেন সুস্থ-সবল প্রাণবন্ত । তাদের জীবনযাপনও সুখ-শান্তিপূর্ণ ।

বিপরীতে এমন লোকদেরও জানি, যারা মেদবহুলতা ও স্থূলতায় আক্রান্ত । তাদের কেউ কেউ জটিল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে ।

জনৈক লেখক নিজের স্থূলতা ও মেদবহুলতার কথা বলেছেন:

কায়িক পরিশ্রমহীন জীবন ও অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে আমাকে চরম বিপাকে পড়তে হয় । অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠি । সামান্য পরিশ্রমেই আমার হাঁসফাঁস অবস্থা । শারীরিক অবস্থারও ক্রমাবনতি হতে থাকে ।

আমি ভীষণ দুচ্চিন্তা ও অস্থিরতায় পড়ে যাই । কী করব, ভেবে উঠতে পারি না । চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সুস্থতা ফিরে পাব কি না, সে ব্যাপারেও অনিশ্চয়তা কাজ করে ।

এরপর বিশেষ এক উপলক্ষে জনৈক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হলো । আমার শারীরিক অবস্থা দেখে তিনি নিজেই কথা তুললেন । তাঁর সাথে আমার দীর্ঘক্ষণ কথা হয় । গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার সঙ্গে সঙ্গে খাবারের রুটিন পাল্টে দেন । রুটিনমাত্তিক কিছু ব্যায়াম ও শরীরচর্চার ব্যাপারো গুরুত্বারোপ করেন ।

ডাক্তারের পরামর্শ ও আশ্বাসে আমি সাহস ফিরে পেলাম। সুস্থ হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রুটিনমাসিক খাবার-দাবারে অভ্যস্ত হলাম। কোনো দিন ব্যায়াম করতে ভুলি না। এভাবে কয়েক মাসের মধ্যেই অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে সুস্বাস্থ্য ফিরে পেলাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল জীবনযাপন করছি।

ধূমপান

ধূমপান হলো তামাকজাতীয় দ্রব্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া শ্বাসের সাথে শরীরে গ্রহণ-প্রক্রিয়া। যেকোনো পোড়ানো বস্তুর ধোঁয়া শ্বাসের সাথে গ্রহণ করাকে ধূমপান বলা হয়। তবে মূলত তামাকজাতীয় দ্রব্যাদির পোড়ানো ধোঁয়া শ্বাসের সাথে গ্রহণ করাই ধূমপান হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

বর্তমান বিশ্বে ধূমপান প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক বদভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ধূমপায়ী ও তার চারপাশের সমাজ এর চরম ভুক্তভোগী।

কয়েকটি কারণে মানুষ ধূমপান করে থাকে। কিছু মানুষ ধূমপান করে শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে। কিছু লোক ধূমপান করে চরম মানসিক কষ্ট-যাতনার শিকার হয়ে। তাদের ধারণা, ধূমপান মনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করে। আর একটা শ্রেণি সিগারেট ফুঁকে-তাদের বিশ্বাস, সিগারেট আভিজাত্য ও ফ্যাশনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

ওলামায়ে কেরামের অনেকেই ধূমপানকে সুস্পষ্ট হারাম বলেছেন। কারণ, ধূমপান ধূমপায়ী ও তার চারপাশের সকলের ক্ষতি করে। তা পরিবেশ ও বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ১৭০]

অর্থ: 'নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।' (বাকারা, ২: ১৯৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ.

অর্থ: 'মানুষ যাতে কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও তাতে কষ্ট পান।' (ইবনে মাযাহ, ২/১১১৬)

ধূমপান একই সাথে পরিবেশ ও সমাজের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। তাতে অর্থের অপচয়ের সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে। ধূমপানের কারণে ব্যক্তি যক্ষ্মা ও ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো মারাত্মক দুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হয়। এছাড়াও তাতে নিউমোনিয়া ও এজমার ঝুঁকি রয়েছে।

‘ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন’ (বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা)-এর একটি জরিপে দেখা যায়, বিশ্বে প্রতি বছর ছয় মিলিয়ন মানুষের মৃত্যুর কারণ হলো ধূমপান। তাদের মধ্যে ৮৩ ভাগ মানুষের মৃত্যু হয় সরাসরি ধূমপানের কারণে। বাকিদের পরোক্ষ ধূমপানের কারণে।

এখনই যদি আমরা ধূমপানের বিষয়ে সচেতন না হই, তাহলে পরিবেশ-দূষণ ও স্বাস্থ্য-ঝুঁকি আরও প্রকট আকার ধারণ করবে। পর্যায়ক্রমে তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্যে আমাদের অবশ্যই ধূমপানের বদভ্যাস ছাড়তে হবে। এর জন্য আমাদের করণীয় কী? এ চলমান সংকট থেকে নিষ্কৃতির উপায় কী?

সমাধান:

১. প্রথমেই বুঝতে হবে এবং স্বীকার করতে হবে, ধূমপান স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।
২. ধূমপানে অভ্যস্ত ও নেশাগ্রস্ত হওয়ার পূর্বেই সিগারেট ছাড়তে হবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক, কাল বিলম্ব না করে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে—এ সময়ের মধ্যে অতি অবশ্যই ধূমপান ছেড়ে দিব।
৩. বন্ধু-বান্ধব ও চারপাশের পরিচিতদের জানিয়ে দিন, আপনি পাকাপাকিভাবে ধূমপান ছেড়ে দিচ্ছেন। এ লক্ষ্যে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করুন।
৪. বাড়িতে, গাড়িতে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ধূমপানের কথা মনে করিয়ে দেয়—এমন সমস্ত কিছু সরিয়ে ফেলুন। যেমন: সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, সিগারেট রাখার পাত্র ইত্যাদি।

৫. কী কী কারণে আপনি ধূমপান ছেড়ে দিতে আগ্রহী-তার একটা তালিকা করে ফেলুন। তালিকাটি নিজের সাথেই রাখুন। তা আপনাকে ধূমপান ছাড়তে প্রস্তুত করবে এবং সাহস জোগাবে।
৬. ধূমপানের যাবতীয় ক্ষতি সম্পর্কে জানুন। মনে রাখবেন, ধূমপানের মধ্যে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ হতে শুরু করে যক্ষ্মা ও ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধির আশঙ্কা রয়েছে। ধূমপানের ক্ষতি সম্পর্কে ইন্টারনেটে ভিডিও ক্লিপগুলো দেখতে পারেন। তাতে বিষয়টি আপনার কাছে আরও পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হবে।
৭. ধূমপান না করার উপকারিতা সম্পর্কে জানুন। যেমন: বায়ুদূষণ, পরিবেশ-দূষণ, অর্থের অপচয়, শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি-এসবই ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব। আপনি যদি ধূমপানমুক্ত জীবনযাপন করতে পারেন, তাহলেই এর উপকারগুলো লাভ করতে সক্ষম হবেন। ধূমপানমুক্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব-সবাই প্রশান্তি বোধ করে।
৮. ধূমপান ছাড়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিজের মনটাকে কাবু করতে হবে। কঠিন মুহূর্তে মনের চাহিদা হবে-একবার ধূমপান করলে এমন কী-ই বা ক্ষতি হবে; কিন্তু এমন প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।
৯. আপন রবের নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হোন। আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারা আপনার যবান তরতাজা রাখুন। সময়মতো সালাত কায়েম ও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতে যত্নবান হোন।
১০. সবসময় নিজের কল্যাণে, দশের কল্যাণে নিয়োজিত থাকুন। উদ্দেশ্যহীন অবসর-যাপন নিরাপদ নয়। কারণ, অবসর হলো নফস ও শয়তানের সুবর্ণ সুযোগ। অবসরেই শয়তান মানুষকে নানা বদভ্যাস ও কুকাজে প্ররোচিত করে।

ছুটি ও অবসরের সময়টাতে কোনো ক্রীড়াদল কিংবা এক্সারসাইজ টিমের সঙ্গে যোগ দিন। আপনার জীবন আরও প্রফুল্ল ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা ও কর্মমুখরতায় আপনাকে ধূমপানের কথা ভুলিয়ে দিবে।

১১. ধূমপান থেকে বাঁচার লক্ষ্যে একটি টিম গড়ে তুলুন। যাদের প্রত্যেকেই ধূমপান ছাড়ার জন্য প্রতিশ্রুতিশীল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নিজেকে ধূমপানমুক্ত করার জন্য এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করুন। এটা তো সর্বজনস্বীকৃত যে, একক প্রচেষ্টার চেয়ে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ।

১২. যে সময় ও উপলক্ষগুলোতে ধূমপানে অভ্যস্ত, তা চিহ্নিত করুন। যেমন: তিনবেলা খাবার পর, ঘুমাতে যাওয়ার আগে এবং ঘুম থেকে উঠার পর-এ সময়গুলোতে ধূমপানের পরিবর্তে কোনো ভালো খাবার খান। যেমন: তাজা ফলমূল, সালাত, হালকা নাশতাজাতীয় খাবার ইত্যাদি।

১৩. ধূমপানের পেছনে আপনার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি একবার চিন্তা করুন। প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রত্যেক বছরে কী বিপুল পরিমাণ অর্থ ধূমপানের পেছনে অপচয় হচ্ছে। অথচ এ অপচায়িত অর্থের যথার্থ ব্যয়ের প্রকৃত হকদার হলেন স্বয়ং আপনি, আপনার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, দুস্থ ও প্রয়োজনগ্রস্ত মানবসমাজ।

নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন, কাল কিয়ামতের দিন যখন অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন এর সদুত্তর কী হবে? কিয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ব্যতীত বান্দা একচুল নড়তে পারবে না। তার মধ্যে অর্থ-সম্পদের আয়-ব্যয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস অন্যতম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِكَ فِيمَا أَفْنَيْتَ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَ، وَعَنْ مَالِكَ مِنْ أَيْنَ كَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ، وَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ"

অর্থ: 'কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের পা নড়তে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়: তার জীবন

সম্পর্কে, কী কাজে তুমি তোমার জীবন নিঃশেষ করেছ? তার যৌবন সম্পর্কে, কীসে তোমার যৌবন ক্ষয় করেছ? তার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে, কোন পথে উপার্জন করেছ, আর কোন পথে ব্যয় করেছ? যে জ্ঞানার্জন করেছ তার ওপর কতটুকু আমল করেছ?’ (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৯/১৭৮)

১৪. ধূমপানে অভ্যস্ত বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলুন। কেননা তাদের উৎসাহে ধূমপান আপনাকেও প্ররোচিত করবে। মুত্তাকী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সাথে চলুন। তাদের সংস্পর্শ আপনাকে বদভ্যাস ছাড়ার লক্ষ্যে উৎসাহিত করবে।
১৫. লক্ষ করুন, ধূমপানের কারণে শুধু আপনার একার ক্ষতি হচ্ছে না, আপনার চারপাশের ধূমায়িত পরিবেশে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীরা পরোক্ষ ধূমপানে বাধ্য হচ্ছে। তাদের শরীর-স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন। অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

অর্থ: ‘সে-ই প্রকৃত মুসলমান, অন্য সকল মুসলমান যার যবান ও হাত থেকে নিরাপদ থাকে।’ (বুখারী, ১/১১)

১৬. দেহ-মন সতেজ-সবল রাখার জন্য ধূমপান ছেড়ে বেশি বেশি পানি পান করুন। এক্ষেত্রে দুধ, ফলের জুসও বেশ কার্যকর।
১৭. যদি ধূমপানের ইচ্ছা জাগে, তাহলে ধূমপানের কারণে যক্ষ্মা ও ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের কথা চিন্তা করুন। তাদের রোগাক্রান্ত করুণ অবস্থা আপনাকেও সতর্ক সচেতন করবে।
১৮. সদিচ্ছা ও নিজ উদ্যোগেও যদি ধূমপান থেকে বিরত থাকা সম্ভব না হয় তাহলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন। তার সুপরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী চলার চেষ্টা করুন।
১৯. ধূমপান থেকে প্রত্যেকের বিরত থাকা উচিত। তবে বিশেষভাবে পিতা, শিক্ষক ও সমাজের অভিভাবক ও অনুসরণীয় ব্যক্তিদের বিরত থাকা

বাঞ্ছনীয়। কেননা তাদের দেখাদেখি তরুণ সমাজও এই ভ্রষ্টাচারে প্ররোচিত হয়, ধূমপানের পথে পা বাড়ায়।

২০. দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যারা ধূমপানের পথ থেকে সরে এসেছে, এখন ধূমপানমুক্ত সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপন করছে, জনসম্মুখে তাদের সফলতার বিষয়টি প্রচার করে পুরস্কৃত করতে হবে; যেন তাদের দেখে অন্যরাও উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়।
২১. যেকোনো পারিবারিক সমস্যা দ্রুততর সময়ে সমাধান করতে হবে। পারিবারিক বন্ধন মজবুত ও অটুট রাখার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা কর্তব্য। কেননা পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ও অশান্তির কবলে অনেকেই ধূমপানের পথে পা বাড়ায়।
২২. সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসনে গড়ে তুলতে হবে। ধূমপান ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে। ধূমপানটাকে আভিজাত্য ও আধুনিকতার অনুসঙ্গ না বানিয়ে এটাকে ক্ষতিকর ও ঘৃণ্যরূপে তুলে ধরতে হবে।
২৩. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ধূমপানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। সিগারেট ও তামাকজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইউনিভার্সিটি, অফিস-আদালত, মার্কেট, শপিং মল-মোটকথা, সর্বত্র ধূমপানের জন্য মোটা অঙ্কের আর্থিক জরিমানা আরোপ করতে হবে।
২৪. দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালাতে হবে। তাতে তিনটি বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হবে:
 - এক. ধূমপানের ওপর শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা।
 - দুই. ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত।
 - তিন. ধূমপানের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
২৫. ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে কিছু অনলাইন প্রোগ্রাম ও ভিডিও ক্লিপ প্রচার করতে হবে, যেখানে ধূমপানের কারণে সৃষ্ট দুরারোগ্য

ব্যাধিগুলো, বিশেষভাবে যক্ষ্মা ও ফুসফুসের ক্যান্সারের বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছিতরূপে প্রচার করা হবে।

২৬. আপনি যদি সরাসরি ধূমপান না করে থাকেন, তাহলে পরোক্ষ ধূমপান থেকে বেঁচে থাকুন। অর্থাৎ, যে সমস্ত স্থান সিগারেটের ধূয়ায় ধূমায়িত হয়ে আছে সেখান থেকে দূরে থাকুন। চলার পথে আশপাশ থেকে সিগারেটের ধূয়া নাকে এলে সাময়িক দম বন্ধ রাখুন। সবচেয়ে নিরাপদ হলো ভালেঅ মাস্ক ব্যবহার করা।

২৭. অনেক বন্ধু-বান্ধব বলবে:

‘লাইফে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত হতে নেই। সবকিছুরই অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। সিগারেটে একটু-আধটু টান দিয়েই দেখ না।’

এমন বন্ধুদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। মনে রাখবেন, ক্ষতিকর ও অন্যায় কাজের প্রথম অভিজ্ঞতাই পরবর্তী জীবনে বিরাট আক্ষেপ-অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২৮. বিশ্বাস করুন, সুস্থ-সবল ও সুন্দর জীবনযাপনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ পদক্ষেপ হলো ধূমপান থেকে বিরত থাকা। এ আপদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। তাঁর সাহায্য ও তাওফিক কামনা করুন।

পরিশিষ্ট:

❖ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِكَ فِيمَا أَفْنَيْتَ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَ، وَعَنْ مَالِكَ مِنْ أَيْنَ كَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ، وَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ"

অর্থ: ‘কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের পা নড়তে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়: তার জীবন সম্পর্কে, কী কাজে তুমি তোমার জীবন নিঃশেষ করেছ? তার যৌবন সম্পর্কে, কীসে তোমার যৌবন ক্ষয় করেছ? তার অর্থ-

সম্পদ সম্পর্কে, কোন পথে উপার্জন করেছ, আর কোন পথে ব্যয় করেছো? যে জ্ঞানার্জন করেছ তার ওপর কতটুকু আমল করেছ?’ (মুসনাদে আবু ইয়াল্লা, ৯/১৭৮)

❖ ধূমপানে আসক্ত হয়ে পড়বেন না। মনে রাখবেন, আপনি যদি ধূমপানকে নিঃশেষ না করতে পারেন, ধূমপান আপনাকে নিঃশেষ করে ফেলবে। সুতরাং দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন এবং সিগারেট ছুড়ে ফেলুন। -আয়েয আল কারনী

❖ এক ধূমপানকারীকে জিজ্ঞেস করা হলো:

‘ধূমপানে কী লাভ?’

বললো:

‘কুকুর তাড়াই।’ উদ্দেশ্য, যখন সে সজোরে কাশাকাশি করে, আশেপাশের কুকুরগুলো পালিয়ে যায়।

এমন কথা শুনে তার এক বন্ধু বললো:

‘কুকুর তাড়াতে গিয়ে তুমি তো! নিজেকেই পুড়িয়ে ফেলছ। বন্ধু-বান্ধব ও নিকটজনদের পরোক্ষ ক্ষতি করছ।’

আসক্তি ও নেশা

নেশা হলো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়-বস্তুতে মানুষের অস্বাভাবিক আসক্তি। নেশা বিভিন্নমুখী হতে পারে—সুনির্দিষ্ট বিষয়ে, ড্রাগে কিংবা নেশাজাতীয় দ্রব্যে।

ব্যক্তি যখন কোনো কিছুতে এডিটেড হয়, এর নেতিবাচক প্রভাব তার জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে প্রতিফলিত হয়। তার মনে হতে থাকে, আসক্তির বিষয় ও নেশার দ্রব্য ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এগুলো না পাওয়াতে তার মানসিকতায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। মন-মেজাজ ভীষণ রকম বিগড়ে যায়। আসক্তির বিষয় ও নেশার দ্রব্য পাওয়ার জন্য সে বেপরোয়া হয়ে উঠে। পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব কারোর ক্ষতির প্রতিই সে বিন্দুমাত্র ভ্রক্ষেপ করে না। যেকোনো মূল্যে তার আসক্তির বিষয় ও নেশার দ্রব্যটি চাই-ই চাই।

নেশা দু'ধরনের: এক. দ্রব্যজাতীয় শারীরিক নেশা, দুই, আর স্বভাব ও আচরণগত নেশা।

দ্রব্যজাতীয় শারীরিক নেশা হলো, ড্রাগ গ্রহণ কিংবা মাদক-সেবনে এডিটেড হয়ে পড়া, যা ছাড়া সে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

স্বভাব ও আচরণগত নেশা হলো, নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি অস্বাভাবিক অভ্যস্ত হয়ে পড়া। যেমন: ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়া এডিটেড, গেমস্ এডিটেড ও মুভি-সিরিজ এডিটেড।

ব্যক্তি যখন কোনো নেশা ও এডিকশনের শিকারে পরিণত হয়, তার জীবন হয়ে পড়ে কল্যাণশূন্য। নিজের ও দেশের কল্যাণে তার কোনো কার্যকারিতা থাকে না। পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য সে এক অসহনীয় বোঝা।

সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য মাদকমুক্ত ও এডিকশনমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার বিকল্প নেই। কিন্তু উপায় কী? নেশা ও মাদক সমস্যার সমাধান কী?

সমাধান:

১. ব্যক্তিকে প্রথমেই নেশাগ্রস্ততার বিষয়টিকে অপরাধ বলে স্বীকার করতে হবে। নেশার কারণে নিজের মনে গভীর অপরাধবোধ থাকতে হবে। এডিকশনমুক্ত হওয়ার জন্য সুদৃঢ় মানসিকতা ও সর্বাঙ্গিক চেষ্টা অত্যাবশ্যিক। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজন ও নিকটজনদের সাহায্য-সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য।
২. অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। চিকিৎসকের প্রতিটি পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক চলতে হবে।
৩. যেকোনো পারিবারিক সমস্যা দ্রুততর সমাধান করা বাঞ্ছনীয়। পারিবারিক বন্ধন মজবুত ও অটুট রাখার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা কর্তব্য। কারণ, পারিবারিক সম্পর্কের তিক্ততা ও অশান্তির কবলে অনেকেই মাদক ও নেশার পথে পা বাড়ায়।
৪. সন্তানদের কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ ও ধর্মীয় অনুশাসনে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহভীতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করতে হবে।
৫. বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানদের মধ্যে মাদক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা কর্তব্য। নেশা ও মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়। বয়সের এ নাজুক সময়টাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সন্তানদের অভিভাবকহীন ছাড়া উচিত নয়। কেননা যেকোনো অসৎসঙ্গের কবলে পড়ে সে নৈতিক ও চারিত্রিক ভ্রষ্টাচারের শিকার হতে পারে।
৬. দু'আ ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহমুখী হতে হবে। সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস বারবার পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে। অসৎ সঙ্গ পরিহার করে সৎসঙ্গ গ্রহণ করতে হবে। কেননা অসৎসঙ্গ ব্যক্তিকে অন্যায় ও পাপাচারের পথে ধাবিত করে। আর সৎসঙ্গ ন্যায় ও সদাচারের পথ সুগম করে।
৭. খারাপ নেশা ও নেগেটিভ এডিকশনের পরিবর্তে ভালো কাজে অভ্যস্ত হতে হবে। যেমন: ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া ও গেমস এডিকশনের পরিবর্তে সময়মতো পাঁচওয়াক্ত নামায, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ ও ইস্তিগফারে সদামশগুল থাকাই কর্তব্য।

৮. যে পরিবেশ-পরিস্থিতি ব্যক্তিকে মাদক-নেশার দিকে ঠেলে দেয়, অস্বাভাবিক আসক্তি ও এডিকশনের পথে ধাবিত করে, তা থেকে বেঁচে থেকে সুস্থ, শালীন ও সুন্দর পরিবেশে স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যিক। কেননা ব্যক্তি যতই সভ্য-ভদ্র ও শালীন-কুলীন হোক-না-কেন, অন্ধকার কলুষিত সমাজের উদ্যাম স্রোতে তার পদস্থলন হবে না-এর নিশ্চয়তা কোথায়?
৯. নেতিবাচক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা ও হতাশার কবল থেকে বেঁচে থাকুন। কখনো কখনো তা ব্যক্তিকে নেশা ও মাদকতার পথে ধাবিত করে। অবসরের গুণি থেকে বেরিয়ে এসে কর্মমুখর জীবনযাপন করুন। সর্বদা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, নিজের কল্যাণে ও দেশের কল্যাণে নিয়োজিত থাকুন।
১০. অভিজ্ঞতা লাভের জন্য কিংবা একবার উপভোগ করার উদ্দেশ্যে-যেকোনোভাবেই হোক না কেন-ড্রাগস ও মাদক সেবনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কেননা ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়ে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা লাভের উদগ্র বাসনা এক পর্যায়ে তাকে মারাত্মক নেশার পথে ধাবিত করে এবং পরবর্তী জীবনে গভীর আক্ষেপ-অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
১১. এ কথা কস্মিনকালেও বিশ্বাসযোগ্য নয়, এডিকশন ও নেশাগ্রস্ততা মনের কষ্ট-যাতনা দূর করে অনাবিল সুখ ও প্রশান্তি দান করে। এটা নির্জলা মিথ্যা ধারণা। ড্রাগস ও মাদক হলো গণবিধ্বংসী বিষ। এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি সর্বব্যাপী।
১২. মনে রাখতে হবে, ড্রাগস ও মাদক সেবনে ব্যক্তি অনেক দূরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো লিভার ডিজিজ, হৃদরোগ, মানসিক রোগ ও ক্যান্সার ইত্যাদি।
১৩. নেশাগ্রস্ত লোকেরা নেশার তাড়নায় নানা অন্যায় অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। কখনো বা আইনের হাতে পড়ে দীর্ঘদিনের স্বশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। একপর্যায়ে সামাজিক মান-মর্যাদা হারিয়ে পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য দুর্বিষহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

১৪. ড্রাগস ও মাদক-নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করে এর যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা ও শিথিলতা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।
১৫. এডিটেড ও মাদকাসক্ত লোকদের শাস্তির সম্মুখীন করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সেখানে বিজ্ঞ চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞ ডাক্তারদের নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
১৬. পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যখন আলাপ-আলোচনার বৈঠক হবে, তখন সমস্ত অমনোযোগিতা ছেড়ে মনোযোগে তাদের কথা শুনুন। এ সময় মোবাইলে ব্যস্ত হয়ে পড়া, ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘাঁটাঘাঁটি করাও একপ্রকার আসক্তি, যা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।
১৭. দেশের প্রতিটি অঞ্চলে মাদকতার বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালাতে হবে এবং তা ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করতে হবে। তাতে তিনটি বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হবে:
 এক. নেশা ও মাদকদ্রব্যের ওপর শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা।
 দুই. মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিমত।
 তিন. মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
 মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে কিছু অনলাইন প্রোগ্রাম ও ভিডিও ক্লিপ প্রচার করতে হবে। যেখানে মাদকের কারণে সৃষ্ট দুরারোগ্য ব্যাধিগুলো, বিশেষভাবে যক্ষ্মা ও ফুসফুসের ক্যান্সারের বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট ও স্বচিহ্নরূপে প্রচার করা হবে।
১৮. নিজেকে নেশা ও মাদকতার অসহায় শিকারে পরিণত করবেন না। আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন। যেকোনো ধরনের আসক্তি ও নেশা থেকে বিরত থাকার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও তাওফিক কামনা করুন। তিনিই পরম সাহায্যকারী।

পরিশিষ্ট:

- ❖ আমাদের দেশে এক যুবককে চিনি। সাঈদ হাম্মাদ। তার মতো মেধাবী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্যমী ও প্রতিশ্রুতিশীল যুবক সচরাচর দেখা যায় না। লেখাপড়ার প্রতিটি স্তরেই সে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে।

চাকরির জন্য তাকে দশ জায়গায় ধন্যা দিতে হয়নি। নিজ যোগ্যতাবলেই ভালো চাকরি পেয়েছে। দুটি শিশু সন্তানসহ সুন্দর সাজানো সংসার তার। বেশ উচ্ছল প্রাণবন্ত ও হাসি-আনন্দের কাটছিল তার দিনগুলো।

প্রতিদিন চলার পথে, কর্মসূত্রে কতজনের সাথেই তো দেখা হয়। কারো সাথে নতুন পরিচয় ঘটে। এমনই একদিন অফিস শেষে ফেরার পথে পরিচয় হলো এক যুবকের সাথে। নাম তার যাইফ সাদেক। পোশাক-আশাকে পুরোদস্তুর ভদ্র সম্ভ্রান্ত। কথাবার্তায় ঈষৎ চটপটে।

তারপর আরেক দিন যাইফের সাথে দেখা। কোথাও যাচ্ছে সে। ছুটির দিন। কথা বলতে বলতে হাম্মাদও তার সাথে চলতে লাগল।

জাইফের সূত্রে দেখা হলো, পরিচয় হলো আরও একদল যুবকের সাথে। এরা সবাই যাইফের বন্ধু। তাদের সাথে চুটিয়ে আড্ডা হলো। একজন অপরজনের কথায় কথায় জীবনের কত অনুষঙ্গই উঠে এল। আলাপ-আলোচনায় তার মনে হলো, যাইফ ও তার বন্ধু-বান্ধব-সবাই ড্রাগস এডিষ্টেড।

এরপর দিন দিন বিভিন্ন উপলক্ষে, অবসরের সুযোগে যাইফ ও তার বন্ধুদের সাথে হাম্মাদের নিয়মিত উঠাবসা। এখন সে তাদের সাথে নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। একপর্যায়ে তারও কৌতূহল জাগল, এডিকশন ও নেশার অনুভূতিটা কী ধরনের? এদের কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে বেশ ইন্টারেস্টিং।

এখান থেকেই হাম্মাদের ভেতর সঙ্গদোষের ক্ষতিকর প্রভাববিস্তারের শুরু। নেশার ঘোরে মাদকতার উন্মত্ততায় দিন দিন তার অবস্থার চরম অবনতি হতে লাগল।

হাম্মাদ ছিল পরিবার-পরিজনমুখী প্রাণবন্ত । এখন তার পরিবার-বিমুখতা ও নিশ্চলতা দেখে সবাই যারপনাই বিন্মিত । এরপর কিছু দিন তাকে আর কোথাও দেখা যায় না । খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মাদক অপরাধে গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে বন্দি ।

শরীর স্বাস্থ্য একেবারেই ভেঙে পড়েছে । মাদকতার তাড়নায় উপার্জিত সমস্ত অর্থ-সম্পদ খুইয়ে বসেছে । অভিভাবকহীন সন্তান দু'টাও এখন ছন্নছাড়া ।

জীবদ্দশাতেই নিজ হাতে সে তার উজ্জ্বল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দিল । ইহকাল-পরকাল বরবাদ করে ছাড়ল । তার কাছে আমার জিজ্ঞেস, মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো বিবেক-বুদ্ধি । এই অমূল্য নিয়ামত কি নেশা ও মাদকতায় নিঃশেষ করার জন্য?

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ঈমানের ওপর অবিচল রাখুন । আমাদের-বিবেক-বুদ্ধি সঠিক পথে পরিচালিত করুন । আমাদের সরল পথ প্রদর্শন করুন । (আমিন)

- ❖ আট বছর বয়সের ছোট বালকটির কথা আমি ভুলতে পারব না । কী নিষ্পাপ মাসুম চেহারা । কিন্তু অভিভাবকের আদর-আহ্বাদ কিংবা উদাসীনতায় এখন সে-ই মোবাইল-এডিষ্টেড হয়ে পড়েছে । সারা দিন মোবাইল হাতে একের পর এক গেমস খেলছে, ভিডিও দেখছে । মোবাইল ছাড়া একমুহূর্তও সে থাকতে পারে না । লেখাপড়া, খেলাধুলা, আনন্দ-বিনোদনপূর্ণ উচ্ছল প্রাণবন্ত জীবন তার মোবাইল, গেমস ও ইন্টারনেটে সংকুচিত হয়ে পড়েছে ।

ডাক্তার তার সার্বিক অবস্থা যাচাই করার পর বলল, 'তার অবস্থা উদ্বেগজনক । ছেলেটির থ্রম্বসিস অর্থাৎ, গভীর শিরায় রক্ত জমাট হওয়ার ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে ।

মোবাইল, গেমস, সোশ্যাল মিডিয়া ও মুভিসিরিজ ইত্যাদিতে আমরা এতটাই আকর্ষণ মজে যাই, নিজেদের অজান্তেই এডিষ্টেড হয়ে পড়ি । তাই এ জাতীয় বিষয়গুলোর পরিমিত ব্যবহার বাঞ্ছনীয় ।

অন্ধ অনুকরণ

তাকলীদ^{৪১} হলো অন্যের কথা মান্য করা, তার মতো করে কাজ করা।

তাকলীদ দুই প্রকার:

এক. যে তাকলীদ ওয়াজিব^{৪২} ও মুস্তাহাব^{৪৩}, তার উদ্দেশ্য হলো, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করা এবং ইহকালে ও পরকালে সফলতা লাভ করা। যেমন: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ ও আদর্শের অনুসরণ করা। তাঁর আনীত আসমানি কিতাব কুরআনের বিধি-বিধান মেনে চলা। এর বাইরে বিজ্ঞ পণ্ডিত, মহামনীষী বা অন্যদের ভালো কথা ও হিতাকাঙ্ক্ষামূলক উপদেশ মেনে চলাও কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এমন ন্যায়-নীতি ও সত্যানুসারী লোকদের হেদায়েতপ্রাপ্ত ও জ্ঞানী বলে আখ্যায়িত করেছেন:

﴿الَّذِينَ يَسْتَبِيعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ط أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ১৮]

অর্থ: 'যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম তার অনুসরণ করে, তারাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।'

(যুমার, ৩৯: ১৮)

দুই. যে তাকলীদ হারাম^{৪৪} ও নিন্দনীয়। এটাকে বলে 'আত্মকলীদুল আ'মা' (অন্ধ অনুকরণ)। অর্থাৎ, কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়া অন্যের কথা ও মতাদর্শ গ্রহণ করা। কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে বিচার না করে, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির আলোকে যাচাই ন করে একরোখাভাবে কারো অনুসরণে লেগে যাওয়া।

^{৪১} তাকলীদ: অনুসরণ-অনুকরণ।

^{৪২} ওয়াজিব: অত্যাবশ্যক।

^{৪৩} মুস্তাহাব: পছন্দনীয়।

^{৪৪} হারাম: নিষিদ্ধ।

এমন অন্ধ-অনুকরণের কবলে ব্যক্তি তার ভালো-মন্দ যাচাই করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। বোধ-উপলব্ধি ও বিবেক-বুদ্ধিতে সে নিস্তেজ অকার্যকর হয়ে পড়ে। তার দু' চোখ খোলা; কিন্তু আলোহীন। সে দেখে; কিন্তু অন্যের চোখে। গ্রহণ করে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি। তার কান সজাগ উৎকর্ণ; কিন্তু শোনে অন্যের মতো করে। তার নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই। সর্বদা অন্যের বুলি মুখস্থ আওড়িয়ে বেড়ায়। স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনার ঘর শূন্য। অন্যের ভাবধারায় আকর্ষণ নিমজ্জিত।

এভাবে নিজের অজান্তে কখন-যে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শচ্যুত হয়ে পড়ে, ঠাওর করতে পারে না। যখন বুঝতে পারে ফিরে আসার পথ থাকে না।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আদর্শ ও মতাদর্শ অনুসরণের জন্য অবশ্যই মানবরচিত আদর্শের অন্ধ অনুকরণের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তার উপায় কী? অন্ধ অনুকরণ সমস্যার যথার্থ সমাধানই বা কী?

সমাধান:

১. মনে রাখতে হবে, নিঃশর্ত আনুগত্য ও প্রশ্রীত অনুসরণ একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। এ ব্যাপারে ইসলাম কোনো ধরনের শিথিলতা ও আপসরফার মনোভাব সমর্থন করে না। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য এমন কোনো বিষয় নয়, যাতে যৌক্তিক মতভেদ হতে পারে। অতএব মতামতের স্বাধীনতার মূলনীতি এখানে অচল।
২. এ কথা স্বীকার করতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাসুম ও গুনাহমুক্ত। কথাবার্তা ও কর্মপদ্ধতিতে, আদর্শে ও মতাদর্শে তিনি যাবতীয় ভুল-বিচ্যুতির উর্ধ্বে। কেননা নিজের পক্ষ থেকে তিনি কিছুই বলতেন না। যা বলতেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে ওহীর আলোকে বলতেন। যা কিছু করতেন, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মোতাবেক করতেন।

তিনি ব্যতীত যে কেউ ভুলের শিকার হতে পারে। ভুল করে বসতে পারে নিজের অজান্তেই। তাই অন্যদের মতামত ও আদর্শ যদি কুরআন-সুন্নাহর মানদণ্ডে হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় তা বিবর্জিত।

৩. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোতে নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কর্মপ্রচেষ্টা সচল রাখতে হবে। প্রতিটি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হতে হবে মানব-কল্যাণমুখী, জীবন-জগতের প্রয়োজন ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল, যা ইহজাগতিক জীবনের গতিময়তা বৃদ্ধি করবে এবং পরকালের কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনের পথ সুগম করবে।
৪. অন্যান্য জাতিবর্গের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সফলতার ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করে তাদের উদ্ভূত চিন্তাপ্রসূত মতাদর্শ, অন্যায়-অন্যায্য কৃষ্টিকালচার ও ভ্রষ্টাচার পরিহার করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো:

"الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"

অর্থ: প্রজ্ঞার বাণী হলো মু'মিনের হারানো ধন। যেখানেই তা পাওয়া যাবে, মুমিনই হলো এর অগ্রগণ্য হকদার।

৫. দেশের সর্বত্র গবেষণা ইনস্টিটিউট ও শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে হবে। যেন মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তি তার মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগানোর উপযুক্ত সুযোগ পায়। বিজ্ঞান ও গবেষণার প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় উন্নতি-অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বিচারে বিশুদ্ধতা ও যুগের চাহিদার মাঝে সমন্বয় করে কাজ করা আবশ্যিক। এ দুয়ের মধ্যে যদি কখনো সংঘাত দেখা দেয়, তবে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শই হতে হবে অগ্রগণ্য।
৬. গবেষণা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় তরুণ প্রজন্মের জন্য উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন ও আত্মোন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে, যেন তারা বিশ্বসমাজে নিজেদের ব্যক্তিত্ব, স্বাভাব্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে সসম্মানে টিকে থাকতে সক্ষম হয়।
৭. যুগে যুগে ধর্মীয় সংস্কারক, বুদ্ধি ও চিন্তার জগতে নতুন দিগন্ত উন্মোচনকারী মহীয়সী ব্যক্তিদের জীবনী অধ্যয়ন করতে হবে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম শাফেয়ী, ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনে খালদুন ও ইবনুন নাফীস (রহ.) প্রমুখ।

৮. মনে রাখতে হবে, পবিত্র কুরআনে বহুবার অন্ধ অনুকরণের সমালোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ
آبَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَنْبَاءٌ هُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

অর্থ: 'যখন তাদেরকে (কাফিরদেরকে) বলা হয়, আল্লাহ যে বাণী নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, না, আমরা তো কেবল সে সকল বিষয়েরই অনুসরণ করব, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। আচ্ছা! সেই অবস্থায়ও কি (তাদের এটাই করা উচিত) যখন তাদের বাপ-দাদা (দ্বীনের) কিছুমাত্র বুঝ-সমঝ রাখত না? আর তারা কোন (ঐশী) হিদায়াতও লাভ করেনি?' (বাকারা, ২: ১৭০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«الَّتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِيرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّىٰ لَوْ
سَلَكَوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكَتُمُوهُ»، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: الْيَهُودَ،
وَالنَّصَارَى قَالَ: «فَمَنْ» (صحيح البخاري (১৬৯/৬))

অর্থ: (আমি আশঙ্কা করছি,) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি অন্ধরে অন্ধরে অনুসরণ করবে (যা আদৌ করা উচিত নয়)। এমনকি তারা যদি গুঁইসাপের গর্তেও ঢুকে যায়, তোমরাও তাতে ঢুকবে।' সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা কি ইহুদী ও খ্রিষ্টান?' জবাবে তিনি বললেন, 'তারা ছাড়া আর কে?' (বুখারী, ৪/১৬৯)

৯. যারা অন্ধ অনুকরণের পথে হাঁটে তারা শয়তানের খেলার পুতুলে পরিণত হয়। পাপাচার, অনাচার, শিরক, ধর্মচ্যুতি ও নাস্তিকতার ময়দানে শয়তান তাদের নিয়ে খেলে বেড়ায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْآ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ط قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ * إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَبِطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[الأعراف : ١٣٨، ١٣٩]

অর্থ: ‘আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল যারা তাদের মূর্তিপূজায় রত ছিল। বনী ইসরাঈল বলল, হে মূসা! এদের যেমন দেবতা আছে, তেমনি আমাদের জন্যও কোন দেবতা বানিয়ে দাও। মূসা বলল, তোমরা এমন (আজব) লোক যে, মূর্খতাসূলভ কথা বলছ। নিশ্চয়ই এসব লোক যে ধাক্কায় লেগে আছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারা যা-কিছু করছে সব ভ্রান্ত।’ (সূরা আ’রাফ : ১৩৮-১৩৯)

১০. বর্তমান তরুণ প্রজন্ম ও যুব সমাজের মধ্যে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে। সজাগ করে তুলতে হবে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ঈমানী চেতনা। শিষ্টাচার, শালীনতা ও নীতি-নৈতিকতাবোধের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে। বয়ঃসন্ধিকাল ও যৌবনের দূরন্ত আবেগ-উদ্দীপনার মুহূর্তে নানা পথ ও মতাদর্শের পিচ্ছিল অঙ্গনে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষাহীন অবাধ বিচরণ কখনই আশঙ্কামুক্ত নয়।
১১. পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে সন্তানদের ওপর আদর-স্নেহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ তত্ত্বাবধান বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে অসৎসঙ্গ ও ভ্রষ্ট মতাদর্শ থেকে সতর্ক করে সৎসঙ্গ ও প্রকৃত আদর্শে অনুপ্রাণিত করা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। অন্ধভক্তির কবল থেকে বাঁচিয়ে কুরআন-সুন্নাহর আদর্শে পরিচালিত করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
১২. হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যের কর্মধারা ও ভাবাদর্শের অন্ধ অনুকরণের মানসিকতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। তার পরিবর্তে নিজ যোগ্যতা ও

দক্ষতাবলে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতা লালন করা কর্তব্য। এটাই সফলতার মূল চাবিকাঠি।

১৩. অবসর ও ছুটিতে ছেলে-মেয়েদের সাথে সময় কাটাতে হবে। তাদের সাথে মহতি উদ্যোগ-আয়োজনে शामिल হতে হবে। দীর্ঘ ছুটিতে ছেলে-মেয়েদের বন্ধু-বান্ধবের সাথে লাগামহীন মেলামেশা এবং যত্রতত্র অবাধ বিচরণ, নানা পথ ও মতাদর্শের অন্ধ অনুকরণের ঘেরাটোপে আবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি করে।
১৪. পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচারের চাকচিক্যপূর্ণ ও জমকালো আয়োজন দেখে প্রতারিত না হবেন না। কুরআন-সুন্নাহর আদর্শ, এর স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যের গৌরব ধারণ করুন। ইসলাম মানবতার কল্যাণে আকিদা-বিশ্বাস, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়ানুগতা ও শুদ্ধাচারের যে মহান বার্তা নিয়ে আগমন করেছে, মানবসমাজ ও সভ্যতাকে যে অন্যায়-অনাচার, পাপাচার-নষ্টাচার এবং কুফর-শিরকের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে, তা ভুলে গেলে চলবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর উদ্দেশ্যে বলেছেন:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ১১০]

অর্থ: '(হে মুমিনগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা পুণ্যের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। কিতাবীগণ যদি ঈমান গ্রহণ করত, তাহলে তাদের জন্য তা কতই না উত্তম হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাকরমান।' (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

পরিশিষ্ট:

- ❖ মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) (৩৬৮-৪৬৩ হি.) অন্ধ অনুকরণের নিন্দা করে বলেছেন:

‘ওলামায়ে কিরামের নিকট অনুসরণ আর অন্ধ অনুকরণ এক নয়। অনুসরণ হলো, বক্তার বক্তব্যের তত্ত্ব, মর্ম ও যথার্থতা অনুধাবন করে তা গ্রহণ করা এবং মেনে চলা। আর অন্ধ অনুকরণ হলো, না বুঝে, না জেনে প্রকৃত মর্ম ও তত্ত্ব অনুধাবন না করে কারো কথা গ্রহণ করা, কোনো মতাদর্শ আঁকড়ে থাকা।’

আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) অন্ধ অনুকরণের নিন্দা করেছেন শিক্ষণীয় শৈলীতে ও চমকপ্রদ ও কবিতার ভাষায় :

يَا سَائِلِي عَنْ مَوْضِعِ التَّقْلِيدِ خُذْ
عَنِّي الْجَوَابَ بِفَهْمٍ لُبٍّ حَاضِرِ
وَاصْنَعْ إِلَى قَوْلِي وَدُنْ بِنَصِيحَتِي
وَاحْفَظْ عَلَيَّ بَوَادِرِي وَنَوَادِرِي
لَا فَرْقَ بَيْنَ مُقَلِّدٍ وَبَهِيمَةٍ
تَنْقَادُ بَيْنَ جَنَادِلٍ وَدَعَائِرِ
تَبَا لِقَاضٍ أَوْ لِمُفْتٍ لَا يَرَى
عِلَلًا وَمَعْنَى لِلْمَقَالِ السَّائِرِ
فَإِذَا اقْتَدَيْتَ فَبِالْكِتَابِ وَسُنَّةِ
الْمَبْعُوثِ بِالذِّينِ الْحَنِيفِ الطَّاهِرِ
ثُمَّ الصَّحَابَةِ عِنْدَ عُذْمِكَ سُنَّةً
فَأُولَٰكَ أَهْلُ نَهْيٍ وَأَهْلُ بَصَائِرِ

وَكَذَٰلِكَ إِجْمَاعُ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

مِنْ تَابِعِيهِمْ كَافِرًا عَنْ كَافِرٍ

إِجْمَاعُ أُمَّتِنَا وَقَوْلُ نَبِيِّنَا

مِثْلُ النَّصُوصِ لِذِي الْكِتَابِ الرَّاهِرِ

অর্থ: তাকলীদ সম্পর্কে প্রশ্নকারী, দিল-মন লাগিয়ে গভীর মনোযোগে উত্তর শুনে নাও! আমার হিতোপদেশ গ্রহণ কর!

অন্ধ-অনুকরণকারী ও ঐ গবাদিপশুর মাঝে কোনো তফাৎ নেই, যা পালের পশুগুলোর দেখাদেখি চরছে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—এ সবই তার অজানা।

হতভাগা ঐ কাযী ও মুফতী, যে কথার তত্ত্ব ও মর্ম অনুধাবন করতে পারে না, প্রবাদ বাক্যের অর্থ জানে না।

তুমি যদি অনুসরণ করতেই চাও, তাহলে আসমানি কিতাব ‘আল-কুরআন’ ও সঠিক ধর্ম ইসলাম নিয়ে আগত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসরণ অত্যাবশ্যিক।

সুন্নাহর অবর্তমানে সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ অগ্রগণ্য। কেননা তাঁরা হলেন কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

এরপরই পর্যায়ক্রমে তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসরণীয়।

আইম্মায়ে কিরামের ইজমা^{৪৫} ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ পবিত্র কুরআনের মতোই অবশ্য পালনীয়।

^{৪৫} ইজমা: সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

যাদু

যাদু হলো একটা বস্তুকে তার আসল রূপ থেকে বের করে বিভ্রম ঘটানো কিংবা বস্তুকে অতি প্রকৃতিরূপে দেখানো।

যাদুকররা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটায়, তাদের কল্পনা শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে ফেলে। এমনকি যাদুর সাহায্যে তারা মানুষের নানাবিধ ক্ষতিসাধন করতেও সক্ষম।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যাদু সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং জঘন্যতম কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:
«الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ
الْمُخَصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ» صحيح البخاري (١٠/٤)

অর্থ: ধ্বংসাত্মক সাতটি বিষয় পরিহার কর। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন :

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় কী?’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন :

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা।
২. যাদু করা।

৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন।

৪. সুদ খাওয়া।

৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাত করা।

৬. জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।

৭. সতী-সাক্ষী মু'মিন নারীকে অপবাদ দেওয়া। (বুখারী, ৪/১০)

যাদু প্রকারান্তরে একপ্রকার কুফুরি ও চরম ভ্রষ্টতা। কেননা যাদু-টোনা করতে গিয়ে মানুষ আল্লাহ ব্যতীত শয়তানের অনুসরণ উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আল বলেছেন :

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: ১০২]

অর্থ: 'আর তারা (বনী ইসরাঈল) সুলায়মান (আ.)-এর শাসনামলে শয়তানগণ যা-কিছু (মন্ত্র) পড়ত, তার পেছনে পড়ে গেল।

সুলায়মান (আ.) কোন কুফর করেনি। অবশ্য শয়তানগণ মানুষকে যাদু শিক্ষা দিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল।' (বাকারা, ২: ১০২)

যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদুর ক্ষতিকর প্রভাব বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। যাদুতে আক্রান্ত হয়ে কেউ নামায, রোযা, যিকির ও কুরআন তিলাওয়াত, মোটকথা নেক আমল ও যাবতীয় ভালো কাজ থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ আবার নানান উদ্ভট জল্পনা-কল্পনা ও দুঃস্বপ্নের জটিল ঘোরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যাদুর শিকার হয়ে কত পরিবার ভেঙ্গে গেছে, কত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, কত লোক নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

বর্তমান সমাজে যাদু একটি মহাসংকট ও নীরব ঘাতক। সময়ের সাথে এ সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এ সংকট থেকে উত্তরণের পথ কী? এ সমস্যা কাটিয়ে উঠার উপায় কী?

সমাধান:

১. প্রথমেই বুঝতে হবে, যাদু নিয়তির অবধারিত ফায়সালা ও ইহজাগতিক অনুমোদনের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তবে তা শরীয়ত-অনুমোদিত নয়। ইহজাগতিক অনুমোদনের অর্থ হলো, যে বিষয়ের বাস্তবায়ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত ও অবধারিত, কিন্তু অনুমোদিত নয়। আল্লাহ তা'আলা তা করার আদেশ করেননি এবং তিনি তা পছন্দও করেন না।

আর শরীয়তের অনুমোদিত হওয়ার অর্থ হলো, কোনো বিষয় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হালাল হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া, তাঁর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত এবং তা বাস্তবায়নের বিনিময়ে প্রতিদানপ্রাপ্ত হওয়া।

২. আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের পাশাপাশি যাবতীয় শিরকী-বেদাতী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা যাদুকররা ভ্রান্ত আকিদাবাদী ও শিরকী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসীদের অতি সহজেই কাজে কাবু করতে সক্ষম। তাদের ভুলভাল বুঝিয়ে মতলব হাসিল করে নিতে তৎপর।

৩. অত্যন্ত খুশ-খুশুর^{৪৬} সঙ্গে সময়মতো জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে। বান্দার সুরক্ষায় নামায হলো মজবুত বর্ম ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর স্বরূপ।

৪. অবসরে ও কাজেকর্মে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকা কর্তব্য। যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে সুরক্ষার জন্য হাদীসে বর্ণিত সকাল-সন্ধ্যার দু'আসমূহ পাঠ করতে হবে। পরিভাষায় এ দু'আসমূহকে **الْأَدْعِيَّةُ الْمَأْتُورَةُ** (আল-আদয়িয়াতুল মা'সূরা) বলা হয়।

৫. নিরক্ষতা, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের প্রতিরোধে ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রচার-প্রসার ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে সমাজের জ্ঞানী-গুণী, বিশেষভাবে আলেম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা কর্তব্য।

^{৪৬} খুশ-খুশুর: বিনম্রতা ও একাগ্রতা।

৬. প্রচলিত উদ্ভট প্রথা, বেদআত ও কুসংস্কারের পথ ছেড়ে কুরআন-সুন্নাহর বিধান মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ১০৩]

অর্থ: (হে নবী! তাদেরকে) আরও বল, এটা আমার সরল-সঠিক পথ। সুতরাং এর অনুসরণ কর, অন্য কোনও পথের অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। হে মানুষ! এসব বিষয়ে আল্লাহ তোমাদেরকে গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।' (আনআম, ৬: ১৫৩)

৭. কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে নিয়মিতভাবে এবং অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করে গভীর চিন্তা-ফিকিরের সাথে। বিশেষভাবে সূরা বাকারার তিলাওয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে ঘরে এ সূরা পাঠ করা হয়, শয়তান তার কাছেও ঘেঁষতে পারে না। যতসব বাতিলপন্থি, ভ্রষ্টাচারী যাদুকর তার ওপর প্রভাববিস্তার করতে পারে না।

৮. যে ব্যক্তি যাদুটোনায়ে আক্রান্ত হয়েছে সে যেন কোনো ভণ্ড কবিরাজ, গণক ও যাদুকরের দ্বারস্থ না হয়ে প্রকৃত আলেমে দ্বীনের শরণাপন্ন হয়। কেননা এসব মিথ্যাবাদী ভণ্ড কবিরাজ, গণক ও যাদুকররা ভীতু ও দুর্বলপ্রাণ লোকদের অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত করে তাদের অর্থ-সম্পদ হাতিয়ে নেয়। এরা হলো অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারী। এদের কবলে পড়ে ভুক্তভোগীরা দ্বিগুণ ক্ষতির শিকার হয়।

৯. যাদু-টোনার সবচেয়ে বড় প্রতিশেষক হলো 'শরয়ী রুকইয়া'^{৪৭}। যদি সম্ভব হয় তাহলে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের ওপর 'শরয়ী রুকইয়া'

^{৪৭} 'রুকইয়া'র আভিধানিক অর্থ হলো, ঝাড়ফুঁক করা, তাবিজ করা। অর্থাৎ, কোনো প্রকার ক্ষতি ও কষ্টদায়ক বিষয় থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ কিংবা ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করা। (আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়াহ (দ্বিতীয় সংস্করণ), খণ্ড: ২৩, পৃষ্ঠা: ৯৬)

প্রয়োগ করবে। সে যদি না পারে তাহলে এ বিষয়ে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ কারো মাধ্যমে প্রয়োগ করাবে। 'শরয়ী রুকইয়া'র একটি পদ্ধতি হলো:

- * সূরা 'সাফফাত'-এর প্রথম দশ আয়াত একবার।
- * সূরা 'ফাতেহা' তিনবার।
- * সূরা 'কাফিরুন' তিনবার।
- * সূরা 'ফালাক', তিনবার।
- * সূরা 'নাস' তিনবার।
- * সূরা 'এখলাস' তিনবার।
- * 'আয়াতুল কুরসী' তিনবার।
- * নিম্নোক্ত শেফার দু'আগুলো তিনবার করে পাঠ করতে হবে।

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» (صحيح البخاري) ১৩২/৭

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ، أَوْ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»
(مسند أحمد) ৬৭৭/২৬

শরীয়তের পরিভাষায়: আরোগ্য লাভের জন্য কিংবা বিপদমুক্তির উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত দু'আ ও যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করা। (আল-কওলুল মুয়ীন ফি মুরতাকাযাতি মুআলিজীস সারয়ি ওয়াস সিহরি ওয়াল আইন (প্রথম সংস্করণ), পৃষ্ঠা: ৩৬৫) ঝাড়ুট কিংবা তাবিজ করার ক্ষেত্রে প্রধানতম শর্তটি হলো, আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করা এবং এ বিশ্বাস ধারণ করা যে, ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই হয়। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো পক্ষে কোনো উপর করা ও ক্ষতি সাধন করার সাধ্য নেই। (আল-কওলুল মুয়ীন ফি মুরতাকাযাতি মুআলিজীস সারয়ি ওয়াস সিহরি ওয়াল আইন (প্রথম সংস্করণ), পৃষ্ঠা: ৩৬৫) (অনুবাদক)

তরতাজা বড়ই গাছের সাতটি পাতা চূর্ণ করে এক বালতি পানিতে মেশাতে হবে। উল্লিখিত কুরআনের আয়াত ও শেফার দু'আগুলো পাঠ করে পানিতে দম দিতে হবে। এ পানি দিয়ে গোসল করার মাধ্যমে যাদুর আসর দূর হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

১০. যাদুর প্রভাবে ব্যক্তি যে মানসিক প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়, তা কাটিয়ে উঠার জন্য পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা একান্ত কাম্য। যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে নামায, যিকির ও কুরআন তিলাওয়াতে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তার নামে দান-সদকা করাও কর্তব্য।
১১. প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাওয়ার দ্বারা ইনশাআল্লাহ যাদুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যাবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন:

«مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ» (صحيح البخاري ৮/১০)

অর্থ: 'প্রতিদিন সকালে যে ব্যক্তি সাতটি 'আজওয়া খেজুর' খাবে, ঐ দিন তাকে কোনো বিষক্রিয়া ও যাদু আক্রান্ত করতে পারবে না।' (বুখারী, ৭/৮০)

১২. ভূত-প্রেতের ভয়ানক দৃশ্যসংবলিত মুভি^{৪৮} দেখা থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ছাড়াও যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনি ও দৃশ্যসংবলিত ভিডিও বর্জনীয়। কেননা মানসপটে এসব ভয়ানক দৃশ্যের কল্পনা যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থার অবনতি ঘটায়।
১৩. যাদুর আলামতযুক্ত বস্তু, যেমন: একটা অপরটার সাথে বন্ধনযুক্ত, গিটযুক্ত সুতা কিংবা রশি, অপ্রচলিত অদ্ভুত চিহ্নযুক্ত লেখা কিংবা কাপড়ের টুকরা ইত্যাদি পাওয়া গেলে তা নষ্ট করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

^{৪৮} হরর ফিল্ম।

১৪. মনে রাখতে হবে, যাদুর মোকাবেলার যাদু কাজে লাগানো এবং এক যাদুর সাহায্যে আরেক যাদু প্রতিহত করা সুস্পষ্ট হারাম এবং শয়তানের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কাজ করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন:

إِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই তা শয়তানের কাজ।'

আরেকটি হাদীসে বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» (سنن أبي داود ৪/৭)

অর্থ: 'তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর; কিন্তু হারাম পন্থায় চিকিৎসা গ্রহণ কর না।' (আবু দাউদ, ৪/৭)

১৫. আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। তাঁর ওপর ভরসা করুন। সর্বদা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকুন। তাঁর হুকুমের বাইরে মানুষ আপনার ক্ষতি সাধন করার যতো পরিকল্পনা করুক, যতো চেষ্টা-তদবির করুক, আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ১০২]

অর্থ: 'তারা তার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না।' (বাকারা, ২: ১০২)

১৬. যারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ও যাদুবিদ্যাজীবী, তাদের উচিত যাদু প্রয়োগের মতো ন্যাকারজনক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং এর ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা। কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ মেনে মানবজাতির হিতাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণ সাধনার মধ্যেই তাদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা নিহিত।

পরিশিষ্ট:

❖ পবিত্র কুরআনে বাণী:

﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ১০২]

অর্থ: 'আর তারা (বনী ইসরাঈল) সুলায়মান (আ.)-এর শাসনামলে শয়তানগণ যা-কিছু (মন্ত্র) পড়ত তার পেছনে পড়ে গেল। সুলায়মান (আ.) কোন কুফর করেনি। অবশ্য শয়তানগণ মানুষকে যাদু শিক্ষা দিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া (বনী ইসরাঈল) বাবিল শহরে হারুত ও মারুত নামক ফিরিশতাদ্বয়ের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল তার পেছনে পড়ে গেল। এ ফিরিশতাদ্বয় কাউকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন তালীম দিত না, যতক্ষণ না বলে দিত, আমরা কেবলই পরীক্ষাস্বরূপ (প্রেরিত হয়েছি)। সুতরাং তোমরা (যাদুর পেছনে পড়ে) কুফরী অবলম্বন করো না। তথাপি তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত, (তবে প্রকাশ থাকে যে,) তারা তার মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কারও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না। (কিন্তু) তারা এমন জিনিস শিখত, যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল - এবং উপকারী ছিল না। আর তারা এটাও ভালো করে জানত যে,

যে ব্যক্তি তার খরিদার হবে আখিরাতে তার কোন হিস্যা থাকবে না। বস্তুত তারা যার বিনিময় নিজেদেরকে বিক্রি করেছে তা অতি মন্দ। যদি তাদের (এ বিষয়ের প্রকৃত) জ্ঞান থাকত।’ (বাকারা, ২: ১০২)

❖ আবু হুরায়রা (রা.) ও হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا
أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» (مسند أحمد مخرجا) ৩৩১/১৫

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি কোনো গণক, জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হবে এবং তার কথা বিশ্বাস করবে, সে যেন মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ (আসমানি কিতাবকে) অস্বীকারকারী হবে।’ (মুসনাদে আহমাদ, ১৫/৩৩১)

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ হলো, মানুষ তার দেশ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও বংশপরিচয় প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ববাদী ধ্যান-ধারণা পোষণ করা। যেমন: আমি ব্রিটিশ; ইন্ডিয়ান নই। আমি আমেরিকান; মেক্সিকান নই। আমি জার্মানি খ্রিষ্টান; ইহুদি নই। আমি শ্বেতাঙ্গ; কৃষ্ণাঙ্গ নই।

জাতীয়তাবাদ আমাদের সামনে একেক সময় একেক রূপ পরিগ্রহ করে, একেক রং ধারণ করে। কখনো জাতিসত্তা, কখনো নাগরিক সত্তা, কখনো ধর্মীয়, কখনো পার্থিব, কখনো ডান, কখনো বাম-এই রকম বহু চেহারা নিয়ে সে হাথির হয়।

জাতীয়তাবাদের মতো ভ্রষ্ট মানসিকতার শিকার হয়ে মানুষ অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে শুরু করে গালমন্দ ও ক্ষতিসাধন করতেও পরোয়া করে না। আর উগ্র জাতীয়তাবাদের বশবর্তী হয়ে মানুষ অন্যের ওপর যুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিগ্রহ, এমনকি হত্যা-গণহত্যায় উন্মত্ত হয়ে উঠে।

ইতিহাস দেখেছে, অতীতে জাতীয়তাবাদী আগ্রাসনে মানবতার করুণ পরিণতি। দেখেছে মিলেসিভিচের নেতৃত্বে স্লেনিকাতেই সার্বিয়ান যোদ্ধাদের কর্তৃক বসনিয়ান মুসলমানদের ওপর পাশবিক নির্যাতন ও গণহত্যা। এক গণহত্যায় তারা আটহাজার মুসলমানকে সমূলে ধ্বংস করেছিল।

ইতিহাস দেখেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা ইহুদিদের ওপর কী নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে! ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে সংখ্যালঘু মুসলমানরা জাতীয়তাবাদী আগ্রাসনের কবলে কী নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে! বর্তমানে জাতীয়তাবাদী আগ্রাসনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, ফিলিস্তিনের মুসলিম ভূখণ্ডে ইসরাইলি ইহুদিদের জাতীয়তাবাদী দখলদারি আগ্রাসন।

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভেদাভেদহীন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান কলুষিত জাতীয়তাবাদের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু উপায় কী? এ সংকট নিরসনের সরল পথ কী?

সমাধান:

১. জ্ঞানী-গুণী, চিন্তাবিদ ও আলেম সমাজের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদের ক্ষতি ও নেগেটিভ দিকগুলো সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক ও সচেতন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সাম্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ১০৩]

অর্থ: আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ করো না। (আলে-ইমরান, ৩: ১০৩)

২. অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বোঝাতে হবে, আসমানি কিতাব ও ঐশী ধর্ম ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, মানবজাতির মাঝে সাম্য, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব অটুট রেখে ধর্মপরায়ণতায় অনুপ্রাণিত করা। আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার একমাত্র মানদণ্ড হলো তাকওয়া, আনুগত্য ও উত্তম আমল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বলেছেন:

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾

অর্থ: '(হে মানুষ!) নিশ্চিত জেন, এটাই তোমাদের দ্বীন, যা একই দ্বীন এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর।' (আম্বিয়া, ২১: ৯২)

৩. মনে রাখতে হবে, মানবজাতির মূলে আছেন আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)। তাদের সৃষ্টির উপাদান হলো মাটি। সুতরাং পরস্পর গর্ব-গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের কোনো যৌক্তিকতা নেই। শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হলো তাকওয়া। যার মাধ্যমে ব্যক্তি আপন রবের নৈকট্য অর্জন করতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ১]

অর্থ: 'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।' (নিসা, ৪: ১)

৪. মনে রাখতে হবে, জাতীয়তাবাদের পরিণতি হলো মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ, বিভেদ ও শত্রুতা। উগ্র জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত হলো নির্যাতন-নিপীড়ন, হত্যা-গণহত্যা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা জাহেলি যুগের জাতীয়তাবাদের পরিণতি ও ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের সুফল স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন :

﴿وَاذْكُرُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ১০৩]

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখ। একটা সময় ছিল, যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিলেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে।' (আলে-ইমরান, ৩: ১০৩)

৫. মানবজাতির পরস্পর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কৃতিতে ইসলামের সারমর্ম হলো:

মহান আল্লাহর তা'আলার দৃষ্টিতে গোটা মানবজাতিই সমান। সেখানে কালো-সাদা, উচু-নীচু, ধনী-গরিব, এদেশীয়-ওদেশীয় সকল মানুষ সমান। মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতা। তবে তাকওয়া ও ধর্মপরায়ণতা জাহির করে আত্মগৌরব প্রকাশ করার বৈধতা নেই। এটাই ইসলামের মূলমন্ত্র।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সাম্যের বাণী প্রচার করেছিলেন বলেই ইসলাম অতি সহজে সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছিল। আজ থেকে চোদ্দশো বছর আগে ইসলাম পৃথিবীর নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের সামনে যে আশার আলো জ্বলেছিল, সে আলোর মশাল যদি তুলে ধরা যায়, ইসলামের নবী করীম ﷺ যে সাম্যের বাণী প্রচার করেছিলেন, তা যদি বাস্তবায়ন করা যায়, তবে তা-ই হবে বর্তমান কলুষিত জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبْلَغْتُ؟، قَالُوا: بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ - (مسند أحمد ط الرسالة ٣٨ / ٤٧٤)

অর্থ: ‘হে লোকসকল! শুনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমাদের রব এক। তোমাদের আদি পিতা এক। মনে রেখ, কোনো অনারবির ওপর আরবির শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের প্রাধান্য নেই। কোনো শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের প্রাধান্য নেই। (শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি হলো) তাকওয়া (আল্লাহভীতি) আমি কি (আমার রবের বার্তা) যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছি?’ সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ‘আল্লাহ রাসূল ﷺ (তঁার রবের বার্তা) যথার্থভাবে পৌঁছে দিয়েছেন।’ (মুসনাদে আহমাদ, ৩৮/৪৭৪)

৬. পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলা মানবজাতিকে অন্য সমস্ত সৃষ্টি হতে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং দেশ, জাতি, ধর্ম-বর্ণের ভিন্নতার কারণে কোনো মানুষ হয়ে প্রতিপন্ন হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ৭০]

অর্থ: 'বাস্তবিকপক্ষে আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং স্থলে ও জলে তাদের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করেছি, তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমার বহু মাখলুকের ওপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (বনী ইসরাইল, ১৭: ৭০)

৭. সমাজে পরিবারই হলো ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা ও বোধ-উপলব্ধির প্রথম পরিসর। তাই অভিভাবকদের কর্তব্য হলো, সন্তানদের মানবিক মূল্যবোধ, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও পরকল্যাণের দীক্ষায় দীক্ষিত করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। তাই শিক্ষকমণ্ডলী হতে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের ওপরও একই দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়।
৮. সাম্য-সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে এবং সচেতনতামূলক লেখা প্রচার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-মানুষে ভেদাভেদ ও জাতীয়তাবাদের ক্ষতির বিষয়ে সতর্ক করতে হবে।
৯. একটি জাতিকে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ জাতি হয়ে উঠতে হলে অবশ্যই তাকে ধর্মীয় বিশ্বাস, ভাষা, বর্ণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, এমনকি ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তিতে গোষ্ঠীবদ্ধতার বিশ্বাস পরিহার করতে হবে। অতীতে ইসলামই সর্বপ্রথম এ মহৎ কাজটি করে দেখিয়েছে।

জাহেলি যুগের সমস্ত ভেদাভেদ ও পার্থক্য রেখা নির্মূল করে উচ্চ শ্রেণি, পতিত শ্রেণি, সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সবাইকে এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। ফলে বেলাল (রা.), সুহাইব রুমী (রা.) ও সালমান ফারসী (রা.) প্রমুখ সংখ্যালঘু ও পতিত শ্রেণির ব্যক্তিগণ স্বসম্মানে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নিজ যোগ্যতা ও কর্মগুণে মর্যাদা ও নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পেরেছেন।

পরবর্তীযুগেও ইসলামের সাম্য রক্ষার ধারা অব্যাহত ছিল এবং বর্তমানেও ইসলাম মানবজাতির জন্য সে মহৎ উদরতার বার্তা বহন করছে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ একটি বিষয়ে একবার আবু যর (রা.) ও বেলাল (রা.)-এর মতভেদ হলো। বাদবিসংবাদের একপর্যায় আবু যর (রা.) বেলাল (রা.)-কে ‘কৃষ্ণাঙ্গের বাচ্চা’ বলে গাল দিলেন। বেলাল (রা.) কোনো প্রত্যুত্তর না করে রাসূল ﷺ-এর দরবারে অভিযোগ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। আবু যর (রা.)-কে ডেকে বললেন:

«يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرُؤُ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ»

অর্থ: ‘হে আবু যর! তুমি তাঁকে (বেলালকে) তাঁর মার নামে গালাগাল করতে পারলে? তোমার মধ্যে তো জাহেলি যুগের কুসংস্কার রয়ে গেছে।’ (বুখারী, ১/১৫)

এরপর আবু যর (রা.) বেরিয়ে গেলেন। পথিমধ্যে বেলাল (রা.)-এর সাথে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটির সঙ্গে গাল লাগিয়ে শুয়ে পড়লেন। বেলাল (রা.)-এর উদ্দেশ্যে বললেন:

‘তুমি যদি আমার গাল পদদলিত না কর, তাহলে আমি এভাবেই পড়ে থাকবো।’

বেলাল (রা.) বললেন :

‘কিছুতেই আমি তা করতে পারি না।’

তখন সাহাবয়ে কিরাম তাদের মিলিয়ে দিলেন। ভালোবাসা ও সম্প্রীতির আবেগে অশ্রুসিক্ত হয়ে তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন।

এটাই হলো ইসলামি সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের দৃষ্টান্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ১৩]

অর্থ: 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।' (হুজুরাত, ৪৯: ১৩)

সমালোচনা

সমালোচনা দু'ধরনের: গঠনমূলক ইতিবাচক সমালোচনা, আর আক্রমণাত্মক নেতিবাচক সমালোচনা।

গঠনমূলক ইতিবাচক সমালোচনার উদ্দেশ্য হলো, ভুল শুধরে দিয়ে মতামত ব্যক্ত করা; ভুলগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ব্যক্তিকে ছোট করা উদ্দেশ্য নয়। আর নেতিবাচক সমালোচনার নেপথ্য কারণ হলো হিংসা, বিদ্বেষ ও অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা। এর উদ্দেশ্য, সমাজের চোখে ব্যক্তিকে খাটো করা, হেয় প্রতিপন্ন করা। এছাড়াও ব্যক্তির যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মোদ্দীপনা দমিয়ে রাখাও নেতিবাচক সমালোচনার অন্যতম টার্গেট।

যখনই আপনি সমাজে নিজের মেধা, যোগ্যতা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারবেন, কর্মদক্ষতা ও অনন্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জন করতে শুরু করবেন, আপনাকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে।

এক্ষেত্রে গঠনমূলক ইতিবাচক সমালোচনা অবশ্যই আপনার জন্য এক বড় পাওনা। তবে পাশাপাশি আক্রমণাত্মক নেতিবাচক সমালোচনার জ্বালাও সহ্যেতে হবে। হিংসুক, নিন্দুক ও শত্রুভাবাপন্ন লোকদের গালমন্দ, অন্যায় অপপ্রচার ও মিথ্যা অপবাদ-এর কোনোটির হাত থেকেই আপনার রেহাই নেই। সমাজের চোখে আপনাকে খাটো ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্যোগ মানসিকতা নিয়ে তারা গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সর্বত্র আপনার সমালোচনায় সোচ্চার ভূমিকা পালন করবে। চারপাশের অনুকূল পরিবেশ ও সুবিস্তৃত কর্মপরিসর মুহূর্তেই আপনার জন্য বন্ধ গুহার মতো সংকুচিত হয়ে পড়বে।

জীবনের এমন রুদ্ধ কঠিন মুহূর্তে আপনার করণীয় কী? সমালোচনার সংকট কাটিয়ে উঠার যথার্থ উপায় কী?

সমাপ্তি:

১. সমালোচনার আক্রমণে দোদুল্যমান হবেন না। প্রকম্পিত হবেন না। মনে রাখবেন, সমালোচনা আপনার যোগ্যতা ও মর্যাদার পরিচায়ক।
২. সমালোচনা যদি গঠনমূলক ও ইতিবাচক হয় তাহলে তার মূল্যায়ন করে নিজের ভুলগুলো শুধরে নিন। কর্মক্ষেত্রে নিজেকে আরও দক্ষ অভিজ্ঞরূপে গড়ে তুলুন।
৩. আক্রমণাত্মক নেতিবাচক সমালোচনার মুখে ধৈর্যধারণ করুন। নিজ অবস্থানে অটল-অবিচল থাকুন। কাফের মুশরিকদের ভিত্তিহীন সমালোচনার মুখে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ধৈর্য ও অবিচলতার আদেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا﴾ [المزمل: ১০]

অর্থ: 'আর তারা (অর্থাৎ কাফেরগণ) যেসব কথা বলে, তাতে ধৈর্যধারণ কর এবং তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চল উত্তমরূপে।' (মুয্যাম্মিল, ৭৩: ১০)

৪. বেশি বেশি তাসবীহ পাঠ করুন ও নামায আদায়ে যত্নবান হোন। সমালোচনার মুখে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিশেষভাবে এ দু'টি আমলের আদেশ করেছেন:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

وَكُنْ مِنَ السَّجِدِينَ﴾ [الحجر: ৯৭, ৯৮]

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমি জানি, তারা যে সব কথা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। (তার প্রতিকার এই যে,) তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তার তাসবীহ পাঠ করতে থাক এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাক।' (হিজর, ১৫: ৯৭-৯৮)

৫. আপন রবের নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হোন। খুশ-খুযর সাথে (বিনম্র ও একাগ্রচিত্তে) নামাযে মশগুল হোন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ১৭]

অর্থ : সিজদা কর ও নিকটবর্তী হও । (সূরা আলাক : ১৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো বিষয়ে বিচলিত হতেন, তখন বেলাল (রা.)-এর উদ্দেশ্যে বলতেন:

يَا بِلَالُ، أَرْحِنَا بِالصَّلَاةِ. مسند أحمد مخرجا (১৭৮/৩৮)

অর্থ: হে বেলাল, নামাযের মাধ্যমে আমার মনে প্রশান্তি দাও ।
(মুসনাদে আহমদ, ৩৮/১৭৮)

৬. আপনি যদি সর্বজনমান্য ও সর্বমহলে নন্দিত হতে চান, যদি চান যাবতীয় দোষ-ত্রুটিমুক্ত থাকতে, তাহলে আপনি অসম্ভবকে সম্ভব করার পেছনে ছুটছেন, দুঃসাধ্য সাধনের চেষ্টায় লেগে আছেন, যা কখনো সম্ভব নয় । মানুষ হিসেবে আপনার ভুল হতেই পারে । সে ভুলের সুযোগে কেউ আপনার সমালোচনায় মুখর হতে পারে । কিন্তু আপনি কখনো তাদের নিন্দা-সমালোচনা কানে তুলবেন না ।

এক্ষেত্রে আপনার করণীয় হবে হিংসুক, নিন্দুক ও মূর্খ লোকদের ভিত্তিহীন সমালোচনা এড়িয়ে চলা । আপনি যদি তাদের সমালোচনার মোকাবিলা করতে যান, তাহলে আপনার প্রত্যুত্তর প্রমাণ করবে, আপনি নিন্দুকের নিন্দা ও অজ্ঞ-মূর্খের অযাচিৎ সমালোচনার মূল্যায়ন করছেন । পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ‘ইবাদুর রাহমান^{৪৯}’-এর পথ অনুসরণ করুন । কুরআনের ভাষায়:

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ৬৩]

অর্থ: ‘এবং অজ্ঞলোক যখন তাদেরকে লক্ষ্য করে (অজ্ঞতাসূলভ) কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা বলে ।’ (ফুরকান, ২৫: ৬৩)

৭. নিন্দুকের নিন্দা ও অজ্ঞ-মূর্খের গালাগালের জবাব দিতে যাবেন না । এভাবে আপনি তাদের সমালোচনা বন্ধ করতে পারবেন না; বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তারা নিত্য-নতুন সমালোচনায় মুখর হবে । তার চেয়ে বরং

^{৪৯} আল্লাহ তা‘আলার প্রকৃত বান্দাগণ ।

প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সাথে তাদের সমালোচনা এড়িয়ে চলুন। আপনার বিরুদ্ধে নিরাবেগ ভূমিকাতেই তাদের আগ্রহে ভাটা পড়বে। নিজেদের ক্ষোভ ও আক্রোশের জ্বালায় নিজেরাই জ্বলে মরবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ [آل عمران : ১১৭]

অর্থ: ‘(তাদেরকে) বলে দাও, তোমরা নিজেদের আক্রোশে নিজেরা মর।’ (আলে-ইমরান, ৩: ১১৭)

৮. হিংসুক, নিন্দুক ও অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। সাক্ষাতে, মজলিসে কিংবা উপলক্ষ্যে তারা যেন আপনার কাছেও ঘেঁষতে না পারে। সুযোগ পেলেই তারা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে মেতে উঠবে।
৯. প্রজ্ঞা, বিনয় ও মহৎ চরিত্রগুণে সর্বোত্তম পন্থায় সমালোচনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করুন। এগুলো এমন শক্তিশালী মানবিক গুণ, যা চরম শত্রুকেও পরম বন্ধুতে রূপান্তরিত করে।
১০. মানুষের ভিত্তিহীন সমালোচনা ও নিন্দা যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ে, শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে আদালত ও বিচারের দ্বারস্থ হোন। আদালত ও সুবিচার আপনার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে।
১১. নিশ্চিত থাকুন, প্রশান্ত হোন, উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনাও আপনার জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। হতে পারে আপনার গুনাহ মাফ হওয়ার কারণ। কাল কিয়ামতের দিন যখন নিন্দুকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠবে, আপনি হবেন নিন্দুক সমালোচকদের নেকির অংশীদার, কিংবা তারা হবে আপনার গুনাহর ভাগিদার।
১২. অজ্ঞ, মূর্খ ও নির্বোধ লোকেরা তো মহান স্রষ্টা ও রিয়িকদাতা আল্লাহ তা‘আলাকেও গালমন্দ করে। সে তুলনায় আমার আপনার মতো নগণ্য মানুষ-যাদের ভুল-বিচ্যুতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে-তাদের ক্ষেত্রে নিন্দুকের পক্ষ থেকে আর কী-ই বা আশা করতে পারে!

১৩. উদ্দেশ্যমূলক নেতিবাচক নিন্দা-সমালোচনায় ব্যথিত মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। কেননা এটা প্রমাণ করে, সমাজে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান বর্তমান; তা না হলে নিন্দুকেরা আপনাকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগত না।

১৪. সমালোচনা ও গালমন্দ মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীতে রয়েছে আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

মক্কার কাফের মুশরিকদের দ্বারা তিনি কত কটুক্তি ও বিরূপ মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছেন, কত গাল-মন্দ ও অশালীন আচরণের শিকার হয়েছেন; কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। মহান আল্লাহর দরবারে এর প্রতিদান আশা করেছেন।

পবিত্র কুরআনে মক্কার কাফের-মুশরিকদের কটুক্তি ও এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। যেন আগত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তা এক অনুপম আদর্শ ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

১৫. আপনি যদি নিন্দুকের কথার গুরুত্ব দিয়ে তাদের সমালোচনার জবাবে প্রবৃত্ত হন, তাহলে তো তাদের আশাই পূরণ হলো, উদ্দেশ্য সফল হলো। তখন তারা দ্বিগুণ উদ্যমে নিত্য-নতুন সমালোচনায় মুখর হবে। সঙ্গে সঙ্গে আপনার জীবন অস্থির দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। এটাই নিন্দুকের পরম উদ্দেশ্য। তাই নেতিবাচক যতো নিন্দা-সমালোচনা, তাতে মানসিক অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ করবেন না, যথাসম্ভব তা এড়িয়ে যান।

মক্কার কাফেররা যখন রাসূল ﷺ-এর নামে কুৎসা রটনা করছিল, তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত লিপ্ত ছিল, তখন তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ছিল (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكُرُّونَ﴾ [النحل: ১২৭]

অর্থ: 'তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে কুণ্ঠিত হয়ো না।'

(নাহল, ১৬: ১২৭)

১৬. মহৎ ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক উদারতার গুণে নিন্দা সমালোচনা মুছে ফেলুন। নিন্দার মুখে নীরব-নিরুদ্ধেগ ভূমিকা পালন করে নিন্দুক সমালোচককে নিষ্পৃহ করে ফেলুন।

পারিশিষ্ট:

- * আরবিতে একটি কথা প্রচলিত আছে:

طَنَشُ تَعِشُ تَنْتَعِشُ.

অর্থ: 'যত বাধা-বিপত্তি, সংকীর্ণতা-প্রতিকূলতা-কোনো কিছু প্রতি
ভ্রক্ষেপ না করে নিজের মতো করে বাঁচুন। তাতেই জীবনের পরম
সুখ-শান্তি নিহিত।' .

- * আমার সহপাঠী ডক্টর আবু তায়্যেব 'মুতানাব্বি?' বলেন, 'জীবনে আমি
কোনো বাধা-বিপত্তি, সংকট-সংকীর্ণতার পরোয়া করিনি। তাতে আমি
জীবনের কোনো কল্যাণ খুঁজে পাইনি।
- * আপনি যদি নিজের বিরুদ্ধে প্রতিটি কথার জবাব দিতে যান, এক-একটি
সমালোচনা মোকাবিলায় প্রবৃত্ত হন, বিরুদ্ধবাদীদের ব্যাপারে
প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেন, তাহলে-আপনার ওপর আল্লাহ রহম
করুন-আপনার জীবন ত্যক্ত-বিরক্ত ও চরম দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। তাই
জীবনের এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে ক্ষমা, উদারতা ও ভ্রক্ষেপহীনতাই
শ্রেয়। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ১৭৭]

অর্থ: '(হে নবী!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর এবং
(মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের দিকে ভ্রক্ষেপ
করো না।' (আ'রাফ, ৭: ১৯৯)

- * এক লোক আবু বকর (রা.)-কে গালমন্দ করল। জবাবে তিনি
লোকটাকে বললেন, 'এসব কটু কথা ও গালমন্দ তোমার সাথে তোমার
কবরেই যাবে। আমার কবরে যাবে না।'

মনে রাখবেন উদ্দেশ্যমূলক নেতিবাচক সমালোচনা, নিন্দা, কটুকথা ও
গালমন্দ-এসবই নিন্দুক সমালোচকের কাফনের সাথে তার কবরে
যাবে। কাল কিয়ামতের দিন বিচারের সম্মুখীন হওয়ার আগ পর্যন্ত সে
এগুলো বহন করে চলবে। তাই অন্যায় সমালোচনা এড়িয়ে চলা ও

ক্রম্পহীনতার পথ অবলম্বন করুন। এটাই জ্ঞানী ও মহৎ ব্যক্তিগণের আদর্শ। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿وَإِذَا سَبَّحُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَا تَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ৫৫]

অর্থ: 'তারা যখন কোন বেহুদা কথা শোনে, তা এড়িয়ে যায় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদেরকে সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।' (কাসাস, ২৮: ৫৫)

কুরআন-বিমুখতা

পবিত্র কুরআন মানব জাতির শেফা, হৃদয়ের প্রশান্তি ও আত্মার পরিতৃপ্তি।
কুরআন আমাদের জীবন-সমস্যার সমাধান, শ্রেষ্ঠ জীবন বিধান।

যে ব্যক্তি দিনের কর্মব্যস্ততায় ও রাতের নীরবতায় কুরআন তিলাওয়াতের
নিয়ামত লাভ করেছে, কুরআনের আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করার সুযোগ
পেয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক অনুশাসন ও সমাজ বিনির্মাণে
কুরআনের বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে, সে কতই
না সৌভাগ্যবান!

চরম হতভাগা ঐ ব্যক্তি, যে দিনের কর্মব্যস্ততায় ও রাতের অঘোর নিদ্রায়
আল-কুরআনকে ভুলে বসেছে। যার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক
জীবনে নেই আল-কুরআনের প্রভাব। নেই কোনো কার্যকারিতা।

কুরআন বিমুখতার অনেক ধরন রয়েছে। পবিত্র কুরআনকে মুহাম্মদ ﷺ-এর
ওপর অবতীর্ণ আসমানি গ্রন্থ বলে বিশ্বাস না করা থেকে শুরু করে, কুরআনের
ফায়সালা না মানা, তাঁর হালালকে হালাল বলে এবং হারামকে হারাম বলে
বিশ্বাস না করা, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে কুরআনের ভুলভাল ব্যাখ্যা করা,
পর্যায়ক্রমে কুরআন তিলাওয়াত না করা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির না করা,
এমনকি কুরআন-শিক্ষায় অনাগ্রহ, অবহেলা-এসবই কুরআন-বিমুখতার
অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন-বিমুখতার কিছু কারণ রয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা-দীক্ষার অভাব,
ধর্মীয় মূল্যবোধের শূন্যতা, জীবন-জগতের মোহাবিষ্টতা, পরকাল-বিমুখতা
এবং পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির আগ্রাসন-মোটাদাগে এগুলো হলো কুরআন
বিমুখতার অন্যতম কারণ।

এসব কারণে মানুষের হৃদয় আজ রুম্ম-কঠোর হয়ে গেছে। সে কুরআন তিলাওয়াতে আগ্রহ বোধ করে না। কালে-ভদ্রে তিলাওয়াত করলেও কুরআনের স্বাদ অনুভব করতে পারে না এবং কুরআনের মর্ম-বাণী তার মনে দাগ কাটে না।

সে অভাব-অনটনে ভোগে, দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়, নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়; কিন্তু আল-কুরআনের সমাধান কাজে লাগাতে পারে না।

আমরা যদি জীবন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চাই, ব্যক্তিগত জীবন, পারিবার ও সামাজিক সুষ্ঠু বিনির্মাণ চাই, তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের সর্বস্তরের কুরআন-বিমুখতা দূর করার বিকল্প নেই। কিন্তু তার উপায় কী? কুরআনমুখী হওয়ার পথ কী?

সমাধান:

১. প্রথমেই আমাদের উদাসীনতার বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করতে হবে। কীভাবে আমরা আল্লাহর কালাম ছেড়ে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অধ্যায় থেকে দূরে সরে জাগতিক ব্যতিব্যস্ততায় আকর্ষণ নিমজ্জিত হয়ে আছি?! পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় ডুবে আছি?!
২. মুভি, নাটক, সিরিয়াল, গেমস, চিত্তাকর্ষক ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিকে অনর্থক কাজে প্রবৃত্ত করে। তার মধ্যে কুরআন-বিমুখতা সৃষ্টি করে। এসব অনর্থক ও গুনাহের কাজ থেকে বিরত থেকে বেশি বেশি তাসবীহ-তাহলীল ও তাওবা-ইস্তিগফারে মশগুল থাকতে হবে।
৩. শিক্ষা সিলেবাসে কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। কুরআন শিক্ষার মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শাখাভিত্তিক কুরআন তিলাওয়াত প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।
৪. জীবনের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে শুরু করে সমস্ত অঙ্গনে কুরআনী শিক্ষা-দীক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।
৫. চারটি মৌলিক উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে:
এক. কুরআন হিফজ করা।

দুই. কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা ।

তিন. বাস্তব জীবনে কুরআনী বিধি-বিধানের সঠিক প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা ।

চার. কুরআনী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ।

কুরআনের ধারক-বাহকগণকেই এই চারটি মহৎ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে ।

৬. পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে কুরআনমুখী করার জন্য তাদের সাথে শিক্ষা-দীক্ষামূলক বাস্তবিক ও প্রায়োগিক নীতি অবলম্বন করতে হবে । তাদের কাছে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন-বিমুখতার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করতে হবে ।

৭. জান্নাতে উঁচু মর্যাদা ও সুউচ্চ মাকাম হাসিল করার জন্য কুরআন তিলাওয়াত একটি শ্রেষ্ঠ উসিলা । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ، وَارْتَقِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنَزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرُؤُهَا".

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কুরআনের হাফেজকে বলা হবে, 'তিলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক । দুনিয়াতে যেভাবে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করতে, ঠিক সেভাবে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত কর । সর্বশেষ আয়াতটি পাঠ করার সময় যে স্তরে থাকবে, সেটাই হবে তোমার আবাসস্থল ।' (আবু দাউদ, ২/৭৩)

৮. ভুলে গেলে চলবে না, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে যে নূর (কুরআন) দান করেছেন, সে নূরের আলোয় উদ্ভাসিত পথেই আপনার সৌভাগ্য ও সফলতা নিহিত । তাতেই রয়েছে আপনার তাওফিক ও হিদায়াতের পাথর ।

৯. দোকান, অফিস-আদালত কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেখানেই থাকুন না কেন, কুরআন তিলাওয়াতের ফযিলত থেকে বঞ্চিত হবেন না। মনে রাখবেন, পবিত্র কুরআনের এক একটি হরফে দশ নেকি। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে চান কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন।
১০. বিশ্বাস করুন, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আপনি আপন রবের সাথে একান্তে কথা বলার মহা সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"أَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذِكْرِي."

অর্থ: 'যে আমার যিকির করে, আমি তার সাথেই থাকি।'^{৫০}

এটা তো সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, সর্বোত্তম যিকির হলো কুরআন তিলাওয়াত।

১১. নির্দিষ্ট কিছু যিকির ও নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত প্রতিদিনের অত্যাবশ্যকীয় আমল বানিয়ে নিন। অভ্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত ফরয নামাযের মতো গুরুত্ব দিয়ে আমল দু'টি করতে থাকুন। কোনো দিন যদি ছুটে যায় তাহলে পরদিন দু'দিনের সমপরিমাণ পাঠ করুন।
১২. অভিজ্ঞ কোনো কারী সাহেবের তত্ত্বাবধানে কুরআন শিখুন। তাহলে বিপ্লবভাবে ও সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন।
১৩. নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন, বর্তমান বিশ্বের কোনো ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট যদি আপনার জন্য কোনো মেসেজ পাঠান, আপনি কি তা না পড়ে বেমালুম ভুলে থাকতে পারবেন? তাহলে আকাশমণ্ডলী ও যমীনের স্রষ্টা, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী আল কুরআন কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে!
১৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মুনাফিকদের একটি চরিত্র ছিল, তারা কুরআনবিমুখ হয়ে থাকত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর যে আয়াতই নাযিল হতো, তারা তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করত।

^{৫০} মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, ১/১০৮

স্পষ্টতই কুরআন-বিমুখতা একটা মুনাফেকি চরিত্র। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। কোনো মুনাফেকি চরিত্র যেন আপনার দ্বারা প্রকাশ না পায়।

১৫. বুখারী শরীফে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসটি মনে রাখুন:

«لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، وَقَامَ بِهِ آثَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آثَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» (صحيح البخاري ১৭১/৬)

অর্থ: ‘দু’ ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো প্রকার ঈর্ষা করা যাবে না: (এক.) যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের নিয়ামত দান করেছেন এবং দিনে-রাতে সে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকে। (দুই.) যাকে আল্লাহ তা‘আলা সম্পদ দান করেছেন এবং দিন-রাত সে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে।’ (বুখারী, ৬/১৯১)

১৬. কুরআন শেখা ও শেখানোর মাধ্যমে নিজেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» (صحيح البخاري ১৭২/৬)

অর্থ: ‘তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে কুরআন শিখে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।’ (বুখারী, ৬/১৯২)

১৭. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি বাণী বিশেষভাবে স্মরণ রাখুন:

«اقْرءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ»

অর্থ: ‘তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা কিয়ামত দিবসে কুরআন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারী হবে।’ (মুসলিম, ১/৫৫৩)

১৮. অসৎ গুনাহগার লোকদের সঙ্গে ত্যাগ করুন। পবিত্র কুরআনের হাফেয ও মুস্তাকী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকুন। তাদের সংসঙ্গ আপনাকে কুরআন তিলাওয়াতে অনুপ্রাণিত করবে।

১৯. তিলাওয়াতের পাশাপাশি একটি সহজ-সাবলীল তাফসির গ্রন্থ সাথে রাখুন। অর্থ-না-জানা শব্দের বিশ্লেষণ ও আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তা থেকে সহজেই জেনে নিন। সহজ-সাবলীল তাফসির-গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হলো:

- * তাফসিরুল জালালাইন।
- * তাফসিরুস্ সা'দী।
- * আত্-তাফসিরুল মুয়াস্সার।
- * সাফওয়াতুত্ তাফসির।

২০. নিজের সঙ্গে ক্ষুদ্র কলেবরের একটি কুরআনের কপি রাখুন, কিংবা মোবাইলে কুরআনের একটি সফটওয়্যার ডাউনলোড করে রাখুন। ঘরে-বাইরে যেকোনো স্থানে কুরআন তিলাওয়াত করার সুযোগ পাবেন এবং কোনো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ফিকির করতে পারবেন।

পরিশিষ্ট:

❖ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার একটি ঘোষণার মহত্ত্ব ও তাৎপর্যের সামনে যে কাউকে নীরব, নিশ্চুপ ও বিনম্রচিত্ত হতে হবে:

﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِثَلِّ هَذَا الْقُرْآنِ

لَا يَأْتُونَ بِثَلِّهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ৮৮]

অর্থ: 'বলে দাও, এই কুরআনের মত বাণী তৈরি করে আনার জন্য যদি সমস্ত মানুষ ও জিন একত্র হয়ে যায়, তবুও তারা এ রকম কিছু আনতে পারবে না, তাতে তারা একে অন্যের যতই সাহায্য করুক।' (বানী ইসরাঈল, ১৭: ৮৮)

❖ বিখ্যাত মিশরীয় কবি মুহাম্মদ বিন সাঈদ বৃসীরী^{৫১} (৬০৮-৬৯৬ হি.) বলেছেন:

^{৫১} রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসাসম্বলিত কাব্যরচনা জন্য তিনি বিশেষভাবে বিখ্যাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্তুতিসম্বলিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম 'আল-কাওকিবুদ্ দুররিয়াহ্ ফি মাদহি খইরিল বারিয়াহ্'। (অনুবাদক)

‘আমাকে তার অলৌকিকত্বের নিদর্শন বর্ণনা করতে দাও। তার অলৌকিকত্বের নিদর্শন যখন প্রকাশিত হয়, পাহাড়ের চূড়ায় অতিথির জন্য রান্নার আগুনের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।’

- ❖ হে আল্লাহ, মহাশয় আল কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের সবুজ-শ্যামল বসন্ত বানিয়ে দিন। কুরআনের উসিলায় মনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, দূর্চিন্তা ও অস্থিরতা দূর করে দিন। পবিত্র কুরআনকে আমাদের একাকীত্বের বন্ধু ও চলার পথের সাথি বানিয়ে দিন। কিয়ামত-দিবসে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী ও সুপারিশকারী বানিয়ে দিন।

বিস্মৃতি

বিস্মৃতি হলো প্রয়োজনের মুহূর্তে অতীতের জানা-বিষয় স্মরণ করতে না পারা। বিস্মৃতি আমাদের জন্য সুখকর, যখন আমরা নিজেদের কষ্ট-যাতনা, বিপদ-আপদ ও দুঃখের স্মৃতিগুলো ভুলে থাকতে পারি। ভুলে যেতে পারি ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায় বিরোধিতা ও শত্রুতা।

বিস্মৃতিই আবার আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, যখন আমরা ভুলে যাই নির্দিষ্ট সময় ও উপলক্ষে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা, জীবনের প্রয়োজন ও আয়োজনের কথা।

উল্লেখযোগ্য কিছু কারণে মানুষ বিস্মৃতির শিকার হয়। তার মধ্যে একটি হলো পুষ্টিহীনতা। মানুষের মস্তিষ্ক ও ব্রেইন যখন পর্যাপ্ত পুষ্টি না পায়, তার কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে। স্মরণশক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়াও অতি ভোজন, ধূমপান, কোমল পানীয়, ড্রাগস ইত্যাদিতে মানুষের মেধা ও স্মরণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যে কারণেই হোক, আপনি কি স্মৃতিশক্তির দুর্বলতায় ভুগছেন? আপনি কি এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন, যা করবেন বলে ভেবেছিলেন, এখন কিছুতেই তা মনে করতে পারছেন না? যা কিছু মুখস্থ করতে চান, কিছুতেই পেরে উঠেন না?

তাহলে আমার সাথে চলুন। বিস্মৃতির কবল থেকে মুক্তির পথ বাতলে দিচ্ছি। এ জটিল সমস্যার সমাধান বলে দিচ্ছি।

সমাধান:

১. মরে রাখতে হবে, বিস্মৃতি ও ভুলে যাওয়ার স্বভাব ব্যক্তিকে অযত্ন-অবহেলার পথে ধাবিত করে। ফলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার সামান্য ভুলের কারণে বড় ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে। যেমন: সিগন্যাল-ম্যানের সামান্য ভুলের কারণে বড় ধরনের ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটা।

অনুরূপভাবে জীবনের এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট রয়েছে, যেখানে সামান্য ভুলের কারণে ভয়ানক আর্থিক ও মানবিক বিপর্যয় নেমে আসার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

২. বিতারিত শয়তান থেকে সর্বদা মহান আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করুন। কেননা যেকোনো ভালো কাজ ও কল্যাণকর উদ্যোগ ভুলিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানই মূল হোতা।

খিযির (আ.)-এর সন্ধানের পথে মূসা (আ.)-এর সফরসঙ্গী যুবক তার দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। বলেছিল (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿وَمَا أَنْسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ৬৩]

অর্থ: 'সেটির কথা বলতে আমাকে আর কেউ নয়, শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল।' (কাহফ, ১৮: ৬৩)

৩. কোনো কিছু যদি ভুলে যান, কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছেন না, তাহলে বেশি বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করুন। সঙ্গে সঙ্গে এই দু'আটিও বার বার পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ، هَادِي الضَّالَّةِ، تَهْدِي مِنَ الضَّالَّةِ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ. (الدعوات الكبير ১৮৭/২)

অর্থ: 'হে হারানো বিস্মৃত বস্তুর প্রভু, হারানো বস্তুর সন্ধান দানকারী, ভুলে যাওয়া বস্তুর সন্ধান আপনিই দিতে পারেন। নিজ

শক্তিমত্তা, ক্ষমতা দান ও অনুগ্রহের গুণে আমার হারানো বস্ত্র ফিরিয়ে দিন।^{৫২}

৪. বেশি বেশি তাওবা-ইস্তিগফার করুন। কেননা গুনাহ ও পাপাচার মানুষের মনের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। আর তাওবা-ইস্তিগফার সে প্রভাব দূর করে মনটাকে বিশুদ্ধ পরিশুদ্ধ করে।
৫. মেধা-মস্তিষ্ক দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই একটি অঙ্গ। সমস্ত পরিচর্যার মাধ্যমে তা সবল শক্তিশালী হয়ে উঠে। তাই অধিক পাঠ ও অধ্যয়নের মাধ্যমে মেধার পরিচর্যা করুন। ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ও গুগল ইত্যাদি সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়াই মেধা খাটিয়ে কঠিন ও জটিল বিষয়ের সমাধান বের করার চেষ্টা করুন।
৬. নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করুন। কেননা তা শরীর-স্বাস্থ্যের সুস্থতা ও মন-মস্তিষ্কের প্রফুল্লতা ধরে রাখতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
৭. ভেজালমুক্ত নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যরুটিন মেনে চলুন। মেদ, ভুঁড়ি ও স্থূলতা থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা তা মেধা ও স্মরণশক্তির জন্য ক্ষতিকর।
দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও পুষ্টিযুক্ত খাবার খান। বিজ্ঞানজনের উক্তি 'সুস্থ দেহ, সুস্থ মন।'
৮. আমাদের শরীর-স্বাস্থ্য ও স্মরণশক্তির সুরক্ষায় শাকসবজি ও ফলমূলের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অধিক শাক-সবজি ও ফলমূল থাকতে হবে। তাতে প্রচুর পরিমাণ ফ্রেভোনয়েড ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট বিদ্যমান। স্মৃতিশক্তি বজায় রাখা এবং স্মৃতিশক্তিজনিত যেকোনো সমস্যা প্রতিরোধে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের যাদুকরি কার্যক্ষমতা রয়েছে।
৯. ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আপনার দেহে ক্যালসিয়ামের শূন্যতা ও ভিটামিন-ঘাটতির বিষয়ে নিশ্চিত হোন। বিশেষ করে ভিটামিন বি১২

^{৫২} আদদাওয়াতুল কাবীর, ২/১৮৭

ও ভিটামিন ডি-সুস্বাস্থ্য ও স্মৃতিশক্তি রক্ষায় এ দু'টি ভিটামিন অত্যন্ত কার্যকর ।

১০. থাইরয়েড গ্রন্থির দুর্বলতা^{১০} ও রক্তস্বল্পতা-ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ দুটি বিষয়ের নিশ্চিত হবে । কোনো সমস্যা ধরা পড়লে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করা কর্তব্য । কেননা স্মৃতিশক্তি দুর্বল ও ক্ষয় করার ক্ষেত্রে এ দুটি রোগের ভীষণ সক্রিয় ।
১১. ক্রোধ, বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, ত্বরা-প্রবণতা ইত্যাদি মানসিক সমস্যা থেকে বেঁচে থাকুন । কেননা এসব কারণে অনেক সময় ভুলো মানসিকতা সৃষ্টি হয়, স্মৃতিবিভ্রম ঘটে ।
১২. প্রতিদিনের গতানুগতিক জীবনের একঘেয়েমি ভাব দূর করার চেষ্টা করুন । এ লক্ষ্যে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ঘুরে আসুন । কিংবা ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্পট পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ুন । এতে মন-মানসিকতা প্রশান্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে । স্মৃতিশক্তি সতেজতা ও গতিময়তা ফিরে পাবে ।
১৩. পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও নিয়মিত ঘুম সুস্থ মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বিশেষভাবে রাতের ঘুম মানসিক সুস্থতার জন্য এক শক্তিশালী নিয়ামক । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ

مَعَاشًا﴾ [النِّبَا: ৯ - ১১]

^{১০} দেহের গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থি থাইরয়েড । থাইরয়েড গ্রন্থি একটি এনড্রোক্রাইন গ্র্যাড । এটা মানুষের গলার সামনে অবস্থিত । এখানে থেকে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয় । এই হরমোন শরীরের সব রেচন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে ।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে । থাইরয়েড গ্রন্থি ঠিকমতো কাজ না করলে শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় । একটি শিশু যদি ছোট বেলা থেকে এর অভাবে ভোগে, তাহলে সে প্রতিবন্ধী হয়ে বড় হবে । যদি তাকে চিকিৎসা দেওয়া না হয়, সে বুদ্ধি ও শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে যাবে ।

আর বড়দের ক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থির বিভিন্ন রকম রোগ হতে পারে । থাইরয়েড যে হরমোন তৈরি করছে, এটি একটি স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে থাকবে । তবে যদি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে কম তৈরি হয়, একে বলা হয় হাইপোথাইরয়েডিজম ।

অর্থ: 'আর তোমাদের ঘুমকে ক্রান্তি ঘুচানোর উপায় বানিয়েছি। এবং রাতকে বানিয়েছি আবরণ স্বরূপ। এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সয় নির্ধারণ করেছি।' (নাবা, ৭৮: ৯-১১)

তাই রাতে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ুন এবং সতেজ ও প্রাণবন্ত মনে কর্মমুখর জীবন-যাপন করুন।

১৪. নিয়মিত জামাতের সাথে ফজর নামায আদায়ে যত্নবান হোন। এতে একই সঙ্গে আপনি দু'টি কল্যাণ লাভ করতে পারবেন। প্রথমত: ফজর নামাযের বিরাট ফযিলত হাসিল হবে। দ্বিতীয়ত: ভোরের স্বচ্ছ-সতেজ আবহাওয়া আপনার মেধা ও স্মরণশক্তিকে পুষ্টি জোগাবে।

১৫. যেকোনো বিষয় মুখস্থ ও আত্মস্থ করার জন্য উপযুক্ত স্থান বাছাই করুন। এর জন্য শোরগোল ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশ অধিক উপযুক্ত।

১৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা মোতাবেক পাকস্থলিকে তিনভাগে ভাগ করুন। এক ভাগ খাবারের জন্য আরেক ভাগ পানীয়র জন্য তৃতীয় ভাগ নিজের জন্য খালি রাখুন।

বিজ্ঞ ডাক্তারদের অভিমত হলো, পাকস্থলি যত বেশি খাবার-দাবারে পূর্ণ হয়, খাদ্য হজমের জন্য পাকস্থলির দিকে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক রক্তচলাচল ব্যাহত হয়, যা মস্তিষ্ক ও স্মরণশক্তির জন্য ক্ষতিকর।

১৭. আপনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বারবার ফোকাস করুন। মনে রাখার জন্য এটা অত্যন্ত কার্যকর কৌশল। রবার্ট গ্রিন তাঁর **كَيْفَ تُمْسِكُ بِرِزْمَامٍ** গ্রন্থে বলেছেন:

'গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ে বারবার ফোকাস করুন। কয়েক ধাপে একাধিকার প্রাপ্তিস করুন। বিষয়টি আপনার ভালোভাবে আত্মস্থ হয়ে যাবে।'

শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদাহ (রহ.) **صَفَحَاتٌ مِنْ صَبْرِ الْعُلَمَاءِ** কিতাবে কোনো বিষয় ভালোভাবে মুখস্থ ও আত্মস্থ করার জন্য বারবার পাঠ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

১৮. জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয় ভুলে যাওয়ার হাত থেকে যদি বাঁচতে চান, তাহলে কাজ শুরু করার আগে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুর খোঁজ নেওয়ার কৌশল অবলম্বন করুন। যেমন: প্রতিদিন কাজে বের হওয়ার আগে আপনার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বস্তু সাথে নিয়েছেন কি না, খোঁজ করে দেখুন।

আমি লক্ষ্য করেছি, বিমান-যাত্রায় নেভেগেটররা এ দায়িত্ব বেশ গুরুত্বের সাথে পালন করে। যাত্রা শেষে তারা যাত্রীদের সতর্ক করে দেয়, প্রত্যেকেই যেন নিজ দায়িত্বে যার যার সামান্যত্র নিয়ে অবতরণ করে। ব্যক্তিজীবনে এ দায়িত্ব নিজেদেরই পালন করতে হবে।

১৯. যেকোনো ক্ষেত্রে চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মৌখিকভাবে চূড়ান্ত না করে লিখিতরূপে সংরক্ষণ করুন। প্রয়োজনের মুহূর্তে অবিকল মনে করার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকর কৌশল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা মেয়াদি ঋণ প্রদান করার ক্ষেত্রে ভুল থেকে বাঁচার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং ঋণের বিষয়টি লিখে রাখার আদেশ করেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

[البقرة: ২৮২]

অর্থ: ‘হে মুমিনগণ! তোমরা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও।’ (বাকারা, ২: ২৮২)

২০. প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়-দায়িত্বের একটি তালিকা তৈরি করুন। তালিকা তৈরির কাজটি চাইলে আপনি ক্যালেন্ডারে, নোটবুকে কিংবা মোবাইলের ক্যালেন্ডারের এড ইভেন্ট অপশনেও তৈরি করতে পারেন। তালিকা দেখে নির্দিষ্ট সময়ের কাজটি সহজেই মনে করতে পারবেন। মোবাইলে সেভ করে রাখলে মোবাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট সময়ে আপনার কাজের কথা মনে করিয়ে দিবে।

২১. আপনার ভুলো মানসিকতা ও স্মৃতিবিভ্রম যদি অতিমাত্রায় ও অস্বাভাবিক পর্যায়ে হয়ে থাকে, তাহলে আপনার মানসিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে

- ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে কুণ্ঠিত হবেন না। এমন গুরুতর ডাক্তার পাবেন আপনার সমস্যা চিহ্নিত করে তার সমাধান দিতে।
২২. মেধা ও স্মরণশক্তিকে দুর্বল করে দেয়, ভুলো মানসিকতা ও স্মৃতিবিভ্রম ঘটায়, এমন সমস্ত বস্তু পরিহার করুন। যেমন: অ্যালকোহল জাতীয় পানীয়, ধূমপান, মাদক, ড্রাগস ও অনবরত রাত্রিজাগরণ ইত্যাদি।
২৩. ভুলে যাওয়ার সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য একটি কার্যকর পন্থা হলো, সদ্য-জানা বিষয়গুলোকে প্রসিদ্ধ কোনো স্থান কিংবা বিষয়ের সাথে জুড়ে দেওয়া। যেমন: অপরিচিত কারোর সাথে সাক্ষাৎ হলো। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, তার নাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ। আপনি ঠিক করে নিন, তার নাম তো অবিকল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামের সাথে মিলে যায়। পরে কখনো তার সাথে দেখা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামের বদৌলতে তার নামটি সহজেই মনে পড়ে যাবে।
২৪. যে বিষয়টি আপনি পড়েছেন ও মুখস্থ করেছেন, তা যদি ভুলে যান তাহলে দ্বিতীয়বার সরাসরি মুখস্থ করতে যাবেন না। এ পর্যায়ে আপনি বিষয়টির অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বোঝার চেষ্টা করুন। এরপর বিষয়টির সারসংক্ষেপ লিখে আপনার টেবিলের ওপর সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখুন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বারবার দেখতে দেখতে বিষয়টি অনায়াসেই আত্মস্থ হয়ে যাবে।
২৫. পবিত্র কুরআনের এ দু'আটি বারবার পাঠ করুন:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ২৮৬]

অর্থ: '(হে মুসলিমগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে এই দু'আ কর যে,) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দ্বারা যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় তবে সে জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না।' (সূরা বাকারা, ২: ২৮৬)

২৬. বারবার ভুলে যাওয়ার কারণে শঙ্কিত হবেন না। আশাহত হয়ে পড়বেন না। মনে রাখবেন, বিস্মৃতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক বিরাট নিয়ামত। এক জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও জ্বালা-যন্ত্রণার কথা যদি মানুষ মনে করতে পারত, তাহলে এই মনঃকষ্টেই সে মৃত্যুবরণ করত।

পরিশিষ্ট:

❖ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (سنن ابن ماجه ١/ ٦٥٩)

অর্থ: ‘আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মতের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং এমন অপরাধও ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা করার জন্য তাদের বাধ্য করা হয়েছে।’ (ইবনে মাযাহ, ১/৬৫৯)

❖ বিখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদ ও ইসলামি ইতিহাসবেত্তা ইমাম যাহাবী (রহ.) (৬৭৩-৭৪৮ হি.) তাঁর ‘সিয়াকু আলামিন নুবালা’ গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন:

জনৈক মুহাদ্দিস তার ভুলো মনের কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এক রাতে তিনি সুস্বাদু মাছ নিয়ে বাড়িতে এলেন। মাছটি ভালোভাবে রান্না করতে বলে সামান্য বিশ্রামের জন্য বিছানায় পিঠ লাগালেন। এরপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন, নিজেও টের পাননি।

ইতোমধ্যেই মাছ রান্না হয়ে গেছে। একজন ডাকতে এসে দেখল, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। দিনভর ক্লান্তির পর ঘুম, জাগানো উচিত হবে না—এই ভেবে সে চলে গেলো। পরিবারের সবাই রাতের খাবার শেষে শায়েখের হাতে আলগোছে মাছের তেল মাখিয়ে দিল।

ফজরের আজানে শায়েখের ঘুম ভাঙল। উঠেই তিনি মাছ খেতে চাইলেন। বললেন:

‘মাছ কোথায়? মাছ নিয়ে এস। আমি তো মাছ খাইনি।’

পরিবারের সদস্যরা বলল:

‘রাতে আমাদের সাথেই তো আপনি মাছ খেয়েছেন।’

শায়েখ বললেন:

‘কিছুতেই না, আমি মাছ খাইনি।’

পরিবারের সদস্যরা বলল:

‘তাহলে আপনার হাত শুঁকে দেখুন ।’

শায়েখ হাত শুঁকে মাছের ঘ্রাণ পেলেন । বললেন:

‘তোমাদের কথাই ঠিক । বোধ হয় আমিই ভুলে গেছি ।’

- ❖ জনৈক দার্শনিক বলেছেন, ‘মানুষের ওপর আল্লাহ তা‘আলার দুটি বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে । এ দুটি অনুগ্রহ ছাড়া সুখে শান্তিতে বাঁচতে পারতো না । দুটি অনুগ্রহের একটি ভুলে যাওয়া, অপরটি আশা-ভরসা । দুঃখ বেদনার বিস্মৃতি ছাড়া অশ্রুসিক্ত চোখ নিদ্রাবিভোর হতে পারে না । আশা-ভরসার হাতছানি ব্যতীত বেদনাবিধূর হৃদয়ে আশার আলো জ্বলতে পারে না ।

সড়ক দুর্ঘটনা

যখন আমরা গাড়ি ড্রাইভ করি, আমাদের সামান্য অসতর্কতার কারণে যুহুতেই তা এক যন্ত্রদানব ও মরণাস্ত্রে পরিণত হতে পারে। গাড়িযোগে যে বিনোদন কেন্দ্র কিংবা কর্মস্থলে যাওয়ার কথা ছিল, তার পরিবর্তে আমাদের ঠিকানা হতে পারে (আল্লাহ না করুন) হাসপাতাল কিংবা কবরস্থান।

বিশ্বে প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে সড়ক দুর্ঘটনা। যন্ত্রদানবের তাণ্ডব প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী নানা শ্রেণির মানুষের। সড়ক দুর্ঘটনা যেন মানবতার বিরুদ্ধে নীরব যুদ্ধ ও গুপ্তঘাতক। অতি সঙ্গোপনে কী নির্মমভাবে কতশতো মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে!

সড়ক দুর্ঘটনার কারণে কত প্রাণ ঝরেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কত রক্ত ঝরেছে, এর কোনো হিসাব নেই। কত পরিবার সমূলে ধ্বংস হয়েছে, কত অর্থ-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, এর কোনো হিসাব নেই। এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য আমাদের প্রতিনিয়ত দেখতে হয় পত্র-পত্রিকায়, টিভির পর্দায়। হৃদয় কেঁপে উঠে যখন দেখি, একই পরিবারের পাঁচ-ছয়জন একসাথে নিহত হতে।

বর্তমান বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক সংকটের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ সংকটের কবলে মায়েরা সন্তানহারা হচ্ছে। নারীরা বিধবা হচ্ছে। এতিম হচ্ছে সন্তান-সন্ততি। কত লোক অচল হয় বিছানায় পড়ে আছে।

বিশ্বমানবতার কল্যাণে অবশ্যই আমাদের এ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে হবে। এ সংকট উত্তরণের পথ অবলম্বন করতে হবে।

সমাধান:

১. মা-বাবার পক্ষ থেকে সন্তানদের সতর্ক করতে হবে সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে। তাদের মধ্যে সড়ক-চলাচল ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
২. দেশের জনপ্রিয় প্রচার-মাধ্যমগুলোর সাহায্যে রাস্তা পারাপার, সড়ক ও ট্রাফিক আইন-শিক্ষামূলক কার্যক্রম সম্প্রচার করে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের রাস্তা পারাপার ও সড়ক আইন সম্পর্কে অবহিত করা কর্তব্য।
৩. ড্রাইভিং লাইসেন্স অনুমোদনের সময় বয়সের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালের সদ্য তরুণদের ও উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের হেঁয়ালিপনা ও খেয়ালি মানসিকতা প্রবল থাকে। এ বয়সের ছেলে-মেয়েদের হাতে গাড়ির চাবি ও ড্রাইভিং লাইসেন্স তুলে দিলে সড়ক নিরাপত্তা চরম হুমকির মুখে পড়বে।
৪. গাড়িচালকদের জন্য প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম চালু করতে হবে। যেখানে ভিডিও চিত্র ও বাস্তবে প্রায়োগিক পদ্ধতিতে গাড়ি চালানোর কলাকৌশল এবং সড়ক ও ট্রাফিক আইন-কানুন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের মেডিকেল সার্টিফিকেট যাচাই করা কর্তব্য।
৫. নিরাপদ ও উন্নত সড়ক-ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে হবে।
 - সড়ক নির্মাণ ও এর সুরক্ষার জন্য সর্বাধুনিক উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং প্লান মোতাবেক কাজ করা এবং সময় ও প্রয়োজনানুযায়ী এর সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা।
 - সড়কের দুপাশে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা।
 - সড়কের পাশে গাড়ির সর্বোচ্চ গতি, প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও সড়কের পাশে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির দিকনির্দেশনা-সংবলিত ফলক স্থাপন করা।

- পথচারীদের পারাপার ও গাড়ি পার্কিংয়ের সুব্যবস্থা করা।
- যেকোনো সড়ক দুর্ঘটনায় দ্রুত অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।
- রাস্তার সংস্কার ও খননকাজ করার সময় ভারি যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সাবধানে ব্যবহার করা।

৬. যারা সড়ক ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করবে, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইন প্রণয়ন করতে হবে। অপরাধের গুরুতরতা অনুযায়ী আর্থিক জরিমানা থেকে শুরু করে উপযুক্ত দণ্ডবিধি কার্যকর করতে হবে।

যারা সুনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ট্রাফিক আইন মেনে চলবে, জনসম্মুখে তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। যেমন: কোনো গাড়িচালক সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অবধি কোনো সড়ক ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করেনি, রাস্তাঘাটে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট করেনি এবং দুর্ঘটনার শিকার হয়নি।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ব্যক্তি খারাপ কাজ করল, সমাজের কেউ তাকে তিরস্কার করল না; আরেক ব্যক্তি ভালো কাজ করল, কারো পক্ষ থেকে সে পুরস্কৃত হলো না, বুঝতে হবে সমাজে অবক্ষয় চলছে।

৭. যখন যানবাহনে আরোহণ করবেন, দু'আ পড়তে ভুলবেন না। যানবাহনে আরোহনের দু'আ হলো:

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

৮. প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করুন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকনির্দেশনা শুনুন:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلْهَا وَاتَّوَكَّلْ، أَوْ أَطْلِقْهَا وَاتَّوَكَّلْ؟
قَالَ: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» (سنن الترمذي: ৬/ ৬৬৮)

অর্থ: জনৈক সাহাবি এসে জিজ্ঞেস করলেন:

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি উট বেঁধে তার নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসা করব? না কি লাগামহীন ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করব?’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

‘প্রথমে তুমি উট বাঁধ, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা কর।’
(তিরমিযী, ৪/৬৬৮)

সুতরাং আপনি নিজের সাধ্যমতো সতর্কতা অবলম্বন করুন। পথনির্দেশ ও ট্রাফিক সিগন্যাল মেনে চলুন। সড়ক ও ট্রাফিক আইন রক্ষায় প্রতিশ্রুতিশীল হোন।

৯. গাড়ি চালানো ও হেঁটে চলাচল করার ক্ষেত্রে কয়েকটি আইন মেনে চলুন:
 - ট্রাফিক পুলিশের সম্মান বজায় রাখুন। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করুন।
 - অনর্থক হর্ন বাজিয়ে শব্দ দূষণ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন।
 - সড়ক অনুযায়ী গাড়ির নির্দিষ্ট গতিসীমা বজায় রাখুন।
 - রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকুন। কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে সরিয়ে ফেলুন।
১০. অহংকার ও দাস্তিকতাপূর্ণ চাল ছেড়ে বিনম্রভাবে চলাচল করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ:

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ

الْجِبَالِ طُؤًا﴾ [الإسراء: ৩৭]

অর্থ: ‘ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলো না। তুমি তো ভূমিকে ফাটিয়ে ফেলতে পারবে না এবং উচ্চতায় পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। (বনী ইসরাঈল, ১৭: ৩৭)

১১. আপনি যদি পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন, তাহলে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে রাস্তার পাশে কিংবা পথচারীদের জন্য নির্ধারিত পথে যাতায়াত করুন।

রাস্তা পার হওয়ার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করুন। তড়িঘড়ি করে রাস্তা পার হওয়ার প্রবণতা ছেড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের অপেক্ষা করুন।

১২. গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যাত্রীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা আপনার প্রধান কর্তব্য, মহাগুরুত্বপূর্ণ আমানত। আপনার সামান্য অবহেলায় অসতর্কতায় যাত্রীদের জান-মাল বিরাট ঝুঁকির কবলে পড়তে পারে। মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে।
১৩. নেশাগ্রস্ত, মানসিক ভারসাম্যহীন, নিদ্রাকাতর, ক্লান্তশ্রান্ত, ভীষণ মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুর্বল ইত্যাদি প্রতিকূল অবস্থায়—যা আপনার ও যাত্রীদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে পারে—গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন।
১৪. রাতে গাড়ি চালাতে হলে ফ্লাগলাইট, পেছনের লাল-বাতি, হলুদ বাতি ঠিক আছে কি না, নিশ্চিত হোন। এ বাতিগুলোর সাহায্যেই অন্যান্য গাড়ির চালকগণ আপনার গতিবিধি বুঝতে পারবে। রাতে রাস্তায় চলাচল করতে হলে উজ্জ্বল রঙের জামা পরিধান করুন। যেন গাড়ির চালকরা সহজেই আপনার উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারে।
১৫. নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গাড়ি ফিটনেস যাচাই করুন। এ বিষয়ে আপনার সামান্য অবহেলা ও গাড়ির ফিটনেসের ঘাটতি বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে।
গাড়ি মেরামতের প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সাথেই রাখুন। যেন পথিমধ্যে আকস্মিক সমস্যাগুলোতে গাড়ির প্রাথমিক মেরামত নিজেই সেরে ফেলতে পারেন।
১৬. গাড়ি চালানোর সময় অন্য সমস্ত চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে সামনের রাস্তায় মনোযোগ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। আপনার সামনে চলন্ত গাড়ির সাথে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
১৭. গাড়ি চালানোর সময় বিশেষভাবে মোবাইলে কথাবার্তা কিংবা কোনো যাত্রীর সাথে আলাপ-আলোচনা থেকে বিরত থাকুন।

১৮. সুনির্দিষ্ট সিগন্যালের সাহায্যে অন্য চালকদের আপনার গতিবিধির জানান দিন। যেমন: ডানে-বায়ে মোড় নেওয়ার সময় কিংবা গাড়ি থামানোর সময় সিগন্যাল দিয়ে পেছনের চালকদের সতর্ক করুন। অতিরিক্ত গতি বাড়িয়ে সামনের গাড়িগুলোকে ওভারটেক করার চেষ্টা করবেন না। পেছনের গাড়ি আপনার আগে চলে যাওয়ার কারণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবেন না।

১৯. সড়ক দুর্ঘটনার সময় কৌতূহলজনিত ভিড় না করে নিরাপত্তা ও মেডিকেলকর্মীদের উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করুন। আহত-নিহতের সাহায্যে এগিয়ে আসুন। এ সময় কৌতূহলী জনতার অযাচিৎ ভিড় উদ্ধারকর্মীদের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

এমন গুরুতর মানবিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে না এসে তাদের ছবি ও ভিডিও চিত্র ধারণ করে প্রচার করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

পরিশিষ্ট:

❖ ব্রিজট ড্রস্কল বিশ্বে প্রথম ব্যক্তি, যিনি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল ১৮৯৬ সালের ১৭ আগস্ট লন্ডন শহরে।

তিনি ছিলেন দু' সন্তানের জননী। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৪৪ বছর। সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটার সময় তিনি ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। জানা যায়, তখনকার যুগে কেউ সাধারণত ছয় কিলোমিটারের চেয়ে বেশি গতিতে গাড়ি চালাত না।

সড়ক দুর্ঘটনায় ব্রিজট ড্রস্কনের মৃত্যুর পর জনৈক গবেষক লোকদের সতর্ক করে বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতে যেন এমন দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।'

তার এমন কঠোর সতর্কবাণীর পরও সড়ক দুর্ঘটনায় কত লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে, আজও ঘটছে, তার কোনো হিসাব নেই।

❖ আমেরিকান প্রবাদ:

'কাজক্ষিত গন্তব্যে চিরদিনের জন্য না পৌঁছানোর চেয়ে সাময়িক গন্তব্যে একটু বিলম্বে পৌঁছাই শ্রেয়।'

অবসর

লেখাপড়া ও কাজকর্মের মধ্যে যে ছুটি ও কর্মবিরতি থাকে, তাই অবসর। পেশা ও দায়িত্বের তারতম্যভেদে আমাদের অবসরও কম-বেশি হয়ে থাকে। অবসর নিয়ে মানুষের বিচিত্র অনুভূতি। কেউ কাজ ছাড়া, ব্যস্ততা ছাড়া একদণ্ড বসে থাকতে পারে না। কেউ বা আবার অধীর আগ্রহে ছুটি ও অবসরের প্রতীক্ষায় দিন গুনতে থাকে।

ছুটি, কর্মবিরতি ও অবসর-যাই বলেন না কেন-এর মূল উদ্দেশ্য হলো, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের দায়দায়িত্বের একঘেয়েমি দূর করে, বিশ্রাম ও আনন্দ-বিনোদনের সুযোগ দিয়ে নব উদ্যম-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

অবসর হলো বৈধ আনন্দ-বিনোদন উপভোগের এবং নিজের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে কাজ করার এক সূবর্ণ সুযোগ। তা না করে ব্যক্তি যদি ঘরকুনো হয়ে একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতায় ডুবে থাকে, কিংবা অসৎ সঙ্গদোষে নানা অন্যায়-অপকর্মে, পাপাচারে-অনাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে অবসর তার অকল্যাণ ও ক্ষতির কারণ।

এমন কত ব্যক্তি আছে, যারা অবসরের সুযোগে বিপথে পা বাড়িয়েছে। এরপর কর্মজীবনের মতো ব্যস্ততা তাদের সুপথে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শত বিচ্যুতি ও পদস্থলন তার ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত করে ছেড়েছে।

কত লোক অবসরে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বে নানা জল্পনা-কল্পনার শিকার হয়েছে। উদ্ভট চিন্তা-চেতনায় বিপথগামী হয়েছে।

আমরা যদি অবসরের সুফল ভোগ করতে চাই, এর ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে বাঁচতে চাই, তাহলে অবশ্যই তা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

সমাধান:

১. অবসর পেলে দু'রাকাত নামায আদায় করুন। কিছুক্ষণ যিকির করুন। ভালো বই পড়ুন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যান। কিংবা পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত মুখস্থ করে ফেলুন। অবসরের মুহূর্তে এ আমলগুলো আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুঁজি এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায়।

২. সময়মতো জামাতের সাথে পাঁচওয়াক্ত নামাযে যত্নবান হোন। বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করুন। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় নিমগ্ন থাকুন। ওলামায়ে কিরাম, জ্ঞানী-গুণী ও সফল আশাবাদী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকুন।

অবসরে নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে জল্পনা-কল্পনা ও উদ্ভট ধ্যান-ধারণার কাছে সঁপে দিবেন না।

কবি আবুল আতাহিয়া বলেছেন:

‘কল্যাণ অর্জনের জন্য কর্মব্যস্ততাই শ্রেয়। আর অবসর তো যত অনর্থক কথাবার্তা ও গুজব-রটা গালগল্পের আখড়া।’

৩. একটি দৈনন্দিন রুটিন তৈরি করুন। প্রতিটি কাজ রুটিনমাসিক সময়মতো সম্পন্ন করুন। কোনো কাজে অবহেলা করা, এক মুহূর্ত বিলম্ব করা সমীচীন নয়। কাজে বিলম্ব করার প্রবণতা সময়ের সুফল লাভের সুযোগ নষ্ট করে ফেলে।

৪. অবসরে স্বপ্নবান, প্রজ্ঞাবান ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকুন। তাঁদের সংস্পর্শ আপনাকে সময়ের সদ্যবহারে অনুপ্রাণিত করবে। অলস, হিংসুক, পশ্চাদপদ ও নিরাশাবাদী লোকের সঙ্গে ত্যাগ করুন। বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করুন। মহৎ হিতবাদী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করুন।

৫. কর্মজীবনের গতানুগতিক কর্মধারার বাইরে, শিক্ষাজীবনের একঘেয়েমি সিলেবাসের চাপমুক্ত অবসরের সময়টা আপনার জীবনের সুবর্ণ সুযোগ।

এ সুযোগ আপনি ব্যক্তিগত পঠন-পাঠন, জ্ঞান চর্চা, ব্যক্তিত্ব গঠন ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচর্যায় কাজে লাগান।

এ লক্ষ্যে কোনো বিজ্ঞ আলোমে দ্বীনের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-দীক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন। এ জাতীয় কার্যক্রম আপনার জ্ঞান-বিদ্যা, বোধ-উপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনার জগৎকে আরও ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ করবে।

মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করুন। আপনার ঈমান বৃদ্ধি পাবে। অথবা নিজের জীবন ও ব্যক্তিত্বকে আরও সুন্দর সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করুন।

৬. একটি দ্বীনি আমল শেষ করার পর কোনো জাগতিক প্রয়োজনীয় কাজ করুন। একটা ব্যক্তিগত কাজ করার পর পারিবারিক কাজে সাহায্য করুন। অবসরে ঘর-দোর ও বাসাবাড়ির খোঁজ-খবর নিন। যা মেরামত করা প্রয়োজন, তা মেরামত করুন। যা গোছানো দরকার, গুছিয়ে রাখুন।

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন আপনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। তিনি নিজ হাতে জুতা সেলাই করতেন। কাপড়ে তালি লাগাতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন। জীবনের একটি মুহূর্তও তাঁর কর্মহীন অবসর ছিল না। (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: ৮, ৭]

অর্থ: 'সুতরাং তুমি যখন অবসর পাও, তখন (ইবাদতে) নিজেকে পরিশ্রান্ত কর। এবং নিজ প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হও।'

(শারহ, ৯৪: ৭, ৮)

৭. ঘরে বসে দীর্ঘ অবসর না কাটিয়ে কোনো ক্রীড়াসংঘে যুক্ত হোন। তাদের বিভিন্ন ধরনের শরীরচর্চা ও খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করুন। এতে আপনার দৈহিক ও মানসিক উদ্দীপনা অটুট থাকবে।
৮. অবসরে সময়-সুযোগ পেয়ে, বাড়িতে মুখরোচক খাবারের সমাহার দেখে অতি ভোজনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন না। কায়িক পরিশ্রমহীন অবসর ও অতি ভোজন আপনার ওজন বাড়িয়ে দিবে। সঙ্গে সঙ্গে অলসতা দুর্বলতা দানা বাঁধতে শুরু করবে।

রাতে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ুন। দীর্ঘ রাতজাগা থেকে বিরত থাকুন। নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুমের জন্য একটা রুটিন করে নিন। প্রতিদিন রুটিনমাসিক ঘুমান; কম না, বেশিও না।

৯. জীবনে যদি সুস্থতার নিয়ামত ও অবসরের সুযোগ লাভ করেন, তাহলে এটা আপনার জন্য সুবর্ণ সুযোগ ও বিরাট নিয়ামত। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয় করুন। জাগতিক কাজকর্ম সম্পন্ন করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ"

(صحيح البخاري (৮/৮৮))

অর্থ: 'দুটি নিয়ামত, অনেক মানুষ তা যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। সুস্থতা ও অবসর।' (বুখারী, ৮/৮৮)

সুতরাং সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করুন। সময়ের প্রতি অবহেলা ও গুরুত্বহীনতা আপনাকে ব্যর্থতার পথে ঠেলে দিবে। মনে হবে, আগামীকাল তো আজকের মতোই, গতকালকের মতোই গতানুগতিক। তাতে নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের কী আছে?

কিন্তু যে সময়ের গুরুত্ব বোঝে, অবসর কাজে লাগায়, তার কাছে প্রতিটা ভোরের সূর্যই অপার সম্ভাবনাময়। প্রতিটা দিনের আলো সফলতা অর্জনের প্রেরণা।

১০. প্রাতিষ্ঠানিক কর্মমুখর দিন আর অবসর দিনের কার্যধারার মধ্যে বিস্তর ফারাক। তাই ছুটির দিনগুলোর জন্য ভিন্ন রুটিন করুন।

প্রতিদিন সকালে উঠে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক করে নিন। এ রুটিন আপনাকে কর্তব্য পালনে সজাগ সচেতন করবে।

মনে রাখবেন, আপনি কর্মবিমুখ হয়ে থেমে থাকুন, কিংবা দায়িত্বে অবহেলা করে মগ্ন গতিতে চলুন, সময় কিন্তু থেমে নেই; আপন গতিতে ছুটে চলছে। তাই প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। অন্যথায় সময়-সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। আপনার কপালে জুটবে শুধু আফসোস অনুতাপ।

১১. গতানুগতিক জীবনধারা পরিবর্তন করুন। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক রেখে চিন্তাধারায় নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য আনুন। যেমন: স্থান পরিবর্তন করুন। নতুন কোনো জায়গায় বেড়াতে যান। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ভিন্ন ধারার বইপত্র পাঠ করুন। একই ধারার চিন্তা-ভাবনার বাইরে নতুন সৃষ্টিশীল বিদ্যা-বুদ্ধির চর্চা করুন। এতে গদবাঁধা জীবনের বিরক্তিকর গুমোট ভাব দূর হয়ে জীবন নতুনত্ব ও বৈচিত্র্যের রঙে রঞ্জিত হবে।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পাওলো কোয়েলহো বলেন:

‘মানুষের প্রতিটা দিন যদি একইভাবে, একই ধারায় অতিবাহিত হতে থাকে, তাহলে এর অর্থ হলো, তারা নতুন কিছু ভাবতে ভুলে গেছে; নতুন কিছু করতে ভুলে গেছে।’

১২. অবসর ও ছুটির সময়টা যদি সুপরিচালনা মাফিক না কাটান, তাহলে এর পরিণতির কথা একবার ভাবুন-বিরক্তি, অস্বস্তি, অলসতা, কর্মবিমুখতা, বিষণ্ণতা ও দুশ্চিন্তা আপনাকে ঘিরে ধরবে। পরবর্তী জীবনে অবসরের সুযোগ হাতছাড়া করার কারণে সম্ভাবনাময় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আফসোস-অনুতাপ করতে হবে। হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম জাওয়ী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন:

‘নিজেকে যদি সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে না পার, অসত্য ও অন্যায় তোমার ওপর জেঁকে বসবে।’

১৩. নিজের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা লালন করুন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করে উন্নতি-অগ্রগতি সাধনে সচেষ্ট থাকুন। হিজরতের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা‘আলা অগ্রগামী মুহাজিরদের প্রশংসা করে বলেছেন:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ ﴿التوبة: ১০০﴾

অর্থ: ‘মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথমে ঈমান এনেছে এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানরাজি তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহর বহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সাফল্য।’ (তাওবা, ৯: ১০০)

কল্যাণ অর্জনে সচেষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

اٰخِرُضْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ، (مسند الحميدي ٢/ ٢٦٧)

অর্থ: ‘যা তোমার জন্য মঙ্গলজনক তা অর্জনে সচেষ্টি হও, এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো।’ (মুসনাদুল হুমায়দী, ২/২৬৭)

১৪. ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ এক সেকেন্ডেই বলা যায়। এক সেকেন্ডের এ আমলটিই মিয়ানের পাল্লা ভারি করে দেয়। ‘মুসলিম’ শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

‘আল-হামদুলিল্লাহ মিয়ানের পাল্লা পূর্ণ করে দেয়।’

খুব স্বল্প সময়ে একশতবার সুবহানাল্লাহ পাঠ করা যায়। যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে সে একশত সওয়াব হাসিল করতে পারবে। এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, অবসরের কত সময় আমাদের অযথা কথাবার্তা ও অনর্থক কাজেকর্মে ব্যয় হয়েছে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ আমিরুল মু‘মিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন:

‘আল্লাহ তা‘আলা হাত দু’টি সৃষ্টি করেছেন কাজ করার জন্য। তা যদি ভালো কাজে নিয়োজিত না থাকে, তাহলে গুনাহ ও নাফরমানিতে লিপ্ত হবে। সুতরাং হাত দু’টিকে ন্যায় ও কল্যাণের স্বার্থে কাজে লাগান। অন্যায়-অন্যায্য থেকে বিরত রাখুন।’

- ❖ ফরাসি লেখক ও দার্শনিক ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘সময় নষ্ট করার চারটা পথ: অবসর, অবহেলা, খারাপ কাজ ও সময়ের কর্তব্য সময়ে পালন না করা।’

- ❖ 'অবসর সময়ে ঘরকুনো হয়ে গুমরে পড়ে থাকা আত্মহত্যার পথে ধাবিত করে।' -ড. আয়েয করনী
- ❖ হাফেজ ইবনুল কাইয়্যাম জাওযী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.) বলেছেন :
'শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) অন্যদের কাজেকর্মে সাহায্য-সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কেননা তিনি জানতেন, যে অন্যকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। তাইতো অলস-অকর্মা লোকদের দেখবে, তারা বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট, উদ্যমহীন ও কর্মবিমুখ। কিন্তু যারা কর্মব্যস্ত উদ্যমী, তারা গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়েই সমান তৎপর।'
- ❖ ঈসা বিন যায়েদ মারাকি নিজের ঘটনার বর্ণনা করেন:
'আমার এক গোলাম ছিল। আল্লাহর যমীনে তার মতো অলস-অকর্মা আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। একদিন তাকে বাজারে পাঠলাম আগুর ও ডুমুর ফল কিনে আনতে। সে যখন বাজার থেকে ফিরে এসেছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। তার ওপর শুধু আগুর নিয়ে এসেছে; ডুমুর ফল আনেনি।
বললাম:
'এমনিতেই তুমি দেরি করে এসেছ। তার ওপর দু'টি কাজের কথা বলেছিলাম, করেছ একটা।'
এ অপরাধে তাকে শাস্তি দিলাম-আজ থেকে তোমার দায়িত্ব হলো, তোমাকে একটা কাজের কথা বললে দু'টা কাজ করবে।
এর কিছুদিন পরই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। গোলামকে পাঠাই একজন ডাক্তার ডেকে আনতে। সে যখন ফিরে এসেছে, তার সাথে আরও একজন লোক। গোলামকে জিজ্ঞেস করলাম:
'এ ডাক্তার সাহেবকে তো আমি চিনি। তার সাথে এই লোকটা কে?'
গোলাম বলল:
'ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করবে। চিকিৎসায় যদি কাজ না হয়, এবং (আল্লাহ না করুন) যদি আপনার মৃত্যু হয়, তাহলে এই লোকটা আপনার কবর খননের কাজ করবে।'

অপচয়

যেকোনো বস্তুর অপব্যবহার, অপাত্রে ব্যবহার ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়কেই অপচয়-অপব্যয় বলা হয়। এখানে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো অর্থের অপচয়।

মানুষ যখন কোনো আর্থিক বিচারবুদ্ধি ছাড়া, যাচ্ছেতাইভাবে, সাধ্য ও সামর্থ্যের সীমা ছাড়িয়ে অর্থ ব্যয় করতে থাকে, তখন এটাকে অপচয় বলে। এমনতাবস্থায় তার কাছে অর্থ-সম্পদের কোনো মূল্য থাকে না। কারণে-অকারণে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে লাগামহীনভাবে অর্থব্যয় করতে থাকে।

মানুষ এটা করতে পারে, যখন সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বীভাবে। সঞ্চিত অর্থ আয়ের উৎসটাকে নিজের রক্ষক ও সহায়ক বলে বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿كَذَٰلِكَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّطٌ ۖ * أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَىٰ﴾ [العلق: ৬, ৭]

অর্থ: 'বস্তৃত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে। কেননা সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে।' (আলাক, ৯৬: ৬-৭)

একটি জাতির উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত-যেকোনো শ্রেণির মধ্যে অপচয়প্রবণতা দেখা দিতে পারে। তবে সাধারণত উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই ভোগবিলাস ও অপচয়প্রবণতা প্রকট আকার ধারণ করে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সর্বক্ষেত্রেই অপচয়ের সূত্র ধরে বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কারণ, অপচয় হয়ে থাকে মূলত অন্যের হক নষ্ট করে, কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ করে।

সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের স্বীকৃত অভিমত হলো, কোনো জাতির অপচয়-অপব্যয় ও ভোগ-বিলাসিতার যখন চূড়ান্ত হয়, তাদের নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় অনিবার্য। পবিত্র কুরআনে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ১৬]

অর্থ: 'আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনবসতির প্রতি আমার আঘাবের ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেই।' (ইসরাঈল, ১৭: ১৬)

সুতরাং কোনো জাতি যদি অধঃপতন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে চায়, অবশ্যই তাকে অপচয়, অপব্যয়ের পথ থেকে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু এর উপায় কী? এক্ষেত্রে যথার্থ করণীয় কী?

সমাধান:

১. অপচয় সম্পর্কে, অপব্যয়ের ক্ষতি ও পরিণতি সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ কী বলেছে, এ সংকট নিরসনে কুরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা কী-এ সম্পর্কে জানুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা অপচয়কারীদের সম্পর্কে বলেছেন:

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا﴾ [الإسراء: ২৭]

অর্থ: 'নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।' (বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৭)

২. মনে রাখুন, অর্থ-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তির কোনোটাই আপনার চিরস্থায়ী মালিকানাধীন নয়। অন্যের হাত ঘুরে তা যেমন আপনার মালিকানাধীন হয়েছে, আপনার হাত ঘুরেও অন্যের মালিকানায় চলে যাবে।

প্রখ্যাত মুসলিম সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খৃষ্টাব্দ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন'-এ লিখেছেন:

'অপচয়-অপব্যয় ও ভোগবিলাস যেকোনো জাতি ও রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।'

পবিত্র কুরআনের আয়াত এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ১৬]

অর্থ: 'আমি যখন কোন জনবসতিকে ধ্বংস করতে চাই তখন তাদের সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে আদেশ করি (আমার আদেশ মেনে চলার জন্য)। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করতে থাকে। তখন সে জনবসতির প্রতি আমার আযাবের ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তখন আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দেই।' (ইসরাঈল, ১৭: ১৬)

আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের বলে আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করছেন, শখ-শৌখিনতা ও ভোগ-বিলাসের ষোলোকলা পূর্ণ করছেন; কিন্তু একটিবারও কি ভেবেছেন, সমাজের কত লোক এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে? কত পরিবার দু'বেলা খেতে পায় না? কত নিঃস্ব, হতদরিদ্র আপনার সাহায্যের মুখাপেক্ষী?

মুস্তফা মানফালুতী^{৪৪} যথার্থ বলেছেন :

مَا رَأَيْتُ مُسْرِفًا مُتْرَفًا إِلَّا وَجَدْتُ بِجَانِبِهِ بَائِسًا جَائِعًا.

অর্থ: 'প্রত্যেক অপব্যয়ী, বিলাসী ব্যক্তির পাশে একজন ক্ষুধার্ত হতদরিদ্রকে দেখতে পাই।'

৪. অপচয়-অপব্যয়ের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করুন। শরীর-স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতার ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং আর্থসামাজিক বৈষম্য ও বিশৃঙ্খলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

^{৪৪} মুস্তফা লুতফী মানফালুতী। প্রখ্যাত মিসরীয় কবি সাহিত্যিক। সাহিত্যকর্মে তিনি একটি স্বকীয় ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অনুবাদকর্মেও তার অনন্য অবদান সর্বজনে স্বীকৃত। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের অন্যতম কীর্তি হলো "আন্না জারাত" ও "আল-আবারাত" গ্রন্থ। (অনুবাদক)

অর্থ: 'আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (আ'রাফ, ৭: ৩১)

৫. ব্যক্তিগতভাবে ও পারিবারিকভাবে একটি সুষ্ঠু, ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থার অর্থনীতি মেনে চলুন। সুখী ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারবেন। এ দিকনির্দেশনা পবিত্র কুরআনের:

﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ২৭]

অর্থ: '(কৃপণতাবশে) তোমার হাতকে তোমার গলার সাথে বেঁধে দিও না, আর (অপব্যয়ী হয়ে) তা একেবারে প্রসারিত করেও দিওনা, তা করলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।' (বনী ইসরাঈল, ১৭: ২৯)

৬. স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে-তারা যদি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান না হয়, সাংসারিক বোধ-বুদ্ধিতে পাকাপোক্ত না হয়, তাহলে তাদের হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া সমীচীন নয়। কেননা সম্পদ হলো আপনার হাতে আমানত। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা শুনুন:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: ৫]

অর্থ: 'তোমরা অবুঝ (ইয়াতীম)দের কাছে নিজেদের সেই সম্পদ অর্পণ করো না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনের অবলম্বন বানিয়েছেন। তবে তাদেরকে তা থেকে খাওয়াও পরাও আর তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গতভাবে কথা বল।' (নিসা, ৪: ৫)

৭. খরচ করার আগে অপব্যয় হবে কি না এবং খরচ করার পর অপচয় হলো কি না-বিষয়টি যাচাই করে দেখুন। অবহেলা, অযত্নে সম্পদ নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণে অবহেলা সমাজে ধোঁকা প্রতারণা চৌর্যবৃত্তির পথ খুলে দেয়।

৮. মনে রাখবেন, আপনার অর্থ-সম্পদ ও আয়-ব্যয় সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে। তাই আপন রবের নিকট হিসাব দেওয়ার পূর্বে নিজেই নিজেকে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِكَ فِيمَا أَفْنَيْتَ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَ، وَعَنْ مَالِكَ مِنْ أَيْنَ كَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ، وَمَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ" (মসন্দ

أبي يعلى الموصلي ১৭৮/৯)

অর্থ: 'কিয়ামত দিবসে আদম সন্তানের পা নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: তার জীবন সম্পর্কে, কী কাজে তুমি তোমার জীবন নিঃশেষ করেছ? তার যৌবন সম্পর্কে, কীসে তোমার যৌবন ক্ষয় করেছ? তার অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে, কোন পথে উপার্জন করেছ, আর কোন পথে ব্যয় করেছ? যে জ্ঞানার্জন করেছ, তার ওপর কতটুকু আমল করেছ?' (মুসনাদে আবু ইয়াল্লা মুসিলী, ৯/১৭৮)

৯. মনে রাখতে হবে, মহান দাতা আপনাকে যে সচ্ছলতা দান করেছেন, মুহূর্তের মধ্যে তিনি তা ছিনিয়েও নিতে পারেন। পূর্বের বহু জাতিবর্গ, যারা অপচয়-অপব্যয়, ভোগবিলাস ও সীমালঙ্ঘনে মগ্ন ছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে তাদের অবস্থা এভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا^ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ [النمل : ৫২, ৫৩]

অর্থ: 'ওই তো তাদের ঘর-বাড়ি, যা তাদের যুলুমের কারণে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয়ই যারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য এতে আছে শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ।

আরা যারা ঈমান এনেছিল ও তাকওয়া অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আমি রক্ষা করি।' (নামল, ২৭: ৫২-৫৩)

১০. অচয়কারী ও অপব্যয়দের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা কাছে ঘেঁষবেন না। সঙ্গ-দোষে আপনিও অপব্যয়ের দোষে দুষ্ট হতে পারেন। জীবন-যাপনে মধ্যপন্থি ও পরিমিতিবোধ-সম্পন্ন ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থাকুন। ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের সংস্পর্শ আপনার জন্য সহায়ক হবে।
১১. আর্থিকভাবে আপনি যতই সচ্ছল ও অবস্থা-সম্পন্ন হোন-না-কেন, নিজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কেনাকাটা নিজেই করার চেষ্টা করুন। পরিবারের আর্থিক বিষয়গুলো নিজেই দেখভাল করুন।
১২. আপনার কর্তব্য হলো, মধ্যপন্থায় ব্যয় করা এবং অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করা। এখন হয়ত আপনি সুস্থ, সচ্ছল ও নিরাপদ জীবনযাপন করছেন; কিন্তু অসুস্থতা, অসচ্ছলতা ও বিপদ-আপদ-এগুলোও জীবনের অংশ। জীবনের এসব প্রতিকূলতার মুহূর্তে সঞ্চিত সম্পদ আপনার একনিষ্ঠ সহযোগী। বিজ্ঞজন যথার্থ বলেছেন:

‘সুখের দিনগুলোতে সম্ভাব্য বিপদ-মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ কর।’

১৩. অপচয় থেকে বাঁচতে গিয়ে কৃপণতার মতো নিকৃষ্ট স্বভাবদোষে দুষ্ট হওয়াও ঠিক নয়। স্বভাবধর্ম ইসলাম অপব্যয় ও কৃপণতা-এর কোনোটাকেই সমর্থ করে না; বরং এ দুটিকে পাশে রেখে মধ্যপন্থা অবলম্বনের দিকনির্দেশনা প্রদান করে। পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকানে আল্লাহ তা‘আলার প্রকৃত বান্দাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। একটি বৈশিষ্ট্য হলো (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا﴾ [الفرقان: ৬৭]

অর্থ: ‘এবং যারা ব্যয় করার সময় না করে অপব্যয় এবং না করে কার্পণ্য; বরং তাদের পন্থা হল (বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতার) মধ্যবর্তী ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা।’ (ফুরকান, ২৫: ৬৭)

পরিশিষ্ট:

- ❖ আব্বাসীয় খেলাফতকালে বারামিকা জাতি ছিল রাজ্য জয়, শাসন ও নেতৃত্বগুণে অনন্য। অর্থনীতি ও রাজনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আব্বাসী খলিফাদের ওপরও ছিল তাদের বিস্তার প্রভাব-ক্ষমতা। বাদশা হারুনুর রশীদের যুগেও তারা ছিল রাজকীয় আদর-সমাদরের পাত্র।

রাজকীয় সুযোগ-সুবিধা পেয়ে তারা অপচয়-অপব্যয় ও ভোগবিলাসে মেতে উঠল। শখ-শৌখিনতার পেছনে কাড়িকাড়ি অর্থ ঢালতে লাগল। অবশেষে বাদশাহ হারুনুর রশীদের শাসনামলেই বারামিকা জাতির ক্ষমতা, শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হলো। এরপর তারা আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি।

এক যুবক শহরের পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধাকে দেখল, রাস্তার পাশে বসে কেঁদে-কেঁদে ভিক্ষা করছে। যুবক জিজ্ঞেস করল:

‘তোমার পরিচয় কী? তোমার এ অবস্থা হলোই বা কীভাবে?’

বৃদ্ধা অনুতাপের সুরে শুধু এতটুকুই বলল:

‘আমি বারামিকা গোষ্ঠীর লোক।’

যুবক বিস্ময়ে ‘থ’ হবার দশা। বলল:

‘হায় আল্লাহ! এ কী বলছ! তোমরা তো ছিলে শাসন-ক্ষমতার অধিকারী। অর্থপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ জাতি।’

এবার বৃদ্ধা তার অতীতের কথা খুলে বলল:

‘বললে হয়ত বিশ্বাস করবে না, যৌবনে আমি এমন আরাম-আয়েশ ও ভোগবিলাসে ছিলাম, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবেন না। স্বর্ণের পানি দিয়ে আমাদের ঘরদোর লেপা হতো। আমার সেবায় ছিল একশ দাস-দাসী। কিন্তু এমন সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। আমরা ভাগ্য-বিড়ম্বনার শিকার হলাম। এখন তো কোনো কোনো দিন এক বেলা খাবারও খেতে পাই না।’

‘বারামিকা’ জাতির ভাগ্যবিপর্যয় মানবজাতির জন্য এক বিরাট শিক্ষা।
তাই সম্পদের অপচয় নয়; এর সঠিক মূল্যায়ন করুন। মহানদাতা
আল্লাহ তা‘আলার শোকর আদায় করুন। পবিত্র কুরআনে তাঁর নির্দেশ
মেনে চলুন:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

অর্থ: ‘আহার ও পান করবে, কিন্তু অপব্যয় করবে না। আল্লাহ
অপব্যয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।’ (আ‘রাফ, ৭: ৩১)

দারিদ্র্য

দারিদ্র্য হলো মানবিক মৌলিক চাহিদাগুলো-অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা, বাসস্থান ও চিকিৎসা-ন্যূনতম মানে পূরণ করার অক্ষমতা। কিংবা আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে, বেঁচে থাকার স্বার্থে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

দরিদ্রতার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশু-কিশোররা। তারা হলো দরিদ্রতার ভয়াল থাবার নিরীহ শিকার। মাতৃগর্ভ থেকেই তারা অযত্ন, অবহেলা ও পুষ্টিহীনতার শিকার। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতি-সর্বক্ষেত্রেই তাদের ওপর চরম বঞ্চিতা চেপে বসে।

নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার ক্ষেত্রেও দারিদ্র্যের থাবা অত্যন্ত ভয়ানক। অভাব-অনাটন মানুষের মনে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার মানসিকতা উদ্ভেদে দেয়। সমাজে যত অন্যায়, অনিয়ম, অনাচার, পাপাচার-এসবের অন্যতম নেপথ্য কারণ হলো দরিদ্রতা।

হতদরিদ্র, অভাব-অনাটনগ্রস্ত মানুষ তার অস্তিত্বের লড়াইয়ে কি না করতে পারে-মিথ্যা, কপটতা, ধোঁকা থেকে শুরু করে, পর্যায়ক্রমে চুরি, রাহাজানি, নির্যাতন এমনকি হত্যা, আত্মহত্যা করতেও সে পরোয়া করে না।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পড়ে কুফুরি ও দারিদ্র্য থেকে আল্লাহর তা'আলার কাছে পানাহ চাইতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল ﷺ সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে^{৭৭} এ দু'আটি পাঠ করতেন:

^{৭৭} সুনানে নাসায়ীর রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي دُبْرِ الصَّلَاةِ» (سنن النسائي ৭৩/৩)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর এ দু'আটি পাঠ করতেন। (নাসায়ী, ৩/৭৩)

এতে বোঝা যায়, সকাল-সন্ধ্যায় ও প্রত্যেক নামাযের পর-দুটি সময়েই আমল করার সুযোগ রয়েছে। (অনুবাদক)

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (مسند أبي داود الطيالسي ١٩٩ / ٢)

অর্থ: ‘হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কুফুরি ও দরিদ্রতা থেকে পানাহ চাই। পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে। (মুসনাদে আবু দাউদ, ২/১৯৯)

আমরা যদি দুর্নীতিমুক্ত, শান্তিপূর্ণ সভ্য সমাজ গড়তে চাই তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনের বিকল্প নেই। কিন্তু উপায় কী? এ লক্ষ্যে আমাদের করণীয় কী?

সমাপ্তি:

১. আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। আল্লাহ তা‘আলা বান্দার সাথে তার ধারণা মোতাবেক আচরণ করেন। তাঁর কাছেই প্রার্থনা করুন। সময়মতো জামাতের সাথে পাঁচওয়াক্ত নামাযে যত্নবান হোন। নামায হলো রিযিকের প্রশস্ত পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর উম্মতের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ হলো :

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ط لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ط نَحْنُ

نَرْزُقُكَ ط وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ১৩২]

অর্থ: ‘এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। রিযিক তো আমিই দেব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই।’ (ত্বহা, ২০: ১৩২)

২. আখেরাতের সৌভাগ্য ও সফলতা অর্জনকে ইহকালীন জীবনের কার্জিকত লক্ষ্য উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করুন। সবর ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। নিজের যাবতীয় প্রয়োজনে মানুষের দ্বারস্থ না হয়ে আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করুন। সুখ-সচ্ছলতা দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ
أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ." (صحيح البخاري) ১২২/২

অর্থ: 'যে ব্যক্তি সচ্ছলতা চায়, আল্লাহ তাকে সচ্ছলতা দান করেন।
যে ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যক্ষমতা দান করেন।
আর সহনশীলতা ও ধৈর্যের চেয়ে কল্যাণকর ও বিরাট নিয়ামত
কেউ প্রাপ্ত হতে পারে না।' (বুখারী, ২/১২২)

৩. দরিদ্র ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোকদের সাহায্য-সহযোগিতায় যে সমাজসেবী ও দাতা সংস্থাগুলো সচেষ্ট, তাদের আর্থিক ফান্ড সচল রাখার জন্য সমাজের ধনী ও বিত্তশীলদের এগিয়ে আসতে হবে। এর পাশাপাশি ধনী লোকদের যাকাত আদায়ে যত্নবান হতে হবে। যাকাত আদায়কারীর আত্মশুদ্ধির ও সমাজের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।
৪. দেশ ও সমাজকে সর্বপ্রকার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলামুক্ত রাখতে হবে। কেননা বিদ্রোহ ও নৈরাজ্যের কবলে দেশের সরকার ও জনগণ সবচেয়ে বেশি আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়। ক্যান্সার যেমন মানবদেহকে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে নিঃশেষ করে ফেলে, তেমনি বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহের কবলে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো সমূলে ধ্বসে পড়ে।
৫. দেশে লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। গবেষক ও চিন্তাশীলদের উৎপাদনমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।
৬. শ্রমিক ও কর্মচারীদের সাথে মালিক ও কর্তাশ্রেণি ব্যক্তিদের অবশ্যই সম্মানজনক বিনম্র ব্যবহার করা কর্তব্য। তাকওয়া ও ধার্মিকতার বিবেচনায় অনেক কর্মচারী তার মালিক পক্ষের তুলনায় আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। এক্ষেত্রে অর্থবিত্ত ও জাগতিক চাকচিক্যের কোনো মূল্য নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: ১৩]

অর্থ: ‘তোমাদের মধ্যে আলাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আলাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।’ (হুজুরাত, ৫৯: ১৩)

৭. শ্রমিক হলো সৃষ্টি ও উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি। তাদের কর্মস্পৃহা সচল ও বেগবান করার জন্য তাদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে বেতন-ভাতা পরিশোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রকার অবহেলা ও গড়িমসি গ্রহণযোগ্য নয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘হাদীসে কুদসীতে’ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. (صحيح البخاري ১৩/৮৩)

অর্থ: ‘কেয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিবাদি হব। (এক.) যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; এরপর (প্রয়োজনের মুহূর্তে) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। (দুই.) যে স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বলে বিক্রি করে মূল্য আত্মসাৎ করেছে। (তিন.) যে শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে তার কাজ (ষোলো আনা) বুঝে নিয়েছে; কিন্তু তার শ্রমের মূল্য পরিশোধ করেনি।’ (বুখারী, ৩/৮৩)

৮. আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় আল্লাহ তা‘আলা হারাম করেছেন-যেমন: জুয়া, সুদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোঁকা-প্রতারণা-ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতে হবে। শরীয়তের এ নিষিদ্ধ আর্থিক লেনদেনগুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাময়িক লাভজনক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে ও দূরদর্শী দৃষ্টিকোণ থেকে তা অভাব-অনাটন ও দরিদ্রতার অন্যতম কারণ।

৯. গুনাহগার ও নাফরমান ব্যক্তির ধনাঢ্যতা ও অর্থবিশ্বের বাড়ন্ত অবস্থা দেখে প্রতারণিত হবেন না। এটা রিয়িকের প্রশস্ততা নয়, আল্লাহ তা‘আলার তরফ থেকে নাফরমান বান্দাকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করার

কৌশল। তার অবস্থা হলো সুদি কারবারিদের মতো-বাহ্যিকভাবে তা অত্যধিক বেশি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নিতান্ত কম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ الرَّبَّاءَ وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلٍّ» (مسند ابن أبي شيبة ١/ ٢٠٧)

অর্থ: ‘সুদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক-না-কেন, তার শেষ পরিণতি হল নিঃস্বতা।’ (মুসনাদে ইবনে আবি শায়বা, ১/২০৭)

১০. হালাল আয়-উপার্জনের পেশায় নিয়োজিত থাকার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু নেক আমল করুন, যার ওসিলায় আপনার রিযিক বরকতপূর্ণ হবে। এমন কয়েকটি আমল হলো, বেশি বেশি ইস্তিগফার করা, মাতা-পিতার প্রতি সদাচার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, অভাবী-দরিদ্রদের সাহায্য করা ও বেশি বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبَسِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً» (صحيح البخاري ৩/ ৫৬)

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি তার রিযিক বৃদ্ধি ও তার পশ্চাতে সুনাম কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।’ (বুখারী, ৩/৫৬)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[النحل: ৯৭]

অর্থ: ‘পুরুষ আর নারীদের মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে আর সে মু‘মিনও, তাকে আমি অবশ্য অবশ্যই উত্তম জীবন দান করব। আর তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই তারা যা করে, তার চেয়ে উত্তম প্রতিফল দান করব।’ (নাহল, ১৬: ৯৭)

১১. নিজের আয়-উপার্জন অনুযায়ী এখনই একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করুন-মাসিক আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য রেখে নিজের ও পরিবারের আর্থিক চাহিদা ও ব্যয়ের খাতগুলো তালিকাবদ্ধ করুন। তালিকায় নিত্য প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে। গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। এসব নিত্য প্রয়োজনীয় সেবা-পরিসেবার বিল যথাসম্ভব কমিয়ে আনার পাশাপাশি শখ-সৌখিনতা ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের মানসিকতা পরিহার করুন। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, সময়ে-অসময়ে ঋণ গ্রহণের স্বভাব ত্যাগ করুন। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কখনো ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

১২. সকাল-সন্ধ্যায়^{১৬} নিয়মিতভাবে এ দু'আটি পাঠ করুন:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» (مسند أبي داود الطيالسي ١٩٩ / ٢)

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কুফুরি ও দরিদ্রতা থেকে পানাহ চাই। পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে।' (মুসনাদে আবু দাউদ, ২/১৯৯)

১৩. আপনি যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কাঁধের ওপর একাধিক ঋণের বোঝা চেপে থাকে, তাহলে পাওনাদারদের নামের পাশে টাকার অংক বসিয়ে একটা তালিকা করে নিন। পর্যায়ক্রমে কোন ঋণ কোন তারিখে শোধ করবেন, তা-ও চূড়ান্ত করুন। এক্ষেত্রে যেন কোনো কালবিলম্ব না হয়, সে বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন। আপনার সদিচ্ছা ও একান্ত প্রচেষ্টাই পারে আপনাকে ঋণমুক্ত করতে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

^{১৬} সুনানে নাসায়ীর রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে:

«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُهُنَّ فِي ذُبْرِ الصَّلَاةِ» (سنن النسائي ٧٣ / ٣)

অর্থ: রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর এ দু'আটি পাঠ করতেন। (নাসায়ী, ৩/৭৩)

এতে বোঝা যায়, সকাল-সন্ধ্যায় ও প্রত্যেক নামাযের পর-দুটি পন্থায়ই আমল করার সুযোগ রয়েছে।

«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَاقَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ» (صحيح البخاري ১/১১৬)

অর্থ 'যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে (যত দ্রুত সম্ভব) আদায় করার ইচ্ছায়, আল্লাহ তা'আলা তার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি ঋণ নিবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে (এ ধরনের অর্থ যথার্থ কাজে ব্যয় করার সুযোগ থেকে) বঞ্চিত করবেন।' (বুখারী, ৩/১১৬)

১৪. ঋণ পরিশোধের জন্য, অর্থনৈতিক অবস্থা সচল রাখার জন্য কিংবা কোনো লাভজনক প্রকল্প শুরু করার জন্য পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘরের অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে দিতে পারেন। অথবা বর্তমান বিলাসবহুল ফ্লাট ছেড়ে এমন ফ্লাটে স্থানান্তর হতে পারেন, যার মূল্য কিংবা মাসিক ভাড়া তুলনামূলক কম। এসব ক্ষেত্রে আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী কোনো বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে পরামর্শ করুন; তাহলে ঋণ পরিশোধ ও জমানো পুঁজি লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে সহজেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন।

১৫. আপনার ঋণগুলোকে এককেন্দ্রিক করে ফেলার চেষ্টা করুন। তা এভাবে হতে পারে, একজনের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নিয়ে সকলের পাওনা পরিশোধ করে দিন। এবার ঋণের অঙ্কটা আপনার সাধ্যানুযায়ী কয়েক মাসের কিস্তিতে ভাগ করুন। প্রতিমাসের ব্যয় কিংবা বেতনের খাত থেকে সে পরিমাণ অর্থ সংকলন করে ঋণ পরিশোধ করতে থাকুন। এ পন্থায় অতি সহজেই মোটা অঙ্কের ঋণ পরিশোধ সম্ভব। ঋণ পরিশোধের অর্থ-জমানো দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ হলে একসাথে জমিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে যাওয়া বোকামি। এ ধরনের ক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের টাকা একসাথে জমা হয়ে উঠে না।

১৬. আয়-উপার্জন বৃদ্ধির জন্য চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য আরও বেশি সময় দিন, পরিশ্রমের মাত্রা বাড়িয়ে দিন, কিংবা আরও লাভজনক বৈধ কোনো পেশা অবলম্বন করুন। এমন একটা পেশা বেছে নিন, যা আপনার চাহিদা ও প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

এক্ষেত্রে হালাল উপার্জনের সমস্ত পেশা ও শ্রমকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। পেশা ও শ্রেণিভেদে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের তারতম্য অবশ্যই আছে। তাই বলে একটি পেশার মূল্যায়নে বাড়াবাড়ি করা, আরেকটা পেশায় নাক ছিটকানো ও অবজ্ঞা করা কোনো ক্রমেই সমীচীন নয়।

১৭. আর উপার্জন ও জীবনধারণের ক্ষেত্রে কখনো অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন না। এতে মানুষ আপনাকে বোঝা মনে করবে। তার চেয়ে বরং মহান আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা করে নিজ যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ

الطَّيْرُ تَغْذُو خِمَاصًا وَتَرْوُحُ بِطَانًا» (سنن الترمذي ৫/ ৫৭৩)

অর্থ: ‘যদি তোমরা আল্লাহ তা‘আলার ওপর পূর্ণ ভরসা করতে পার, তাহলে তোমরা সেভাবেই রিযিকপ্রাপ্ত হবে, যেভাবে বিহঙ্গকুল রিযিকপ্রাপ্ত হয়—সকালে খালি পেটে বের হয়; সন্ধ্যায় ভরপেট হয়ে ফিরে আসে।’ (তিরমিজী, ৪/৫৭৩)

১৮. আত্মবিশ্বাস রাখুন। সর্বোচ্চ চেষ্টা ও পরিশ্রম দিয়ে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন। বিশ্বাস করুন, আপনার শ্রম কখনো বৃথা যাবে না। আপনার সাথে আছে আল্লাহর তা‘আলার প্রতিশ্রুতি। যিনি মহান রিযিকদাতা। তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن

رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [المالك: ১৫]

অর্থ: ‘তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে বশ্য করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার কাঁধে চলাফেলা কর ও তাঁর রিযিক খাও। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে পুনর্জীবিত হয়ে যেতে হবে।’ (মূলক, ৬৭: ১৫)

১৯. আয়-উপার্জনের সমৃদ্ধি ও রিযিকে বরকত লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের শোকর আদায় করুন। শোকরগুয়ার বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা বহুগুণ বেশি দান করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ৭]

অর্থ: 'তোমরা সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, আমি তোমাদের আরও বেশি দেব।' (ইবরাহীম, ১৪: ৭)

২০. আল্লাহ তা'আলা আপনার কল্যাণে যে রিযিকের ফায়সালা করেছেন, তাতেই তুষ্ট থাকুন। তাঁর ফায়সালার বাইরে মানুষের পক্ষে কোনো জীবিকা উপার্জন করা সম্ভব না। তিনিই সৃষ্টিজগতের রিযিকদাতা ও জীবিকার ব্যবস্থাপক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ» (سنن ابن ماجه ১৩৭০/২)

অর্থ: 'যে ব্যক্তির সমস্ত চিন্তা-ভাবনা শুধু জাগতিক জীবনকে কেন্দ্র করে, আল্লাহ তা'আলা তার জীবনকে বিক্ষিপ্ত করে দেন। তার দৃষ্টিতে অভাব-অনটনের বিষয়টি বড় করে দেখান। দুনিয়ার ততটুকু (সুযোগ-সুবিধা) সে লাভ করতে পারে, যা আল্লাহ তার জন্যে ফায়সালা করেন। আর যার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা শুধু আখিরাতের সফলতা কেন্দ্র করে, আল্লাহ তা'আলা তার জীবন সুসংগঠিত করে দেন। তাকে আত্মিক সচ্ছলতা দান করেন। দুনিয়া মাথানত করে তার কাছে ধরা দেয়।' (ইবনে মাযাহ, ২/১৩৭৫)

২১. চেষ্টা পরিশ্রমের সুফল পেতে কিংবা বিনিয়োগকৃত পুঁজির লভ্যাংশ পেতে কালবিলম্ব হলে কখনো উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত হবেন না। কেননা প্রত্যেকের

জীবিকা নির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ। সুনির্দিষ্ট সময়ের আগে সে তা কিছুতেই লাভ করতে পারবে না।

রিযিকপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে যে অত্যন্ত ত্বরাপ্রবণ, চেষ্টা পরিশ্রমের লাভালাভ নগদ নগদ বুঝে পেতে যে অতি ব্যগ্র, তার অবস্থা হলো ঐ মুসল্লির মতো, যে দ্রুত নামায শেষ করার ইচ্ছায় ইমাম সাহেবের আগেই রুকু সিজদায় চলে যায়; কিন্তু শেষে তাকে ইমাম সাহেবের সাথেই সালাম ফেরাতে হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ১০৭]

অর্থ: 'তিনি যদি তোমার কোনও মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তবে এমন কেউ নেই, যে তার অনুগ্রহ রদ করবে।' (ইউনুস, ১০: ১০৭)

২২. জাগতিক সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-সচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে যারা আপনার চেয়ে উচ্চস্তরের, তাদের দিকে না তাকিয়ে, যারা আপনার চেয়ে নিম্নস্তরের, তাদের অবস্থা লক্ষ্য করুন। মনের সচ্ছলতা ও অল্পে তুষ্টির অনন্য গুণের কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনিই অধিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَرْضٌ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ.

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা আপনার ভাগে যা রেখেছেন, তাতেই তুষ্ট থাকুন। মনের সচ্ছলতায় আপনি হবেন জগতের শ্রেষ্ঠ ধনী।' (আয যুহদ লি আবি দাউদ, ১৩৯)

২৩. মনে রাখবেন, নিজের জন্য আপনি যা কল্যাণকর ভাবছেন, তার চেয়ে আল্লাহ তা'আলার ফায়সালাই অধিক মঙ্গলজনক। সামান্য অভাব-অনাটন সত্ত্বেও ব্যক্তির গুনাহমুক্ত জীবনযাপন, পূত-পবিত্রতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয় ও বিরাট প্রতিদান লাভের ওসিলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ»

অর্থ: 'আমার উম্মতের গরিব-দরিদ্র শ্রেণি ধনী সম্পদশালীদের চেয়ে পঁচশ বছর আগে জান্নাতের প্রবেশ করবে।' (ইবনু হাজার, ১৩৯)

পরিশিষ্ট:

❖ ইমাম শাফেয়ী^{৫৭} (রহ.) বলেছেন:

أَمْطِرِي لَوْلَا جِبَالُ سَرَنْدِيبَ

وَفِيضِي أَبَارُ تَكْرُورَ تَبْرَا

أَنَا إِنْ عِشْتُ لَسْتُ أَعْدَمُ قَوْتًا

وَإِذَا مِتُّ لَسْتُ أَعْدَمُ قَبْرًا

هَمَّتِي هِمَّةُ الْمُلُوكِ وَنَفْسِي

نَفْسُ حُرٍّ تَرَى الْمَذَلَّةَ كُفْرًا

অর্থ: ‘হে আকাশ, তুমি সারান্দিবের পর্বতমালায় মণিমুক্তা বর্ষণ কর! তাকরুরের কূপগুলোকে স্বর্ণখণ্ডে ভরে দাও, (তাতে আমার কী আসে-যায়)।

আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে তো আমি রিযিক-বঞ্চিত হব না, আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে কবরই হবে আমার শেষ ঠিকানা।

তবে রাজা-বাদশাহের মতোই আমার মানোবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আমার মানসিকতাও নির্ভীক স্বাধীনচেতা; নচেৎ নিজের প্রতি সামান্য অপমানও যে কুফুরির মতো ঘৃণা করে।’

^{৫৭} একজন যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামি ফকীহ। যে সকল মহা মনীষী ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করে, ইসলামকে অনুসরণের জন্য সাধারণের জন্য সহজসাধ্য করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

১৫০ হিজরিতে মিশরের আসকালান শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দু’ বছর বয়সে তাঁর মা তাঁকে নিয়ে মক্কায় পাড়ি জমান। সাত বছর বয়সে পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেন। জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে তিনি মদীনা, ইয়েমেন, ইরাক ও মিসর সহ বহুদেশ সফর করেন। তার উস্তাদগণের মধ্যে ইমাম মালেক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ্শায়বানী, হিশাম ইবনে ইউসূফ সানআনী ও ওয়াকী ইবনে জাররাহ (রহ.) সহ প্রসিদ্ধ ইমামগণ রয়েছেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ‘আল-উম্ম’ ও ‘আররিসালাহ’ অন্যতম। ২০৪ হিজরিতে তিনি মিশরে ইন্তেকাল করেন। (অনুবাদক)

❖ বিখ্যাত তাবেরী ইমাম হাসান বসরী (রহ.) (৬৪২-৭২৮ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন :

‘পবিত্র কুরআনের নিরানব্বই জায়গায় পড়েছি। “আল্লাহ তা‘আলা রিযিকের ফায়সালাকারী ও সমস্ত সৃষ্টিজীবের রিযিক দানকারী।” আর পবিত্র কুরআনের মাত্র একটা জায়গায় পড়েছি, “শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়।” (কিন্তু এরপরও আমাদের অবস্থা হলো) নিরানব্বইবার আল্লাহ তা‘আলার প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত না হয়ে এক জায়গার শয়তানের অপচেষ্টায় ভরকে যাই।’

❖ জনৈক পশ্চিমা দার্শনিক বলেছেন:

‘সেবক হিসেবে সম্পদ যত একনিষ্ঠ, মনিব হিসেবে সে ততটাই নিকৃষ্ট।’

❖ স্পাইক মিলিগান^{৫৮} বলেছেন:

‘অর্থবিস্তৃত তোমার জন্য নিঃস্বার্থ বন্ধু জোগাতে পারবে না; উল্টো তোমার পেছনে ঘোর শত্রু লেলিয়ে দিবে।’

^{৫৮} তিনি ভারতের আহমেদ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি স্থায়ীভাবে আয়ারল্যান্ডে পাড়ি জমান। তিনি ছিলেন আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট কবি ও রম্যলেখক। ২০০২ সালের ২৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্বল ব্যক্তিত্ব

পৃথিবীতে কেউ দুর্বল ব্যক্তিত্ব ও হীনম্মন্যতা নিয়ে জন্মায় না। প্রতিটি শিশুই সুস্থ স্বাভাবিক, সুন্দর প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এরপর শৈশবে, বয়ঃসন্ধিকালে পারিপার্শ্বিক সামাজিকতা, পরিবেশ-প্রতিকূলতা, জীবনের ছোটখাটো ভুল ও সঙ্গদোষ ইত্যাদি কারণে সে দুর্বল মানসিকতার শিকার হয়। তার মধ্যে প্রবল হীনম্মন্যতা কাজ করে। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে বহিঃজীবনে সমন্বিত কার্যক্রমে ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তার দুর্বল ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেতে থাকে।

দুর্বল ব্যক্তিত্বের আলামত:

- নিজের বিদ্যাবুদ্ধির আলোকে বিচার না করে, সুফল ও পরিণতির কথা না ভেবে অন্যের পেছনে ছোট্টা, অন্যের চিন্তা-চেতনা ও মতাদর্শ গ্রহণ করা।
- জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম হয়ে অন্যের দ্বারস্থ হওয়া।
- অন্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাওয়া। অপরিচিতজনদের সাথে সাক্ষাৎ ও গুঁঠা-বসায় লজ্জাবোধ করা।
- কোনো চিন্তা-ভাবনা ও বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই অন্যের চাহিদা ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।
- সামাজিক আদর্শে নিজেকে দুর্বল ও ছোট মনে করা।
- নিজস্ব মতামত ও সিদ্ধান্ত প্রকাশে সাহস হারিয়ে ফেলা। বিশেষ করে ব্যক্তিগত মতামত যদি অন্যদের বিপরীত হয়, মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকা, কিংবা অন্যদের মতামতের প্রতি সহাস্য সমর্থন ব্যক্ত করা।

- কোনো অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েও এর নৈতিক প্রতিবাদের সাহস হারিয়ে ফেলা ।
- কঠিন পরিস্থিতি থেকে গা বাঁচানোর জন্য মিথ্যার অশ্রয় নেওয়া ।
- উন্নতি-অগ্রগতির লক্ষ্যে নতুন কোনো উদ্যোগ-আয়োজনে নিস্পৃহ হয়ে থাকা ।

মানসিক দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতা ব্যক্তিকে জীবনের সমুন্নত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনের পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয় । সমাজে স্বাধীনভাবে ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে হলে ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা কাটিয়ে আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে ।

এ লক্ষ্যে আমাদের করণীয় কী? হীনম্মন্যতা ও দুর্বল ব্যক্তিত্ব কাটিয়ে উঠার উপায় কী?

সমাধান:

১. মা-বাবাকে সন্তানদের সাথে আলাপ-আলোচনায় বসতে হবে । তাদের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে । তাদের সুন্দর চিন্তা-ভাবনা ও সফলতার কথায় মুগ্ধতা প্রকাশ করতে হবে । যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিবে এবং আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন হতে সহায়ক হবে ।
২. বাল্যবয়স থেকে সন্তানদের ব্যক্তিত্ব গঠনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে । কয়েকটি গবেষণা এ তথ্য প্রকাশ করেছে যে, জাতির নেতৃত্ব ও পরিচালনার যোগ্য ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য দু'বছর বয়স থেকেই শিশুদের নিয়মতান্ত্রিক পরিচর্যা করা কর্তব্য ।
৩. অন্যদের সাথে সন্তানদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে । সঙ্গে সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ ও ভদ্রতা-সভ্যতা বজায় রাখার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা কর্তব্য ।
৪. শিশুদের লজ্জা, ভয় ও দুর্বল মানসিকতা থেকে বেঁচে থেকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠার লক্ষ্যে আরও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে । অভিভাবকদের তা অবশ্যই গুরুত্বের সাথে পালন করতে হবে । করণীয় বিষয়গুলো হলো:

- শিশুদের সার্বিক বিষয়ের সমগ্র তত্ত্বাবধান করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। অনুপ্রেরণাদায়ক কথা বলে তাদের উদ্দীপনা ও চঞ্চলতা সচল রাখতে হবে।
- বিভিন্ন উপলক্ষে-আয়োজনে অন্যদের সাথে শিশুদের অংশগ্রহণ এবং পরিচিত-অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়গুলো তাদের সম্মুখে শেখাতে হবে।
- পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিনোদন-ভ্রমণে অংশগ্রহণ এবং সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা মানসিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- মা-বাবার কর্তব্য হলো, সন্তানদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা। তাদের চিন্তা-ভাবনা ও বোধ-উপলব্ধির কথা শোনা। কোথাও ভুল-ত্রুটি হলে তা শুধরে দেওয়া।
- সন্তানদের কীর্তি ও সফলতা যত ক্ষুদ্র সামান্য হোক-না-কেন, এর যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে, তার যোগ্যতার প্রশংসা করে কিংবা সফলতায় পুরস্কৃত করে।
- প্রত্যেক শিশুকে বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার বিষয়ে সজাগ-সচেতন করতে হবে। যেন তারা নিজ যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের সফল ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।
- শিশুদের অপচ্ছন্দনীয় ও সাধ্যাতীত বিষয়ে কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি না করে তাদের পছন্দ ও আগ্রহের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা আবশ্যিক।
- লোক-সমাজের মাঝে, বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধবের পরিবেশে সন্তানদের শাসানো ও খাটো করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে।
- শিশুদের যদি জন্মগত কোনো খুঁত থাকে, তাহলে তা মেনে নিয়েই তার সাথে সুন্দর স্বাভাবিক আচরণ করা এবং তাকে লজ্জা, ভয় ও মানসিক সংকীর্ণতাবোধ থেকে মুক্ত রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনুপ্রাণিত করা কর্তব্য।

- অন্যদের যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তুলনা করে সন্তানদের তিরস্কার ভৎসনা করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। তাদের মনে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।
 - সন্তানদের প্রতি প্রশয়মূলক আদর-সোহাগ দেখানো, তাদের যেকোনো শখ-শৌখিনতা পূরণ করা ঠিক নয়। এমন অতিরিক্ত আশ্কারা ও প্রশয়ে সন্তানদের উচ্ছ্নে যাওয়ার আশঙ্কাই প্রবল। এক্ষেত্রে তাদের আত্মনির্ভরশীলরূপে গড়ে তোলা কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন কাজকর্ম-ড্রেস পরা, বইপত্র গুছিয়ে রাখা, ব্যক্তিগত আসবাবপত্র সযত্নে গুছিয়ে রাখা ও সংরক্ষণ-নিজেকেই করতে শেখাতে হবে।
 - শিশুদের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের বীরত্বগাথা ঘটনা বর্ণনা করতে হবে, যা তাদের মনে সাহসিকতা ও উদ্দীপনা যোগাবে।
 - মেহমানদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো, তাদের সাথে সুন্দর করে কথা বলা এবং ভদ্র-মার্জিত ব্যবহার করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চর্চা করাতে হবে।
 - সন্তানদের মাঝে পরস্পর বোঝাপড়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাদের ওপর কঠোর শাসন প্রয়োগ করা এবং তাদের যৌক্তিক-অযৌক্তিক সমস্ত মতামত অগ্রাহ্য করার মানসিকতা পরিহার করা উচিত। এর ফলে সন্তানদের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে।
৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ও সমন্বিত উদ্যোগ-আয়োজনে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এতে তারা মানসিক জড়তা কাটিয়ে উঠার পাশাপাশি নিজেদের নানামুখী যোগ্যতা প্রকাশ করার সুযোগ পাবে।
৬. আপনার মানসিক জড়তা ও ব্যক্তিত্বের দুর্বলতার দিকগুলো শনাক্ত করে একটা কাগজে টুকে রাখুন। কীভাবে তা কাটিয়ে উঠা যায়, চিন্তা-ফিকির করুন। এমন কোনো বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারস্থ হোন, যিনি আপনার যোগ্যতার মূল্যায়ন করতে পারেন এবং আপনার ভুল-বিচ্যুতির সংশোধন করে সুসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে গড়ে তুলতে পারেন।

৭. জীবন-জগৎ সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার পাশাপাশি বই-পুস্তক পাঠ করুন। জীবন ও সমাজ বিষয়ক কুরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে জানুন, যেন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নিজেই সিদ্ধান্তে গ্রহণ করতে পারেন।
৮. যৌক্তিক বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার গুণে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হোন। অন্যের অন্ধ অনুকরণ না করে, অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের সামনে নত না হয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন। সাহসিকতার সাথে নিজের যৌক্তিকতা তুলে ধরুন।
৯. আগে নিজেকে চেনার চেষ্টা করুন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু বিশেষ যোগ্যতা ও সুপ্ত প্রতিভা বিদ্যমান। আপনি আপনার যোগ্যতার জায়গাগুলো নির্ণয় করুন। সফলতার সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করুন। দ্রুত সফল হওয়ার জন্য, সমাজের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথার্থ ক্ষেত্রে মেধা-শ্রম ব্যয় করুন।
১০. শুধু একটা পেশার গণ্ডিতে আটকে না থেকে, সম্ভব হলে এর পাশাপাশি আরও বিভিন্ন পেশা ও উদ্যোগ শুরু করুন। এর মাধ্যমে অনেক বিচিত্র চিন্তা-চেতনা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাবেন। আপনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ঋদ্ধ-সমৃদ্ধ হবে।
১১. বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম, শিক্ষা-দীক্ষামূলক কর্মশালা ও সমন্বিত উদ্যোগে অংশগ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে অপরিচিত ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আপনার মানসিক জড়তা দূর হবে এবং সবকিছুতে অযাচিত সংকোচ ও জড়সড়-ভাব কেটে যাবে। স্বভাব-প্রকৃতি উচ্ছল প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।
১২. জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে নিজেকেই নিজে চ্যালেঞ্জ করুন। সফলতা লাভের জন্য চ্যালেঞ্জিং মানসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের সফল ব্যক্তিদের সম্পর্কে জানুন। নিজ যোগ্যতা ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে যারা সফলতার শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন, তাদের জীবনের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হবে আপনার চলার পথের পাথর।

১৩. আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডি থেকে বের হয়ে চারপাশের সমাজ ও সামাজিকতার সাথে সম্পৃক্ত হোন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করুন। সর্বোপরি সমাজের মৌলিক ক্ষেত্রগুলোতে নিজের সচেষ্ট তৎপরতা বজায় রাখুন এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করুন।

১৪. মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন। আল্লাহর ভয় ও তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস ব্যক্তির মধ্যে মানসিক প্রশান্তি, আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে। আর গায়রুল্লাহর ভয়^{৫৯} সম্মান মর্যাদার স্থানে অসম্মান, সফলতা সৌভাগ্যের স্থলে দুঃখ-দুর্দশা এবং সুখ-সমৃদ্ধির পরিবর্তে দরিদ্রতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৫. ক্রীড়াসংস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিয়মিত খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করুন। খেলাধুলা ও ক্রীড়াচর্চা আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। জড়তা ও সংকোচ দূর করে উচ্ছল প্রাণবন্ত স্বভাব-প্রকৃতিতে অভ্যস্ত করে তুলবে।

১৬. যারা শক্তিহীন দুর্বল মানসিকতার শিকার, তারা যৌক্তিক সত্য কথাটি বলার সাহস করে না। ন্যায়সংগত সাহসী ভূমিকা পালন করতে পারে না। অগোচরে নিন্দা-সমালোচনামুখর হয়ে উঠে।

সমাজে এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। তাদের থেকে আপনি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। নচেৎ সময়ের ব্যবধানে আপনার মধ্যে একই পশ্চাদপদ মানসিকতা ক্রীয়াশীল হয়ে উঠবে।

সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের সাথে চলুন। তাদের সংস্পর্শ আপনার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক হবে।

১৭. অন্যের কথা ও কাজের যৌক্তিক প্রতিবাদ করতে ভয় করবেন না। তবে এক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

আপনার কাছে যদি এমন কোনো বিষয় উত্থাপিত হয়, যা নীতি-নৈতিকতাশূন্য ও অযৌক্তিক, তাহলে নিঃসংকোচে আপনি তার প্রতিবাদ করুন। ভয় ও সংকোচের বশবর্তী হয়ে নিজেকে কখনো এমন কাজে বাধ্য করবেন না, যা অগ্রহণযোগ্য।

^{৫৯} আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য জাগতিক বস্তু ও প্রভাব-প্রতিপত্তির ভয়।

এক্ষেত্রে আপনাকে দু'টি বিষয় মনে রাখতে হবে:

এক. মানুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। নীতি-নৈতিকতার স্থলে সবাই সমান। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মানদণ্ড হলো তাকওয়া ও ধার্মিকতা।

দুই. সমাজের নীতিবান ও নীতিবহির্ভূত-সকলের মন জয় করার প্রবণতা ঠিক নয়। নৈতিক অবস্থানে থেকে কখনো তা সম্ভবও নয়।

১৮. যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করুন। সময়মতো জামাতের সাথে পাঁচওয়াক্ত নামাযে যত্নবান হোন। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুলো বারবার পাঠ করুন :

﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

অর্থ: এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে।

নিরাশা ও ব্যর্থতার মানসিকতা ছেড়ে আশাবাদী মানসিকতা ধারণ করুন। আপন রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। এতে আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে ব্যক্তিত্ব সুদৃঢ় হবে।

১৯. সামান্য সমস্যাতে, এমনকি কঠিন সংকটেও মানুষের দ্বারে-দ্বারে অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়াবেন না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে যাবতীয় সমস্যার কথা ব্যক্ত করুন।

২০. মনের ওপর জোর খাটিয়ে অন্যের চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন না, তাহলে সবাই আপনাকে দিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধার করে নেবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা বজায় রাখুন। প্রথমে বিবেক-বুদ্ধির বিচারে যাচাই করুন। তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

২১. আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। রাগ-বিরাগ, দুঃখ-বেদনা ও হাসি-আনন্দের মুহূর্তে আত্মনিয়ন্ত্রণ করুন। আবেগ-তাড়িত হয়ে কখনও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাবেন না। আপনার সিদ্ধান্ত যখন উৎকর্ষা, ব্যাকুলতা, একচেটিয়া সমর্থন ও চরম বিরোধিতা ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক আবেগমুক্ত হবে, তখনই তা যথার্থ ও ন্যায্যানুগ হতে পারে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ মদিনার পথে শিশু বাচ্চারা খেলা করছিল। একই পথে আমিরুল মু'মিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে বাচ্চারা সবাই দৌড়ে পালান। শুধু একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রইল। খলিফার আগমনে তার চেহারায কোনো ভাবান্তর নেই। ডর-ভয়ের কোনো ছাপ নেই। ছেলেটি হলো আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)।
আমিরুল মু'মিনীন ওমর (রা.) তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন:
'অন্য ছেলেদের সাথে তুমি কেন দৌড়ে পালালে না?'
ছোট বালক আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর বলল:
'আমি তো কোনো অপরাধী নই যে, আপনাকে দেখে পালিয়ে যাব। এ রাস্তাও তো এতটা সংকীর্ণ নয় যে, কারো চলার জন্য একপাশে সরে দাঁড়াতে হবে।'
ছোট বালক আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর এমন উত্তর তাঁর ভয়-ডরহীন সাহসিকতার বহিঃপ্রকাশ।
- ❖ লিবিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ইতালিয়ান উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে 'সানুসী' আন্দোলনের প্রাণপুরুষ উমর আল মুখতার (১৮৫৮-১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
'আত্মসম্মান-বোধসম্পন্ন হোন। উপস্থিত বিষয়ে সহমত পোষণ করা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক-না-কেন, অযৌক্তিক মনে হলে কিছুতেই তা মেনে নিবেন না। কেননা এমনও হতে পারে, অন্যায়-অন্যায্যের সামনে একবার মাথা নোয়ানোর পর আর কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস হবে না।'
- ❖ আইরিশ লেখক জর্জ বার্নার্ড শ' (১৮৫৬-১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:
'অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা বলা উচিত, তা-ই বলতে ভয় হয়।'
- ❖ যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট প্রযুক্তি উদ্ভাবক ও কম্পিউটার বিপ্লবের পথিকৃত স্টিভ জবস (১৯৫৫-২০১১ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন :

‘পৃথিবীতে আপনার জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এ ক্ষণকাল অন্যের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে নষ্ট করবেন না।’

- ❖ জার্মান লেখক ও কবি ইয়োহান ভোলফগাং ফন গ্যোটে (১৭৪৯-১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

‘ধৈর্য ও শৈশ্বের মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটে। জীবনের বাস্তবতা মোকাবেলা করার মাধ্যমে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে।’

গুজব

গুজব হলো ভিত্তিহীন বানোয়াট খবর, যা জনসাধারণের মধ্যে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে তাদের মনে আর কোনো দ্বিধা-সংশয় থাকে না।

গুজব রটানোর কারণ:

যদি ভয় শঙ্কা কিংবা অনিশ্চয়তার পরিবেশ বিরাজ করে, তবে অতি সহজেই সেখানে গুজব ছড়ায়। যদি যথাসময়ে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য না আসে, তবে সে সুযোগেও গুজবের বিস্তার হতে পারে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে দোণামনা ও সিদ্ধান্তহীনতায় দীর্ঘ কাল ক্ষেপণ হলেও গুজব রটতে পারে।

গণমানস বা জনতার মনস্তত্ত্বের একটা চরিত্র হলো, সংকট আসছে জেনে তা ঘনীভূত হওয়ার আগেই প্রতিটি মানুষ নিজের ও তার প্রিয়জনদের জন্য নিরাপত্তা ও স্বস্তি নিশ্চিত করতে চায়। মানুষের এই প্রবণতা যৌক্তিক। তাতে বাধা দেওয়ার উপায় নেই। এই যৌক্তিক প্রবণতার সাহায্যেও অনেক সময় গুজবের ডালপালা ছড়ায়।

গুজব সাধারণত চটকদার ও কৌতূহলোদ্দীপক কিংবা অত্যন্ত ভীতিকর ও আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে। গুজব হলো দাবানলের মতো, কোথেকে উৎপত্তি, কোথায় এর শেষ পরিণতি—এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। গুজবও কার থেকে রটেছে, কীভাবে রটেছে, কেন রটেছে, সাধারণ মানুষের অত ভাবার ফুরসত নেই।

গুজব রটানো হয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তি বিঘ্নিত করে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অপপ্রচার অথবা পরস্পর বৈরিতা ও শত্রুতা, গুজবের নেপথ্য কারণ হয়ে থাকে।

গুজব মানুষের মধ্যে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাদের সঠিক পথ ও মত থেকে বিচ্যুত করে ছাড়ে। গুজবের হাত ধরে যে সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, পর্যায়ক্রমে তা ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞের রূপ ধারণ করে।

একটি সমাজে যদি শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে হয়, তাহলে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আবশ্যিক। এ লক্ষ্যে মিথ্যা রটনা ও গুজবের ছিদ্রপথগুলো বন্ধ করা কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের যথাযথ উপায় কী? গুজব প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী?

সমাধান:

১. দেশের শিক্ষা-দীক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন করতে হবে। জনসাধারণ সদা চোখে যা দেখে, সরল মনে যা শুনে, তার সবই যেন বিশ্বাস না করে বসে—এ ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষা ও সচেতনতাই মানুষকে যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় ও মিথ্যা গুজব থেকে বিরত রেখে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের পথে পরিচালিত করে।
২. গুজবের উৎস-অনুসন্ধান ও গুজব-বন্ধে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত সন্দেহ-সংশয় দূর করে জনগণকে প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।
৩. গুজব ও বানোয়াট খবর ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য গণমাধ্যমকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভিত্তিহীন খবরের প্রতিবাদ করে প্রকৃত সত্য প্রচারে প্রতিশ্রুতিশীল হতে হবে। গুজব ও সন্দেহ-সংশয় ছড়ানোর মতো অনর্থক কাজে সময় নষ্ট না করে জনসাধারণকে ভালো ও কল্যাণকর কাজে সময় ব্যয় করায় অনুপ্রাণিত করতে হবে।
৪. প্রত্যেকেই নিজের যাবতীয় কাজ-কর্মে দায়বদ্ধ হতে হবে। কারোর এই অধিকার নেই যে, নিজের ব্যর্থতা ও বিফলতার দায় অন্যের উপর চাপিয়ে গুজব ছড়ানো।
৫. শোনামাত্রই যেকোনো সংবাদ বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কেননা কোনো কোনো সংবাদ বানোয়াট ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে। তাই

মিথ্যা বানোয়াট খবরের ধোঁকায় না পড়ে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ হলো:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ৬]

অর্থ: ‘হে মুমিনগণ! কোন ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখাবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।’ (হুজুরাত, ৪৯: ৬)

৬. অনেক সময় সঠিক আদর্শ ও মতাদর্শের বিরুদ্ধবাদী ও শত্রুভাবাপন্ন লোকদের পক্ষ থেকেও মিথ্যা রটানো হয়ে থাকে। সতর্ক থাকুন, না জেনে, সুনিশ্চিত না হয়ে মিথ্যা বানোয়াট খবরে প্রতারণিত হবেন না। গুজবের প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআনের আদর্শ অনুসরণ করুন। সঠিক তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কথা বিশ্বাস না করা এবং নিঃসন্দেহ ও সুনিশ্চিত না হয়ে কোনো কথা না বলাই হলো পবিত্র কুরআনের নির্দেশ। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ [الأنعام: ১৬৮]

অর্থ: বল, ‘তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে?’ (আনআম, ৬: ১৬৮)

৭. যাচাই করে সুনিশ্চিত না হয়ে কোনো সংবাদ প্রচার করতে যাবেন না। অনেক সাদাসিধে সরল মনের মানুষ তা বিশ্বাস করে যত্রতত্র ছড়াতে থাকে।
৮. গুজব ও বিশৃঙ্খলার মুহূর্তে ঘরে অবস্থান করুন এবং নীরব ভূমিকা পালন করুন। কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সাথে জড়ানো এবং এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন নয়। তবে যদি এমন কোনো কথা বলতে

হয়, যাতে দেশ ও দশের কল্যাণ হবে তাহলে বলুন। এটাই শান্তি ও নিরাপত্তার উপায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، وَابْنُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

سنن الترمذي ت بشار (১৮৩/৬)

অর্থ: ‘তোমার যবান সংযত রাখ। (ফেতনার যামানায়) নিজ ঘরে আবদ্ধ থাক। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হও।’ (তিরমিজী, ৪/১৮৩)

৯. আপনার নামে যদি কোনো মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা রটানো হয়, তাহলে স্বভাবতই আপনি ক্রুদ্ধ, ভীষণ ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু নিজের এ অস্বস্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে গিয়ে যদি অতিরিক্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন, তাহলে অন্যরা ভাববে, আপনার নামে যে মিথ্যাচার করা হয়েছে, তা পুরোপুরি না হলেও আংশিক সত্য। তারা নিজেরাই প্রশ্ন ছুড়ে দিবে, আপনার নামে যা বলা হয়েছে, তা যদি নির্জলা মিথ্যাই হয়ে থাকে, তাহলে আপনি এত ক্ষুব্ধ হচ্ছেন কেন? তাই অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশের ক্ষেত্রেও উগ্রতা পরিহার করে ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখা কর্তব্য।
১০. দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, ধীরস্থিরতা ও প্রজ্ঞার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা। অর্থাৎ, আপনি এমন মানসিকতা প্রকাশ করুন, যেন বিষয়টা গুরুত্বহীন ও নিতান্ত সাধারণ। দেখবেন, বিষয়টা নিয়ে অন্যরাও আর মাথা ঘামাবে না। বিশ্বাস করুন, আপনার নামে অপপ্রচার অচিরেই পর্দার আড়াল হবে। অন্য একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য তার স্থান দখল করে নিবে।
১১. নিতান্ত সাধারণ শ্রেণির লোকেরা খবরের সত্যাসত্য যাচাই না করেই বিশ্বাস করে বসে। খবরটা যদি কিঞ্চিৎ চটকদার ও কৌতূহলোদ্দীপক কিংবা ভীতিকর হয়, মুহূর্তের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে তারা কোনো কসুর করে না। তাই নিজে সুনিশ্চিত না হয়ে সাধারণ লোকের কথায় কখনো কান দিতে যাবেন না।

১২. প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের গুজব ও ফেতনা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। এ ধরনের সজিন পরিস্থিতিতে বেশি বেশি ইস্তিগফার করুন এবং ইবাদতে মশগুল থাকুন। এ দু'আটি বারবার পাঠ করুন:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ! প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের ফেতনা-ফাসাদ থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।'

১৩. সংবাদের উৎস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। কোনো কথা বলার ক্ষেত্রে দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে বলুন। কোনো কথার সত্যাসত্য যাচাই না করে শোনামাত্র তা প্রচার করতে থাকা সমীচীন নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন: 'মানুষের পাপ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই বলে বেড়ায়।' (মুসলিম. ১/১০)

১৪. তারা বলেছে কিংবা আমি শুনেছি-এ জাতীয় সূত্রে কথা বলার প্রবণতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«بُئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ زَعَمُوا» (سنن أبي داود ২/৬/২৭৬)

অর্থ: 'তারা ধারণা করছে-কথা বলার ক্ষেত্রে এ ধরনের সূত্র ব্যবহার করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' (আবু দাউদ, ৪/২৯৪)

১৫. আপনার গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে যদি দ্বিধা-সংশয় দেখা দেয় এবং আপনার মনে হয়, মানুষ তাতে ভুল বুঝতে পারে, তাহলে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া আবশ্যিক। মানুষ তাতে আশ্বস্ত ও সুনিশ্চিত হতে পারবে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একবার সাফিয়্যাহ (রা.) রাসূল ﷺ-এর সাথে মসজিদে দেখা করতে এলেন। ফেরার পথে অন্ধকারে রাসূল ﷺ তাঁর পেছনে হাঁটছিলেন। ইতোমধ্যে দু'জন সাহাবি রাসূল ﷺ-কে অতিক্রম করে গেল। তিনি আশঙ্কা করলেন, সাফিয়্যাহ (রা.)-কে কেন্দ্র করে শয়তান তাদের মনে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সাহাবি দু'জনের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'এ হলো সাফিয়্যাহে বিনতে হুয়াই।'

এতেই সাহাবা দু'জন বুঝে গেলেন, তিনি রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী। সামান্য ক্ষুদ্র বিষয়ও সুস্পষ্ট করে দেওয়া হলো রাসূল ﷺ-এর আদর্শ।

পরিশিষ্ট:

- ❖ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় মদিনা মুনাওয়ারায় একটা উদ্দেশ্যমূলক প্রপাগাণ্ডা ছড়ানো হলো। যা ছিল রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিণী, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা বিনতে সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে। যার চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার প্রমাণ পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান।

একটা সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে মদিনার মুনাফিকরা আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রপাগাণ্ডা ছড়াতে প্রবৃত্ত হলো। মুনাফিক ও তাদের সহযোগীদের তৎপরতায় তা গোটা মদিনায় মানুষের মুখে মুখে রটতে থাকল।

মুনাফিকরা আয়েশা (রা.)-এর মানহানি করার নিকৃষ্ট তৎপরতায় মেতে উঠেছিল ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও ইসলামের রাসূলের ﷺ-এর প্রতি বিদ্বেষবশত। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাঁরা ছিলেন ঈমান ও বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দুতে অবিচল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পরিবারের প্রত্যেকের চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতায় ছিলেন নিঃসন্দেহ। তাই সর্বান্তঃকরণে তাঁরা বলতে পেরেছিলেন (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ﴾ [النور: ১৬]

অর্থ: ‘আলাহ পবিত্র ও মহান, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ!’
(নূর, ২৪: ১৬)

মুনাফিকদের এ মিথ্যাচার ও প্রপাগাণ্ডা কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআনের সূরা নূরে আয়াত নাযিল হলো। যেখানে মুনাফিকদের দাবি ও অপপ্রচার মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের অভিশপ্ত আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাশাপাশি অপপ্রচার ও গুজবের পরিস্থিতি সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়ানুগ অবস্থানের প্রশংসা করা হয়েছে।

সুতরাং গুজব প্রপাগাণ্ডা ও অপপ্রচারের ক্ষেত্রে বাকসংযম করুন। নিশ্চিত না হয়ে কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকুন। এটাই প্রকৃত মু’মিনের চরিত্র। এ থেকে বিচ্যুত হয়ে মুনাফিকদের কাতারে शामिल হবেন না।

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ
وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: ১২]

অর্থ: ‘যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ?’ (নূর, ২৪: ১২)

❖ কানাব আল গাতফানী বলেছেন:

صَمٌّ إِذَا سَمِعُوا خَيْرًا ذَكَرْتُ بِهِ
وَإِنْ ذَكَرْتُ بِسَوْءٍ عِنْدَهُمْ أَذْنُوا
إِنْ يَسْمَعُوا رِيْبَةً طَارُوا بِهَا فَرَحًا

مَنِّي، وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا

অর্থ: ‘আমি কোনো মঙ্গলের কথা বললে তারা বধির হয়ে থাকে। অমঙ্গলের কিছু বললে উৎকর্ণ হয়ে উঠে। সন্দেহ সংশয়ের কিছু শুনলে সর্বত্র রাষ্ট্র করে বেড়ায়, আর ভালো কিছু জানলে জায়গায় দাফন করে ফেলে।’

❖ খুরাসানে যখন দুর্যোগ ও বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়, বিশ্ববরেণ্য কবি সাহিত্যিক আলী ইবনে আব্দুল আযীয আল জুরজানী খুরাসানেই ছিলেন। দেশের এমন উত্তাল পরিস্থিতিতে তিনি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজার ওপর কেবল কবিতার তিনটি পঙক্তি লিখে দিলেন, যা তার অবস্থান স্পষ্ট করে:

أَنَسْتُ بِوَحْدَتِي وَلَزِمْتُ بَيْتِي
فَطَابَ الْأُنْسُ لِي وَنَمَا السُّرُورُ
فَأَدَّبَنِي الزَّمَانُ فَلَا أُبَالِي
هُجِرْتُ فَلَا أَزَارُ وَلَا أَزُورُ
وَلَسْتُ بِسَائِلٍ مَا دُمْتُ حَيًّا
أَسَارَ الْجَيْشِ أَم رَكِبَ الْأَمِيرُ

অর্থ: 'একাকিত্ব বরণ করে নিজেই নিজেকে গৃহবন্দী করে রেখেছি। এই নিঃসঙ্গতার মধ্যেই আমার আন্তরিকতা ও চিত্তবিনোদন নিহিত।

কালের ঘাত-প্রতিঘাত ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকের শিক্ষা আমি পেয়েছি। তাই আমি কি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম, কেউ আমাকে দেখতে আসে না, আমিও কারো সাক্ষাতে যাই না-এসব কিছুই আমি পরোয়া করি না।

যত দিন বেঁচে আছি, জানতে চাইব না-সেনাবাহিনী কি যুদ্ধাভিমুখী হয়েছে? যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শাসক কি ঘোড়া ছুটিয়েছে-এসবের কিছুই।'

- ❖ বিখ্যাত মার্কিন রম্য লেখক ও সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছেন:

'তুমি কিছু মানুষকে সবসময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পার কিংবা মানুষকে কিছু কালের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পার। কিন্তু সব মানুষকে সবসময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে না।'

প্রবাস-পরবাস

‘প্রবাস-পরবাস’ শব্দ দু’টা বলা যত সহজ, শুনতে তত কঠিন কষ্টদায়ক । প্রবাস হলো, প্রয়োজনের তাড়নায় কিংবা দায়িত্বের তাগাদায় মাতৃভূমি ছেড়ে ভিন্ন দেশে পাড়ি জমানো । প্রবাস-জীবনে ব্যক্তিকে পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়াপ্রতিবেশী-সবার থেকে দূরে থাকতে হয় । শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি, পরিবারের আনন্দ-বেদনার স্মৃতি, পরিচিত ভাষা ও সমাজ ছেড়ে নতুন পরিবেশ ও অপরিচিত লোক-সমাজের মধ্যে একাকী জীবনযাপন করতে হয় ।

দেশে যেখানে প্রতিদিন তিন বেলা মার হাতের সুস্বাদু খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হতো, এখন দূর পরবাসে খাবারের বাছ-বিচার না করে কোনো রকম ক্ষুধার জ্বালা মিটিয়েই তৃপ্ত হতে হয় । রোগ-শোকে, বিপদ-আপদে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব পাশে এসে দাঁড়াত । প্রবাসে এখন জীবনের যত ঝড়-ঝাপটা, সব একাই শামাল দিতে হয় ।

এতসব দুঃখ-কষ্ট সে সহ্য করে যায় পরিবার-পরিজনের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য । পরিবার যেন সুখে থাকে, ছেলে-মেয়েরা যেন উন্নত শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পায়, মা-বাবার চিকিৎসাটা যেন ভালোমতো হয়, এ-ই তার একমাত্র চাওয়া ।

প্রবাস জীবনের দুঃখ-কষ্ট, এ জীবনের দায়-দায়িত্বের চাপ শুধু একজন প্রবাসীই বুঝতে পারে । তাসত্ত্বেও নিয়তির অবধারিত নীতি মেনে তাকে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে হয় ।

হাসিমুখে কষ্ট-যাতনা আড়াল করে প্রবাস জীবন উপভোগ করার জন্য আমাদের করণীয় কী? এত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও একটু হাসি-আনন্দে জীবনযাপন করার উপায় কী?

সমাপ্তি:

১. মনে রাখতে হবে, প্রবাসজীবনের উদ্দেশ্য হলো এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণ করা ও কল্যাণচিন্তা বাস্তবায়ন করা, স্বদেশে থেকে ব্যক্তির জন্য যা অত্যন্ত দুরূহ ও কষ্টসাধ্য। অনেক সময় শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুচিকিৎসার উদ্দেশ্যে বিদেশযাত্রা আপনার জন্য অধিক কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে।
২. বিদেশ যাত্রা ও প্রবাস-জীবনে অনেক কল্যাণ নিহিত। এর মাধ্যমে নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতি, জীবনধারা ও সামাজিকতা পরখ করার সুযোগ হয়। তার মধ্যে যা কিছু কল্যাণ, যা কিছু মঙ্গল, তা হয়ে থাকে ভবিষ্যৎ জীবন পথের পাথেয়। এভাবে ব্যক্তির বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ঋদ্ধ হয়। জীবনধারা উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়।
৩. আপনি নিশ্চিত থাকুন। দৃষ্টিস্তত্রস্ত হবেন না। প্রযুক্তি ও আবিষ্কারের যুগে এখন যোগাযোগব্যবস্থা অনেক উন্নত। মোবাইল ও ইন্টারনেটের কল্যাণে গোটা পৃথিবী আপনার হাতের মুঠোয়। যখন ইচ্ছা, যার সাথে ইচ্ছা, যোগাযোগ করতে পারেন। তাদের খোঁজ-খবর নিতে পারেন।
৪. বিদেশে এমন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন-যেমন: স্বদেশের দূতাবাস, মসজিদ, ইসলামি প্রতিষ্ঠান এবং স্বদেশী ব্যক্তিবর্গ-যাদের আন্তরিক ব্যবহার ও কথাবার্তায় আপনার প্রবাস জীবনের কষ্ট লাঘব হবে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকার কষ্ট কিছুটা হলেও ভুলে থাকতে পারবেন।
৫. স্মরণ করুন, নবী-রাসূলগণ, ইতিহাসের মহা মনীষী ও বিপ্লবী ব্যক্তিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার উদ্দেশ্যে, দেশ ও জাতির কল্যাণে স্বদেশ ত্যাগ করে ভিনদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। দূর দেশের অজানা পথের দুর্যোগ-দুর্বিপাক হাসিমুখে সহ্য করেছেন।
৬. স্বদেশ ছেড়ে যে দেশে অবস্থান করছেন, অবসরের সময়টাতে সেখানে শিক্ষা-দীক্ষামূলক চর্চা অথবা অর্থোন্নয়নমুখী কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হোন। যা আপনাকে প্রবাস জীবনের দৃষ্টিস্তা-দুর্ভাবনা ও দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলিয়ে দেয়।

৭. মনে রাখুন, আপনি নিজের ও পরিবারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। এজন্য অবশ্যই আপনাকে হালাল উপার্জনের কোনো একটা উপায় অবলম্বন করতে হবে। জাগতিক জীবনে এটাই চিরাচরিত রীতি। তাই বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখুন এবং জীবনের এ মহান দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে পেরে সম্মান ও গৌরব বোধ করুন।
৮. চিন্তা করে দেখুন, পরকালীন জীবনের বিবেচনায় আমাদের এ জাগতিক জীবনও একপ্রকার প্রবাস জীবন। যে দিন আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) আমাদের আসল ভূমি জান্নাত থেকে পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ করেছেন, সে দিন থেকেই আমরা প্রবাসী। এভাবেই চিন্তা করে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিন।
৯. সময়মতো জামাতের সাথে পাঁচওয়াক্ত নামায ও অন্যান্য ইবাদতে যত্নবান হোন। বেশি বেশি যিকির আযকারের মাধ্যমে আপন রবের সাথে মহাব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করুন। এর মধ্যে যুগপদ দু'টি কল্যাণ নিহিত:
প্রথমত, বিরাট প্রতিদান হাসিল হবে। দ্বিতীয়ত, নেক আমলের মধ্যে সময় কাটানোর মাধ্যমে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনামুক্ত থাকা সহজ হবে।
১০. নিজের মধ্যে একটা আলাদা জগৎ গড়ে তুলুন, যা হবে কল্যাণকর চিন্তাভাবনা, আল্লাহর যিকির ও দু'আ পাঠের মতো মহৎ আমলের জগৎ। মনে করুন, এ জগৎটাই আপনার স্বদেশ মাতৃভূমি।
১১. আপনি কেন কাঁটা তারের সীমারেখা ভুলে গোটা বিশ্বটাকে আপনার স্বদেশ ভাবছেন না? এ জগৎটাকে নিজের আবাসভূমি মনে করছেন না?
আপনি এভাবে চিন্তা করুন—বিশ্বজগৎটা তো একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সমগ্র পৃথিবী তো মহান আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। যেখানে আপনার অবস্থান, সেটাই হবে আপনার আবাসভূমি। কবির ভাষায়:

وَأَيْنَمَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فِي بَلَدٍ

عَدَدْتُ ذَاكَ الْحَيِّ مِنْ صُلْبِ أَوْطَانِي

অর্থ: 'পৃথিবীর যেখানেই মহান আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয়, আমি মনে করি, সেটাই আমার মাতৃভূমি।'

১১. বিদেশে অবস্থানকালে সেখানের নিয়ম-নীতি মেনে চলুন। আপনার স্বকীয়তা ও ধার্মিকতা অটুট রেখে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি সম্মান বজায় রাখুন। নিজেকে ইসলাম ও মুসলমানের আদর্শ নমুনাক্রমে উপস্থাপন করুন। আপনার স্বকীয়তা ও স্বাভাব্যতা, আপনার জন্য সামাজিক মূল্যায়ন ও সম্মান বয়ে আনবে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ অবিসংবাদিতভাবেই হাদীসশাস্ত্রে সর্বাধিক প্রশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব হলেন ইমাম বুখারী (রহ.)। ষোলো বছর বয়সেই তিনি স্বদেশ ছেড়ে বের হয়ে পড়েন। পবিত্র মক্কায় হজ পালন করেন এবং মদিনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রওয়া মোবারক যিয়ারত করেন। এরপর হেজাজ, মিশর হয়ে ইরাকের বাগদাদ এসে পৌঁছান।

বাগদাদ শহরে যখন প্রবেশ করেন, তিনি পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন রিক্তহস্ত। একমাত্র সম্বল হলো আপন রবের ওপর ভরসা ও গভীর জ্ঞানপিপাসা। আল্লাহ তা'আলাও তাঁর ভরসার যথার্থ প্রতিদান দিয়েছেন। যা ছিল হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতির বহিঃপ্রকাশ:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيُظَنَّ بِي مَا شَاءَ

অর্থ: 'আমার প্রতি বান্দার বিশ্বাস মোতাবেক আমি তার সাথে আচরণ করি। সুতরাং বান্দা আমার প্রতি বিশ্বাস রাখুক, সে যেমন চায়।' (মুসনাদে আহমাদ, ২৫/৩৯৮)

জ্ঞানসাধনায় সুদীর্ঘ সফর, অবিরাম চেষ্টা-সাধনা ও কালের দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবেলার পরই তিনি মুসলিম জাতির কল্যাণে বুখারী শরীফ সংকলন করতে সক্ষম হয়েছেন।

- ❖ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) (১৫০-২০৪ হি.) বলেছেন:

مَا فِي الْمَقَامِ لِيَذِي عَقْلٍ وَذِي أَدَبٍ
 مِنْ رَاحَةٍ فَدَعِ الْأُوطَانَ وَاغْتَرِبْ
 سَافِرٌ تَجِدُ عِوَضًا عَمَّنْ تُفَارِقُهُ
 وَإِنْصَبْ فَإِنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ
 إِنِّي رَأَيْتُ وَقُوفَ الْمَاءِ يُفْسِدُهُ
 إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجِرْ لَمْ يَطْبِ
 وَالْأُسْدُ لَوْ لَا فِرَاقُ الْأَرْضِ مَا افْتَرَسَتْ
 وَالسَّهْمُ لَوْ لَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يُصِبْ
 وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الْفُلْكِ دَائِمَةً
 لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَرَبٍ
 وَالتَّبَرُّ كَالْتُّرْبِ مُلْقَى فِي أَمَاكِنِهِ
 وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ الْحَطَبِ
 فَإِنْ تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ مَطْلَبُهُ
 وَإِنْ تَغَرَّبَ ذَاكَ عَزَّ كَالذَّهَبِ

জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য একই স্থানে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া সমীচীন নয়। সুতরাং জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে স্বদেশ ছেড়ে দূর-দূরান্তে সফর করো।

সফর ও হিজরতের বদৌলতে জ্ঞান সাধনার এমন পাথেয় পাবে, যা তোমাকে স্বদেশ ত্যাগের কষ্ট ভুলিয়ে দিবে। অবিরাম চেষ্টা সাধনার মধ্যেই কাঙ্ক্ষিত জীবনের সন্ধান পাবে।

আমি দেখেছি, স্থবিরতা ও প্রবাহহীনতা পানিকে নষ্ট করে ফেলে ।
কিন্তু তা যদি হয় সদা প্রবাহমান, তাহলে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায়
থাকে ।

সিংহ যদি গর্ত ছেড়ে বের না হয়, তার শিকার জুটবে কী করে?
তীর যদি তৃণীর থেকে নিষ্কিণ্ট না হয়, লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানবে
কীভাবে?

সূর্য যদি আপন কক্ষপথের একই স্থানে থেমে থাকে, মানুষ তাতে
যারপরনাই বিরক্ত হবে ।

স্বর্ণখণ্ড যদি তার খনির মধ্যে পড়ে থাকে, মাটির মতো মূল্যহীন
পড়ে থাকবে । সুগন্ধি কাঠ যদি বনের মধ্যে পড়ে থাকে, তবে তা
সাধারণ কাঠ মাত্র ।

স্বর্ণখণ্ড যদি তার খনি ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তাহলেই অমূল্য রতন ।
সুগন্ধিকাঠ যদি বন ছেড়ে বেরিয়ে আসে, স্বর্ণের মতো অমূল্য
বস্তু ।’

অনধিকার চর্চা

নাক-গলানো অর্থ অনর্থক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা, অনধিকার চর্চা করা। প্রত্যেক সমাজে এমন স্বভাবের লোক দেখা যায়, যারা অন্যের বিষয়ে ভীষণ কৌতূহলী। অন্যের জীবনের একান্ত বিষয় জানার জন্য, গোপন কথা উদ্ধার করার জন্য তাদের মধ্যে একধরনের ব্যাঘ্রতা কাজ করে; অথচ ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তার কোনো ভ্রক্ষেপ নেই।

নিজের কর্তব্য সম্পর্কে যতোটা উদাসীন, অন্যের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ততোটা তৎপর। কখনো কখনো নাগ গলানো ও অনধিকার চর্চার প্রবণতা এমন প্রকট আকার ধারণ করে এবং ব্যক্তির মনের কৌতূহল এত উদগ্র হয়ে উঠে যে, যত্রতত্র সে প্রশ্ন করে বেড়ায়, জানতে চায়:

‘অমুক কী করল? সেখানে কে গেল? অমুকের বাড়িতে কে এল? তমুকের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না কেন? কিংবা, বিয়ে হলো কত বছর গেল, বাচ্চা-কাচ্চা হচ্ছে না কেন? অমুকের সাথে না তার রেষারেষি ছিল, এখন এত ভাব কীসের?’

এমন অনর্থক শত-সহস্র প্রশ্ন তার মনে কিলবিল করতে থাকে আর মুখ পিছলে বেরুতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ»

অর্থ: ‘মুসলমানের ইসলামের সৌন্দর্য হলো যাবতীয় অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা।’ (ইবনে মাযাহ, ২/১৩১৫)

আরেকটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى
يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ» (سنن ابن ماجه ১৫০/২)

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার ভুল-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ ফাঁস করে দিবে আল্লাহ তা‘আলাও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি নিজ ঘরে তাকে অপমানিত করে ছাড়বেন।’ (ইবনে মাযাহ, ২/৮৫০)

বর্তমান সমাজে নাক গলানোর প্রবণতা ও অনধিকার চর্চার মানসিকতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে, দুরারোগ্য ব্যাধির রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ থেকে বাঁচার উপায় কী? এ জটিল সমস্যার সমাধান কী?

সমধান:

১. মনে রাখতে হবে, আমাদের জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। যা আমাদের দায়-দায়িত্ব, প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্যই পর্যাপ্ত নয়, সেখানে অন্যের বিষয়ে নাক গলানো ও অনধিকার চর্চা করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।
২. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ পালন করুন:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ৩৬]

অর্থ: ‘আর সে বিষয়ের পেছনে ছুটো না, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই। কান, চোখ আর অন্তর-এগুলোর সকল বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’ (বানী ইসরাঈল, ১৭: ৮৮)

সুতরাং অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ও গুণ্ডচরবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে। যবান, চোখ, কান ইত্যাদির অপব্যবহার থেকে বাঁচতে হবে।

৩. মনে রাখতে হবে, অন্যের পিছু লেগে থাকা এবং তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে অনধিকার চর্চা করা ইত্যাদি দুষ্টাচারের কারণে অনেক সময় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ও ক্ষতির শিকার হতে হয়। তাই অন্যের বিষয়ে নাক গলানো বাদ দিয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাই শ্রেয়। সফল ব্যক্তি কাক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথেই সদা ব্যস্ত। অন্যের বিষয়ে অনর্থক কৌতূহল দেখানোর মতো সময় তার নেই।

৪. অন্যের ব্যাপারে যখন কৌতূহল জাগবে, উদগ্র কৌতূহল কাজ করবে, নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করতে হবে:

নিজের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কি পালন করতে পেরেছি? আমার কাজগুলো কি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পেরেছি? নিজেই তো কত নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার সমাধান না করে অন্যের বিষয়ে নাক গলানো কি আমার জন্য সাজে?

৫. প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের দায়ভার বহন করতে হবে। কেউ কারো কৃতকর্মের বোঝা বহন করবে না এবং সে বাধ্যও নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام: ১৬৬]

অর্থ: 'এবং কেউ অন্য কারো [গুনাহের] বোঝা বহন করবে না।' (আনআম, ৬: ১৬৩)

তাই অন্যের বিষয় এড়িয়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাই শ্রেয়। অন্যের ছিদ্রান্বেষণ না করে আত্মসমালোচনা করাই কর্তব্য।

৬. পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে। তাদের বিষয়ে নাক গলিয়ে, একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন করে বিব্রত করা সমীচীন নয়।

৭. অন্যের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে না তাকিয়ে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন, তার কথা চিন্তা করুন। কারণ, অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বড় করে দেখার প্রবণতা আপনার মধ্যে মানসিক অস্থিরতা ও আত্মিক কলুষতার জন্ম দিবে।

৮. বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে অনধিকার চর্চা ও নাক গলানোর প্রবণতার ব্যাপারে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে মাতা-পিতাকেই হতে হবে উত্তম আদর্শ। সবার আগে তাদেরই এই স্বভাবদোষ থেকে বিরত থাকা এবং এ সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করা কর্তব্য।
৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী মনে রাখুন এবং তা থেকে প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করুন:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي يَتِيَّتِهِ» (سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٠)

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার ভুল-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ ফাঁস করে দিবে আল্লাহ তা'আলাও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি নিজ ঘরে তাকে অপমানিত করে ছাড়বেন।' (ইবনে মাযাহ, ২/৮৫০)

১০. অন্যের বিষয়ে নাক গলানোর স্বভাবদোষ থেকে বেঁচে থাকুন। কেননা এমন স্বভাবদুষ্ট লোক বন্ধু মহলে ও পরিচিত সমাজে অপ্রিয় অনাকাঙ্ক্ষিত।

পরিচিত-অপরিচিত সর্বমহলে বাতাসের মতো প্রাণবন্ত ও ফুলের মতো প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠুন। তাহলে মানুষ আপনার সাক্ষাৎপ্রত্যাশী হবে এবং আপনার সাথে কথা বলে স্বস্তি পাবে।

১১. অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। তারাও আপনার একান্ত বিষয়ে অনধিকার চর্চা থেকে বিরত থাকবে। মনে রাখবেন, প্রত্যেকের জীবনের কিছু গোপনীয়তা আছে। আপনি কখনো

তা উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হবেন না। কেউ যদি আপনার সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে আপনাকে আগ বাড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না, নিজ থেকেই সে আপনার কাছে তার সমস্যার কথা খুলে বলবে এবং তার কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণ করবে।

১২. অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাকগলানোর আগে নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন:

কেউ যদি আমার একান্ত বিষয় জানার জন্য তৎপর হয়, খুটিয়ে খুটিয়ে সব গোপনীয়তা উদ্ধারের চেষ্টা করে, আমার কী দশা হবে? আমার এমন স্বভাব-দোষের কারণেও তো অন্যরাও ভীষণ বিব্রত বোধ করবে, চরম অস্বস্তিতে পড়বে।

১৩. যারা অন্যের বিষয়ে নাক গলায়, অনধিকার চর্চা করে, তাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন। এমন কারোর সাথে যদি সাক্ষাৎ হয়েই যায়, তাহলে অত্যন্ত সাবধানে আগপিছ ভেবে-চিন্তে কথা বলুন। তার নাক গলানোর প্রবণতা থেকে বাঁচার জন্য কুশল বিনিময়স্বরূপ তার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন জুড়ে দিন। কিংবা তার উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করুন।

আপনার একান্ত বিষয় জানার জন্য সে যদি পীড়াপীড়ি করে, তাহলে ভদ্রভাবে বলে দিন:

‘এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তা জানা ঠিক হবে না।’

এতে কোনো লজ্জাবোধ করবেন না। সে তো লাজ-লজ্জা ছেড়ে আপনাকে অযাচিত প্রশ্ন করতে পেরেছে, আপনি কেন নৈতিক উত্তর প্রদানে লজ্জিত হতে যাবেন?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ৬৩]

অর্থ: ‘এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে ‘সালাম’।’ (ফুরকান, ২৫: ৬৩)

পরিশিষ্ট:

❖ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا التَّجَاةُ؟ قَالَ: «أَمْلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلَيْسَعُكَ يَتُّكَ، وَأَبُكَ عَلَى خَطِيئَتِكَ»
(سنن الترمذي ٦٠٥ / ٤)

অর্থ: উকবা বিন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুক্তির পথ কী?’ তিনি বললেন, ‘তোমার যবান সংযত রাখো। (ফেতনার যামানায়) নিজ ঘরে আবদ্ধ থাক। নিজের ভুল-ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হও।’ (তিরমিজী, ৪/৬০৫)

❖ ঢাকনা-ঢাকা পাত্র:

ছোট্ট গল্প। তাতে নাক গলানোর ও অনধিকার চর্চার বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম প্রতিবাদ বিদ্যমান।

এক মেয়ে ঢাকনা-ঢাকা পাত্র হাতে হেঁটে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে এক লোক জিজ্ঞেস করল:

‘এই মেয়ে, কী নিয়ে যাচ্ছে? এই পাত্রে কী?’

উত্তরে মেয়েটি বলল:

‘আমার মা যদি সবাইকে দেখাতে চাইতেন, পাত্রে কী আছে, তাহলে এভাবে ঢেকে দিতেন না।’

❖ আপনি যদি অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকেন, অনধিকার চর্চা পরিহার করেন, তাহলে নিজের প্রয়োজন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পর্যাপ্ত সময়-শ্রম ব্যয় করার সুযোগ পাবেন। -আয়েয আল কারনী

বন্ধ্যত্ব

বন্ধ্যাত্ব হলো সন্তান প্রজননে অক্ষমতা। এ সমস্যা যেমন নারীর ক্ষেত্রে হতে পারে, পুরুষের ক্ষেত্রেও হতে পারে। একটা পরিবারে বন্ধ্যাত্ব-সমস্যা দেখা দিলে প্রথমেই নারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়। এটা অন্যায়।

বন্ধ্যাত্বের কারণে একটা পরিবার নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। প্রশান্ত প্রাণবন্ত মন হয়ে উঠে বিষণ্ণ অস্থির। শান্তি-সুখের সংসারে নেমে আসে দুশ্চিন্তা-বিষাদের অন্ধকার। নারী তার সংসার জীবনের অর্থময়তা হারাতে থাকে। পুরুষ তার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের অনিশ্চয়তায় ভুগে কর্মস্পৃহা হারাতে থাকে।

পারিবারিক জীবনের এ সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় কী? এ সংকট মোকাবিলায় আমাদের করণীয় কী?

সমাধান:

১. বিয়ের আগে অবশ্যই ডাক্তারি চেকআপ-এর বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে-ছেলে-মেয়ের কোনো একজন গুরুতর কোনো শারীরিক কিংবা মানসিক রোগে আক্রান্ত কিনা?
২. জেনে রাখুন, বন্ধ্যাত্ব সমস্যার সম্মুখীন আপনি একাই নন। আপনার পূর্বেও কোনো কোনো নবী-রাসূল ও মহা মনীষী এ সমস্যার শিকার হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এমনও আছেন, যারা বিয়ে পর্যন্ত করেননি। কিন্তু এ কারণে তো তাঁদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব একটুও কমেনি। তাঁদের জীবনের মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হয়নি। তাহলে আপনি কেন নিজের সাধারণ জীবনযাপনের পথে এ সমস্যাটাকে এত গুরুতর মনে করছেন!

৩. বন্ধ্যাত্বের বিষয়টাকে আপনার মন-মানসিকতা থেকে ঝেড়ে ফেলুন। ব্যস্ততা ছাড়া দীর্ঘক্ষণ একাকী থাকা ঠিক নয়। তাহলে যত দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা আপনার মনে বাসা বাঁধবে। সবসময় কর্মমুখর জীবনযাপন করুন। স্বপ্নবান আশাবাদী ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের সাথে চলুন। জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন। তা আপনাকে জীবনের সমস্যা-সংকটের কথা ভুলিয়ে সাবলীল প্রাণবন্ত জীবনযাপনে সাহায্য করবে।

৪. কয়েকজন এতিম ও দরিদ্র সন্তানকে নিজ সন্তানের মতো আপন করে নিন। তাদের আদর-যত্ন ও দেখাশোনা করুন। প্রয়োজনের মুহূর্তে তারাই সন্তানের চেয়েও বেশি আপন হয়ে আপনার পাশে দাঁড়াবে।

৫. একটা এতিম সন্তানকে পালক নিন, কিংবা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। এ মহৎ কর্মে যুগপদ দু'টি কল্যাণ নিহিত।

প্রথমত, আপনার জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে। দ্বিতীয়ত, জান্নাতুল ফিরদাউসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى،
وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (صحيح البخاري ৫৩/৭)

অর্থ: আমি ও এতিমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এই দু'আঙুলের ন্যায় পাশাপাশি অবস্থান করব। এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল কাছাকাছি করে দেখালেন। দু'টি আঙুলের মধ্যে তিনি সামান্য ফাঁকা রাখলেন। (বুখারী, ৭/৫৩)

৬. এতিম-অনাথ শিশুদের জন্য অর্থ ব্যয় করাও অনেক ফযিলতপূর্ণ কাজ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أُنْفِقُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [البقرة : ২১৫]

অর্থ: লোকে আপনাকে জিজ্ঞেস করে (আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য) তারা কী ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন, তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য হওয়া চাই। আর তোমরা কল্যাণকর যে কাজই কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। (বাকারা, ২: ২১৫)

৭. সন্তান না হওয়ার ইতিবাচক দিকগুলোর কথা চিন্তা করুন। যেমন : সন্তানের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ঝঙ্কি-ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। সন্তানের নানা রোগ-শোক ও বিপদ-আপদ থেকে আশঙ্কামুক্ত হয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করার সুযোগ হয়। কারো জীবদ্দশায় যদি নিজ সন্তানের মৃত্যু দেখতে হয়, এর দুর্বিষহ কষ্ট-যন্ত্রণা তাকে আজীবন বয়ে বেড়াতে হয়। কিন্তু যদি সন্তান না থাকে, তাহলে নিজ চোখে সন্তানের অকাল মৃত্যু দেখার জ্বালা সহ্য করতে হয় না।

সন্তান যদি কোনো অপরাধ জগতের সাথে জড়িয়ে পড়ে কিংবা কোনো নৈতিক ও চারিত্রিক ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হয়, তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ভুক্তভোগী মা-বাবার জীবন নিঃশেষ হয়ে যায়। নিঃসন্তান হওয়ার ফলে আপনার জীবনে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা নেই।

৮. নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন, কিংবা আপনার চারপাশের সমাজের খোঁজ নিয়ে দেখুন, এমন অনেক লোকের সন্ধান পাবেন, যারা দশটি কিংবা তার কম-বেশি সন্তানের বিরাট পরিবারের কর্তা। সারা জীবন সংসারের ঘানি টেনে, পরিবারের নানান ঝঙ্কিঝামেলা সামাল দিতে গিয়ে এখন তারা এমন পরিস্থিতির শিকার যে, সর্বান্তকরণে তাদের একটাই কামনা, তারা যদি নিঃসন্তান হতে পারত! এ অবস্থা বিবেচনায় আপনি রবের শোকর আদায় করুন। যে তিনি আপনাকে জীবনের এমন কঠিন পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছেন।

৯. মনে-প্রাণে সর্বদা এ চিন্তা লালন করুন, আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় প্রকৃত কল্যাণ নিহিত।

সন্তান লালন-পালনে, না কি নিঃসন্তান জীবনযাপনে, অসুস্থতায় না কি সুস্থতায়, সচ্ছলতায় না কি দরিদ্রতায়-কীসে আপনার কল্যাণ নিহিত, এ

বিষয়ে মহান আল্লাহ তা‘আলাই সর্বজ্ঞাত । তার ফায়সালাই সম্ভ্রষ্টচিত্তে গ্রহণ করুন । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী ।

১০. কিতাব সম্পর্কে হাফেজ ইবনুল কাইয়্যিম জাওয়ী (রহ.) (৬৯১-৭৫১ হি.)-এর অভিমত শুনুন । তিনি বলেছেন:

‘আপনার কিতাবগুলো আপনার চিরস্থায়ী সন্তান ।’

অর্থাৎ, মৃত্যুর পর সমাজের মধ্যে সন্তানই আপনার প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকবে । কালের ব্যবধানে একদিন তারও মৃত্যু হবে । আপনার অবদানও নিঃশেষ হয়ে যাবে । কিন্তু আপনার রচিত বইয়ের কোনো মৃত্যু নেই । তা চিরদিন আপনার অবদান ও সুকীর্তির প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকবে । আপনি এমন কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হোন, মানবকল্যাণে যার অবদান স্থায়ী, দীর্ঘস্থায়ী ।

১১. মেধাবী যোগ্য ছাত্র-গড়ার মহৎ উদ্যোগে নিয়োজিত হোন । আপন সন্তানের মতো তাদের দেখাশোনা করুন । ইহকাল ও পরকালের কল্যাণে তারাই আপনার আপন সন্তানের চেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে ।

১২. বিয়ে করেছেন । একএক করে কয়েক বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু সন্তানের দেখা নেই । আশাহত হবেন না । আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না । এমন অনেকের কথা শুনেছি, বিয়ের দীর্ঘ কয়েক বছর পর এক সময় যখন তারা সন্তানের আশা ছেড়ে দিয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা তাদের কোল জুড়ে ফুটফুটে সন্তান দান করেছেন ।

অসুস্থতার পর সুস্থতা, অসচ্ছলতার পর সচ্ছলতা ও দুঃখের পর সুখ-পরিবর্তনের এই চলমান ধারাই হলো জীবন । সুতরাং দীর্ঘকাল সন্তানহীনতার কষ্টের পর সন্তান লাভের সুখ সমাগত ।

১৩. এই দু‘আটি বেশি বেশি পাঠ করুন:

﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: ৮৭]

অর্থ: ‘হে আমার রব! আমাকে একা রেখ না, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ।’ (আম্বিয়া, ২১: ৮৯)

যারা সন্তানহীনতার সম্মুখীন হয়েছেন, এই দু'আটি তাদের জন্য ঐশী সমাধান।

১৪. অবসর ও কাজেকর্মে, ঘরে-বাইরে সর্বদা তাওবা-ইস্তিগফারে মশগুল থাকুন। এই আমলের প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা সন্তান-সন্ততি দান করার ওয়াদা করেছেন :

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَرًا ﴾ [نوح: ১০-১২]

অর্থ: 'আমি তাদেরকে বলেছি, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চিতভাবে জেন, তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। তিনি আকাশ থেকে তোমাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে উন্নতি দান করবেন এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করবেন উদ্যান আর তোমাদের জন্য নদ-নদীর ব্যবস্থা করে দিবেন।' (নূহ, ৭১: ১০-১২)

১৫. নিরাশ হবেন না। এখন বন্ধ্যাত্ম সমস্যার সমাধানে এবং সন্তান প্রজননের জন্য অনেক উন্নত চিকিৎসা রয়েছে। সুতরাং আপনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন এবং আল্লাহর তা'আলার কাছে দু'আ করতে থাকুন। তিনিই সর্বশ্রোতা ও দোয়া কবুলকারী।

পরিশিষ্ট:

নবী যাকারিয়া (আ.) আশতিপর বৃদ্ধ কিংবা বয়স একশ ছুইছুই। আপন রবের দরবারে সন্তানহীনতার অনুযোগ করলেন। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে কেঁদে যারযার হয়ে দু'আ করলেন :

﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ [الأنبياء: ৮৭]

অর্থ: 'হে আমার রব! আমাকে একা রেখ না, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী।' (আম্বিয়া, ২১: ৮৯)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দু'আ কবুল করলেন। পরন্তু বার্ষক্যে পুত্রসন্তান দান করলেন। তিনি হলেন নবী ইয়াহইয়া (আ.)। পুত্র ইয়াহইয়া (আ.)-কে পেয়ে যাকারিয়া (আ.) আনন্দে আত্মহারা। আপন রবের উদ্দেশ্যে বললেন (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مریم: ৬]

অর্থ: 'সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, মাথা বার্ষিক্যজনিত শুভ্রতার উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করে কখনও ব্যর্থকাম হইনি।' (মারইয়াম, ১৯: ৪)

আল্লাহ তা'আলার কুদরত এমনই। সবকিছুর উর্ধ্বে। সমস্ত বাহ্যিকতার উর্ধ্বে। তাই অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক, সমস্যা যতই চরম আকার ধারণ করুক, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না। আপনার যেকোনো প্রয়োজন, নিবেদন করুন একমাত্র আল্লাহর কাছে। তিনিই দোয়া কবুলকারী।

অসুস্থতা

ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা ও সুস্থতা-অসুস্থতা-অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার এই চলমান ধারাই হলো পার্থিব জীবন।

সুস্থতার মতো অসুস্থতাও জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অনাকার্ষিক বাস্তবতা। নবী-রাসূলগণের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থেকে শুরু করে বর্তমান পৃথিবীর সর্বনিম্নস্তরের লোকটাও এ বাস্তবতার শিকার।

সুস্থতার সময় তো মানুষ তার যোগ্যতা-দক্ষতার বড়াই করে। পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহমিকা প্রদর্শন করে। বংশমর্যাদা, অর্থবল, লোকবল তাকে এতটাই মোহিত করে রাখে, চরম আবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রদর্শনেও সে কোনো কিছুই পরোয়া করে না। কিন্তু যে-ই অসুস্থ হয়, তার আসল দুর্বলতা প্রকাশ পায়। শরীর-স্বাস্থ্য ও মন-মানসিকতায় ভীষণ অসহায়ত্বের ছাপ ফুটে উঠে। অসুস্থতার এ সময়টাতেই মানুষ বুঝতে পারে, সে কত দুর্বল, কত অসহায়!

অসুস্থতার ধরন ভিন্নতায় ব্যক্তি নানা ধরনের প্রতিকূলতার শিকার হয়। সুস্বাদু খাবার-দাবার বিশ্বাস লাগে। আরামের বিশ্রাম হারাম হয়ে যায়। গোটা দেহ নিস্তেজ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। মন মানসিকতা তার স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও উদ্যমতা হারায়।

জীবনের এই প্রতিকূলতাকে আমরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব? অসুস্থ অবস্থায় আমাদের করণীয় কী হবে?

সমাধান:

১. আমি আপনাকে সে কথাই বলবো, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«لَا بَأْسَ ظَهَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» (صحيح البخاري ٤/ ٢٠٢)

অর্থ: 'ভয়ের কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।'
(বুখারী, ৪/২০২)

অসুস্থতার কবলে ভেঙ্গে পড়বেন না। জেনে রাখুন, অসুস্থতা অবশ্যই আপনাকে সুস্থতার নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। মন থেকে অহংকার ও দাঙ্গিকতার শিকড় উপড়ে ফেলবে। উদাসীনতা দূর করে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

২. অসুস্থ হলে নিকটজনদের সাথে পরামর্শ করুন এবং আপনার অসুস্থতার বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করুন।
৩. চিকিৎসকের কর্তব্য হলো, রোগীর সাথে সহাস্য বদনে কুশল বিনিময় করা। অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। রোগ যতই গুরুতর হোক, কোনো ধরনের ভয় ও আশঙ্কার প্রকাশ না করে রোগীর কাছে সহজ-স্বাভাবিকভাবে তার রোগের কথা বলা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এ-বলে আশ্বস্ত করা, দুশ্চিন্তার কিছু নেই, ইনশাআল্লাহ, অচিরেই সুস্থ হয়ে যাবেন।
৫. আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এটা প্রমাণ করেছে যে, রোগীর উঁচু মনোবল ও আরোগ্য লাভের দৃঢ় প্রত্যাশা তার দেহে রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে, হতাশা ও নিরাশা রোগীর দেহে রোগ-প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলে। ফলে তার আরোগ্য লাভও বিলম্বিত হতে থাকে।
৬. মনে রাখবেন, আপনার রোগ যত গুরুতরই হোক-না-কেন, পৃথিবীতে এর চেয়েও জটিল ও ভয়ানক রোগ বিদ্যমান। তাই আপন রবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন এজন্য যে, তিনি আপনাকে তুলনামূলক বড় রোগ থেকে মুক্ত রেখেছেন।

আরেকটি বিষয় মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। বিজ্ঞজনের বাণী:

‘অসুস্থতা তোমাকে কত গুনাহ, নাফরমানি ও ভুল-বিচ্যুতি থেকে বিরত রেখেছে।’

৭. আপনি অসুস্থ? তাহলে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। অসুস্থতা হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। কেননা এর মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান নিশ্চিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

ফাযল ইবনে সাহল (রহ.) বলেছেন:

إِنَّ فِي الْعِلِّ لِنِعْمًا لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَجْهَلَهَا، فَهِيَ تَمْحِصُ
لِلذُّنُوبِ، وَتَعْرِضُ لِثَوَابِ الصَّبْرِ، وَإِقَاطُ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَتَذَكِيرُ
بِالنَّعْمَةِ فِي حَالِ الصَّحَّةِ، وَاسْتِدْعَاءُ لِلتَّوْبَةِ، وَحَضُّ عَلَى الصَّدَقَةِ.

অর্থ: রোগ-শোক ও অসুস্থতায় বান্দার জন্য কিছু নিয়ামত রয়েছে।

জ্ঞানী ব্যক্তির তা জেনে রাখা উচিত। নিয়ামতগুলো হলো:

অসুস্থতার মাধ্যমে বান্দার গুনাহ মাফ হয়। ধৈর্যধারণের প্রতিদান লাভ হয়। অবহেলা উদাসীনতা দূর হয়ে অসুস্থ ব্যক্তির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সুস্থতার নিয়ামতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। গুনাহ ও নাফরমানি পরিহার করে তাওবা করার মানসিকতা তৈরি হয়। আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করার অনুপ্রেরণা জাগে।

৮. দু'টি কল্যাণ লাভের প্রত্যাশায় অসুস্থ অবস্থায় পাঠ্য দু'আগুলো পাঠ করুন। প্রথমটি সুস্থতা লাভ, দ্বিতীয়টি গুনাহমুক্ত হওয়া।
৯. অসুস্থ হলে প্রতিদান লাভের প্রত্যাশায় ধৈর্যধারণ করুন। এর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে যে উঁচু মরতবা লাভ হবে, অনেক নেক আমলের মাধ্যমেও তা অর্জন করা কঠিন। অসুস্থতার মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরীক্ষা করছেন, উঁচু মরতবা লাভ করার এ সুযোগ আপনি কাজে লাগাতে পারেন কি না?

১০. লক্ষ করে দেখুন, আপনি একাই অসুস্থ নন, গোটা বিশ্বে আরও লক্ষ কোটি মানুষ নানা রকম অসুস্থতায় জর্জরিত। তাদের অনেকের আরোগ্য লাভ দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। আর কারো কারো মৃত্যু অনিবার্য। সে তুলনায় আপনার অসুস্থতা নিতান্ত সাধারণ মনে হবে। সুতরাং তাদের কথা চিন্তা করে সান্ত্বনা গ্রহণ করুন।

১১ অসুস্থতার অন্যতম ইতিবাচক দিক হলো, ব্যক্তিকে তা অন্যান্য রোগীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের সেবা-শুশ্রূষা করার মানসিকতা তৈরি করে।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: "يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدَّنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟" (صحيح مسلم ٤/ ١٩٩)

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ হয়েছিলাম; কিন্তু তুমি আমার সেবা করেনি।'।

বান্দা বলবে:

‘আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আর আমি আপনার নগণ্য বান্দা। আমার পক্ষে কীভাবে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করা সম্ভব?’

আল্লাহ তা'আলা বলবেন:

‘তোমার কি জানাছিল না, আমার বান্দা অমুকের ছেলে অমুক অসুস্থ? কিন্তু তুমি তার সেবায়ত্ন করেনি। তুমি যদি তার সেবায়ত্ন করতে, তাহলে তার কাছে আমাকে পেতে।’ (মুসলিম, ৪/১৯৯)

১২. দান-সদকা হলো যাবতীয় রোগের প্রতিষেধক এবং জাহান্নামের অগ্নিনির্বাপক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"ذَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ"

অর্থ: দান-সদকার মাধ্যমে তোমরা রোগীদের চিকিৎসা কর।^{৬০}

১৩. আরোগ্য লাভের জন্য অস্থির ত্বরাপ্রবণ হওয়া সমীচীন নয়। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। রোগের মাত্রা আরও বেড়ে যেতে পারে। প্রতিটা রোগই নির্দিষ্ট কিছু কাল স্থায়ী হয়। তাই ধৈর্যধারণ করুন এবং আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় নিয়মিত দু'আ করতে থাকুন।

মনে রাখবেন, আরোগ্য দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। হাসপাতাল, চিকিৎসক ও চিকিৎসা-এগুলো বাহ্যিক উপায় মাত্র। মূর্তিপূজারীদের সামনে ইবরাহিম (আ.) আপন রবের ক্ষমতা ও শক্তিমন্তার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ৮০]

অর্থ: 'এবং আমি যখন পীড়িত হই, তিনিই আমাকে শেফা দান করেন।' (শুআরা, ২৬: ৮০)

১৪. মনে রাখতে হবে, মানবজাতির আসল ব্যাধি হলো ঈমান ও বিশ্বাসের ব্যাধি। তাই পবিত্র কুরআনে দৈহিক রোগ-ব্যাধির তুলনায় হৃদয় ও আত্মা এবং ঈমান ও বিশ্বাসের ব্যাধির ব্যাপারে অধিক সতর্ক করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ بِمَا

كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: ১০]

অর্থ: 'তাদের অন্তরে আছে রোগ। আল্লাহ তাদের রোগ আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে, যেহেতু তারা মিথ্যা বলত।' (বাকারা, ২: ১০)

^{৬০} আল-জামেউস্ সাহীহ লিসুন্নাহ ওয়াল মাসানীদ, ৮/৪০২

১৫. জাগতিক জীবন তো দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, রোগ-ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাকে আকীর্ণ। প্রকৃত সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জায়গা হলো চিরস্থায়ী জান্নাত। তাই ইহজীবনের বাস্তবতা মেনে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে মশগুল থাকাই শ্রেয়। এর মাধ্যমেই পরকালের সফলতা ও জান্নাতের পথ সুগম হবে।
১৬. আমি এক ব্যক্তিকে চিনি। তরুণ বয়সে জটিল এক রোগে আক্রান্ত হয়ে কাঁধ থেকে তার বাঁ হাত কেটে ফেলতে হয়েছিল। এখন সে পরিবার, সন্তান নিয়ে বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছে। পেশায় গাড়ি চালক। এক হাতেই সে এমন স্বচ্ছন্দে গাড়ি চালায় ও অন্যান্য কাজকর্ম করে, যেন সৃষ্টিগতভাবেই সে এক হাত নিয়ে জন্মেছে। সুতরাং আপনিও আল্লাহ তা'আলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন। এতেই আপনার মানসিক প্রশান্তি নিহিত।
১৭. অসুস্থ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা, তার সাথে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনদের সাক্ষাৎ করা কর্তব্য। পাশাপাশি তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, দ্রুত আরোগ্য লাভের আশ্বাস দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে রোগী শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও তার মানসিক শক্তি অটুট থাকে। দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠার জন্য যা অত্যন্ত কার্যকর।
১৮. অসুস্থতা থেকে মুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে সকাল-সন্ধ্যায় 'আদইয়ায়ে মাসূরা' নিয়মিতভাবে পাঠ করুন। শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় 'রুকইয়া' এর পন্থা অবলম্বন করুন। এ দু'টি পন্থা হলো বান্দার ঐশী সুরক্ষা। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।
১৯. মনে রাখবেন, অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করানোর চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করা ও রোগের কারণ-উপকরণ থেকে সুরক্ষিত থাকাই শ্রেয়। এ লক্ষ্যে শুয়ে-বসে অলস অবসর জীবনযাপন, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত ও তৈলাক্ত খাবার এবং ধূমপান ইত্যাদির মতো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার-দাবার, নিয়মিত হাঁটাচলা ও শরীরচর্চায় যত্নবান হওয়া আবশ্যিক।

২০. অসুস্থ হলে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হওয়া কিংবা সুস্থ হওয়ার পর তাঁর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা-কোনোটাই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই অসুস্থ অবস্থায় হতাশায় ভেঙ্গে না পড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَيُنْ أَدَقُّنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْئُوسٌ

كَفُورٌ﴾ [হুদ: ৯]

অর্থ: 'যখন আমি মানুষকে আমার নিকট হতে অনুগ্রহ আশ্বাদন করাই ও পরে তার থেকে তা প্রত্যাহার করে নেই, তখন সে হতাশ (ও) অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়।' (হুদ, ১১: ৯)

২১. পবিত্র কুরআন হলো যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক রোগের প্রতিষেধক। তাই বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সূরা ফাতেহা, ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾

অর্থ: 'আমি নাযিল করেছি এমন কুরআন, যা মু'মিনদের পক্ষে শেফা ও রহমতের ব্যবস্থা। তবে জালেমদের ক্ষেত্রে এর দ্বারা ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি হয় না।' (বনী ইসরাঈল ১৭: ৮২)

২২. আপনার মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা জুড়ে যেন অসুস্থতার প্রভাব বিরাজ করতে না পারে-এ বিষয়ে সচেতন হোন। নিজের ভালো লাগার কোনো কাজে ব্যস্ত থাকা কিংবা বই পড়া, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে অসুস্থতার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করুন।

২৩. দেশের অভিজ্ঞ ডাক্তার ও চিকিৎসকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যার প্রধান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হবে, সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও বিভিন্ন রোগ-বিরোগে তাদের করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২৪. ওষুধ কোম্পানিগুলোকে ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। দেশের প্রতিটি শহর, শহরতলি, পল্লি-গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান করা অত্যাবশ্যিক। এটা একই সঙ্গে মানবিকতা ও ইসলামি শরীয়তের দাবি।
২৫. দেশের জ্ঞানী-গুণী, দায়ী ও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কর্তব্য হলো, হাসপাতাল ও বিভিন্ন মানবসেবা কেন্দ্রে রোগীদের সাক্ষাতে যাওয়া। তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া। তাদের এ কার্যক্রম হতে হবে নিয়ম মাপিক ও ধারাবাহিক। এ সময় তারা নিজেদের সাধ্যানুযায়ী অসুস্থদের সাহায্য-সহযোগিতা করার পাশাপাশি দ্রুত আরোগ্য লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করবে এবং সওয়াব ও প্রতিদান লাভের প্রত্যাশায় তাদের সবার ও ধৈর্যধারণে অনুপ্রাণিত করবে।
২৬. সমাজের ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য হলো, গরিব-মিসকিন ও অসুস্থ লোকদের চিকিৎসা সেবায় আর্থিক অনুদান দেওয়া। কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে এটা বিরাট প্রতিদান ও ফযিলতপূর্ণ আমল।
২৭. রোগী দেখতে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আদব রক্ষা করা কর্তব্য:
- ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধাকে প্রাধান্য না দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তির কাছে উপযুক্ত সময়ে যাওয়া।
 - রোগীর কাছে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান না করা।
 - নেতিবাচক কথা ও দুঃসংবাদ এড়িয়ে ইতিবাচক কথা বলা এবং দ্রুত আরোগ্য লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করা।
 - অসুস্থতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে রোগীকে একের পর এক প্রশ্ন না করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া।
 - হাদীসে বর্ণিত রোগী দেখার দু'আ পাঠ করা। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ... إِلَّا عُوفِيَ.

অর্থ: 'যেকোনো মুসলমান অসুস্থ-যার মৃত্যু এখনও ঘনিয়ে আসেনি-ব্যক্তিকে দেখতে এসে সাতবার এ দু'আ পাঠ করবে, রোগী সুস্থতা লাভ করবে:

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ.

অর্থ: 'মহা আরশের অধিপতি মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করুন।' (তিরমিজী, ৪/৪১০)

আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন (এই দু'আ) পাঠ করতেন:

«أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا» (صحيح البخاري ১২১/৭)

অর্থ: 'হে মানবজাতির প্রতিপালক! (তার) অসুস্থতা দূর করে দিন! (তাকে) আরোগ্য দান করুন। আপনিই তো আরোগ্য দানকারী। আপনি ছাড়া কোনো আরোগ্য দানকারী নেই। (তাকে এমন) সুস্থতা দান করুন, যারপর আর কোনো রোগ থাকবে না।' (বুখারী, ৭/১২১)

২৮. বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মতে প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে সুস্থতা-অসুস্থতা যাচাই করা কর্তব্য। সচেতনতামূলক উপায় অবলম্বন করা আবশ্যিক। বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়তের নির্দেশ।

২৯. সচরাচর সাধারণ রোগগুলোর প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জেনে রাখুন এবং তা যথাযথ প্রয়োগ করতে শিখুন। সময়ে অসময়ে এ সাধারণ চিকিৎসাই অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। যেমন: হাত কেটে যাওয়া, পায়ে সামান্য আঘাত পাওয়া, মাথাব্যথা, ছোট বাচ্চাদের আঘাত পাওয়া ইত্যাদি।

৩০. আপনার ওপর আল্লাহ তা'আলার নায-নিয়ামতের কথা স্মরণ করুন, দেখবেন তা অগণিত। সুস্থতার দিনগুলোর কথা ভাবুন, দেখবেন তা কত দীর্ঘ। এবার অসুস্থতার কয়েকটা দিন গুণে দেখুন, তা হবে নিতান্ত সামান্য। তাই অসুস্থতার গুটি কয়েক দিনের কথা ভুলে সুদীর্ঘ সময়ের সুস্থতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রাখুন এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন।

৩১. আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাকে রোগমুক্ত করে সুস্থতা দান করলেন, দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ফিরিয়ে দিলেন, তখন সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করুন। তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করুন। সদ্য অসুস্থতার কথা ভুলে গিয়ে, শক্তি-সামর্থ্য ফিরে পেয়ে যাচ্ছে-তাই জীবনযাপন করা সমীচীন নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي

ط إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ [হুদ: ১০]

অর্থ: 'আবার যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করার পর তাকে নিয়ামতরাজি আশ্বাদন করাই, তখন সে বলে, আমার সব অমঙ্গল কেটে গেছে। (আর তখন) সে উৎফুল্ল হয়ে অহমিকা প্রদর্শন করতে থাকে।' (হুদ, ১১: ১০)

পরিশিষ্ট:

- ❖ অসুস্থ অবস্থায় ধৈর্য ও সহনশীলতার সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হলো আল্লাহর নবী আইয়ুব (আ.)-এর ঘটনা। অর্থ-কড়ি, সহায়-সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও বংশমর্যাদা-কোনো কিছুতেই তার কোনো কমতি ছিল না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সুসম্পন্ন।

এত বিপুল নায-নিয়ামত ও সীমাহীন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী আইয়ুব (আ.)-এর ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চাইলেন। তিনি এমন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন, যা তার গোটা দেহে

ছড়িয়ে পড়ল। দেহের ভেতর-বাহির সর্বত্রই রোগের প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ল। বাকি রইল শুধু হৃদয় ও জিহ্বা।

রোগাক্রান্ত নবী আইয়ুব (আ.) বিপুল অর্থ-কড়ি, সহায়-সম্পত্তি সবই হারালেন। সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন সবাই তার সঙ্গ ত্যাগ করল। কিছু দিনের ব্যবধানে তিনি হয়ে পড়লেন সহায়-সম্মলহীন নিঃসঙ্গপ্রায়।

তবে সবাই সঙ্গ ত্যাগ করলেও পুণ্যবতী স্ত্রী তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় নিয়োজিত থাকলেন। এমন সর্বাঙ্গ রোগীর সেবায়ত্নে তিনি একটুও ত্যক্ত-বিরক্ত হলেন না।

এমন রোগাক্রান্ত দশায় নবী আইয়ুব (আ.)-এর জীবনের ১৮টা বছর কেটে গেল। কালের নির্মম ঘাত-প্রতিঘাত ও জীবনের চরম দুর্যোগ-দুর্দশার মধ্যেও তিনি আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতেন। তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে রত থাকতেন। প্রতিদানের প্রত্যাশা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার পথ থেকে একচুল বিচ্যুত হননি। বিরক্তি ও অস্বস্তি তাঁর মনে ছাপ ফেলতে পারেনি।

দুরারোগ্য ব্যাধি যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছিল, তিনি আপন রবের কাছে দু'আ করলেন এবং পানাহ চাইলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿وَاَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ اِنِّىْ مَسْنٰى الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِۙ *

فَاَسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاَتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِّلْعٰبِدِيْنَ﴾ [الانبیاء: ৮৩, ৮৪]

অর্থ: 'আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' তখন আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম। আর তাঁর যত দুঃখ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মত আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ। (আম্বিয়া, ২১: ৮৩, ৮৪)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দু'আ কবুল করলেন এবং আরোগ্য লাভের পস্থা বাতলে দিলেন। আইয়ুব (আ.) আপন রবের নির্দেশ মোতাবেক মাটিতে পদাঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পানির ফোয়ারা উৎসারিত হলো। তাতে গোসল করে তিনি দেহের বাহ্যিক রোগমুক্ত হলেন। এরপর ফোয়ারার পানি পান করে তিনি অভ্যন্তরীণ রোগমুক্ত হলেন। এভাবে তিনি সর্বান্তঃকরণে রোগমুক্ত হয়ে উঠলেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

﴿أَرْكَضْ بِرِجْلِكَ ۚ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ * وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ

وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لَآوِلِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ৬২, ৬৩]

অর্থ: (আমি বললাম,) 'তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে) আঘাত কর, এ হচ্ছে গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়'। আর আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ ও বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন ও তাদের সাথে তাদের অনুরূপ অনেককে।' (সোয়াদ, ৩৮: ৪২, ৪৩)

শিক্ষা:

সুস্থতা-অসুস্থতায়, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতায়, বিপদ-আপদে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার খাঁটি বান্দা হয়ে থাকুন। প্রশংসা ও কৃতজ্ঞচিত্ত বান্দা হয়ে জীবন যাপন করুন।

বিশ্বাস করুন, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনিই পারেন বান্দাকে রোগমুক্ত করে সুস্থতা দান করতে। সুতরাং বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করুন। আপনার যাবতীয় বিষয় আপন রবের জিম্মায় সমর্পণ করুন এবং তাঁরই ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন।

- ❖ আব্বাসীয় খেলাফতকালের বিখ্যাত কবি আবুল আতাহিয়া (১৩০-২১৩ হি.) বলেছেন:

إِنَّ الطَّبِيبَ بِطَبِّهِ وَدَوَائِهِ

لَا يَسْتَطِيعُ دِفَاعَ مَكْرُوهِ أَتَى

مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي

قَدْ كَانَ يُبْرِئُ جُرْحَهُ فِيمَا مَضَى

ذَهَبَ الْمُدَاوِي وَالْمُدَاوِي وَالَّذِي

جَلَبَ الدَّوَاءَ وَبَاعَهُ وَمَنْ اشْتَرَى

অর্থ: 'ডাক্তারের সাধ্য নেই শুধু চিকিৎসা ও ওষুধের সাহায্যে রোগমুক্ত করার। এত দিন যে ডাক্তার, চিকিৎসা করে কত রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন, আজ যখন রোগাক্রান্ত হয়ে স্বয়ং তিনিই মৃত্যুপথযাত্রী, তখন তার কি-ই বা করার আছে। হাসপাতাল, ডাক্তার, ওষুধ-সবই ব্যর্থ।'

❖ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

«مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً» (صحيح البخاري ১২২/৭)

অর্থ: 'আল্লাহ তা'আলা যে রোগই দিয়েছেন তা থেকে আরোগ্য লাভের উপায় বাতলে দিয়েছেন।' (বুখারী, ৭/১২২)

❖ কানাডিয়ান লেখক বব প্রক্টর বলেছেন:

'আপনার অসুস্থতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে যদি লোকদের কাছে ঘটা করে বলতে থাকেন, তাহলে আপনার রোগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। চারপাশের লোকদের চাহনিতে করুণার ছাপ ফুটে উঠবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আপনার অসুস্থতা ও দুর্বলতার কথা স্মরণ করিয়ে পিছিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। তাই অসুস্থতার কথা প্রচার না করে, নিজেকে দুর্বলরূপে উপস্থাপন না করে আত্মবিশ্বাসী হোন। দ্রুত আরোগ্য লাভে আশাবাদী হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।'

❖ সকল অসুস্থ ভাইবোনদের জন্য আমার প্রার্থনা:

'হে আল্লাহ! আপনি তাদের দ্রুত আরোগ্য দান করুন। তাদের নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন দান করুন। হে মহান দয়ালু চিরদয়ীবান! সবাইকে সুস্থতা দান করুন এবং সুস্থতার কদর করার তাওফিক দান করুন।' (আমিন)

মৃত্যু

মৃত্যু হলো অমোঘ অজেয় অনিবার্য, সৃষ্টি জগতের প্রতিটা প্রাণীর জন্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

অর্থ: 'সমস্ত প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।' (আলে ইমরান, ১৮৫)

বিজ্ঞানদের অভিমত:

لَذُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ.

অর্থ: জন্মাও মৃত্যুর জন্য, আর নির্মাণ করো বিলুপ্তির জন্য।

জনৈক আরব কবি বলেছেন:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَّا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ

وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ.

অর্থ: শুনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া সমস্তই মরণশীল। আর আনন্দের সবকিছু নিঃসন্দেহে ধ্বংসশীল।

পবিত্র কুরআনের ভাষ্যমতে মৃত্যুই হলো সবচেয়ে কষ্ট ও বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ, যার পর ইহকালে আর কোনো দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ থাকে না।

যার সাথে আপনার রক্তের সম্পর্ক, মনেপ্রাণে যাকে ভালোবেসে এসেছেন, আজ যদি তার মৃত্যু হয়, নিজ হাতে তাকে কবরের মাটিতে দাফন করতে হবে। পৃথিবীতে এক মুহূর্তের জন্য যাকে চোখের আড়াল করতে পারতেন না, আজ চিরকালের জন্য তাকে ছেড়ে আসতে হবে, অন্ধকার কবরে, একাকী নিঃসঙ্গ। হৃদয়-মন জুড়ে দুঃখ-বেদনা উথলে উঠবে। জীবনের যত আনন্দের উপলক্ষ, মুহূর্তেই তা করুণ বেদনায় পরিণত হবে।

জীবনের এ কঠিন বাস্তবতার মুহূর্তে আপনার করণীয় কী? এমন বেদনাদায়ক পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠার উপায় কী?

সমাপ্তি:

১. একটু ভাবুন, নিজেকে একবার জিজ্ঞেস করুন, আপনার প্রিয়জনের প্রকৃত সুখ ও শান্তি কোথায়? ক্ষণস্থায়ী ইহকালে সহাবস্থানে, না কি চিরস্থায়ী পরকালে আপন রবের সান্নিধ্য? বিবেকের কাছেই আপনি এর সদুত্তর পেয়ে যাবেন।

কবি আবুল হাসান আলী আততিহামী পুত্রের মৃত্যুতে বলেছিলেন:

جَاوَزْتُ أَعْدَائِي وَجَاوَزَ رَبِّي

شَتَّانَ بَيْنَ جَوَارِهِ وَجَوَارِي

‘দুনিয়ার শত্রু-মিত্রের মাঝে আমার বর্তমান অবস্থান। আর আপন রবের পরম সান্নিধ্য তাঁর অবস্থান। আমাদের দুজনের অবস্থানে কত বিস্তর ব্যবধান।’

২. কারো মৃত্যুতে যারা আপন রবের প্রতি বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির বাণী উচ্চারণ করে, পবিত্র কুরআন তাদের আদর্শরূপে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

[البقرة: ১৫৬]

অর্থ: ‘এরা হল সেই সব লোক, যারা তাদের কোন মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, ‘আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।’ (বাকারা, ২: ১৫৬)

৩. প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্যধারণ করুন। প্রতিদানে আপন রবের পক্ষ থেকে তিনটি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলার ঘোষণা:

﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ১৫৭]

অর্থ: 'এরা সেই সব লোক, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দায়া রয়েছে এবং এরাই আছে হিদায়াতের ওপর।' (বাকারা, ২: ১৫৭)

৪. আপন রবের ফায়সালা সম্বন্ধে গ্রহণ করুন এবং তাঁর প্রতি সপ্রশংস হোন। বিপদ-আপদে ধৈর্যশীল ও প্রশংসচিত্ত বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জান্নাতে বালাখানার সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলবেন:

"ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ" (سنن الترمذي شاكر ৩/ ৩৩২)

অর্থ: 'আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি আবাসস্থল তৈরি করো এবং এর নাম রাখো "বাইতুল হামদ"।'

৫. মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি ফায়সালাই বান্দার জন্য মঙ্গলজনক। বান্দাকে তিনি পরীক্ষা করেন বিভিন্ন অবস্থা ও পরিস্থিতির মাধ্যমে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে অনেকে ভাবে, এটা তার জন্য অমঙ্গলজনক; অথচ তাতে নিহিত আছে বহুবিধ কল্যাণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَعَلَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ২১৬]

অর্থ: 'এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে কর, অথচ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনক।' (বাকারা, ২: ২১৬)

৬. মনে রাখতে হবে, জগৎ ও জাগতিক জীবন হলো বান্দার পরীক্ষা-ক্ষেত্র, যা দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, সংকট ও প্রতিকূলতায় কণ্টকাকীর্ণ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۖ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ১৫৫]

অর্থ: ‘আর দেখ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনও) ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনও) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনও) জান-মাল ও ফসলহানী দ্বারা। যেসব লোক (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়, তাদেরকে সুসংবাদ শোনাও।’ (বাকারা, ২: ১৫৫)

৭. আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয় গ্রহণ করুন। সবর ও সালাতের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করুন। পবিত্র কুরআনে উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾

[البقرة: ১৫৫]

অর্থ: ‘এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে নয়, যারা খুশু’ (অর্থাৎ, ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে।’ (বাকারা, ২: ৪৫)

৮. নিয়তির ফায়সালায় অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং আল্লাহ তা‘আলার হুকুমে আপত্তি উত্থাপন করা সমীচীন নয়। কেননা বান্দার অভিযোগ অসন্তোষ তার হারানো বস্তু ফিরিয়ে দিতে পারে না, মৃতকে জীবিত করে তুলতে পারে না। সুতরাং সম্ভবসম্মত আপন রবের ফায়সালা মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করাই শ্রেয়।

৯. পরকালের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম ভিত্তি। পরকালে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের উত্তম বিনিময় দান করবেন এবং জান্নাতে প্রিয়জনদের সাথে অবস্থান করার সুযোগ দান করবেন। তাই প্রিয়জনদের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করুন এবং সান্ত্বনা লাভ করুন যে জান্নাতে তাদের সাথেই হবে আপনার অবস্থান।

১০. প্রিয়জনের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা, কান্না করা মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। তাই ইসলামেও শোকের মুহূর্তে শোক প্রকাশে নিষেধ নেই। তবে হাইমাউ করে কান্না করা, বিলাপ করা, মাতম করা, মাথা চাপড়ানো ও জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলা জাহেলি যুগের কুসংস্কার; শরীয়তের দৃষ্টিতে

তা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। মৃত্যুশয্যা পুত্র ইবরাহীমকে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে এলেন, তাঁর দু' চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তা দেখে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.) (বিস্মিত হয়ে) বললেন:

‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও কান্না করছেন?’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

«إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ» (صحيح البخاري ২/৮৩)

অর্থ: ‘চোখ দু’টো অশ্রুবিগলিত, হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত। কিন্তু যবানে তাই উচ্চারিত হবে, যাতে আমার রব সন্তুষ্ট। হে ইবরাহীম! আমরা যে তোমার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত।’ (বুখারী, ২/৮৩)

১১. আপনজনের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে নিঃসঙ্গ পড়ে থাকবেন না। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর উপায় নয়। এমন ব্যক্তিদের সাথে থাকুন, যাদের মাধ্যমে আপনি সান্ত্বনা পাবেন এবং দুঃখ শোক কাটিয়ে স্বাভাবিক হতে পারবেন।
১২. আল্লাহ তা‘আলার কাছে পার্থিব জান্নাতের চেয়ে উত্তম বিনিময় আর কী হতে পারে? তাই প্রতিদানের প্রত্যাশা রেখে হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন।

«مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَخَذْتُ مِنْهُ إِلَّا الْجَنَّةُ»

অর্থ: ‘বান্দার কোনো আপনজনকে যখন আমি দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেই, আর সে প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্যধারণ করে তখন আমার কাছে তার জন্য একটা প্রতিদানই সুনির্দিষ্ট হয়, তা হলো জান্নাত।’^{৬১}

১৩. অতীতের কথা স্মরণ করে শোকের পাল্লা আরও ভারি করবেন না। তার চেয়ে বরং ক্রীড়াচর্চামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুন এবং দুঃখস্মৃতি ভুলে থাকার চেষ্টা করুন।
১৪. সন্তানের মৃত্যুতে সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলে সন্তুনা দিয়েছেন, তা স্মরণ করে আপনিও সান্ত্বনা গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِي ابْنَانِ فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيثٍ تُطِيبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ قَالَ نَعَمْ "صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبَوَيْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا فَلَا يَتَنَاهَى - أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهِي - حَتَّى يَدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ" (صحيح مسلم ٤ / ٢٠٢٩)

অর্থ: আবু হাসসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আবু হুরায়রা (রা.)-কে বললাম, ‘আমার দু’টি ছেলে সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে একটি হাদীস উল্লেখ করবেন, যাতে আমাদের মৃতদের ক্ষেত্রে আপনি আমাদের মনে শান্তি দিতে পারেন।’

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, তিনি বললেন:

‘হ্যাঁ, তাদের জন্যে তার ছোটশিশুরা জান্নাতের প্রজাপতি তুল্য। তাদের মাঝে কেউ তার পিতার সাথে মিলিত হবে, অথবা তিনি বলেছেন বাবা-মা দুজনের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তার পরিধানের কাপড় কিংবা বলেছেন, হাত ধরবে, যেমনটি আমি তোমার কাপড়ের আঁচল ধরছি। এরপর আর তারা তাদের ছাড়বে না। কিংবা রাবী বলেছেন, ধরে থাকা শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আলাহ তার বাবা-মাকে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।’

১৫. বিশ্বাস করুন, পৃথিবীর বুকে মানবজাতি, জীবজন্তু ও জড়পদার্থ এসবের কোনোটিই স্থায়ী নয়। কালের ব্যবধানে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

[الرحمن: ২৬, ২৭]

অর্থ: 'ভূ-পৃষ্ঠে যা-কিছু আছে, সবই ধ্বংস হবে। বাকি থাকবে কেবল তোমার প্রতিপালকের গৌরবময়, মহানুভব সত্তা।' (আর-রহমান, ৫৫: ২৬-২৭)

তাই নশ্বর পৃথিবীতে ক্ষণিকের সম্পর্কচ্ছেদের দুঃখ কষ্ট ভুলে, জান্নাতে প্রিয়জনদের সাথে চিরস্থায়ী জীবন কামনা করুন।

১৬. জীবদশায় এমন মহৎ কীর্তি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করুন, যা আপনার পরকালের কল্যাণ বয়ে আনবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ দিকনির্দেশনা ভুলে যাবেন না:

“إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ” (سنن الترمذي ৩/ ৬০২)

অর্থ: 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল ছাড়া: (১) “সাদকায়ে জারিয়া”^{৬২} (২) তার শেখানো এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। (৩) কিংবা এমন কোনো সন্তান, যে তার কল্যাণের দোয়া করে।' (তিরমিজী, ৩/৬৫২)

১৭. মনে রাখবেন, জাগতিক জীবনের মৃত্যুই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ নয়, আখেরাতে অবশ্যই আমরা একত্রিত হবো। প্রকৃত বিচ্ছেদ তো পরকালীন জীবনে পৃথক অবস্থান-একজন জান্নাতে অপরজন জাহান্নামে। তাই আমাদের কর্তব্য হলো জান্নাতে একসাথে থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

^{৬২} ব্যক্তির মৃত্যুর পরও তার যে আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকে।

পরিশিষ্ট:

- ❖ বিখ্যাত আরব কবি আবু জুআইন হুযালী ছিলেন হেযাজের বাসিন্দা। স্ত্রী ও পুত্রসন্তানদের নিয়ে তার পরিবারটি ছিল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন ফুটফুটে সাতটি পুত্রসন্তান দান করেছিলেন, যাদের দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, আদর-স্নেহে কোলে নিয়ে চুমু খেতে ইচ্ছে করে।

ছেলেরা যখন তরুণ-যুবক, প্রত্যেকেই জ্ঞানে-গুণে, আচার-আচরণে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে লাগল কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে যারা সমুজ্জ্বলরূপে এগিয়ে যাচ্ছিল, নিয়তির ইশারায় তাদেরই যাত্রা থেমে গেল! সন্তানরা এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো যে, ডাক্তার, ওষুধ ও ঝারফুক—কোনো কিছুতেই কাজ হয় না।

পিতা আবু জুআইব হুযালী কত চেষ্টা তদবির করলেন, কত দিকে ছুটলেন, কত জনের দ্বারস্থ হলেন, কিছুতেই কোনো কাজ হয় না। তিনি ছিলেন একজন বিজ্ঞ কবি। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় সুসম্পন্ন। নিয়তের ইশারা আঁচ করতে বিলম্ব হয়নি। আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা বুঝতে দেরি করেননি।

এক এক করে সাত সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যই হলো তার পরম আশ্রয়। আপন রবের নিকট প্রতিদান প্রত্যাশাই হলো তার দিলের যখমের মারহাম^{৬৩}। সবকিছু তিনি আপন রবের যিম্মায় ন্যস্ত করে সন্তান হারানোর শোক বুকে চেপে রাখলেন। হৃদয়ের যত বেদনা, তুলে ধরলেন কবিতার ভাষায়। ইতিহাসের পাতায় যা চির অমর হয়ে আছে, সে কবিতারই কয়েকটি পঙ্ক্তি প্রকাশ করে স্ত্রীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন:

وَتَجَلِّدُنِي لِلشَّامِتِينَ أُرِيهِمْ

أَنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعُّعُ

^{৬৩} হৃদয়ের ক্ষতের প্রলেপ।

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا

أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ

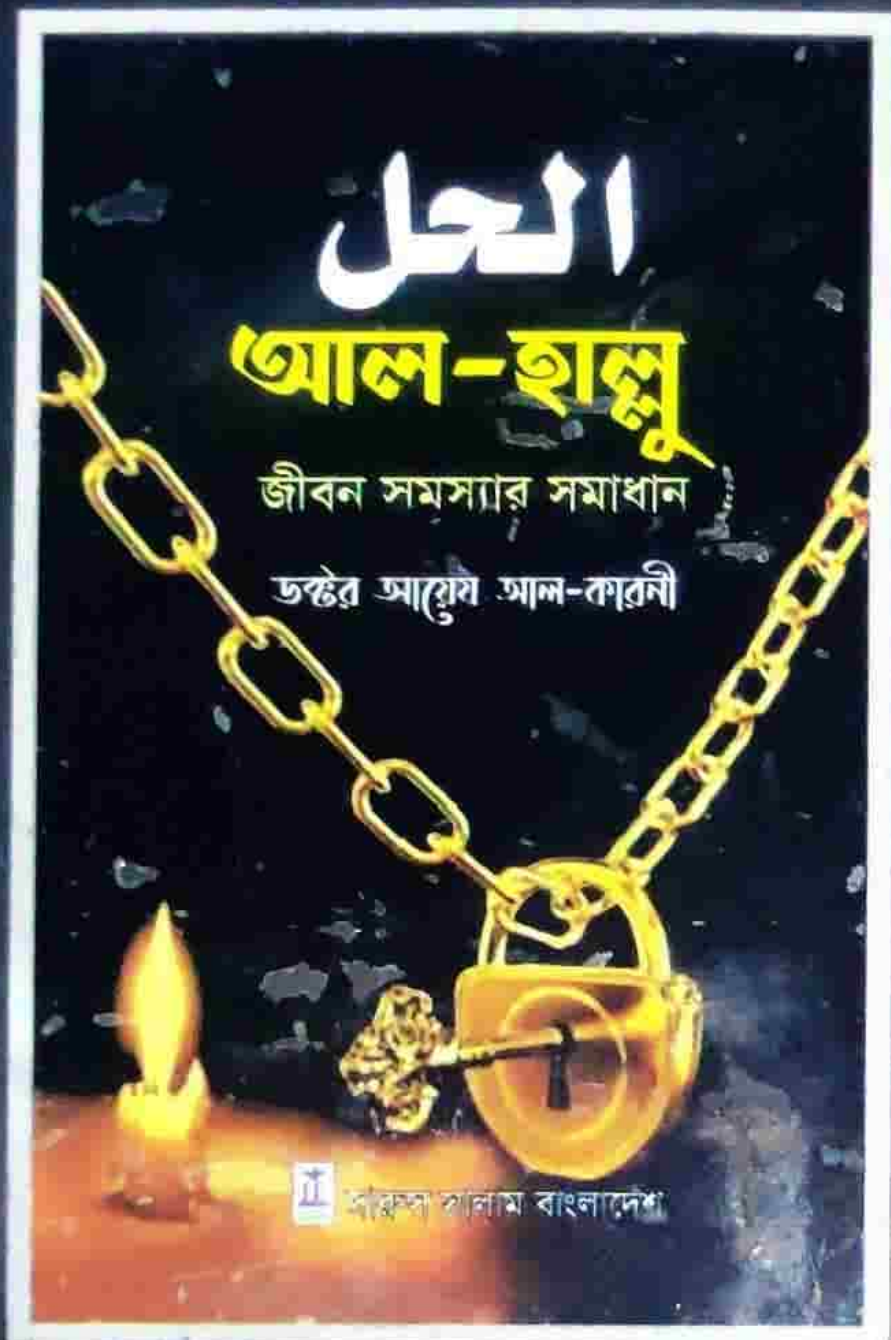
অর্থ: ‘হিংসুকেরা আমার দৃঢ়তা অবিচলতা দেখুক, আমি তাদের দেখিয়ে দিতে চাই কালের ঘাত-প্রতিঘাতে আমি নিঃশেষ হবার নই। মৃত্যু যখন তার নখদন্ত বের করে আগ্রাসী হয়ে উঠে, তখন গলায় যতো তাবিজ-কবজ বুলাও না কেন, কোনো লাভ নেই।’

দারুস সালাম বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
১.	কুরআনুল কারীম (সরল অনুবাদ, টীকা হাদীস)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক; মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ	১০০০ টাকা
২.	আল কুরআনের সারমর্ম	শাহ আলম খান ফারুকী; ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৭৫০ টাকা
৩.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-১	ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক; মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৫০০ টাকা
৪.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-২	ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক; মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৫০০ টাকা
৫.	আসুন আল্লাহর সাথে কথা বলি	মাওলানা মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	৩৫০ টাকা
৬.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী (আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রতিদিন)	মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	৩৭৫ টাকা
৭.	বিভিন্ন দরুদ ও অজীযাহ	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৭০ টাকা
৮.	দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১	মুহাম্মদ ইসরাফিল	১৪০ টাকা
৯.	দারুসুল কুরআন (শেষ ১৪ সূরা)	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	১৮০ টাকা
১০.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও হাদীস সংকলন		১১০ টাকা
১১.	তিন ভাষায় উচ্চারণসহ Quranic Vocabulary	আব্দুল করিম পারেশ	৩৪০ টাকা
১২.	কুরআন অধ্যয়নের গুরুত্ব	ড. মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান	৬০ টাকা
১৩.	সহীহ আল-বুখারী (প্রথম খণ্ড)	হাফেয ইমাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)	১০০০ টাকা
১৪.	সহীহ আল-বুখারী (দ্বিতীয় খণ্ড)	হাফেয ইমাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)	১০০০ টাকা
১৫.	সহীহ আল-বুখারী (তৃতীয় খণ্ড)	হাফেয ইমাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)	১০০০ টাকা
১৬.	সহীহ আল-বুখারী (চতুর্থ খণ্ড)	হাফেয ইমাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)	১০০০ টাকা
১৭.	সহীহ আল-বুখারী (পঞ্চম খণ্ড)	হাফেয ইমাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)	১০০০ টাকা
১৮.	সহীহ আল-বুখারী (ষষ্ঠ খণ্ড)	হাফেয ইমাম শাইখ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)	১০০০ টাকা
১৯.	সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জীবনী	ডক্টর মাজেদ আলী খান	৬০০ টাকা
২০.	আর-রাহীকুল মাখতুম	আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী	৭৫০ টাকা
২১.	আল-কুরআনে নারী (নারীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাহের উদ্দিন	২৯০ টাকা
২২.	মহানবী ﷺ-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছানাহ উদ্দিন কাসেমী	২৫০ টাকা
২৩.	কেমন ছিলেন রাসূল ﷺ	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেন বিন আলী আশ শিকী	২৩০ টাকা
২৪.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিপুল জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৬০ টাকা
২৫.	আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৯০ টাকা
২৬.	মহিলা সাহাবীদের জীবনচিত্র	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	১৪০ টাকা
২৭.	সাহাবীদের জীবন চিত্র (১)	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৪০০ টাকা
২৮.	সাহাবীদের জীবন চিত্র (২)	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩৫০ টাকা
২৯.	মুস্তফা একমাত্র পথ শিরকমুক্ত ইবাদাত	আহসান ফারুক	২১০ টাকা
৩০.	রাসূল ﷺ-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাহের উদ্দিন	২৯০ টাকা
৩১.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বারো চান্দ্রের ফজিলত	তুর্কী উসমানী; আহসান ফারুক	২৬০ টাকা
৩২.	শব্দার্থে হিসনুল মুনলিম	সাদিয়েদ ইবনে আলী আল কাহতানী	১২৫ টাকা
৩৩.	তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	ডক্টর ফয়লে এলাহী	২০০ টাকা
৩৪.	রাহমাতুলিলিলা আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী; আল্লামা আবু আবদুর রহমান	৪০০ টাকা
৩৫.	কিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূলের ভবিষ্যৎ বাণী	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২০০ টাকা

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিরা
৩৬.	কিয়ামতের বর্ণনা রাসূল ﷺ দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৪০ টাকা
৩৭.	লা-তাহযান (হতাশ হবেন না)	ড. আয়েয আল কারনী	৬০০ টাকা
৩৮.	রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘণ্টার আমল	প্রফেসর ইউসুফ আলী শেখ	৪০০ টাকা
৩৯.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামায	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৪০০ টাকা
৪০.	সোনামণিদের সুন্দর নাম	মোঃ আব্দুল লতীফ	২৫০ টাকা
৪১.	মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	৩৭৫ টাকা
৪২.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে কবীরা ওনাহ	ইমাম আব যাহাবী	২৭৫ টাকা
৪৩.	বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি	৩৫০ টাকা
৪৪.	ইসলামে নারী	আল বাহি আল খাওলী	৩৮০ টাকা
৪৫.	ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালোবাসা	আল্লামা ইবনুল জাওযী	২৫০ টাকা
৪৬.	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না	প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী	২৮০ টাকা
৪৭.	গল্পে গল্পে আবু বকর রাঃ	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৮০ টাকা
৪৮.	গল্পে গল্পে ওমর রাঃ	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৮০ টাকা
৪৯.	গল্পে গল্পে ওসমান রাঃ	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৮০ টাকা
৫০.	গল্পে গল্পে আলী রাঃ	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৮০ টাকা
৫১.	গল্পে গল্পে ওমর বিন আব্দুল আযীয	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৮০ টাকা
৫২.	গল্পে গল্পে খালিদ বিন ওয়ালীদ	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৫০ টাকা
৫৩.	প্রথম মুসলমান হযরত খাদিজা রাঃ	রাশীদা হাইলামাঘ	১৮০ টাকা
৫৪.	আদাবে যিন্দেগী	আল্লামা ইউসুফ ইসলামী	৩২০ টাকা
৫৫.	মহিলা সাহাবী	তানীবুল হাশেমী	৪০০ টাকা
৫৬.	ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা	ডক্টর মুহাম্মদ নুরুল আমিন	৩৫০ টাকা
৫৭.	বিষয়ভিত্তিক হাদীসে কুদসী	তাহকীক : নাসিরুদ্দিন আলবানী	২৪০ টাকা
৫৮.	কিভাবে সফল হবেন	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৫০ টাকা
৫৯.	রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদর্শিত সালাত ও যিক্র	আহসান ফারুক	১৮০ টাকা
৬০.	সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায়	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	১৭৫ টাকা
৬১.	সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কে?	মুহাম্মাদ হারেছ উদ্দিন	২৬০ টাকা
৬২.	খোলাফায়ে রাশেদীনের ৬০০ শিক্ষণীয় ঘটনা	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী (মিশর)	৪০০ টাকা
৬৩.	খোলাফায়ে রাশেদীন জীবন ও কর্ম	মোহাম্মদ নাহের উদ্দিন	৫০০ টাকা
৬৪.	Injoy Your Live জীবন উপভোগ করুন	ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল আরিফী	৪৮০ টাকা
৬৫.	সহীহ নি'য়ামুল কোরআন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী; আহসান ফারুক	৪০০ টাকা
৬৬.	হায়াতুল হায়ওয়ান	আহাম্মদ বাজাত	৩০০ টাকা
৬৭.	ইসলামে মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার	আল্লামা ইউসুফ ইসলামী; মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	২০০ টাকা
৬৮.	আল্লাহর অভিশাপ যাদের উপর	ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	১২০ টাকা
৬৯.	সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি	আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী	২৫০ টাকা
৭০.	আলোকিত নারী	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	২১০ টাকা
৭১.	আবু বকর সিদ্দিক রাঃ	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	২৯০ টাকা
৭২.	রাসূল ﷺ-এর চোখে দেখা কবরের আযাব	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২২০ টাকা
৭৩.	ইসলামে হালাল হারামের বিধান	আল্লামা ইউসুফ আল-কারজাভী	৪০০ টাকা
৭৪.	ছোটদের বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	সানিয়াসনাইন খান	১৬০ টাকা
৭৫.	ছোটদের মূসা নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	১৫০ টাকা
৭৬.	ছোটদের ইউসুফ নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	১৫০ টাকা
৭৭.	ছোটদের হযরত আয়েশা ও উম্মে আয়মান রাঃ	নাফিস খান, টরেন্টো, কানাডা	১২৫ টাকা
৭৮.	ছোটদের হযরত উসমান ও হযরত আলী (রা.)	নাফিস খান, টরেন্টো, কানাডা	১২৫ টাকা
৭৯.	মুসলিম পরিবারের সন্তানেরা আজ কেন ইসলাম বিমুখ?	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	২২০ টাকা
৮০.	কেন মুসলিম হলাম?	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	১৮০ টাকা
৮১.	হিসনুল মুসলিম (বড়)	সাদিয়েদ ইবনে আলী আল কাহতানী	২৪০ টাকা

ক্র. নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
৮২.	কিরামত কখন হবে?	ড. খ. ম. আব্দুর রাজ্জাক; মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	৪৫০ টাকা
৮৩.	বহা প্রবর (পৃথিবী যখন ধ্বংস হবে)	ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আল আরিফী	৫০০ টাকা
৮৪.	আধুনিক রান্না ও খাদ্য পুষ্টি	জাকিয়া ফরহাদ	৪০০ টাকা
৮৫.	সাইয়াদা ফাতেমাতুজ্জাহরা	প্রফেসর মুহাম্মদ বাইয়ুমী মিহরান	২৫০ টাকা
৮৬.	কাসাছুল আখিয়া (আল কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী রাসূল)	ইবনে কাসীর (রহ.)	৭৫০ টাকা
৮৭.	জীন কেন্দ্রিক অসুস্থতা প্রতিকার		২৫০ টাকা
৮৮.	আল কুরআন ও বিজ্ঞান	মুহাম্মাদ শামীম আবতার	৪২৫ টাকা
৮৯.	সায়বৌফিক আল কুরআন	মোহাম্মাদ নাছের উদ্দিন	২৫০ টাকা
৯০.	এভাবে হানীস	আবদুল গাকফার হাসান নদভী	২৪০ টাকা
৯১.	রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্মরণীয় ঘটনা	আব্দুল মানিক মুজাহিদ	৩০০ টাকা
৯২.	কিতাবুস সালাত	মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী	২৮০ টাকা
৯৩.	রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে নামায পড়তেন	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	৬০ টাকা
৯৪.	রুগ্ন ব্যক্তির নামাযের বিধান	শারহে আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায রহ.	৫০ টাকা
৯৫.	দু'আ-মুনাজ্জাত ও সহীহ ওষীয়া	মুহাম্মদ আহসান ফারুক	২৩০ টাকা
৯৬.	আল্লাহর শেখানো দু'আ ও মুনাজ্জাত	ড. খ. ম. আব্দুর রাজ্জাক	৬০ টাকা
৯৭.	সহীহ ফিকহুন নিসা	আমর আবদুল মুনিম সেলিম	৪৫০ টাকা
৯৮.	মুহুর ও হুত ব্যক্তিদের জন্য জীবিতদের করণীয় ও বর্জনীয় আমল	ড. খ. ম. আব্দুর রাজ্জাক	১২০ টাকা
৯৯.	আবু বকর ছিনিক		২৯০ টাকা
১০০.	উমর ইবনুল খাত্তাব		৩৫০ টাকা
১০১.	সাহাবীদের সাথে ৩৬৫ দিন	মুহাম্মাদ খালিদ পারভেজ	৪০০ টাকা
১০২.	তাবেইদের জীবন চিত্র	ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা	৩৫০ টাকা
১০৩.	আবু-মুহম্মদ আল্লাহর রাসূলগণ দুনিরাকে যেভাবে দেখেছেন	ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ.	২২৫ টাকা
১০৪.	হুদয়ের ব্যাধি ও প্রতিকার	শহীদুল ইসলাম ও ইবনে তাইমিয়া রহ.	২২৫ টাকা
১০৫.	পরিভ্রম জীবন আল্লাহ জীবিত পূর্ণাঙ্গ রূপ	মোঃ আফনাতুন কাইছার	২০০ টাকা
১০৬.	জার্নি টু আল্লাহ	হাফিজ ইবনে রুজব আল-হাম্বলী রহ.	২৩০ টাকা
১০৭.	আল্লাহর দিকে আহ্বান	ড. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আরিফী	২০০ টাকা
১০৮.	বিত্রে	মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী	২৪০ টাকা
১০৯.	নুবেহর মন্ডানে	ড. আয়েয আল কারনী	৩০০ টাকা
১১০.	পরকাল THE LAST WORLD	ড. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আরিফী	৬৫০ টাকা
১১১.	মুসলিম জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কীলানী	৩৭৫ টাকা
১১২.	শান্তির সংলাপ	খালিদ আবুল ফুতুহ, আব্দুল্লাহ আল মামুন আযহারী	২৫০ টাকা
১১৩.	মুনলমানের ঘর	ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আল-আরিফী	১২০ টাকা
১১৪.	স্বপ্নপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ	ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আল-আরিফী	১২০ টাকা
১১৫.	রাসূল ﷺ-এর সেনাপতিগণ		২০০ টাকা
১১৬.	মহিলা সাহাবীদের ১০১ গল্প ও দু'আ	মুহাম্মদ খালিদ পারভেজ	২০০ টাকা
১১৭.	সাহাবীদের গল্প	মুহাম্মদ হারুন রশীদ ও ইনরাত জে. রুমি	২০০ টাকা
১১৮.	শিও সাহাবীদের জীবন কথা		২০০ টাকা
১১৯.	বাদীয়া		১৮০ টাকা
১২০.	মা আদর্শ সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা		২২০ টাকা
১২১.	জ্ঞান বৃদ্ধির শত গল্প		২০০ টাকা
১২২.	গল্পে আকা কুরআন		২২৫ টাকা
১২৩.	এসো নবীদের গল্প জনি		২০০ টাকা
১২৪.	গল্পে আকা রাসূল ﷺ-এর আদর্শ		১৮০ টাকা
১২৫.	গল্পে গল্পে ছোটদের ৩৬৫ দিন-১	আলী কারাকাম ও হাসিব শাহিন	০০ টাকা
১২৬.	গল্পে গল্পে ছোটদের ৩৬৫ দিন-২	আলী কারাকাম ও হাসিব শাহিন	২০০ টাকা
১২৭.	গল্পে গল্পে ছোটদের ৩৬৫ দিন-৩	আলী কারাকাম ও হাসিব শাহিন	২০০ টাকা
১২৮.	অনুপম আদর্শ সাহাবায়ে কেবাম	হাইদাস মুয়াফফাক হাফিজ	২০০ টাকা



B The Bright
Design Zaker
No. 01711111111

ISBN 978-984-91104-1-5



9 598241 289510



দারুস সালাম বাংলাদেশ

কুরআন ও সুন্নাহ তিত্তিক প্রকাশনা

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯

E-mail: darussalambangladesh@gmail.com